পরিবেশ ও বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি **সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র** রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে: সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক **ন্যায়বিচার**; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার **স্বাধীনতা**; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের **সমতা** প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে **সৌভ্রাতৃত্ব** গড়ে তুলতে; **আমাদের গণপরিষদে**, আজ, 1949 সালের 26 নভেম্বর, **এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবদ্ধ করছি** এবং **নিজেদের অর্পণ করছি**।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens : JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all – FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ দলিল দুটিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই কমিটির বিষয়-বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক চেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের ফসল হলো এই বইটি।

এই বিজ্ঞান বইটি অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে ও নামকরণ করা হয়েছে 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। অতীব সহজ সরল ভাষায় বইটিতে পরিবেশ, ভৌত ও জীবনবিজ্ঞানের বিভিন্ন অভিমুখ আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন ছবি, প্রতিকৃতি, চিত্রের নকশা ব্যবহার করে পরিবেশ ও বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের যাতে তথ্য ভারাক্রান্ত না হতে হয়, সে বিষয়ে লক্ষ রাখা হয়েছে। লেখা ও ছবিগুলি যাতে শিশুমনে আকর্ষণীয় হয় সেদিকে নজর রেখে উৎকৃষ্ট মানের কাগজ, কালি ও রং ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি পর্ষদ প্রণীত 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হবে ও তাদের শিখন সামর্থ্য বাড়াবে। অন্যদিকে সক্রিয়তা-নির্ভর অনুশীলনীর মাধ্যমে তাদের বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ে আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে।

প্রথিতযশা শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাপ্রেমী শিক্ষাবিদ, বিষয়-বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দ — যাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও নিরলস পরিশ্রমের ফলে এই সর্বাঙ্গসুন্দর গুরুত্বপূর্ণ বইটির প্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁদের সকলকে পর্ষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের সহায়তায় বইটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এই প্রকল্পকে কার্যকরী করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন সাহায্য করে পর্ষদকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে তা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে।

আশা করি পর্ষদ প্রকাশিত এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আকর্ষণীয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানচর্চার মান উন্নততর করতে সহায়ক হবে। ছাত্রছাত্রীরা উদবুদ্ধ হবে। এইভাবে সার্থক হবে পর্ষদের সামাজিক দায়বদ্ধতা।

সমস্ত শিক্ষাপ্রেমী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন বিনা দ্বিধায় বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্ষদের নজরে আনেন যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়। এতে বইটির মান উন্নত হবে এবং ছাত্রসমাজ উপকৃত হবে। ইংরেজিতে একটি আপ্তবাক্য আছে যে, 'even the best can be bettered'। বইটির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক সমাজের ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের গঠনমূলক মতামত ও সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ডিসেম্বর, ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞান বইয়ের নাম 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (২০০৫) অনুযায়ী জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান ও পরিবেশ সমন্বিত আকারে একটি বইয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হলো। সহজ ভাষায় এবং উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সহযোগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বুনিয়াদি ধারণা শিক্ষার্থীদের সামনে আমরা উপস্থাপিত করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন চিত্র সংযোজন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীর কাছে বইটি আকর্ষণীয় এবং প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি আমরা স্মরণে রেখেছি—'তাহার ভাষা ও বিষয়বিন্যাস যতদূর সম্ভব সহজ করা উচিত, নতুবা ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির অন্যায় এবং নির্দয় অপব্যয় সাধন করা হয়।' (ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক)। ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রথম 'বিজ্ঞান' আলাদা বিষয় হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে বিন্যস্ত হয়েছে। অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবেশে আর বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক সন্ধানে ব্রতী হবে এবং উৎসাহ নিয়ে বিজ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে পড়বে, এই আমাদের প্রত্যাশা।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

পুস্তক নির্মাণ ও বিন্যাস

অধ্যাপক অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্যসচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

ড. সন্দীপ রায় ড. শ্যামল চক্রবর্তী পার্থপ্রতিম রায় দেবব্রত মজুমদার

সুদীপ্ত চৌধুরী ড. ধীমান বসু রুদ্রনীল ঘোষ দেবাশিস মণ্ডল

নীলাঞ্জন দাস বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

পরামর্শ ও সহায়তা

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ মজুমদার ড. শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য ডা. সুব্রত গোস্বামী

অধ্যাপক অমূল্যভূষণ গুপ্ত শিবপ্রসাদ নিয়োগী

পুস্তক সজ্জা

প্রচ্ছদ—দেবাশিস রায়

অলংকরণ — দেবাশিস রায় ও শংকর বসাক

সহায়তা — হিরাব্রত ঘোষ, অনুপম দত্ত, বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

অষ্টম শ্রেণির পরিবেশ ও বিজ্ঞান বই নিয়ে কিছু কথা

বিজ্ঞানের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে মানুষ বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেছিল প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থেকে। এক সময়ে প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের অনেক ধারণাই স্পষ্ট ছিল না। গ্রিক দার্শনিকদের যুগ থেকে শুরু করে মানুষের ধারণার বিবর্তনের পথে প্রধান সহায় ছিল পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আমাদের এই বইয়ে তাই পড়ার পাশাপাশি হাতেকলমে পরীক্ষা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শুধু বিদ্যালয়স্তরের পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়, পরিপূরকরূপে চাই শিক্ষক/শিক্ষিকা ও বিজ্ঞান বই। আমাদের এই বই ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের পথে যাত্রায় সহায়ক হবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।

আমরা ছাত্রছাত্রীকে বিজ্ঞানের প্রথাগত (Formal) ধারণায় দীক্ষিত করতে চাই, কিন্তু সে যাত্রায় আমরা অনুসরণ করব শিখনের Constructivist পন্থা। আজ সারা বিশ্বে পঠনপাঠনে অনুসৃত এই Constructivist পন্থার মূল কথা হলো শিক্ষার্থীকে তার পরিচিত জগৎ থেকে পাওয়া ধারণাগুলির সাহায্য নিয়ে ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষায় দীক্ষিত করা। যেহেতু বিজ্ঞানের সবকিছুই Intuitive নয়, তাই শিক্ষক/শিক্ষিকাকে Experiential Learning, Concept Learning ও Knowledge Construction- এর বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিখন পরিচালনা করতে হবে।

এই বইটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমন্বয়ী প্রচেষ্টার (Integrated Approach) ফসল। আমরা মনে করি দুটি প্রচ্ছদের মধ্যে জীববিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান ও পরিবেশ অন্তর্ভুক্ত করলেই সমন্বয় সাধিত হয় না। বিষয়গুলির মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপন এবং মেলবন্ধনের চেষ্টাই এই বইটিকে অন্য মাত্রা দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বিজ্ঞানের পথে মানুষের যাত্রার ইতিহাস বিচিত্র। বহু আত্মত্যাগ-সাফল্য-বিফলতা-উপেক্ষা-সামাজিক অপমানের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। আমরা চেয়েছি ছোটোবেলা থেকেই কিশোর-কিশোরীরা বরেণ্য বিজ্ঞানীদের কথা জানুক, তাঁদের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস থেকে প্রেরণা লাভ করুক। তাঁদের আত্মত্যাগ ছাড়া আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হতো না। অনেকক্ষেত্রেই তাই বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ছবি সংযোজিত হয়েছে।

একবিংশ শতকে পৃথিবীর ক্রমহ্রাসমান জীববৈচিত্র্যের প্রতি নবীন শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে এই বইতে জীববৈচিত্র্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হলো।

বিজ্ঞানে তথ্যানুসন্ধান ও সংগৃহীত তথ্যের যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের এই বইয়ের পাঠক ও পাঠিকাদের বহুক্ষেত্রেই Open-ended প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। এই ধরনের প্রশ্ন/কর্মপত্রগুলি ছাত্রছাত্রীদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি ও পাঠ্যবইয়ের বাইরের জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণে উৎসাহী করে তুলতে সংযোজিত হয়েছে। এটিও এই বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বইটি সম্বন্ধে যে-কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

1.1 বল ও চাপ

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা **বল** সম্বন্ধে জেনেছ। **বল** প্রয়োগ ছাড়া আমরা কোনো কাজই যে করতে পারি না, তা দেখেছ। কোনো স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে, কোনো গতিশীল বস্তুর গতির দিক পরিবর্তন করতে বা ওই গতিকে আরও দ্রুত বা মন্থর করতে আমাদের **বল** প্রয়োগ করতে হয়। শুধু কী তাই? কোনো বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতেও **বল** দরকার। একটি স্প্রিংকে সংকুচিত করে ছোটো করা বা প্রসারিত করে লম্বা করা, **বল** প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। আমাদের শরীরের মধ্যেও এরকম কত **বল** যে কত জায়গায় কাজ করে তা ভাবলে অবাক হতে হয়! যখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকি, তখন আমাদের সারা শরীরের পেশিগুলোর মধ্যে, হাড়ের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় **বল** কাজ করে বলেই আমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তোমরা যদি তোমাদের চারপাশে ঘটতে থাকা নানারকম ঘটনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো, দেখবে **বলের** ক্রিয়ার এরকম আরো অনেক কথা তোমাদের মাথায় আসবে। কোথায় কীভাবে **বল** ক্রিয়া করছে তা ভেবে মজা পাবে।

বল ও **গতি** বিষয়ে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন আমাদের যে তিনটি সূত্র বলে গিয়েছেন, তার সম্বন্ধেও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ। চলো আরো একবার দেখি ওই সূত্রগুলো থেকে আমরা ঠিক কী শিখেছি।

- প্রথম সূত্র থেকে আমরা শিখেছি, একটি বস্তুর ওপর কোনো **বল** কাজ করছে কিনা তা বুঝতে বস্তুটির বেগ বদলাচ্ছে কিনা তা দেখতে হয়। বস্তুর বেগ না বদলালে বা বস্তুটি থেমে থাকলে বুঝতে হবে যে বস্তুটির ওপর কোনো **বল** কাজ করছে না, বা বস্তুটির ওপর ক্রিয়াশীল **বল**গুলির যোগফল শূন্য।

- দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা শিখেছি কোনো বস্তুর ওপর প্রয়োগ করা **বল** যত জোরালো হবে, প্রতি সেকেন্ডে ওই বস্তুর বেগের পরিবর্তন, মানে **ত্বরণ**ও তত বেশি হবে। **বল** যদি দ্বিগুণ হয়, ওই বলের জন্য উৎপন্ন **ত্বরণ**ও দ্বিগুণ হবে।

- তৃতীয় সূত্র থেকে আমরা এটা বুঝেছি যে, যখন একটি বস্তু অন্য আর একটি বস্তুর উপর কোনো **বল** প্রয়োগ করে, তখন একই সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুটিও প্রথম বস্তুটির উপর উলটো দিকে **সম মানের বল** প্রয়োগ করে। এই দুটি বলের একটিকে যদি বলি **ক্রিয়া** তবে অন্য **বল**টিকে বলা হয় **প্রতিক্রিয়া**।

এখন প্রশ্ন হলো, এই **বল** মাপা হবে কীভাবে? কোন **বল** বেশি আর কোনটা কম তা জানব কীভাবে?

বলের পরিমাপ ও একক

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে **বল**-এর পরিমাণ জানতে ওই **বল**-এর প্রভাবে কী ঘটল তার হিসেব করতে হয়। টেবিলের ওপর একটি বই রেখে সেটিকে হাত দিয়ে তুমি একবার ধাক্কা দিলে আর একবার তোমার বন্ধু ধাক্কা দিল। যে ধাক্কার জন্য ওই থেমে থাকা বইটিতে বেশি বেগের সৃষ্টি হলো, তাতে নিশ্চয়ই বল প্রয়োগ করা কালীন বেশি ত্বরণ সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে সেই ধাক্কাতে বইটিতে নিশ্চয়ই বেশি বল প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর ওপরে কতটা বল প্রয়োগ করা হলো তা এভাবেই বলের প্রভাব দেখে, অর্থাৎ ত্বরণ মেপে, হিসেব করতে হয়। নিউটনের সূত্র থেকে এব্যাপারে আমরা একটি সমীকরণও

পেয়েছি—

বল = বস্তুর ভর × বলের প্রভাবে বস্তুতে উৎপন্ন ত্বরণ

F = m × a [যেখানে F = বল, m = ভর এবং a = ত্বরণ]

একটি এক কেজি ভরের বস্তুর ওপর যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বস্তুটিতে এক মিটার/সেকেন্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি হয়, সেই পরিমাণ বলকে **এক নিউটন** বল বলা হয়। এই এক নিউটন হলো SI পদ্ধতিতে বল মাপার একক। নিউটনকে **N** দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তুমি যখন একটি এক কেজি ভরের বাটখারাকে হাতে ধরে রাখো তখন তোমার হাতে ওই বাটখারাটি যে বল প্রয়োগ করে তার মাপ হলো প্রায় 9.8 নিউটন।

আমরা দেখলাম, আইজ্যাক নিউটনের দেওয়া সমীকরণ ব্যবহার করে যদি বল মাপতে হয় আমাদের **ত্বরণ**-এর মান জানা চাই। কিন্তু হাতে ধরে থাকা বাটখারাটি বা তোমার হাত দুই-ই তো স্থির— কোনো ত্বরণ নেই। এক্ষেত্রে বল মাপার উপায় কী ? কিংবা ধরা যাক, সুতো (বা দড়ি)-তে একটি ইটের টুকরোকে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছ। আর সুতোর অন্য মাথাটা তুমি ধরে আছ। তুমি দেখছ ইটের টুকরোটা স্থির সেটির কোনো ত্বরণ নেই। অথচ হাতে ধরে বেশ বুঝতে পারছ যে ইটের টুকরোটা সুতোটাকে নীচের দিকে টানছে। তোমার হাতে টান পড়ছে। এক্ষেত্রেই বা বল মাপা হবে কীভাবে? হাতে ধরা বাটখারা বা সুতোয় ঝোলানো ইট— এই দুটোর ওপরেই পৃথিবীর টান নীচের দিকে। এই টানকে আমরা বলি অভিকর্ষ বল বা বস্তুর ওজন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে এটা তোমরা জেনেছ। আমরা নিউটনের সূত্র থেকে এটাও জেনেছি যে বল প্রয়োগ হলে ত্বরণ সৃষ্টি হবেই।

তাহলে ভেবে দেখো বাটখারা বা ইটের টুকরো স্থির রয়েছে কেন? অভিকর্ষ বল প্রয়োগ হওয়া সত্ত্বেও কোনো ত্বরণ সৃষ্টি হয়নি কেন? ওদের ওপর কি তাহলে অন্য কেউ পৃথিবীর টানের উলটোদিকে কোনো সমান বল প্রয়োগ করেছে?
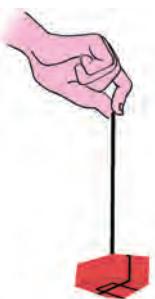
ঠিক ধরেছ। বাটখারার ক্ষেত্রে তোমার হাত, আর ইটের টুকরোর ক্ষেত্রে সুতো এই উলটো বল প্রয়োগ করছে। পৃথিবীর অভিকর্ষের টানে যখন বাটখারা বা ইটের টুকরো নীচের দিকে যেতে চাইছে তখন বাটখারাটি হাতের ওপর, আর ইটের টুকরোটি সুতোর ওপর নীচের দিকে একটি বল প্রয়োগ করছে। ফলে, নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী, হাতও বাটখারার ওপর নীচ থেকে উপরের দিকে এবং সুতোও ইটের ওপর নীচ থেকে উপরের দিকে সমান মানের বল প্রয়োগ করছে। তাই দুটি সমান বল উলটো দিকে কাজ করায় ইট বা বাটখারার উপর মোট বলের মান শূন্য হয়ে গেছে। ফলে কোনো ত্বরণ তৈরি হয়নি।

ত্বরণ তৈরি না হলেও দুটি সমান মানের বল উলটোদিকে কাজ তো করছে। এই বল দুটিকে মাপার উপায় কী?

চলো একটা পরীক্ষার কথা জানা যাক।

একটি স্প্রিং নেওয়া হলো। সেটিকে কোনো একটি হুক থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এবার যদি স্প্রিংটির অন্য প্রান্ত থেকে একটা ভারী বাটখারা বা পাথরের টুকরো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে, স্প্রিংটি একটু লম্বা হয়ে গেছে। আগের বাটখারার বদলে, তার দ্বিগুণ ভারী একটা বাটখারা বা অন্য কিছু ঝুলিয়ে দিলে কী দেখা যাবে? স্প্রিংটা আগের থেকে বেশি লম্বা হয়ে যাবে কি? বেশি ভারী বস্তু ঝোলালে স্প্রিং

-এর প্রসারণের পরিমাণও যে বেশি হয় এটা নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যাবে। খুঁটিয়ে নজর করলে দেখবে যে, দ্বিগুণ ভরের বস্তু ঝোলালে স্প্রিং-এর প্রসারণও দ্বিগুণ হয়।

স্প্রিং থেকে ঝোলানো বাটখারা বা ভারী পাথরের টুকরো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তার কোনো ত্বরণ থাকে না। কিন্তু সেই ঝুলন্ত বস্তুটি স্প্রিং-এর ওপর যে বল প্রয়োগ করে, তার প্রভাবে স্প্রিংটি দৈর্ঘ্যে বেড়ে যায়। স্প্রিং-এর ওপর প্রয়োগ করা বল বেশি হলে, স্প্রিং-এর প্রসারণের মানও বেশি হয়— এই ঘটনাকে আমরা বল মাপার কাজে ব্যবহার করতে পারি।

পাশের ছবিতে একটি স্কেল ও একটি ঝুলন্ত স্প্রিং পাশাপাশি নেওয়া হয়েছে। স্প্রিং-এর ঝুলন্ত প্রান্তে ছবির মতো একটি কাঁটা বা সূচক লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার স্প্রিং-এর ঝুলন্ত প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ওজন ঝুলিয়ে দিয়ে দেখা হচ্ছে যে কাঁটা বা সূচকটি স্কেলের কোন দাগে থাকে। এভাবে বিভিন্ন ওজনের জন্য সূচকের বিভিন্ন পাঠ পাওয়া সম্ভব। যখন কোনো ওজন ঝোলানো হয়নি তখন স্প্রিং-এর ওই সূচক যেখানে থাকে, তাকে শূন্য নাম দেওয়া হয়। যখন 1 কেজি ভরের কোনো বস্তুকে ঝোলানো হয় তখন ওই সূচক যেখানে নেমে আসে সেখানকার পাঠকে নাম দেওয়া হয় 1 কেজি বা 9.8 নিউটন। অর্থাৎ সূচকের অবস্থান দেখে বুঝতে হবে যে, 1 কেজি ভরের বস্তুকে পৃথিবী যে বল দিয়ে টানে, ঠিক সেই পরিমাণ বল স্প্রিংটির ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এভাবে 2 কেজি, 3 কেজি ইত্যাদি বিভিন্ন ভরের বস্তুর জন্য স্প্রিং-এর সূচকের অবস্থান দেখে স্প্রিং-এর ওপর কত বল প্রয়োগ করা হয়েছে তা মাপা যায়। বল প্রয়োগের ফলে স্প্রিং-এর এই প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে বল মাপার যন্ত্র **স্প্রিং তুলা** তৈরি করা হয়েছে।

ধরা যাক, তুমি স্প্রিং তুলাকে দু-দিক থেকে টানলে আর স্প্রিং তুলার কাঁটা 3 কেজি পাঠ দেখাল। এর অর্থ কী? এর অর্থ হলো যে তুমি স্প্রিং তুলাকে যে বল দিয়ে দু-দিকে টেনেছ, সেই বলের প্রতিটির পরিমাণ একটি 3 কেজি ভরের বস্তুকে পৃথিবী যে বল দিয়ে টানে তার সঙ্গে সমান। এই বলের মান (3×9.8) নিউটন বা 29.4 নিউটন।

ঘর্ষণ ও তার পরিমাপ

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা ঘর্ষণ বল সম্বন্ধে জেনেছ। এখানে আমরা দেখব ঘর্ষণ বলের হিসেব কীভাবে করা হয়।

টেবিলের ওপর একটি বাক্স রাখা আছে। আর তুমি একটি স্প্রিং তুলার সাহায্যে বাক্সটিকে টানছ। স্প্রিং তুলা দিয়ে টানার ফলে তুমি কত জোরে টানছ তা মাপতে পারছ। ধরা যাক, স্প্রিং তুলার কাঁটা 1 কেজি বা 9.8 নিউটনের দাগে আছে। অর্থাৎ তুমি বাক্সটিকে 9.8 নিউটন বল দিয়ে ডান দিকে টানছ। যদি এই টান সত্ত্বেও

বাক্সটি স্থির থাকে ও ডানদিকে না সরে, তা হলে নিউটনের প্রথম সূত্র অনুযায়ী তুমি কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো? বাঁ দিকে বাক্সটির উপর নিশ্চয়ই কেউ 9.8 নিউটন বল প্রয়োগ করেছে— যার ফলে বাক্সটির উপর মোট বল শূন্য হয়েছে। এখন প্রশ্ন, বাঁ দিকের এই 9.8 নিউটন বল কে প্রয়োগ করল?
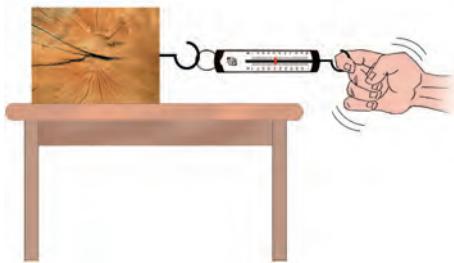
এবার যদি তুমি ওই বাক্সটিকে অন্য একটি টেবিলের ওপর বসাও, যে টেবিলের ওপরের তলটি আরো মসৃণ ও পিচ্ছিল, তাহলে হয়তো দেখবে যে ওই 9.8 নিউটন বল দিয়ে টানলেই বাক্সটি ডান দিকে সরে যাচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, প্রথম টেবিলের ক্ষেত্রে বাঁ দিকের ওই বল টেবিলের উপরিতলই প্রয়োগ করেছিল। যখন টেবিল বদলানো হলো ও পিচ্ছিল তলের ওপর বাক্সটি বসানো হলো, তখন নতুন টেবিলের তল ওই সমপরিমাণ বল (9.8 নিউটন) প্রয়োগ করতে পারেনি। অতএব বোঝা গেল বাক্সটি টানতে গেলেই বাক্সটির নীচের তল, আর টেবিলের উপরের তল—এই দুয়ের সংস্পর্শে একটি বলের জন্ম হয়েছে। বাক্সটিকে টানা মাত্রই ওই বল টানের উলটোদিকে ক্রিয়া করতে শুরু করেছে ও বাক্সটিকে সরতে বাধা দিতে চেয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে ওই বলের মান আর টানের মান সমান। 9.8 নিউটন। তাই প্রথম ক্ষেত্রে দুটি বলের যোগফল শূন্য হয়েছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ওই বলের মান টানের চেয়ে কম। ফলে বাক্স টানের দিকে সরে গিয়েছে। দুটি তলের সংস্পর্শে তৈরি হওয়া এই বলটি যা গতি বা গতি উৎপন্ন করার চেষ্টার বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয় তার নামই হলো ঘর্ষণ বল।

এবার বলোতো, প্রথম ক্ষেত্রে ওই ঘর্ষণ বলের মান কত?

ঠিকই ধরেছ। প্রথম ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলের মান 9.8 নিউটন, অর্থাৎ যে বল দিয়ে ডান দিকে টানা হয়েছে তার সমান।

আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে?

কোনো তলের ওপর স্থির থাকা কোনো বস্তুকে ওই তলের সঙ্গে সমান্তরালে টানা সত্ত্বেও যদি সেটি না সরে, তবেই আমরা বলতে পারি যে ঘর্ষণ বলের মান, টানের মানের সমান। যদি টানের মান স্প্রিং তুলার সাহায্যে জানা সম্ভব হয় তাহলে ঘর্ষণ বলের মানও জানা সম্ভব হয়।

কিন্তু বস্তুটি যদি টানের কারণে চলতে শুরু করে সেক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলের মান এভাবে শুধু স্প্রিং তুলার পাঠ দেখে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যদিও সেক্ষেত্রেও ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে।

বল প্রয়োগ করে টানা সত্ত্বেও যখন কোনো বস্তু কোনো তলের ওপর স্থির হয়ে থাকে, তখন যে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে তার নাম স্থির অবস্থার ঘর্ষণ। আর যখন টানার কারণে বস্তুটি চলতে থাকে তখন যে ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করে তার নাম গতিশীল অবস্থার ঘর্ষণ।

(1)

এবার পাশের ছবিগুলি লক্ষ করো।

1 নং ছবিতে বাক্সটিকে কেউ টানছে না। ভেবে বলো, এখানে কি বাক্সটির ওপর কোনো ঘর্ষণ বল ক্রিয়া করছে?

(2)

2 নং ছবিতে বাক্সটিকে 9.8 নিউটন বল দিয়ে টানা হয়েছে। কিন্তু বাক্সটি স্থির রয়েছে। এখানে ঘর্ষণ বলের মান কত?
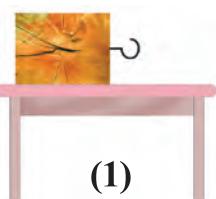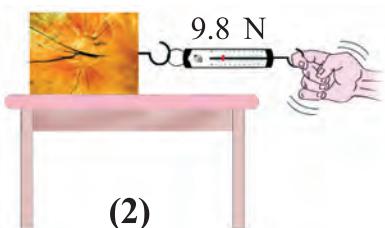
ঘর্ষণ বলটি এক্ষেত্রে কোন দিকে ক্রিয়া করছে?

(3)

3 নং ছবিতে বাক্সটিকে (2×9.8) নিউটন বল দিয়ে টানা হচ্ছে। তবুও বাক্সটি সরছে না। এক্ষেত্রে ঘর্ষণ বলের মান কত আর দিক কোনটি?

(4)
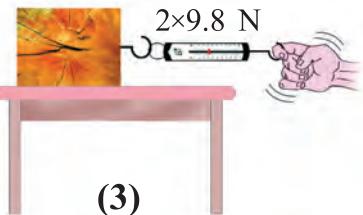
4 নং ছবিতে বাক্সটিকে (3×9.8) নিউটন বল দিয়ে ডানদিকে টানা হচ্ছে ও বাক্সটি ডান দিকে সবে চলতে শুরু করছে। এক্ষেত্রে শুধু স্প্রিং তুলার পাঠ দেখে ঘর্ষণ বলের মান কি নির্ণয় করা সম্ভব?
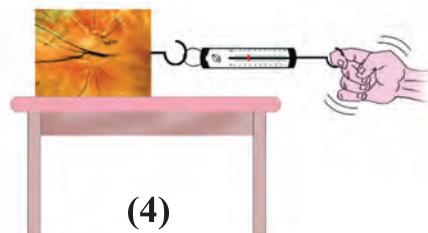
উপরের পরীক্ষাগুলি থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

কোনো একটি বস্তুকে টানা সত্ত্বেও যখন সেটি একটি তলের ওপর স্থির থাকে তখন ওই ঘর্ষণ বলের মান কি নির্দিষ্ট, নাকি বিভিন্ন মানের টানের জন্য বিভিন্ন?

বস্তুর ওপর টানের মান	স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের মান
শূন্য	
5.0 নিউটন	
7.5 নিউটন	
9.8 নিউটন	

যদি স্থির বস্তুটির ওপর টানের মান ধাপে ধাপে বাড়ানো হয় তাহলে স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের মান কেমন হবে তা পাশের সারণিতে লেখো।

যদি বস্তুটির ওপর টান ক্রমাগত বাড়ানো হতে থাকে তাহলে উলটোদিকে ঘর্ষণ বলের মানও কি ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে? না কি ঘর্ষণ বল একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই বাড়বে, ও তারপর বস্তুটি আর স্থির না থেকে সরতে শুরু করবে?

পাশের ছবিতে আরো দুটো পরীক্ষার কথা ভাবা হয়েছে। একটি বস্তুকে একটি কাঠের টেবিলের ওপর রেখে টানা হচ্ছে। যতক্ষণ বস্তুটি না সরে ততক্ষণ টানের মান বাড়ানো হচ্ছে। স্প্রিং তুলার কাঁটা দেখে আমরা সহজেই বিভিন্ন সময়ে ঘর্ষণ বলের মান কত তা জানতে পারি। এমন কী ঠিক কত পরিমাণ টান দিলে বস্তুটি প্রথম সরতে শুরু করবে তাও স্প্রিং তুলার সূচক দেখে নির্ণয় করতে পারি। অর্থাৎ ওই বস্তুটি ওই তলের ওপর থেমে থাকা অবস্থায় ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান কত, অর্থাৎ ঘর্ষণ বল বাড়তে বাড়তে সবচাইতে কত বেশি হয়েছিল, তা স্প্রিং তুলার ওপর নজর রেখে নির্ণয় করা সম্ভব।

(1)

(2)
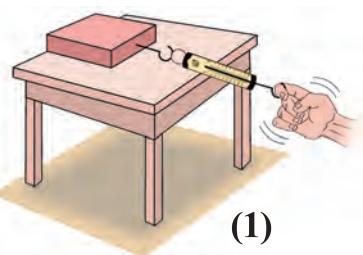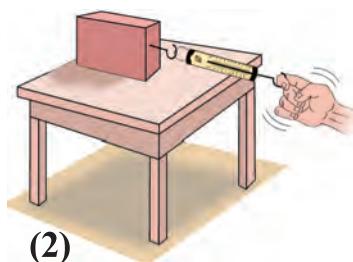
ধরা যাক, 1 নং ছবির মতো করে বস্তুটিকে রেখে একবার পরীক্ষা করা হলো ও স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করা হলো। তারপর ওই বস্তুটিকে 2 নং ছবির মতো রেখে পরীক্ষাটি আবার করা হলো ও স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান আবার নির্ণয় করা হলো। দেখা যাবে যে দুটি ক্ষেত্রেই স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান একই।

এবার ওই বস্তুটিকে একটি কাচের টেবিলের ওপর প্রথমে 1 নং ও তারপর 2 নং ছবির মতো করে রেখে পরীক্ষাগুলি আবার করা হলো। এবারেও দুটি ক্ষেত্রেই স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান একই পাওয়া যাবে। তবে এবারে পাওয়া ওই একই মান কিন্তু কাঠের টেবিলে থাকার সময়কার সর্বোচ্চ মানের সঙ্গে এক হবে না।

এই পরীক্ষাগুলির ফলাফল থেকে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো।

- কোনো একটি বস্তু যখন একটি নির্দিষ্ট তলের ওপর স্থির থাকে, তখন ওই বস্তু ও ওই তলের মধ্যেকার স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান কি সবসময় একই থাকে, না ওই তলের সমান্তরালে দেওয়া টানের পরিমাণের সঙ্গে বদলায়?

- কোনো একটি বস্তুকে কীভাবে একটি তলের ওপর রাখা আছে, অর্থাৎ বস্তুটি তলের যে অঞ্চলকে স্পর্শ করে আছে, তার ক্ষেত্রফল বেশি না কম— তার ওপর কি ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান নির্ভর করে? স্পর্শতলের ক্ষেত্রফল বেশি হলে ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান কি বেশি হয়?

(1)

পাশের তিনটি ছবিতে টেবিলের ওপর একটি বাক্সকে তিনরকম অবস্থায় রেখে টানা হচ্ছে।

প্রথমে শুধু বাক্সটি বসিয়ে সেটি টানা হচ্ছে। তারপর বাক্সটির ওপর একটি 10 কেজির ভারী বাটখারা চাপিয়ে বাক্সটিকে টানা হচ্ছে। আর 3 নং ছবিতে বাক্সটির ওপর 2 টি 10 কেজি-র বাটখারা চাপিয়ে বাক্সটিকে টানা হচ্ছে।

(2)

এই ছবিগুলি লক্ষ করো ও নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

1 নং ছবিতে বাক্সটি টেবিলের ওপর নীচের দিকে যে বল প্রয়োগ করছে তা 2 নং ছবিতে টেবিলের ওপর বাক্সের দেওয়া নিম্নমুখী বলের চাইতে বেশি না কম?

3 নং ছবিতে টেবিলের ওপর বাক্সটি যে নিম্নমুখী বল প্রয়োগ করছে তার মান 2 নং ছবির টেবিলের ওপর বাক্সের দেওয়া নিম্নমুখী বলের চাইতে বেশি না কম?

(3)

বাক্সটি যদি টেবিলের ওপর নীচের দিকে বল প্রয়োগ করে তাহলে টেবিলও নিশ্চয়ই বাক্সের ওপর উপরের দিকে সমান বল প্রয়োগ করছে। কারণ নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী এমনটাই হবার কথা। এবার বলো, কোন ছবির ক্ষেত্রে টেবিল বাক্সটির ওপর সবচাইতে বেশি ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করছে?

তিনটি ছবিতেই বাক্সটিকে ডানদিকে টানা হচ্ছে। ওই টান ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে যতক্ষণ না বাক্সটি চলতে শুরু করে। স্প্রিং তুলার কাঁটার দিকে নজর রেখে স্থির অবস্থার ঘর্ষণের সর্বোচ্চ মান নির্ণয় করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ছবিগুলি লক্ষ করে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

- 1নং ও 2নং ছবির মধ্যে কোনটির ক্ষেত্রে টানের মান বেশি হলে তবে বাক্সটি চলতে শুরু করবে? স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান 1নং ও 2নং ছবির মধ্যে কোনটিতে বেশি?
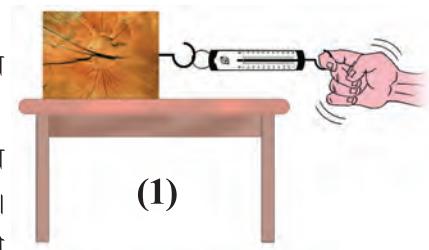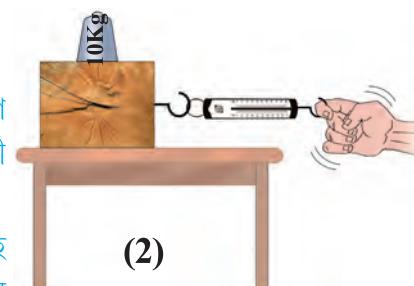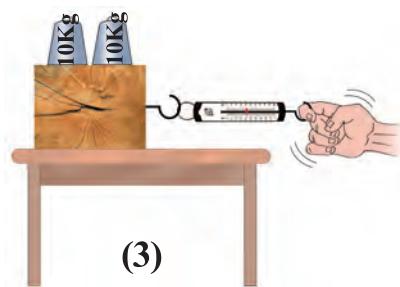
- এবার 2 নং আর 3 নং ছবি তুলনা করে বলার চেষ্টা করো যে, কোন ক্ষেত্রে স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মান বেশি হবে? অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে বাক্সটিকে সরাতে বেশি টান প্রয়োজন হবে?

উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে এবার নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও।

- কোনো বস্তু যখন কোনো তলের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকে, তখন ওই বস্তুটি ওই তলের ওপর লম্বভাবে নীচের দিকে একটি বল প্রয়োগ করে এবং ওই তলটিও ওই বস্তুটির ওপর লম্বভাবে উপরের দিকে সমান বল প্রয়োগ করে। এই লম্বভাবে প্রয়োগ করা বল যদি বেশি হয় তাহলে ওই বস্তু ও ওই তলের মধ্যেকার স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মানও কি বেশি হবে?

ঘর্ষণ বল সম্পর্কে আমরা যা যা জানলাম তা নীচে লিখে ফেলা যাক।

একটি তলের ওপর স্থির হয়ে বসে থাকা একটি বস্তুকে যখন সরানোর চেষ্টা করা হয়, বা ওই তলের ওপর দিয়ে বস্তুটি যখন চলতে থাকে তখন ঘর্ষণ বল ক্রিয়াশীল হয়।

ঘর্ষণ বল সবসময় সংস্পর্শে থাকা তলদুটির সঙ্গে সমান্তরালে ক্রিয়া করে।

টানা বা যে কোনো ধরনের বল যেমন ঠেলা, ধাক্কা ইত্যাদির প্রয়োগ সত্ত্বেও একটি বস্তু যখন একটি তলের ওপর স্থির থাকে তখন যে ঘর্ষণ বলটি ক্রিয়া করে তার নাম **স্থির অবস্থার ঘর্ষণ**।

স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের একটি সর্বোচ্চ মান আছে। এই সর্বোচ্চ মান একটি নির্দিষ্ট বস্তু, একটি নির্দিষ্ট তলের ওপর থাকার সময়, সর্বদা একই থাকে।

দুটি তলের মধ্যে উল্লম্বভাবে ক্রিয়াশীল, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বল যত বেশি হয়, ওই তলের সমান্তরালে ক্রিয়াশীল স্থির অবস্থার ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মানও তত বেশি হয়।

তরলের ঘনত্ব ও চাপ

একই মাপের দুটি প্লাস্টিকের বোতল নাও। এবার একটি বোতল জল দিয়ে ভরতি করো। অন্য বোতলটি গাঢ় নুনজল দিয়ে ভরতি করো।

একটি স্প্রিং তুলা দিয়ে দুটি বোতলকেই আলাদাভাবে ঝুলিয়ে দেখো কোনটি বেশি ভারী।

খালি অবস্থায় দুটি বোতল সবদিক থেকে একই রকম। দুটি বোতলের ভিতরে একই পরিমাণ জায়গা আছে। তাহলে ভরতি বোতল দুটির একটি বেশি ভারী হলো কেন?

একই পরিমাণ গাঢ় নুনজল আর সাধারণ জলের মধ্যে গাঢ় নুনজল বেশি ভারী হয়েছে। তাহলে এক চামচ গাঢ় নুনজল নিশ্চয়ই এক চামচ সাধারণ জলের চাইতে ভারী হবে। একইভাবে এক বাটি গ্লিসারিন ও এক বাটি সাধারণ জলের চাইতে ভারী। তাই এটা নিশ্চিত বলতে পারি যে, গাঢ় নুনজলের ভর ওই সমান আয়তনের সাধারণ জলের চাইতে বেশি। অতএব, একক আয়তনের গাঢ় নুনজলের ভর একক আয়তনের সাধারণ জলের ভরের চাইতে বেশি। একক আয়তন বলতে আমরা সেই আয়তনকে বুঝি যার মান হলো এক (1)। যেমন 1 লিটার, 1 ঘন সেমি, 1 গ্যালন। এরা সবাই একক আয়তন। একক আয়তনের বস্তুর ভরকে ওই বস্তুর ঘনত্ব বলে।
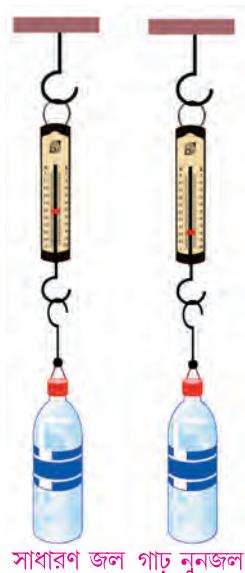
সাধারণ জল গাঢ় নুনজল

অতএব গাঢ় নুনজলের ঘনত্ব সাধারণ জলের ঘনত্বের চাইতে বেশি। তাই এক বোতল গাঢ় নুনজলের ভর একই মাপের এক বোতল সাধারণ জলের চাইতে বেশি হয়েছে, ফলে গাঢ় নুনজলের বোতল বেশি ভারী। ধরা যাক, বোতলটির আয়তন 1 লিটার। জল ভরার আগে ফাঁকা বোতলটি স্প্রিং তুলায় ঝোলানো হলো এবং স্প্রিং তুলার কাঁটা নীচে নামল না। অতএব ধরে নিতে পারি যে বোতলটির ভর এত কম যে তা শূন্য ধরে নেওয়া যায়। এবার জল ভরতি করে বোতলটিকে আবার স্প্রিং তুলা থেকে ঝোলানো হলো। এবার তুলার কাঁটা 1 কেজির দাগে এসে নামল। 1 লিটার আয়তনের জলের ভর পাওয়া গেল 1 কেজি অর্থাৎ জলের ঘনত্ব হলো 1 কেজি/ লিটার। এখন, যদি আমরা ভর মাপার জন্য গ্রাম ও আয়তন মাপার জন্য ঘন সেমি. এককটি ব্যবহার করি তাহলে জলের ঘনত্ব কত হবে?

1 লিটার জল = 1000 ঘন সেমি জল।

1 কেজি জল = 1000 গ্রাম জল।

অতএব লিখতে পারি,

1000 ঘন সেমি জলের ভর 1000 গ্রাম।

$$1 \text{ ঘন সেমি জলের ভর} = \frac{1000}{1000} \text{ গ্রাম}$$

$$\text{ফলে জলের ঘনত্ব} = \frac{\text{জলের ভর}}{\text{জলের আয়তন}} = \frac{1000 \text{ গ্রাম}}{1000 \text{ ঘন সেমি}}$$

$$= 1 \text{ গ্রাম/ ঘন সেমি।}$$

এবার নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

- একটি 2 লিটার মাপের বোতল একটি তরল দিয়ে পুরোপুরি ভরতি করা হলো। স্প্রিং তুলায় ঝুলিয়ে বোতলটির ভর পাওয়া গেল 4 কেজি। ধরে নেওয়া যাক ফাঁকা বোতলটি এত হালকা যে স্প্রিং তুলায় সেটি ঝোলালে স্প্রিং তুলার কাঁটা নীচে নামে না। বোতলে যে তরলটি নেওয়া হয়েছে তার ঘনত্ব কত?
- তোমরা কি কখনও পারদ দেখেছ? থার্মোমিটারের নীচের দিকে যে চকচকে কুণ্ডটি থাকে তার মধ্যে পারদ ভরতি করা থাকে। পারদ একটি তরল পদার্থ। পারদের ঘনত্ব খুব বেশি, 13.6 গ্রাম/ঘন সেমি.। বলতে পারো 1 লিটার পারদের ভর কত গ্রাম?

একটা বাটিতে কিছুটা জল নাও। এবার সামান্য সরষের তেল ওই বাটিতে ঢালো।

কী দেখতে পেলে?

সরষের তেল জলের উপরে ভেসে থাকল নাকি জলের নীচে গেল?

এবার বলোতো কোন তরলটির ঘনত্ব বেশি? জলের, নাকি সরষের তেলের? যদি এক লিটার জলের ভর এক কিলোগ্রাম হয়, তাহলে বলোতো এক লিটার সরষের তেলের ভর এক কিলোগ্রামের চেয়ে বেশি হবে না কম হবে?

তরলের চাপ

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা তরলের চাপ সম্বন্ধে পড়েছ। এটাও জেনেছ যে একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ বল ক্রিয়া করে তাকেই চাপ বলা হয়।

পাশের টেবিলের ওপর 10 কেজি ভরের একটি ব্লক রাখা আছে। ব্লকটিকে পৃথিবী কত বল দিয়ে নীচের দিকে টানছে?

1 কেজি ভরের বস্তুকে পৃথিবী 9.8 নিউটন বল দিয়ে টানে। তাহলে 10 কেজি ভরের বস্তুকে পৃথিবী (9.8×10) নিউটন বা 98 নিউটন বল দিয়ে টানছে।

98 নিউটন বল দিয়ে পৃথিবী নীচের দিকে টানা সত্ত্বেও লোহার ব্লকটি স্থির রয়েছে কেন বলতে পারো?
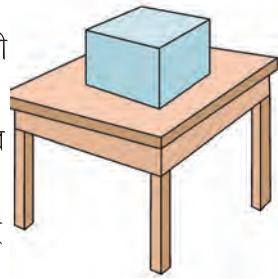
ব্লকটির ওপর পৃথিবীর টান যেহেতু নীচের দিকে, সেহেতু ব্লকটি টেবিলের ওপর নীচের দিকে ঠেলা দেয়। সেই ঠেলার মান ব্লকের ওজনের সমান অর্থাৎ 98 নিউটন। টেবিলের ওপর ব্লকের এই ঠেলাকে যদি বলি ক্রিয়া, তাহলে ব্লকের ওপর টেবিলের দেওয়া প্রতিক্রিয়া বলও 98 নিউটনই হবে এবং তার অভিমুখ হবে উপরের দিকে।

ফলে ব্লকটির ওপর পৃথিবীর দেওয়া 98 নিউটন নিম্নমুখী বল এবং টেবিলের দেওয়া 98 নিউটন ঊর্ধ্বমুখী বল -এর যোগফল শূন্য, এজন্যে ব্লকটিতে কোনো ত্বরণ সৃষ্টি হয়নি। তাই ব্লকটি স্থির রয়েছে।

এবার যদি প্রশ্ন করা হয় যে টেবিলের ওপর ব্লকের জন্য তৈরি হওয়া চাপের পরিমাণ কত?

আমরা দেখলাম যে টেবিলের ওপর ব্লক 98 নিউটন বল প্রয়োগ করছে। এবার জানতে হবে, টেবিলের ওপর কত ক্ষেত্রফল জায়গা জুড়ে এই বল প্রযুক্ত হয়েছে?

যদি টেবিল ও ব্লকের সংযোগতলের ক্ষেত্রফল হয় 0.25 বর্গমি. তাহলে টেবিলের ওপর ব্লকের দেওয়া বল 0.25 বর্গমি. ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত হয়েছে।

0.25 বর্গমি. ক্ষেত্রফলের ওপর দেওয়া বলের পরিমাণ যদি 98 নিউটন হয়,

তাহলে, 1 বর্গমি. ক্ষেত্রফল অর্থাৎ একক ক্ষেত্রফলের ওপর

বলের পরিমাণ $= \frac{98 \text{ নিউটন}}{0.25 \text{ বর্গমি.}} = 392$ নিউটন/বর্গমি.

অতএব টেবিলের ওপর ব্লকের দেওয়া চাপ $= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{98}{0.25}$ নিউটন/বর্গমি. = 392 নিউটন/বর্গমি.

এবার পাশের গামলাটি লক্ষ করো, যাতে 10 কেজি জল রয়েছে। গামলাটির মেঝের ক্ষেত্রফল 0.25 বর্গমিটার। গামলার মেঝের ওপর, অর্থাৎ গামলাটির তলদেশের ওপর জল যে চাপ দেয় তার পরিমাণ নির্ণয় করো।

10 কেজি জলকে পৃথিবী নীচের দিকে 10×9.8 নিউটন বা 98 নিউটন বল দিয়ে টানছে। অর্থাৎ 10 কেজি জলের ওজন 98 নিউটন। কিন্তু জল স্থির রয়েছে। অতএব গামলার মেঝে জলকে ওপরের দিকে 98 নিউটন বল দিয়েছে। নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী জলও গামলার মেঝেকে 98 নিউটন বল দিয়েছে।

ফলে গামলার মেঝের ওপর চাপের পরিমাণ $= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{98 \text{ নিউটন}}{0.25 \text{ বর্গমি.}}$ = 392 নিউটন/বর্গমি.

একটি কঠিন পদার্থের ব্লক টেবিলের ওপর বল প্রয়োগ করেছে ও তা থেকে আমরা চাপ হিসেব করেছি। তরল পদার্থ জল গামলার তলদেশে বল প্রয়োগ করেছে, ও তা থেকে আমরা চাপ হিসেব করেছি। কিন্তু ভেবে দেখো যে তরল পদার্থ জল গামলাটির শুধু তলদেশেই বলপ্রয়োগ করে না, গামলার দেয়ালেও বল প্রয়োগ করে। যদি গামলার দেয়ালে কোনো ফুটো করা হয়, তাহলে সেখান দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। এটা দেখেই বোঝা যায় যে, তরলের ক্ষেত্রে পাশের দেয়ালেও চাপ হিসেব করা উচিত। এখন আমরা তরলের চাপ নিয়ে আরও কিছু কথা জানার চেষ্টা করব।

নীচের ছবি দুটিতে একটি বড়ো ছড়ানো গামলা ও একটি লম্বা জলের বোতল নেওয়া হয়েছে। গামলাটিতে ওই বোতলের প্রায় পাঁচ বোতল জল ধরে।

এবার গামলা ও বোতল দুটিতেই জল ভরে টেবিলের ধারের দিকে বসানো হলো। গামলা এবং বোতল, দুটির গায়েই নীচের দিকে তলদেশের খুব কাছে একটি করে ফুটো করা হলো।

লক্ষ করলে দেখবে যে বোতলের ফুটো দিয়ে জল যত বেগে বেরিয়ে আসছে ও যত দূরে যাচ্ছে, গামলার ফুটো দিয়ে জল তত বেগে বেরোচ্ছে না ও তত দূরেও যাচ্ছে না। অথচ গামলার জলকে পৃথিবী যে পরিমাণ বল দিয়ে নীচের দিকে টানে, বোতলের জলকে তার চাইতে কম বল দিয়ে টানে। কারণ বোতলে যদি 1 কেজি জল ধরে, তাহলে গামলায় 5 কেজি জল ধরে। তাহলে প্রশ্ন হলো, বোতলের ফুটো দিয়ে জল বেশি জোরে বেরোচ্ছে কেন? লক্ষ করে দেখো, বোতলে জলের উচ্চতা (H) গামলার জলের উচ্চতার (h) চাইতে বেশি।
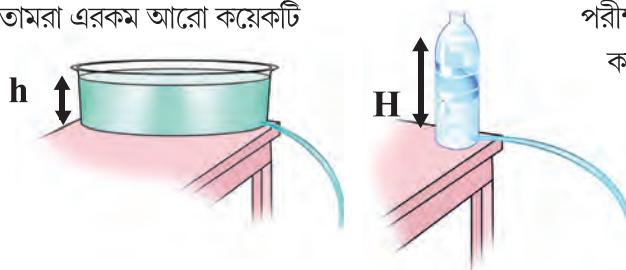
তোমরা এরকম আরো কয়েকটি পরীক্ষা করে দেখতে পারো যে, তলদেশের কাছাকাছি করা ফুটো দিয়ে সেইক্ষেত্রেই জল বেশি বেগে বেরিয়ে আসে যে ক্ষেত্রে পাত্রে জলের উচ্চতা বেশি থাকে। জলের পরিমাণ কম হলেও যদি ফুটো থেকে জলের উপরিতলের উচ্চতা বেশি হয় তাহলে ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসা জলের বেগও বেশি হয়। (একটি 2 লিটার ও আর একটি তার থেকে ছোট বোতল নিয়েও পরীক্ষাটা করা যায়।)

আরো একটি বিষয় লক্ষ করো। গামলায় জলের ভর যেমন বেশি, তেমনি গামলার মেঝের ক্ষেত্রফলও বোতলের চাইতে অনেক বেশি। খালি গামলার মেঝেতে যদি ওইরকম অনেকগুলো বোতল বসিয়ে রাখতে চাও তাহলে কতগুলো বোতল ধরবে?

অন্তত ছটি বোতল তো ধরবেই। এবার চলো একটা হিসেব করা যাক।

বোতলের জলের ভর =1 কেজি

বোতলের জলের ওজন = (1×9.8) নিউটন = 9.8 নিউটন

বোতলের মেঝের ক্ষেত্রফল ধরা যাক A বর্গমি.

অতএব বোতলের মেঝেতে দেওয়া জলের চাপ $= \dfrac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \dfrac{9.8 \text{ নিউটন}}{A \text{ বর্গমি.}}$

$= \dfrac{9.8}{A}$ নিউটন/বর্গমি.

এবার, গামলার জলের ভর = 5 কেজি

গামলার জলের ওজন (5×9.8) নিউটন = 49 নিউটন। গামলার মেঝের ক্ষেত্রফল বোতলের মেঝের ক্ষেত্রফলের প্রায় 6 গুণ।

অতএব গামলার মেঝের ক্ষেত্রফল = 6A বর্গমি.

অতএব গামলার মেঝেতে দেওয়া জলের চাপ = $\frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}} = \frac{49 \text{ নিউটন}}{6A \text{ বর্গমি.}} = \frac{\cancelto{8.166}{49}}{\cancel{6}A}$ নিউটন/বর্গমি.

$= \frac{8.2}{A}$ নিউটন/বর্গমি. (প্রায়)

এখন বলোতো কোন পাত্রের তলদেশে জলের চাপ বেশি — বোতলের, না গামলার?

অতএব, এটা বোঝা গেল যে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসা তরলের বেগ চাপের ওপর নির্ভর করে, বলের ওপর নয়। আবার এটাও দেখা গেল যে চাপ সেখানেই বেশি হয় যেখান থেকে তরলের উপরিতলের উচ্চতা বেশি। আর একটি পরীক্ষা করা যাক।

একটি প্লাস্টিকের তৈরি বোতল নাও। এবার ওই বোতলটির মেঝের খুব কাছে দেয়ালের গায়ে চারদিকেই একটি করে মোট চারটি ফুটো করো। মনে রাখবে, সব কটি পরীক্ষাতেই ফুটোর মাপ যেন সুচ ফুটিয়ে তৈরি করা ফুটোর মতো ছোটো না হয়। মোটা পেরেক গরম করে প্লাস্টিকের গায়ে স্পর্শ করলে যে মাপের ফুটো তৈরি হয়, অন্তত তত বড়ো ফুটো হওয়া চাই। আগের পৃষ্ঠার গামলা ও বোতল নিয়ে করা পরীক্ষার ক্ষেত্রেও এটা জরুরি।

বোতলটিতে জল ভরতি করে দেখো ফুটোগুলো দিয়ে বেরিয়ে আসা জলের বেগ কীভাবে কমছে। জলের উপরিতল যত নেমে আসছে ফুটোগুলো দিয়ে বেরোনো জলের বেগও তত কমে আসছে। বোতলের এই সবকটি ফুটো থেকেই জলের উপরিতলের উচ্চতা সবসময় একই। ফলে জল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে জলের উপরিতলের উচ্চতা যখন কমে তখনও সবগুলো ফুটোর ক্ষেত্রেই তা একইভাবে কমে। আর তাই ঐ ফুটো দিয়ে বেরোনো জলের বেগও একইভাবে কমে।

এই পরীক্ষাটি থেকে তুমি কী বুঝলে? কোনো স্থানে তরলের চাপ কি শুধু নীচের দিকেই ক্রিয়া করে?

মনে রেখো কোনো স্থানে তরলের চাপ সবদিকে সমানভাবে ক্রিয়া করে।

তরলের চাপ ও ঘনত্ব

একই মাপের ও হুবহু একই রকম দুটি প্লাস্টিকের তৈরি বোতলের দেয়ালে তলদেশের খুব কাছে, তলদেশ থেকে একই উচ্চতায় একটি করে ফুটো করা হলো। দুটি ফুটোতেই আলাদা আলাদা ভাবে বাঁকানো যায় এমন প্লাস্টিকের তৈরি হুবহু একই রকমের দুটি সরু নল লাগিয়ে পরের পৃষ্ঠার ছবির মতো (চিত্র নং 1a) করে ব্যবস্থাদুটিকে বসানো হলো। সুচহীন ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ব্যবহার করে ঐ প্লাস্টিকের নলগুলিতে কেরোসিন তেল ভর্তি করা হলো। এখন বোতল দুটির একটিতে জল আর অন্যটিতে একই আয়তনের গাঢ় নুনজল দিয়ে পূর্ণ করা হলো। এই অবস্থায় নল দুটির লম্বা বাহুগুলির কেরোসিন স্তম্ভের উচ্চতা একটু নজর করলেই দেখবে,
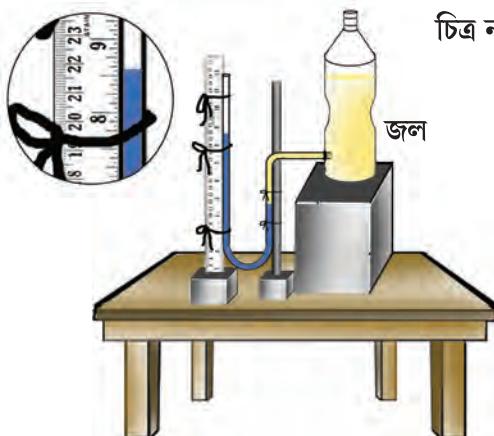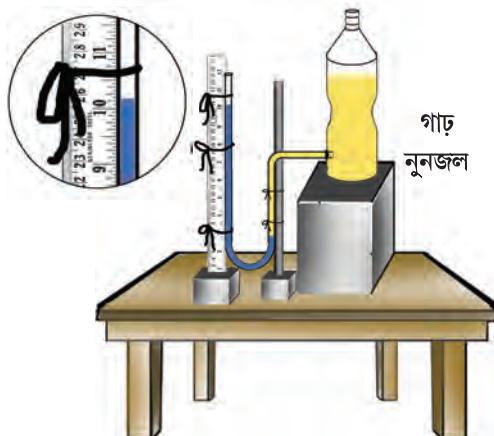
যে বোতলে গাঢ় নুনজল রাখা হয়েছে সেই বোতলের সঙ্গে যুক্ত প্লাস্টিক নলের লম্বা বাহুতে কেরোসিন স্তম্ভের উচ্চতা বেশি হচ্ছে। দুটি বোতলেই ছিদ্র থেকে তরলের উপরিতলের উচ্চতা একই। দুটি তরলের ক্ষেত্রেই ছিদ্রের কাছে তরলের চাপ একই হবার কথা। তাহলে গাঢ় নুনজলের ক্ষেত্রে চাপের মান বেশি কেন? এই সহজ পরীক্ষাটি নিজেরা করো ও উপরের আলোচনার সত্যতা যাচাই করো।

- **তাহলে চাপ-এর পরিমাণ কি তরলের উচ্চতা ছাড়াও আরও অন্য কিছুর ওপরেও নির্ভর করে?**

গাঢ় নুনজলের ঘনত্ব জলের চাইতে বেশি। আবার পরীক্ষা থেকে দেখা গেল, একই উচ্চতা হওয়া সত্ত্বেও গাঢ় নুনজলের ক্ষেত্রে চাপও বেশি। তাহলে তরলের চাপ কি তরলের ঘনত্বের ওপরেও নির্ভর করে?

অতএব এটা বোঝা গেল যে, কোনো তরলের ভেতরে কোনো স্থানে তরলের চাপ কত হবে তা ওই স্থানে তরলের উপরিতলের উচ্চতা, এবং ওই তরলের ঘনত্ব-র ওপর নির্ভর করে।

পাশের ছবিটি ভালোভাবে লক্ষ করো। একটি (U) আকৃতির নলের ডানদিকে লাগানো বড়ো পাত্রে তরলের পরিমাণ বেশি, ফলে ভর বেশি, কিন্তু উপরিতলের উচ্চতা কম। বাঁ দিকের ছোটো পাত্রে তরলের পরিমাণ ও তরলের ভর, দুইই কম, কিন্তু তরলের উচ্চতা বেশি।

দুটি পাত্রেই একই তরল নেওয়া হয়েছে এবং সংযোগকারী নলটিতে লাগানো চাবিটি বন্ধ করা আছে। এবার যদি চাবিটি খুলে দেওয়া হয় তাহলে তরল কোন নল থেকে কোন নলের দিকে প্রবাহিত হবে? ষষ্ঠ শ্রেণিতে এইরকম একটি পরীক্ষা তোমরা করেছ। দেখেছ যে তরলের উপরিতলের উচ্চতা দিয়ে ঠিক হয় তরল কোন দিকে প্রবাহিত হবে। তরলের পরিমাণ বা ভর, বা তরলের ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলের পরিমাণ — এসবের ওপর তরলের প্রবাহের দিক নির্ভর করে না। অর্থাৎ বল নয়, চাপ দিয়েই ঠিক হয় কোনো তরলের প্রবাহের অভিমুখ।
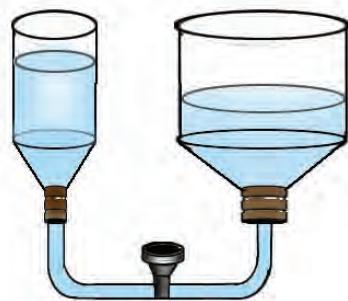
- **পরের পৃষ্ঠার ছবিগুলি লক্ষ করো ও নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।**

মাঝখানের চাবিটি খুলে দেবার পর,

(1) নং চিত্রে তরল কোনদিকে প্রবাহিত হবে? A থেকে B-এর দিকে না B থেকে A-এর দিকে?
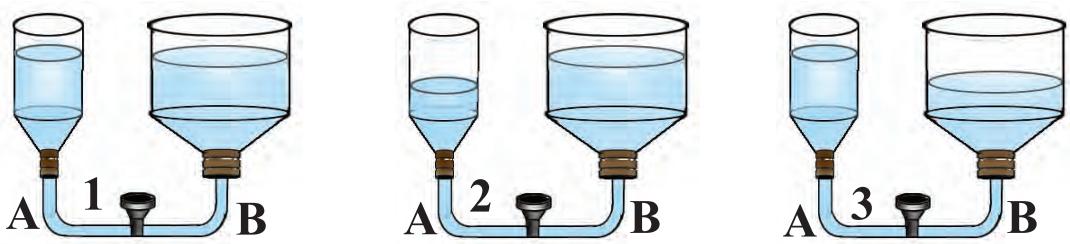
(2) নং চিত্রে তরল কোনদিকে প্রবাহিত হবে? A থেকে B-এর দিকে না উলটোদিকে?

(3) নং চিত্রে তরলের প্রবাহের অভিমুখ কী?

যদি (1), (2) বা (3) নং চিত্রে তরল A থেকে B বা B থেকে A-র দিকে প্রবাহিত হয়, তাহলে সেই প্রবাহ কি চলতেই থাকবে না কি একসময় ওই প্রবাহ নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে?

তরলের প্রবাহ কখন বন্ধ হয়ে যাবে?

4

(4) নং চিত্রের এক একটি নলে তরলের পরিমাণ এক-একরকম। সেখানে কি তরলের কোনো প্রবাহ হবে? সবকটি নলে তরলের উচ্চতা একই আঁকা হয়েছে। এরকমই কি হবার কথা?

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো।
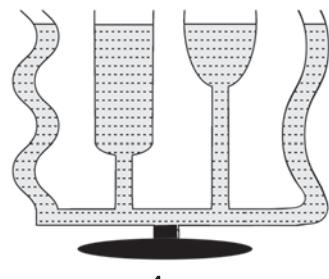
বায়ুর চাপ

একটি গামলা নিয়ে তাতে বেশ খানিকটা জল ভরো। এবার, প্রায় তিন-চার ফুট লম্বা একটি রবারের নল নাও। রবারের নলটির দু-মুখ খোলা। নলটিতে পুরো জল ভরো ও তোমার হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে দু-দিকের মুখ আটকে রাখো। এবার নলের একদিক গামলার জলে ডুবিয়ে আঙুল সরিয়ে নাও। আর নলের অন্যদিক আঙুল দিয়ে চাপা অবস্থায় উঁচু করে ধরো।

নলের নীচের দিকের মুখ এখন খোলা ও গামলার জলে ডোবানো। কিন্তু তা সত্ত্বেও নলের জল গামলায় পড়ে গেল না কেন?

ছবি দেখে বলো B থেকে A-র দিকে জল প্রবাহিত হলো না কেন? A বিন্দুতে জলের উপরিতলের উচ্চতা, B বিন্দুতে জলের উচ্চতার চাইতে কম, তবু জল B থেকে A-র দিকে যায়নি।

বায়ুর চাপ বায়ুর চাপ
A B C

A বিন্দুতে জলের উপরিতলের উচ্চতা কম হওয়া সত্ত্বেও A বিন্দুতে চাপের পরিমাণ B বিন্দুর চাইতে কম হলো না কেন? এর কারণ হলো, বায়ুর চাপ। গামলার জলের উপরিতলের ওপরে রয়েছে বায়ু। তরলের উপরিতলে সেই বায়ুর চাপ ক্রিয়া করবে, ফলে, A বা C বিন্দুতে চাপের পরিমাণ শুধু তরলের চাপ নয়। তরলের ও বায়ুর সম্মিলিত চাপ। কিন্তু B বিন্দুতে চাপের কারণ হলো নলের ভেতরের তরলের উচ্চতা। এবার যদি নলের বন্ধ মুখ থেকে তোমার আঙুল সরিয়ে নাও তাহলে জল নল থেকে গামলায় পড়ে গেল কেন?
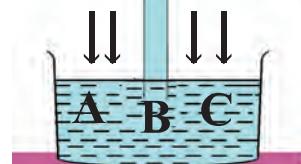
এখন নলের ওপরের মুখেও বায়ুর চাপ ক্রিয়া করেছে, ফলে A বা C বিন্দুর চাইতে B বিন্দুতে চাপের পরিমাণ বেশি হয়েছে ও জল B বিন্দু দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।

এবার ধরা যাক, এই পরীক্ষাটি করার জন্য যে রবারের নলটি নেওয়া হলো তার দৈর্ঘ্য 13 মিটার। রবারের নলটি এবার প্রায় তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। জলভরতি ওই নলের ওপরের মুখ বন্ধ রেখে নীচের মুখ জলভরতি গামলায় ডোবালে দেখা যাবে যে নল থেকে জল বেরিয়ে গামলায় ততক্ষণই পড়তে থাকল যতক্ষণ না বন্ধ মুখ থেকে জলের তল 1.7 মিটার নেমে আসে। অর্থাৎ **যেই না নলের মধ্যে জলের উচ্চতা গামলার জলের উপরিতল থেকে প্রায় 10. 3 মিটার হলো অমনি জলের প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল।** এ থেকে তোমরা কী বুঝতে পারলে? যখন জলের উচ্চতা 10.3 মিটারের বেশি ছিল তখন জলের চাপ বায়ুর চাপের চাইতে বেশি ছিল। তাই জল নল থেকে বেরিয়ে গামলায় পড়েছে। যেই জলের উচ্চতা প্রায় 10. 3 মিটার হলো তখন জলের চাপ ও বায়ুর চাপ সমান হয়েছে ও নলের জল দাঁড়িয়ে গেছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, 10.3 মিটার উঁচু জল যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করে তা বায়ুর চাপের সমান।
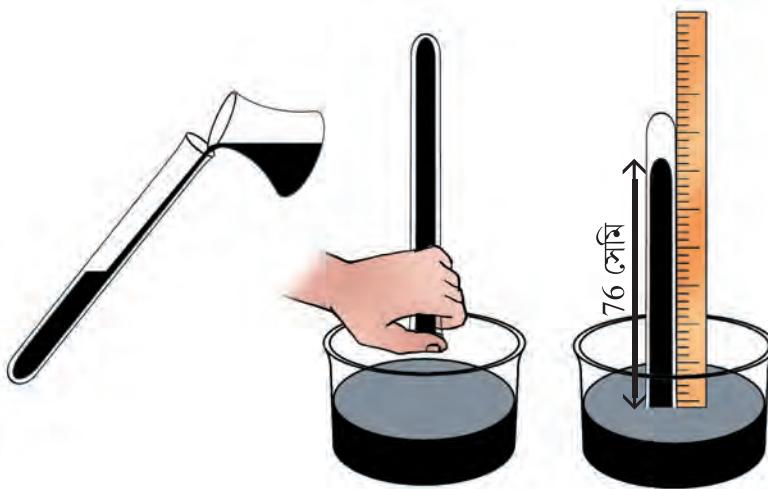
ইতালির পদার্থবিজ্ঞানী টরিচেল্লি এই একই পরীক্ষা করেছিলেন, জলের বদলে পারদ নিয়ে। তিনি দেখেছিলেন যে 76 সেমি উঁচু পারদ যে পরিমাণ চাপ দেয় তা বায়ুর চাপের সমান।

অতএব এই পরীক্ষাগুলো থেকে বোঝা গেল যে, স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ু যে চাপ দেয় তার পরিমাণ 10.3 মিটার উঁচু জলস্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ দেয় তার সমান এবং 76 সেমি উঁচু পারদস্তম্ভ যে পরিমাণ চাপ দেয় তার সমান।

- **এবার এই প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করো:**

একই পরিমাণ চাপ তৈরি করতে যেখানে 10.3 মিটার উঁচু জল দরকার সেখানে মাত্র 76 সেমি পারদ সেই চাপ তৈরি করতে পারল কীভাবে?

বস্তুর ভাসন, প্লবতা ও আর্কিমিদিসের নীতি

জলের মধ্যে কাঠের টুকরো, থার্মোকলের টুকরো, নৌকো বা জাহাজ ভাসে — এটা তোমরা দেখেছ। আবার একটি লোহার পেরেক জলে ফেললে সেটি ডুবে যায় — তাও দেখেছ। তরলে কোনো বস্তুর ভেসে থাকা বা ডুবে যাওয়া এই নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব।

পাশের ছবিটি লক্ষ করো। একটি পাত্রে কোনো একটি তরল, ধরা যাক জল নেওয়া হয়েছে। ওই তরলে তিনটি বস্তু A, B ও C দেখানো হয়েছে।
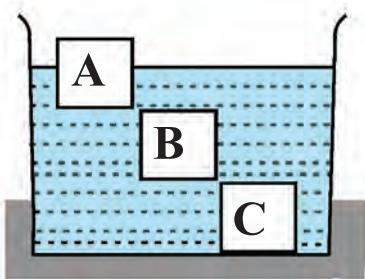
A ও B ভাসছে, কিন্তু C ডুবে গেছে। A বস্তুটিকে পৃথিবী নীচের দিকে টানছে। ধরা যাক A বস্তুটির ওজন 10 নিউটন। তার মানে পৃথিবী A বস্তুটিকে 10 নিউটন বল দিয়ে নীচের দিকে টানছে। A বস্তুটির নীচের দিকে যাবার কথা। কিন্তু সেটি স্থির।

বোঝা যাচ্ছে যে, কেউ A বস্তুর ওপর উপরের দিকে 10 নিউটন বল প্রয়োগ করেছে। ফলে A বস্তুর ওপর মোট বল শূন্য হয়েছে। এখন প্রশ্ন, এই ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করল কে? টেবিলের ওপর স্থির থাকা বস্তুর ক্ষেত্রে টেবিল ওই বল প্রয়োগ করে — এটা আমরা দেখেছি। তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু বস্তুটি জলে আছে, ধরেই নেওয়া যায় যে জল ওই ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করেছে।

B বস্তুটিও জলে ভাসছে। ধরা যাক B বস্তুটির ওজন 15 নিউটন। B বস্তুটিকে পৃথিবী 15 নিউটন বল দিয়ে নীচের দিকে টানে। বলোতো B বস্তুর ওপরে জল কি পরিমাণ ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করেছে?

যখন কোনো বস্তুকে কোনো তরলে ডোবানো হয় তখন ওই তরল বস্তুটির ওপর একটি ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে। এই বলটিকে প্লবতা বলা হয়।

পাশের ছবিগুলো লক্ষ করো। একটি ভারী বস্তুকে একটি স্প্রিং তুলার সাহায্যে ঝোলানো হয়েছে। স্প্রিং তুলার পাঠ দেখে বস্তুটির ওজন জানা যাচ্ছে।

ওই বস্তুটিকে স্প্রিং তুলায় ঝোলানো অবস্থায় একটি তরলে ডোবানো হলো। প্রথমে কিছুটা ডোবানো হলো (চিত্র 2) এবং তারপর পুরোটা ডোবানো হলো। বস্তুটি এমন যে যদি সেটিকে স্প্রিং তুলায় না ঝুলিয়ে তরলে ছেড়ে দেওয়া হতো তাহলে বস্তুটি ডুবে যেত।

এবার নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

চিত্র 1 চিত্র 2 চিত্র 3
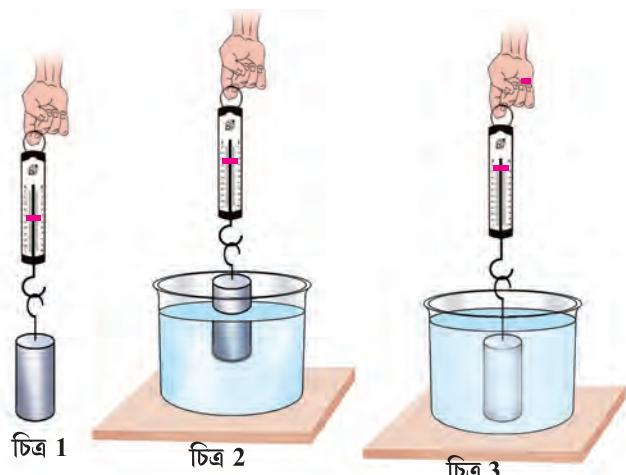
চিত্র 2 এবং চিত্র 3 দেখলে বোঝা যায় যে তরলে ডোবানোর ফলে স্প্রিং তুলার পাঠ কমে গেছে। এর কারণ কী?

চিত্র 2 -এ স্প্রিং তুলার পাঠ যতটা কমেছে, চিত্র 3-এ ওই পাঠ আরো কমেছে। এ থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো? কোনো বস্তুকে তরলে ডোবালে ওই বস্তুটির ওপর তরল যে ঊর্ধ্বমুখী বল (প্লবতা) প্রয়োগ করে তার পরিমাণ কি বস্তুটির কত অংশ তরলে ডুবে আছে তার ওপর নির্ভর করে?

একটি বস্তুকে কোনো তরলে ডোবালে ওই বস্তুটি কিছুটা তরলকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দেয় ও নিজে সেই জায়গা দখল করে। বস্তুটিকে জায়গা দিতে গিয়ে যতটা তরল নিজের জায়গা থেকে সরে গেল সেই পরিমাণ তরলের ওজন যত, বস্তুর ওপর তরলের দেওয়া ঊর্ধ্বমুখী বলের (প্লবতা) মানও তত। বিজ্ঞানী আর্কিমিদিস তাঁর সূত্রে এমন কথাই বলে গেছেন।

একটি বস্তুকে সুতোয় ঝুলিয়ে সেটিকে একটি তরলে তিনভাবে ডোবানো হলো। পাশের চিত্রগুলি লক্ষ করো ও নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

- **পাশের কোন চিত্রের ক্ষেত্রে ডোবানো বস্তুটি বেশি তরলকে অপসারিত করেছে, অর্থাৎ বেশি তরলকে নিজের জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছে?**
- **কোন চিত্রটির ক্ষেত্রে বস্তুর ওপর তরলের দেওয়া প্লবতার মান বেশি?**
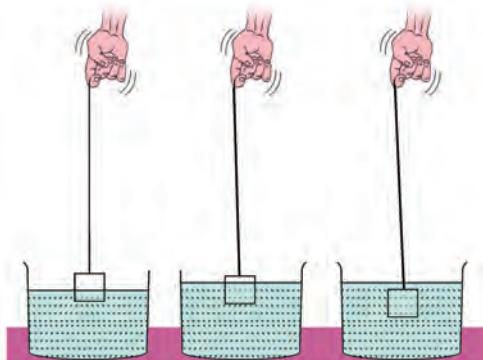
পাশের ছবিদুটি ভালো করে দেখো ও তা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

একই বস্তু D-কে দুটি আলাদা আলাদা তরলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দুটি তরলেই বস্তুটি ভাসে। অর্থাৎ বস্তুটির ওপর মোট বলের পরিমাণ দুটি তরলের ক্ষেত্রেই শূন্য।

- বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরলের আয়তন কোন ক্ষেত্রে বেশি?
- বস্তুটির ওপর কোন তরলটি বেশি ঊর্ধ্বমুখী বল (প্লবতা) প্রয়োগ করেছে? না কি দুটি তরলই সমান প্লবতা প্রয়োগ করেছে?
- কোন ক্ষেত্রে বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরলের ওজন বেশি?
- কোন ক্ষেত্রে বস্তুটির দ্বারা অপসারিত তরলের ভর বেশি?
- তোমরা আগে জেনেছ যে, আয়তন × ঘনত্ব = ভর।
- এবার বলোতো উপরের ছবি দুটির কোন তরলটির ঘনত্ব বেশি?
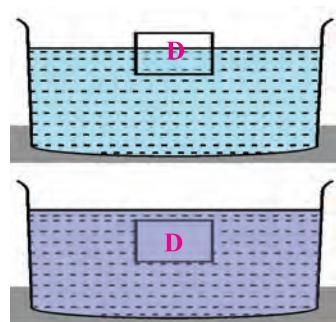
তাহলে বোঝা গেল যে, **কোনো তরলে ডোবানো কোনো বস্তুর ওপর ওই তরলটি কত ঊর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করবে তা নির্ভর করে ওই বস্তুটি দ্বারা অপসারিত তরলের আয়তন ও ওই তরলটির ঘনত্বের ওপর।**

এবার নীচের প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

একটি ছোটো পেরেকের টুকরো বালতির জলে ফেললে সেটি ডুবে যায়, অথচ, পেরেকের চাইতে অনেক ভারী একটি স্টিলের বাটি বালতির জলে ভাসে। কেন?

তরলে ডোবানো কোনো বস্তুর ব্যাপারে আমরা যা যা শিখলাম, তা হলো—

কোনো বস্তুকে কোনো তরলে ডোবালে ওই বস্তুটি কিছুটা তরলকে অপসারিত করে। অপসারিত তরলের ওজনের মান, বস্তুর ওপরে তরলের দেওয়া ঊর্ধ্বমুখী বলের মানের সমান।

কোনো বস্তু যখন কোনো তরলে ভাসে তখন বস্তুর ওজনের মান এবং বস্তুর দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের মান সমান হয়।

1.2 স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল

অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ

- বৃষ্টি কেন আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকেই নেমে আসে? গাছের ঝরাপাতা কেন মাটিতে এসেই পড়ে?
- পৃথিবী কেন সূর্যের চারিদিকে ঘোরে?
- চাঁদ কেন গাছের পাতার মতো পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে না?

এইসব ঘটনা **অভিকর্ষ তথা মহাকর্ষের** খেলা। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ, একটা বলকে ওপর থেকে ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীর **অভিকর্ষ** বলের টানে নীচের দিকে নামে।

পৃথিবী সব বস্তুকেই **অভিকর্ষ** বল দিয়ে টানে। তাই হাতের ওপর একটা বই রাখলে তুমি তোমার হাতে নীচের দিকে একটা টান অনুভব করো। বই-এর সংখ্যা বাড়লে এই টানের অনুভূতিও বাড়ে।

আগের অধ্যায়ে তোমরা দেখেছ পৃথিবীর এই **মহাকর্ষ টানকে** কাজে লাগিয়ে কীভাবে **স্প্রিং তুলা যন্ত্র** তৈরি করা হয়েছে। যা দিয়ে কোনো বস্তুর **ওজন** মাপা হয়।

চিত্র 1 চিত্র 2

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা এও জেনেছ শুধু যে পৃথিবীই তার কাছাকাছি সব বস্তুকে আকর্ষণ করে তাই নয়—এ বিশ্বের যে-কোনো দুটি বস্তুকণাই তাদের সংযোজক সরলরেখা বরাবর একে অন্যকে সমান মানের বলে আকর্ষণ করে। এই বলের নাম মহাকর্ষ। আসলে অভিকর্ষও একটি মহাকর্ষ বল। পৃথিবী ও পৃথিবীর আশেপাশে থাকা অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে যে মহাকর্ষ বল ক্রিয়া করে তারই নাম **অভিকর্ষ**।

বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন এই মহাকর্ষ **বলের মান** কত হবে তা একটি গাণিতিক সম্পর্ক দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। সেটি হলো,

$$F = G \cdot \frac{m_1 \times m_2}{d^2}$$

এখানে, F= মহাকর্ষ বল, m_1ও m_2 বস্তু কণাদুটির ভর, d = বস্তুকণাদুটির মধ্যে সরলরেখা বরাবর দূরত্ব। সরলরেখা যেহেতু সবসময় দুটি বিন্দুর মধ্যেই হয় তাই নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে দুটি বিন্দু আকৃতির বস্তুর মধ্যে আকর্ষণের কথাই বলা হয়েছে।

G-কে বলা হয় **'সার্বজনীন মহাকর্ষ ধ্রুবক'**। কারণ G-এর মান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব জায়গায় একই থাকে, বস্তুদুটির মাঝখানে কী মাধ্যম আছে তার ওপরে নির্ভর করে না।

SI পদ্ধতিতে G-এর একক $\frac{\text{নিউটন} \times \text{মিটার}^2}{\text{কেজি}^2}$ বা $\frac{N \times m^2}{kg^2}$

বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা G-এর মান হিসেব করে দেখা গেছে SI পদ্ধতিতে G-এর মান = $\frac{6.67}{10^{11}} \frac{Nm^2}{kg^2}$

তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে ভূগোল পড়তে গিয়ে জেনেছ কোনো বস্তুকে ন্যূনতম 11.2 km/s বেগে পৃথিবীর মাটির ওপর থেকে ওপরের দিকে ছোড়া হলে তা পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে চলে যায়।

তোমরা এমন শুনে থাকো যে রকেটে করে পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বাইরে চলে যাওয়া যায়। সত্যিই কি তাই! এসো ব্যাপারটা আসলে কী জানতে চেষ্টা করি।
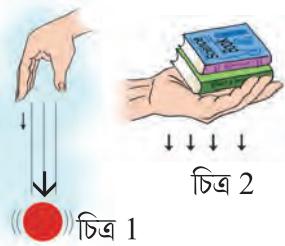
ধরা যাক, m_1 ও m_2 ভরের দুটি বস্তুকণার মধ্যে দূরত্ব d ও তারা পরস্পরকে F মহাকর্ষ বলে আকর্ষণ করছে।

$$\therefore \quad F = G.\frac{m_1 m_2}{d^2}$$

বস্তুকণাদুটির ভর m_1 ও m_2-র কোনো পরিবর্তন ঘটছে না এবং মহাকর্ষীয় ধ্রুবক G-এর মানও স্থির। তাহলে Gm_1m_2-র কি কোনো পরিবর্তন হচ্ছে?

এঅবস্থায় যদি বস্তুদুটির মাঝের দূরত্ব d-কে ক্রমশ বাড়ানো হয় তাহলে F-এর মানের কি পরিবর্তন ঘটবে?

ভগ্নাংশটির লব Gm_1m_2 স্থির, হর d যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে $\frac{Gm_1m_2}{d^2}$-এর মান কমবে। অর্থাৎ বস্তুদুটির পারস্পরিক মহাকর্ষ বল, F কমবে।

এভাবে যদি d বাড়তেই থাকে তাহলে F-এর মান কমতেই থাকবে।

তাহলে d-এর এমন কোনো মান কি তুমি পেতে পারো যার জন্য F=0 হবে?

d-এর মান যত বড়োই নাও না কেন F-এর মান কোনো না কোনো একটি সংখ্যাই পাবে যা কখনোই শূন্য হবে না।

অর্থাৎ **যে-কোনো বস্তুর মহাকর্ষীয় প্রভাব অসীম দূরত্ব পর্যন্ত বহাল থাকে**। যদিও সেই প্রভাব যথেষ্ট ক্ষীণ হতে থাকে। তাই পৃথিবীর থেকে তুমি যত দূরেই যাও না কেন পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রভাব সেখানেও থাকবেই। বাস্তবে দেখা যায় একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের পর বস্তুর মহাকর্ষীয় প্রভাব এত ক্ষীণ হয়ে পড়ে যে, তা প্রায় অনুভূতির বাইরে চলে যায়। তাই সেই দূরত্বের পর মহাকর্ষীয় প্রভাব প্রায় নেই ধরে নেওয়া হয়।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে দুটি বিন্দুবস্তুর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি কি বিন্দুবস্তু? তাহলে এদের ক্ষেত্রে মহাকর্ষ সূত্র কীভাবে প্রয়োগ করা হবে?

দুটি বস্তু যত বড়োই হোক না কেন, তাদের মধ্যে দূরত্ব যদি তাদের ব্যাসের তুলনায় অত্যন্ত বেশি হয়, তখন ওই বস্তুদুটিকে বিন্দুবস্তু ধরা যায়।

আবার পৃথিবী, সূর্য, চাঁদ বা অন্যান্য গ্রহ সবই প্রায় গোলাকার। গোলক আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে তার জ্যামিতিক কেন্দ্রবিন্দুতে ওই বস্তুর সমস্ত ভর জমা আছে ধরে মহাকর্ষ বল হিসেব করা যায়। তাই পৃথিবীর বাইরে যে-কোনো বস্তুকণার ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষ বল নির্ণয়ের জন্য পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ওই বস্তুকণার দূরত্বকে d-এর মান ধরা হয়।

গাণিতিক সমস্যা ঃ সমান ভরের দুটি বস্তুকণার একটিকে অপরিবর্তিত রেখে অপরটির ভর 3 গুণ করা হলো ও তাদের মধ্যে দূরত্ব পূর্বের 5 গুণ করা হলো। তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল পূর্বের কতগুণ হলো?

ধরা যাক, বস্তুকণাদুটির প্রতিটির ভর ছিল m একক ও তাদের মধ্যে দূরত্ব ছিলো d একক

$\therefore$ তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল, $F_1 = G\frac{m \times m}{d^2} = G\frac{m^2}{d^2}$

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল, $F_2 = G\frac{m \times 3m}{(5d)^2} = G\frac{3m^2}{25d^2} = \frac{3}{25}G\frac{m^2}{d^2} = \frac{3}{25}F_1$

$\therefore$ বস্তুকণাদুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল পূর্বের $\frac{3}{25}$ গুণ হবে।

তোমরা জেনেছ, এই বিশ্বের যে-কোনো দুটি বস্তু পরস্পরকে সরলরেখা বরাবর আকর্ষণ করে। তাহলে তো পৃথিবীর ওপর প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে অন্য সব বস্তুর ঠোকাঠুকি লাগা উচিত। কিন্তু তা তো হয় না। তাহলে কি পৃথিবীর ওপরের বস্তুগুলোর ক্ষেত্রে মহাকর্ষ সূত্র খাটে না? এসো হিসেব করে দেখি।

ধরা যাক, A ও B দুটি 1 kg ভরের বস্তুকণা পৃথিবীপৃষ্ঠের ওপর পরস্পর থেকে 1 মিটার দূরে রয়েছে। এর ফলে তারা পরস্পরকে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করছে তার পরিমাণ ধরা যাক F_1 নিউটন।

এখানে, $m_1=1$ kg; $m_2=1$kg

$d=1$m; $G=\frac{6.67}{10^{11}}\frac{Nm^2}{kg^2}$

$$F_1=G\frac{m_1\times m_2}{d^2}=\frac{6.67}{10^{11}}\times\frac{1\times1}{1^2}N=\frac{6.67}{10^{11}}N$$

$$F_1=0.0000000000667\ N$$

অর্থাৎ বস্তুকণা দুটির মধ্যে 6.67 নিউটন-এর দশহাজার কোটি ভাগের এক ভাগ মহাকর্ষ বল কাজ করবে।

এবার এসো পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা একটি 1kg ভরের বিন্দুবস্তুকে পৃথিবী কত পরিমাণ বল দিয়ে আকর্ষণ করছে তা দেখা যাক। ধরা যাক সেই আকর্ষণ বল F_2 নিউটন।

পৃথিবীর ভর = 5.96×10^{24} kg

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ = 6370 km = 6370×10^3m = **পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা** বস্তুকণা ও পৃথিবীর কেন্দ্রের দূরত্ব।

A 1 m B
6370 km
6370 km
পৃথিবী

$$F_2=G\times\frac{\text{বস্তুকণার ভর}\times\text{পৃথিবীর ভর}}{(\text{পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুকণার দূরত্ব})^2}$$

$$=\frac{6.67}{10^{11}}\times\frac{1\times5.96\times10^{24}}{(6370\times10^3)^2}N=9.797\ N$$

9.797 নিউটন বল 0.0000000000667 নিউটন বলের চাইতে অনেক অনেক বেশি। $\therefore\ F_2>>>F_1$

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকা 1 kg ভরের বস্তুকণা দুটিকে পৃথিবী যে পরিমাণ বল দিয়ে টানে, তার তুলনায় ওই বস্তুদুটোর মধ্যেকার পারস্পরিক আকর্ষণ বল এতটাই নগণ্য যে তার কোনো প্রভাব বাস্তবে বোঝা যায় না।

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র প্রয়োগ করে, পৃথিবী পৃষ্ঠে থাকা একক ভরের বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বলের যে রাশিমালা পাই তা হলো,

$$F=G\frac{M\times1}{R^2}$$ M= পৃথিবীর ভর

$$\therefore F=\frac{GM}{R^2}$$ R= পৃথিবীর ব্যাসার্ধ

একক ভরের ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষের টানকে ‘g’ দিয়ে চিহ্নিত করা যাক

$$\therefore\ g=\frac{GM}{R^2}$$

ফলে m - ভরের বস্তুর ওপর পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের মানকে অর্থাৎ m ভরের বস্তুর ওজন (Weight) কে যদি W বলা হয়, তাহলে লেখা যায়

$$W=\frac{GMm}{R^2}$$

বা, $W=(\frac{GM}{R^2})\times m$

$$\therefore W=gm$$

অভিকর্ষ ও মহাকর্ষের প্রভাবে গতি

একটা খেলার বলকে ওপর থেকে ছেড়ে দাও। বলটি অভিকর্ষের টানে নীচের দিকে পড়তে থাকবে। বলটি ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সেটির বেগ কত ছিল? কিন্তু তার পরের মুহূর্তে বলটির বেগ কি আর শূন্য ছিল? তাহলে বলটির বেগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। অর্থাৎ বলটিতে একটি ত্বরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই ত্বরণের জন্যে কোন বল দায়ী তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ।

অভিকর্ষ বলের প্রভাবে অবাধে পতনশীল কোনো বস্তুতে যে ত্বরণের সৃষ্টি হয় তাকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলা হয়। নিউটনের গতি সূত্র অনুযায়ী, বল = ভর × ত্বরণ $(F = m \times a)$। তাহলে কোনো বস্তুর ওপর অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে কত ত্বরণ হওয়া উচিত?

$F = m \times a$ এখানে F হলো m-ভরের বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বল, যার মান $\frac{GmM}{R^2}$

$\therefore \frac{GmM}{R^2} = m \times a$ বা, $a = \frac{GM}{R^2} = g$ [তাহলে দেখা যাচ্ছে g, বস্তুর ভর (m) নিরপেক্ষ। অর্থাৎ যেকোনো ভরের বস্তুর ক্ষেত্রেই g এর মান একই হবে।]

অতএব দেখা গেল যে একক ভরের বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বলের মান ও অভিকষর্জ ত্বরণের মান সমান।

SI পদ্ধতিতে g -এর গড় মান = $9.8 m/s^2$

$g = \frac{GM}{R^2}$ এই সূত্রটিতে যেহেতু GM ধ্রুবক, অতএব g এর মান নিশ্চয়ই 'R' এর ওপর নির্ভরশীল।

পৃথিবী সব স্থানে R এর মান কি সমান? তাহলে পৃথিবীর সব স্থানে g এর মান কি সমান? পৃথিবীর সবস্থানেই কি বস্তুর ওজন (mg) সমান?

হিসাব করে দেখা গেছে চাঁদের গড় অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর গড় অভিকর্ষজ ত্বরণের $\frac{1}{6}$ গুণ।

1 kg ভরের কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে পরিমাণ বল দিয়ে আকর্ষণ করে তার মান = 9.8 N। কোনো বস্তুর ভর 3 kg হলে, তার ওজন = 3×9.8 N। তাহলে ভেবে বলতো ওই বস্তুর ওজন চাঁদের পৃষ্ঠে কত হবে?
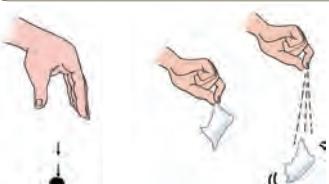
একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো আর একটা পাথরের টুকরোকে একসঙ্গে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দাও।

কী দেখতে পেলে? পাথরের টুকরো ভারী বলেই কি তা কাগজের টুকরোর আগে মাটিতে এসে পড়ল?

গ্রিসের বিখ্যাত দার্শনিক অ্যারিস্টটল কিন্তু এমন ধারণাই পোষণ করতেন যে হালকা বস্তুর তুলনায় ভারী বস্তু আগে মাটি স্পর্শ করে। পরবর্তীকালে ইতালির বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলাই (1564-1642) প্রমাণ করে দেখান হালকা বা ভারী সব বস্তুকেই একই উচ্চতা থেকে একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হলে তারা একসঙ্গে মাটি স্পর্শ করবে।

শোনা যায়, গ্যালিলিও একই আয়তনের একটি নিরেট লোহার গোলক ও একটি কাঠের গোলককে ইতালির পিসা শহরের বিখ্যাত হেলানো মিনারের শীর্ষ থেকে একসঙ্গে ছেড়ে দেন। সবাই অবাক হয়ে দেখেন তুলনায় ওজনে অনেক ভারী লোহার গোলক ও হালকা কাঠের গোলক প্রায় একসঙ্গে নামতে থাকে এবং প্রায় একসঙ্গে এসে মাটি স্পর্শ করে।
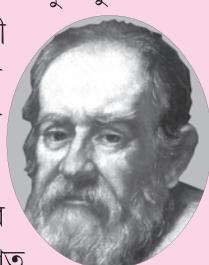
চলো একটা পরীক্ষা করা যাক।

এক টাকার একটা কয়েন নাও। কয়েনটার চাইতে ছোটো একটা কাগজের টুকরো কেটে নাও। কাগজের টুকরোর মাপ যেন কোনোভাবে কয়েনের চেয়ে বড়ো না হয়।
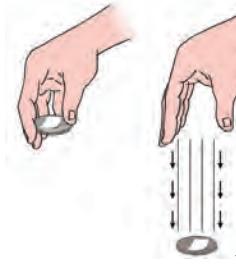
এবার কয়েন ও কাগজের টুকরোকে আলাদাভাবে একই উচ্চতা থেকে ছেড়ে দাও। কী দেখলে?—

কয়েনটা আগে পড়ল আর কাগজের টুকরোটা পরে।

এবার কয়েনটার ওপর কাগজের টুকরোটা ভালোভাবে বসাও ও কাগজের টুকরোসহ কয়েনটা ছবির মতো করে ওপর থেকে ছেড়ে দাও।

এবার কী দেখতে পেলে? কাগজের টুকরোর চেয়ে কয়েন তো অনেক বেশি ভারী, তাহলে তারা একসঙ্গে মাটি স্পর্শ করল কেন?

প্রথমে, আলাদাভাবে ফেলার সময় কয়েন যেভাবে বায়ুর বাধাকে অতিক্রম করতে পেরেছিল, কাগজের টুকরো তা পারেনি। একসঙ্গে ফেলার সময় যেহেতু কয়েন ও কাগজের টুকরো একসঙ্গে বায়ুর বাধা অতিক্রম করেছে, তাই এক্ষেত্রে কয়েন ও কাগজ একসঙ্গে পড়েছে।

এবার ভেবে বলো, বায়ুর বাধা না থাকলে কয়েন ও কাগজকে যদি আলাদাভাবে ফেলা হতো তাহলে তারা কি একইসময় পড়ত না কয়েন আগে পড়ত?

পৃথিবীর টানে কোনো বস্তু পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকলে তাকে পতনশীল বস্তু বলে।

স্থির অবস্থা থেকে বাধাহীনভাবে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে গ্যালিলিও তিনটি সূত্র বলে গিয়েছেন। সূত্রগুলোর মর্মার্থ হলো—

(i) একই উচ্চতা ও স্থির অবস্থা থেকে **অবাধে** পতনশীল সব বস্তুই সমান দ্রুততায় নীচে নামে।

(ii) সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তুর বেগও বাড়তে থাকে।

(iii) সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পতনশীল বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্বও বাড়ে।

পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়ে একটা পাথরের টুকরোকে সোজা ওপরের দিকে ছুড়ে দাও। পাথরটি যত ওপরে ওঠে সেটির গতি কমতে থাকে কেন?

কমতে কমতে সেই গতির দিক উলটে গিয়ে পাথরটি আবার তোমার হাতে ফিরে আসে কেন?
নিশ্চয়ই আন্দাজ করেছ যে পৃথিবীর অভিকর্ষের টানই এর কারণ।

অভিকর্ষের টানের দিকে ত্বরণ হয়। ফলে ঊর্ধ্বমুখী বেগ কমে ও এক সময় অভিকর্ষের টানের দিকে তা বাড়তে থাকে। তাই পাথরটি ফিরে আসে।

এবার ভূমির সঙ্গে কোনাকুনিভাবে একটি পাথরের টুকরোকে ছোড়ো। পাথরটির গতিপথ লক্ষ করো।

এই গতিপথ এরকম হলো কেন?

এক্ষেত্রেও অভিকর্ষের টান ভূমির দিকে। পাথরের বেগের দিক ও ত্বরণের দিক ছবিতে লক্ষ করো।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বেগের দিক বদলাতে বদলাতে আবার ভূমির দিকেই ঘুরে যাওয়ার জন্য যা দায়ী তা হলো অভিকর্ষের টান। অভিকর্ষের টানে এ জাতীয় চলন্ত বস্তুর বেগ পালটায় ও বস্তুটি ছবির মতো বাঁকা পথে ভূমিতে ফিরে আসে।

পাথরের গতির দিক

অভিকর্ষের টানের দিক

কোনাকুনি ছোড়ার সময় পাথরটিকে যদি আরও জোরে ছোড়া হতো তাহলে সেটি কীরকম পথে ফিরে আসত তা নীচের ছবিতে দেখলেই বোঝা যাবে।
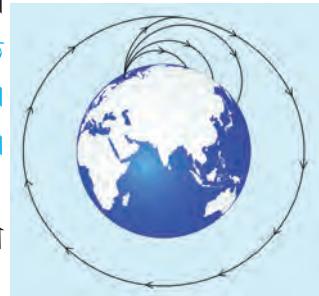
এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে জোরে ছুড়তে ছুড়তে এমন একটা সময় আসতে পারে যখন পাথরটি পৃথিবীতে ফিরে আসার বদলে পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকবে। এই ঘোরার সময়ও কিন্তু পাথরটির বেগ অভিকর্ষের টানের দিকেই বদলাচ্ছে। কিন্তু যাত্রাপথটি বৃত্তাকার হয়েছে।

পৃথিবী থেকে আকাশে পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহকে এভাবেই ছোড়ার ফলে তা পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরতে থাকে।

স্থির তড়িৎ বল ও আধানের ধারণা

আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যেসব ঘটনা ঘটে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে বিজ্ঞানের কত না রহস্য। প্রতিদিনের এইসব ঘটনাই জন্ম দেয় হাজারো প্রশ্নের, আর এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন প্রকৃতির অজানা সব নিয়ম-কানুন, তৈরি হয় বিজ্ঞানের নানান সূত্র বা নীতি। আমাদের দেখা এমন কয়েকটি খুব সাধারণ ঘটনা থেকে বিজ্ঞানের কোন নিয়মের কথা জানা যায়, তা আমরা এখন খোঁজার চেষ্টা করব।
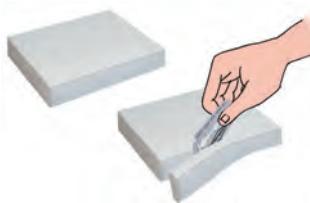
একটি ধাতব ছুরি বা ব্লেড থার্মোকলের টুকরোকে সাধারণ অবস্থায় আকর্ষণ করে না। কিন্তু ওই ধাতব ছুরি বা ব্লেড দিয়ে থার্মোকল কাটার সময়, থার্মোকলের ছোটো টুকরোগুলো ছুরি বা ব্লেডের গায়ে আটকে যায়। জোরে ঝাঁকুনি দিলেও সহজে তা ছাড়ানোযায় না। যদিও ঘটনাটি ক্ষণস্থায়ী।

শীতকালে শুকনো চুল আঁচড়ানোর পর, সঙ্গে সঙ্গে চিরুনিটিকে কয়েকটি কাগজের টুকরোর খুব কাছে আনলে, কাগজের টুকরোগুলো চিরুনির গায়ে আটকে যায়। যদিও কিছুক্ষণ পর চিরুনি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। অথচ চুল আঁচড়ানোর আগে ওই চিরুনিটি কাগজের টুকরোগুলোকে মোটেই আকর্ষণ করে না।

শীতকালে একটি ফোলানো বেলুনকে তোমার পরা সোয়েটারের গায়ে ভালো করে ঘষে ছেড়ে দিলে দেখা যায় সেটি সোয়েটারের গায়ে আটকে আছে, পড়ে যাচ্ছে না। অথচ ওই বেলুনটিকে সোয়েটারে না ঘষে শুধু স্পর্শ করে রাখলে সেটি তোমার সোয়েটারে আটকে থাকে না। পড়ে যায়।

চিত্র :1 চিত্র :2

ওপরের প্রতিটি ঘটনা ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখতে পাবে ছুরি বা ব্লেড, প্লাস্টিকের চিরুনি, ফোলানো বেলুন, প্রত্যেকটি জিনিসেরই অন্য কোনো কিছুর সঙ্গে ঘর্ষণ হয়েছে। আর ঘর্ষণের পর প্রতিটি বস্তুতেই আকর্ষণ করার ক্ষমতার উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু ঘর্ষণ না হলে তাদের মধ্যে কোনো আকর্ষণ ক্ষমতার সৃষ্টি হয় না।

তাহলে কি ঘর্ষণ ও আকর্ষণ ক্ষমতার মধ্যে কোনো সম্পর্ক রয়েছে?

ঘর্ষণের ফলে ওই জিনিসগুলোর মধ্যে একটি পরিবর্তন ঘটেছে, যার ফলে ওই বস্তুগুলো অন্য কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তুর মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটলে বলা হয় ওই বস্তুতে **তড়িৎ আধানের সৃষ্টি হয়েছে**।

ঘর্ষণের ফলে কোনো বস্তুতে সৃষ্টি হওয়া এই ধরনের তড়িৎকে বলে **ঘর্ষণজাত তড়িৎ বা আধান** (Charge)। ঘর্ষণের ফলে বস্তুতে তৈরি হওয়া ওই অবস্থাকে বলে **তড়িতাহিত অবস্থা**।

চলো কয়েকটি পরীক্ষা করে এই **তড়িৎ আধান** সম্পর্কে আরো কিছু জানার চেষ্টা করি।

চিত্র :4

দুটি ফোলানো বেলুন পাশাপাশি ঝুলিয়ে ধরে রাখলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কিছুই দেখা যায় না (চিত্র : 3)। এবার ওই ফোলানো বেলুন দুটি নিয়ে সোয়েটারে ভালোভাবে ঘষো (চিত্র : 4)। বেলুন দুটিকে এবার সুতোর সাহায্যে পাশাপাশি ঝুলিয়ে ধরো (চিত্র : 5)।
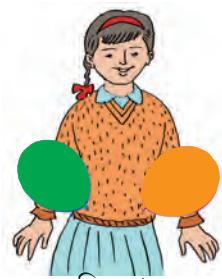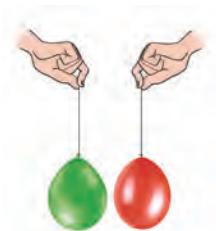
চিত্র ঃ3

কী দেখতে পেলে? বেলুনদুটো পরস্পর থেকে দূরে সরে গেল। অর্থাৎ বেলুনদুটি পরস্পরকে **বিকর্ষণ** করল।

অথচ ওই বেলুনদুটোকে সোয়েটারে ভালোভাবে ঘষে ছেড়ে দিলে তারা সোয়েটারের গায়ে আটকে থাকে। অর্থাৎ ঘর্ষণের পর সোয়েটার আর বেলুনের মধ্যে **আকর্ষণ বল** সৃষ্টি হয়।

বেলুনদুটোকে একই বস্তু (উলের সোয়েটার) দিয়ে ঘষা হয়েছে। তাহলে নিশ্চয়ই দুটি বেলুনেই একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বেলুনদুটিতে সৃষ্টি হওয়া তড়িৎ আধান নিশ্চয়ই একই জাতের। তাহলে কি একই ধরনের তড়িতাহিত দুটি বস্তু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে?

চিত্র ঃ5

আবার, বেলুন আর উলের সোয়েটার পরস্পর ঘষলে তারা একে অন্যকে আকর্ষণ করেছে।

তাহলে কি বেলুন ও সোয়েটারে উৎপন্ন তড়িৎ আধানের প্রকৃতি এক নয়?

সোয়েটার আর বেলুনের তড়িতাহিত অবস্থা দুটি কি আলাদা?

তাহলে বলা যায় —

(i) একই জাতের তড়িৎ আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

(ii) ভিন্ন জাতের তড়িৎ আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে।
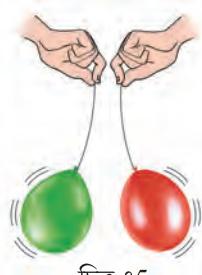
10 cm মাপের ছয় টুকরো চওড়া সেলোটেপ নাও। প্রতিটির এক প্রান্তে আঠার দিকে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ লাগিয়ে রাখো যাতে ওই প্রান্তে সেলোটেপগুলোকে ধরলে হাতে আঠা না লাগে। ওই কাগজ লাগানো প্রান্তটি যেন সেলোটেপটিকে ধরার হাতল। এবার একটা টেবিলের তল বা আয়নার ওপর তিনটি সেলোটেপকে আটকে দাও ও তাদের গায়ে 'B' লেখো। অন্য তিনটি সেলোটেপকে 'B' লেখা সেলোটেপ তিনটির ওপর এমনভাবে লম্বালম্বি আটকে দাও যাতে ওপরের টেপটির জন্য নীচের টেপটি ঢেকে যায়। এবার উপরে সাঁটা টেপ তিনটির গায়ে 'T' লেখো।

এখন দুটি 'T' লেখা টেপকে তাদের কাগজ সাঁটা প্রান্তদুটি দু-হাতে ধরে দ্রুত টান মেরে তুলে নাও। তারপর হাত থেকে ঝুলতে থাকা ওই দুটি টেপের আঠার উলটোদিক পরস্পরের কাছাকাছি আনো। কী দেখতে পেলে? 'T' লেখা টুকরোদুটো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল অর্থাৎ তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করল।

এবার একই রকম করে 'B' লেখা টুকরোদুটোকে দ্রুত তুলে, আঠার উলটো পিঠ দুটি কাছাকাছি আনো। এবার কী দেখলে? এবারও টুকরোদুটো পরস্পরকে বিকর্ষণ করছে।

এখন, বাকি সেলোটেপ দুটো একসঙ্গে দ্রুত তুলে নিয়ে পরস্পর থেকে ছাড়িয়ে নাও ও একইভাবে তাদের আঠার উলটোদিক পরস্পরের কাছে আনো। এবার কী দেখলে? এবার টুকরোদুটো (T ও B) পরস্পরকে আকর্ষণ করল।

এখন নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

'T' লেখা সেলোটেপ দুটিতে যে ধরনের তড়িৎ আধানের সৃষ্টি হয়েছে তা একই জাতের না আলাদা জাতের?

'B' লেখা সেলোটেপ দুটিতে তৈরি হওয়া তড়িত আধান কি একই জাতের না আলাদা জাতের?

'T' লেখা সেলোটেপে উৎপন্ন তড়িৎ আধান ও 'B' লেখা সেলোটেপে উৎপন্ন তড়িৎ আধান কি একই জাতের না আলাদা জাতের?

দুটি বস্তুকে পরস্পর ঘষলে বস্তুদুটিতে যে তড়িৎ আধানের সৃষ্টি হয় তা কি একই জাতের না ভিন্ন জাতের?
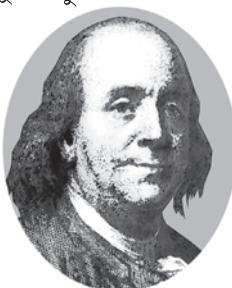
বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী **বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষা থেকে তড়িতের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যদিও তিনি এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।** এই দুই জাতীয় তড়িৎ আধানের নামকরণ করা হয় ধনাত্মক তড়িৎ ও ঋণাত্মক তড়িৎ। এদের যথাক্রমে বীজগণিতের '+' ও '–' চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

তাহলে কোনো একটি বস্তুকে অন্য কোনো বস্তু দিয়ে ঘষা হলে কোন বস্তুর আধানকে ধনাত্মক (+) ও কোন বস্তুর আধানকে ঋণাত্মক (–) নাম দেওয়া হবে তা ঠিক হবে কীভাবে?

পাশের পৃষ্ঠার তালিকাটি লক্ষ করো। তালিকায় অবস্থিত যে-কোনো দুটি বস্তুকে পরস্পর ঘষলে সেই বস্তুর আধানকে ধনাত্মক (+) বলা হবে যার নাম তালিকার উপরে আছে। আর সেই বস্তুর আধানকে ঋণাত্মক (–) বলা হবে যার নাম তালিকার নীচে আছে।
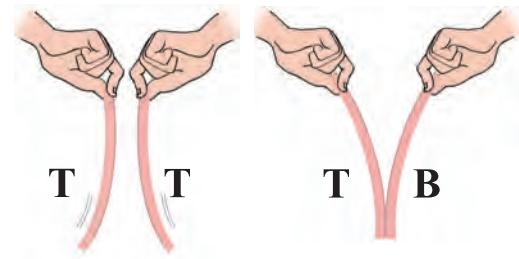
যেমন— কাচকে সিল্ক দিয়ে ঘষলে, কাচে ধনাত্মক (+) ও সিল্কে ঋণাত্মক আধান (–) আহিত হবে, কারণ তালিকায় কাচ সিল্কের উপরে আছে।

- উলের মাফলার দিয়ে একটি কাচের দণ্ডকে ঘষা হলো, আর সিল্কের রুমাল দিয়ে একটি এবোনাইট দণ্ড ঘষা হলো। এবার মাফলার ও এবোনাইট দণ্ডকে কাছাকাছি আনা হলো। কী ঘটবে বলো দেখি আকর্ষণ না বিকর্ষণ? যদি কাচের দণ্ডটিকে এবোনাইট দণ্ডের কাছে আনা হতো তবেই বা কী হতো? মাফলার আর সিল্কের টুকরোকে কাছাকাছি আনলেই বা কী হতো?

1) পশম বা উল
2) কাচ
3) কাগজ
4) রেশম বা সিল্ক
5) কাঠ
6) মানুষের দেহ
7) ধাতব পদার্থ
8) এবোনাইট
9) গালা
10) অ্যামবার
11) রজন
12) সেলুলয়েড

কুলম্ব -এর সূত্র :

দুটি বস্তুর আধানের প্রকৃতি কী হলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করবে তা তোমরা দেখেছ। কিন্তু তড়িৎ আধান যুক্ত বস্তুদুটির মধ্যে ওই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল কত জোরালো হবে তা জানার উপায় কী? ওই আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের হিসেব কীভাবে করা হয়?

তড়িতাহিত দুটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িৎবল-এর হিসেব করার জন্য ফরাসি বিজ্ঞানী **চার্লস অগস্টিন দ্য কুলম্ব** একটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। সূত্রটি নীচে লেখা হলো—

$$F = K\frac{q_1 \times q_2}{r^2}$$

এখানে q_1 এবং q_2 হলো তড়িতাহিত বস্তুদুটির আধানের পরিমাণ, r হলো তড়িতাহিত বস্তুদুটির মধ্যের দূরত্ব, এবং F হলো বস্তু দুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল তড়িৎ বল (তা, আকর্ষণই হোক বা বিকর্ষণই হোক) -এর মান। তড়িতাহিত বস্তু দুটির মধ্যের অঞ্চলে কী পদার্থ আছে তার ওপর 'K'-র মান নির্ভর করে। যেমন, তড়িতাহিত বস্তু দুটিকে যদি বায়ুতে রাখা হয় অর্থাৎ বস্তুদুটির মধ্যের অঞ্চলে যদি বায়ু থাকে তাহলে K-র মান যা হবে, জল থাকলে তা হবে না।

তোমরা জানো যে সরলরেখা এঁকে দুটি বস্তুর মধ্যের দূরত্ব তখনই সঠিকভাবে মাপা সম্ভব, যখন বস্তু দুটি বিন্দু-আকৃতির। কুলম্ব-এর এই সূত্রে তড়িতাহিত বস্তুদুটিকে বিন্দু আকৃতির বস্তু হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

তোমরা জানো যে বল মাপার একটি একক হলো **ডাইন**। 1 গ্রাম ভরের বস্তুতে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করলে বস্তুটিতে 1 সেমি/সেকেন্ড^2 ত্বরণ সৃষ্টি হয়, সেই পরিমাণ বলকে **1 ডাইন** বল বলা হয়। দূরত্ব মাপার একক সেন্টিমিটার বা সেমি — এটাও তোমরা জানো। কিন্তু তড়িৎ আধান q_1 বা q_2 মাপা হয় কীভাবে? এব্যাপারে আমরা এখন একটি উপায় শিখব।

যদি একই পরিমাণ আধান যুক্ত দুটি বিন্দু আকৃতির বস্তুকে শূন্যস্থানে পরস্পর থেকে 1 সেমি দূরত্বে রাখা হয় তবে বস্তুদুটির মধ্যে বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করবে। যদি এই বিকর্ষণ বলের মান 1 ডাইন হয় তাহলে বলা হয় যে বস্তুদুটির প্রতিটির আধানের পরিমাণ **1 ই.এস.ইউ (esu) বা 1 স্ট্যাটকুলম্ব । 1 ই.এস.ইউ বা 1 স্ট্যাটকুলম্ব** হলো আধান মাপার একক। তড়িৎ আধান পরিমাপের এই উপায়কে আমরা **'গাউস'-এর উপায়** বলে জানি।

এই উপায়টিতে শূন্যস্থানের জন্য K-এর মান 1 ধরা হয়। গাউস একজন বিজ্ঞানী, যিনি তড়িৎ সংক্রান্ত বিজ্ঞানে অনেক অবদান রেখেছেন।

আধান মাপার অন্য একটি উপায়ও আছে। সেটিকে বলে SI উপায়। এই উপায়টিতে বল মাপার একক 1 নিউটন, দূরত্ব মাপার একক 1 মিটার, এবং আধান মাপার একক 1 কুলম্ব। এই ক্ষেত্রে শূন্য মাধ্যমের

জন্য K-এর মান 1ধরা যায় না।

শূন্য মাধ্যমের জন্য K-এর মান ধরতে হয় $9 \times 10^9 \frac{\text{নিউটন} \times (\text{মিটার})^2}{\text{কুলম্ব}^2}$

এবার সূত্রটিকে ভালো করে খেয়াল করো।

সূত্রটির ডানপক্ষের লব হলো Kq_1q_2 ও হর হলো r^2। ধরা যাক বস্তুদুটি একই আছে ও একই স্থানে রাখা আছে। ফলে Kq_1q_2 -র মান বদলাচ্ছে না। এবার যদি বস্তুদুটির মধ্যের দূরত্ব কমে, অর্থাৎ ভগ্নাংশটির হর r^2 ছোটো হতে থাকে, তাহলে ভাগফলের মান (F) বাড়বে না কমবে?

আবার, Kq_1q_2 একই রেখে r^2-এর মান যদি বাড়ে, সেক্ষেত্রে ভাগফল F-এর মানের কি পরিবর্তন হবে? তাহলে দেখা গেল একই মাধ্যমে অবস্থিত দুটি বিন্দু আধানের মধ্যে দূরত্ব বাড়লে আধান দুটির মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান কমে। আবার সেই দূরত্ব কমলে ওই বলের মান বাড়ে।

ঘর্ষণের ফলে বস্তুতে আধানের উদ্ভব ঘটে কেন? সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা পড়েছ যে—

- সমস্ত পদার্থ পরমাণু দিয়ে তৈরি।
- একটি পরমাণু তৈরি হয় তিনরকমের কণা দিয়ে — **ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন**। (একমাত্র ব্যতিক্রম সাধারণ হাইড্রোজেন যার পরমাণুতে কোনো নিউট্রন নেই)
- ইলেকট্রন ঋণাত্মক (–) আধান যুক্ত কণা, প্রোটন ধনাত্মক (+) আধান যুক্ত কণা, আর নিউট্রনের কোনো তড়িৎ আধান নেই, অর্থাৎ নিউট্রন নিস্তড়িৎ।
- একটি পরমাণুতে প্রোটনগুলোর মোট ধনাত্মক (+) আধানের পরিমাণ ওই পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোর মোট ঋণাত্মক (–) আধানের পরিমাণের সমান। ফলে একটি পরমাণুর মোট আধানের মান শূন্য ও পরমাণুটি নিস্তড়িৎ।

এবার ভেবে বলোতো, আমাদের চারপাশের সব বস্তুগুলো সাধারণভাবে আধানহীন বা নিস্তড়িৎ হয় কেন? সব বস্তুই যেহেতু পরমাণু দিয়ে তৈরি, আর পরমাণুগুলো যেহেতু নিস্তড়িৎ, তাই বস্তুগুলোও নিস্তড়িৎ।

এখন প্রশ্ন হলো, ওই নিস্তড়িৎ বস্তুগুলো ঘর্ষণের পর তড়িৎ আধান পায় কীভাবে?

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা এটা জেনেছ যে পরমাণুর কেন্দ্রে একত্রে থাকে প্রোটন ও নিউট্রনগুলো। ওই দলা পাকানো কেন্দ্রটির নাম **নিউক্লিয়াস**। নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন বা নিউট্রনকে আলাদা করা খুব কঠিন। ইলেকট্রনগুলো ওই নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে পাক খায়। সূর্যকে ঘিরে গ্রহদের পাক খাওয়ার মতো। পরমাণু থেকে প্রোটনকে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু ইলেকট্রনকে তার কক্ষপথ থেকে সরিয়ে নেওয়া কঠিন নয়। পরমাণু থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে নেওয়া যেমন শক্ত নয় তেমনি পরমাণুতে ইলেকট্রন যুক্ত করাও কঠিন

নয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় পরমাণুগুলো এরকম ইলেকট্রন দেওয়া-নেওয়া করে। ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণু বা পরমাণু জোটকে বলে অ্যানায়ন। ধনাত্মক আধানযুক্ত পরমাণু বা পরমাণু জোটকে বলে ক্যাটায়ন।

এবার নীচের সারণিটি পূরণ করো।

পরমাণুতে যা ঘটল	ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়বে/ কমবে/ একই থাকবে	ইলেকট্রনের তুলনায় প্রোটনসংখ্যা কম হবে/ বেশি হবে/ একই থাকবে	ইলেকট্রনের মোট তড়িতাধানের তুলনায় প্রোটনের মোট তড়িতাধান কমে গেল/ বেড়ে গেল	পরমাণুটির আধানের প্রকৃতি ধনাত্মক/ ঋণাত্মক
নিস্তড়িৎ পরমাণুর ইলেকট্রন গ্রহণ				
নিস্তড়িৎ পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়া				

তাহলে বলা যায়

পরমাণু ইলেকট্রন গ্রহণ করলে পরমাণুটি ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়।

পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে পরমাণুটি ধনাত্মক আধানে আহিত হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, দুটি ভিন্ন পদার্থের তৈরি বস্তু পরস্পর ঘষলে তাদের মধ্যে একটি ধনাত্মক ও অপরটি ঋণাত্মক তড়িতাহিত হয়ে পড়ে কেন?

তাহলে কি এখানে 'ইলেকট্রন যুক্ত হওয়া ও বেরিয়ে যাওয়ার' ব্যাপারটি ঘটে?

আসলে, দুটি ভিন্ন পদার্থের তৈরি বস্তুকে পরস্পর ঘষলে একটি বস্তু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে ফলে সেই বস্তুতে ইলেকট্রনের সংখ্যার তুলনায় প্রোটন সংখ্যা বেশি হয়ে পড়ে। ফলে বস্তুটি ধনাত্মক আধানে আহিত হয়।

কিন্তু ওই ইলেকট্রনগুলি যায় কোথায়?

যেহেতু অন্য পদার্থটি ঋণাত্মক আধানে আহিত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ওই ইলেকট্রনগুলি দ্বিতীয় বস্তুর পরমাণুতে যুক্ত হয়। স্বাভাবিকভাবেই তখন ওই পদার্থের ইলেকট্রন সংখ্যা প্রোটন সংখ্যা অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়।

তাহলে দেখা গেল একটি পদার্থ যতগুলো ইলেকট্রন হারায় অন্য পদার্থটি ঠিক ততগুলোই ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তাই একই সঙ্গে ওই দুই বস্তুতে সমপরিমাণ কিন্তু বিপরীত প্রকৃতির তড়িৎ আধান উৎপন্ন হয়।

এবার একটি অন্য ঘটনার দিকে নজর দেওয়া যাক।

প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়ে শীতকালে শুকনো মাথার চুল আঁচড়ানোর পর তা নিস্তড়িৎ কাগজ টুকরোকে আকর্ষণ করে। এর কারণ কী? চুলের সঙ্গে ঘর্ষণে চিরুনি তড়িতাহিত হলেও কাগজের টুকরোকে তো কোনো কিছুর সঙ্গে ঘষা হয়নি।

তোমরা জানো যে বিপরীত তড়িতাধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে ও সমতড়িতাধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। তাহলে কি নিস্তড়িৎ কোনো বস্তুর কাছে একটি তড়িৎগ্রস্ত বস্তু আনলে, নিস্তড়িৎ বস্তুতে বিপরীত আধান তৈরি হয়? তা না হলে আকর্ষণ কীভাবে সম্ভব?

ধরা যাক, ধনাত্মক তড়িতাধানে আহিত কোনো একটি বস্তুকে, কোনো নিস্তড়িৎ বস্তুর কাছে আনা হলো।

একটি বস্তু নিস্তড়িৎ হবার কারণ হলো এই যে, সেই বস্তুতে সমান পরিমাণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান থাকে। এবার যখন একটি ধনাত্মক আধান যুক্ত বস্তুকে নিস্তড়িৎ বস্তুর কাছাকাছি আনা হয় তখন ওই নিস্তড়িৎ বস্তুর ভেতরকার ঋণাত্মক আধানগুলো ধনাত্মক বস্তুটির জন্য আকর্ষণ অনুভব করে ও ধনাত্মক বস্তুটির দিকে সরে যায়।
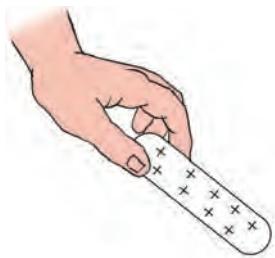
ফলে ধনাত্মক বস্তুটির উপস্থিতির কারণে নিস্তড়িৎ বস্তুটির একপ্রান্ত ঋণাত্মক ও অন্যপ্রান্ত ধনাত্মক তড়িতাহিত বস্তুর মতো আচরণ করে, এবং ধনাত্মক বস্তুটি নিস্তড়িৎ বস্তুর ঋণাত্মক প্রান্তটিকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে নেয়।
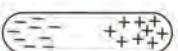
কোনো তড়িতাহিত বস্তুর উপস্থিতির কারণে একটি নিস্তড়িৎ বস্তুর দুই প্রান্তে বিপরীত তড়িৎ-এর সমাবেশ ঘটার এই ঘটনাকে বলে **তড়িৎ আবেশ**। এই কারণেই তড়িতাহিত চিরুনি নিস্তড়িৎ কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে। আবেশ সৃষ্টিকারী বস্তুটিকে সরিয়ে নিলে সাময়িকভাবে আবিষ্ট হওয়া বস্তুটি পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে।

তড়িৎ বলের প্রভাবে গতি

তোমরা দেখলে যে বিপরীতধর্মী তড়িৎ আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে ও সমধর্মী তড়িৎ আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এই প্রকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ — দুটিই হলো ‘বল’। এই বলের নাম তড়িৎ বল বা **স্থিরতড়িৎ বল**।

নিউটনের সূত্র থেকে তোমরা জেনেছ যে বলের প্রভাবে বেগ বদলে যায়, ফলে ত্বরণ সৃষ্টি হয়। বল যে দিকে ক্রিয়া করে বেগ সেই দিকেই বদলায়, অর্থাৎ বলের দিকেই ত্বরণ হয়।

তড়িৎ আকর্ষণ বলের প্রভাবে হওয়া গতির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের গতি। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকা নিউক্লিয়াস ধনাত্মক তড়িৎ যুক্ত, কারণ সেখানে প্রোটন ছাড়া আর কোনো তড়িৎযুক্ত কণা নেই। আর ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত কণা। ফলে নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রনের মধ্যে তড়িৎ আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। তাই চলন্ত ইলেকট্রনের বেগের অভিমুখ ক্রমাগত বেঁকে যায়। আর ওই বেঁকে যাওয়াটা ঘটে কেন্দ্রের দিকে। এই কারণে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে পাক খেতে পারে।
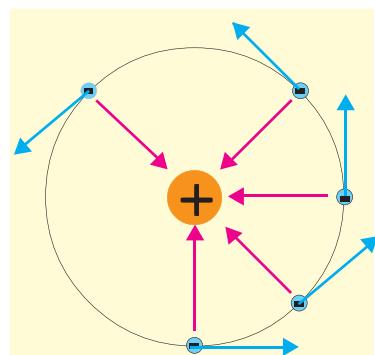
ছবিতে দেখো ইলেকট্রনের বেগ যে তির চিহ্ন (→) দিয়ে বোঝানো হয়েছে সেই তিরগুলো বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে বেঁকে যাচ্ছে। বৃত্তের ব্যাসার্ধ বরাবর তড়িৎ আকর্ষণ বল টানছে (→) বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে।

সূর্যের চারদিকে গ্রহের ঘোরার সময়েও এমন ধরনের ঘটনাই ঘটে। তবে সেখানে তড়িৎ আকর্ষণ বল থাকে না, তার বদলে থাকে মহাকর্ষ বল।

1.3 তাপ

তাপের পরিমাপ ও একক

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ, বস্তুর উষ্ণতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ভর করে বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণের উপর, বস্তুর ভরের উপর ও বস্তু কোন উপাদান দিয়ে তৈরি তার উপর।

বস্তুর উষ্ণতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ নির্ভর করে

i) বস্তুর উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণ

ii) বস্তুর ভর

iii) বস্তুর উপাদান

বস্তুর উষ্ণতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় তাপ ওপরে উল্লেখিত বিষয়গুলির ওপর কীরকমভাবে নির্ভর করে সে সম্বন্ধে আমরা আরো বিশদভাবে এবার জানব।

i) তোমরা জেনেছ নির্দিষ্ট ভরের জলের উষ্ণতা $25^{o}C$ বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন, ওই একই ভরের জলের উষ্ণতা $50^{o}C$ বাড়াতে তার দ্বিগুণ তাপ প্রয়োজন।

একইভাবে, 1 কাপ জলের $1^{o}C$ উষ্ণতা বাড়াতে যতটা তাপ লাগবে, $2^{o}C$ উষ্ণতা বাড়াতে তার 2 গুণ তাপ লাগবে। তাহলে $3^{o}C$ উষ্ণতা বাড়াতে তার কত গুণ তাপ লাগবে?

ii) তোমরা এটাও জেনেছ 1 কাপ জলের উষ্ণতা $1^{o}C$ বাড়াতে যতটা তাপ লাগে, 2 কাপ জলের জন্য তার 2 গুণ তাপ লাগে। তাহলে 3 কাপ জলের উষ্ণতা বাড়াতে তার কত গুণ তাপ লাগবে?

এবার ধরা যাক m গ্রাম ভরের জলের উষ্ণতা $t^{o}C$ বাড়াতে Q পরিমাণ তাপ লাগে।

তাহলে 2m গ্রাম ভরের জলের $t^{o}C$ উষ্ণতা বাড়াতে 2Q পরিমাণ তাপ লাগবে।

এবং 2m গ্রাম ভরের জলের $2t^{o}C$ উষ্ণতা বাড়াতে $2 \times 2Q = 4Q$ পরিমাণ তাপ লাগবে।
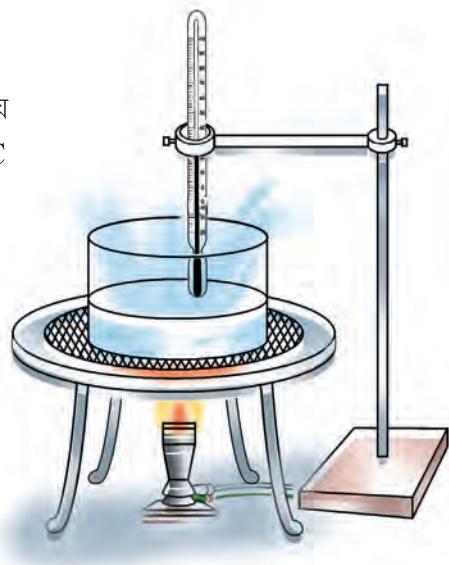
এবার নীচের হিসাবটিকে লক্ষ করো।

$$\frac{\text{তাপ গ্রহণ বা বর্জনের পরিমাণ}}{\text{ভর} \times \text{উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস}} = \frac{4Q}{2m \times 2t} = \frac{Q}{m \times t}$$

একইভাবে

5m গ্রাম ভরের জলের উষ্ণতা $6t^{o}C$ বাড়াতে $(5 \times 6)\,Q = 30Q$ পরিমাণ তাপ লাগবে

সেক্ষেত্রে

$$\frac{\text{তাপ গ্রহণ বা বর্জনের পরিমাণ}}{\text{ভর} \times \text{উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস}} = \frac{30Q}{5m \times 6t} = \frac{Q}{m \times t}$$

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একই পদার্থের (জল) জন্য $\left(\frac{\text{তাপ গ্রহণ বা বর্জনের পরিমাণ}}{\text{ভর} \times \text{উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস}}\right)$ এর মান সবসময় একই থাকে, তা সেই বস্তুটির ভর ও উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিমাণ যতই বদলাক না কেন।

ধরা যাক, জলের ক্ষেত্রে ওই মান হলো k। কিন্তু পদার্থ আলাদা হলে k-এর মানও আলাদা হয়।

এখন যদি আমরা k-এর মান নির্ণয় করতে চাই আমাদের Q-এর মান জানা প্রয়োজন। কিন্তু Q বা তাপ মাপার একক তো এখনও আমরা ঠিক করিনি। তাহলে k-এর মান নির্ণয় হবে কীভাবে?

তাই চলো Q বা তাপ মাপার একক ঠিক করে নেওয়া যাক।

1 গ্রাম বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা $1^{o}C$ বাড়াতে যে পরিমাণ তাপ লাগে তাকেই আমরা একক পরিমাণ তাপ বলি। এই একক পরিমাণ তাপের নাম দেওয়া হয় 1 ক্যালোরি।

এবার দেখা যাক তাপের একক এভাবে ঠিক করার ফলে জলের ক্ষেত্রে k-র মান কত পাওয়া যায়?

$$\because \quad k = \frac{Q}{m \times t}$$

$$\therefore \quad Q = k.m.t$$

1 ক্যালোরির সংজ্ঞা অনুযায়ী $m=1$ গ্রাম, $t=1^{o}C$ হলে জলের ক্ষেত্রে $Q=1$ ক্যালোরি।

অতএব $k = \frac{1}{1 \times 1}$

$= 1$ ক্যালোরি / গ্রাম ^{o}C

এবার চলো একটি পরীক্ষা করা যাক।
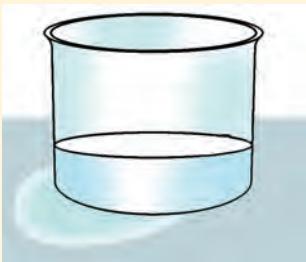
60 গ্রাম জল, 25ºC উষ্ণতা
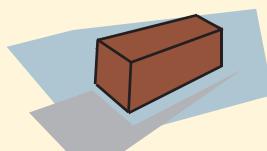
120 গ্রাম ভরের বস্তু
উষ্ণতা 100º C
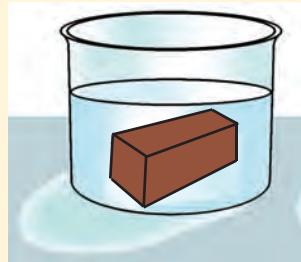
120 গ্রাম ভরের বস্তু
উষ্ণতা 50º C

এবার 25ºC উষ্ণতার 60 গ্রাম জল নেওয়া হলো। 100ºC উষ্ণতার 120 গ্রাম ভরের একটি বস্তুকে ওই জলে ফেলা হলো। এভাবে কিছুক্ষণ রেখে দিলে জল ও বস্তুর উষ্ণতার কি কোনো পরিবর্তন হবে?

জল ও বস্তুর উভয়ের উষ্ণতাই কিছুক্ষণ পর সমান হয়ে যাবে। ধরা যাক এই উষ্ণতা 50ºC।

তাহলে জলের উষ্ণতা (50–25) = 25ºC বাড়বে। অর্থাৎ জল কিছু তাপ গ্রহণ করবে। আর বস্তুর উষ্ণতা (100– 50) = 50ºC কমবে। অর্থাৎ বস্তু কিছুটা তাপ হারাবে।

বস্তু যতটা তাপ বর্জন করল জল ঠিক ততটাই তাপ গ্রহণ করল।

তোমরা জান $Q = m \times k \times t$.

জল যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করল, তা হলো,

$Q = 60 \times 1 \times (50-25)$ ক্যালোরি $= 1500$ ক্যালোরি

(এখানে $m = 60$ গ্রাম, $k = 1$ ক্যালোরি/গ্রাম ºC ও $t = 50 - 25 = 25$ºC)

এবং বস্তু যে পরিমাণ তাপ বর্জন করল,

$Q = 120 \times k \times (100 - 50)$ ক্যালোরি $= 6000\ k$ ক্যালোরি

(এখানে $m = 120$ গ্রাম, $t = 100-50 = 50$ºC এবং k অজানা)

যেহেতু, বস্তুর বর্জন করা তাপ ও জলের গ্রহণ করা তাপের পরিমাণ একই, তাই লেখা যায়,

$\therefore\ 6000\,k = 1500$

$$\therefore\quad k = \frac{1500}{6000} = 0.25$$

বস্তুটির ক্ষেত্রে $k = 0.25$, এই মান পাওয়া যাচ্ছে যখন জলের ক্ষেত্রে $k = 1$ ধরা হচ্ছে। জলের ক্ষেত্রে $k = 1$ না হয়ে অন্য কিছু ধরা হলে বস্তুটির ক্ষেত্রে k -এর মান অন্য হতো। অর্থাৎ k -এর মান আপেক্ষিক।

তাই $Q = m \times k \times t$, এই সম্পর্কটিতে k-কে বলা হয় আপেক্ষিক তাপ। t হলো উষ্ণতার পরিবর্তন ।

আপেক্ষিক তাপকে সাধারণত s দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আগের পাতার আলোচনা অনুযায়ী বিভিন্ন পদার্থের s এর মান আলাদা।

কোনো পদার্থের একক ভরের উষ্ণতা 1^{o} বৃদ্ধি করতে প্রয়োজনীয় তাপকে ওই পদার্থের আপেক্ষিক তাপ বলে। $Q = m \times s \times (t_2 - t_1)$ এটি গৃহীত বা বর্জিত তাপ পরিমাপের রাশিমালা। এখানে t এর পরিবর্তে $(t_2 - t_1)$ লেখা হয়েছে, যেখানে t_1 হলো প্রাথমিক উষ্ণতা ও t_2 হলো অন্তিম উষ্ণতা। এই রাশিমালা প্রয়োগ করে নীচের ফাঁকা স্থান পূরণ করো।

বস্তু বা পদার্থের উপাদানের নাম	ভর (M) গ্রাম	আপেক্ষিক তাপ(s) ক্যালোরি/গ্রাম °C	উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস $(t_2 - t_1)$°C	গৃহীত বা বর্জিত তাপ Q ক্যালোরি। $Q = m \times s \times (t_2 - t_1)$
অ্যালুমিনিয়াম	400	0.21	70-30 =	$Q_1 = 400 \times 0.21 \times 40$ $= 3360$
তামা	100	0.09	90-50 =	$Q_2 =$
সিসা	600	0.03	80-25 =	$Q_3 =$
রুপো	80	0.05	35-25 =	$Q_4 =$

অবস্থার পরিবর্তন ও লীনতাপের ধারণা

তাপ প্রয়োগ বা নিষ্কাশনের ফলে পদার্থের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়াকে **অবস্থার পরিবর্তন** বলে।
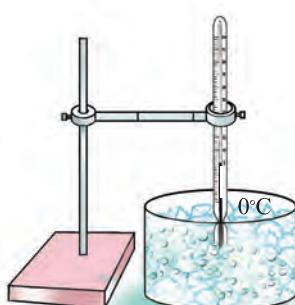
এক কাপ জলকে কিছুক্ষণ ধরে তাপ দিলে তার উষ্ণতা বেড়ে যায়। অথচ 0°C উষ্ণতার একখণ্ড বরফকে তাপ প্রয়োগ করে গলতে দিলে বরফটি সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার আগে যদি তার উষ্ণতা মাপা হয় তবে দেখা যায় সেই উষ্ণতা 0°C ই রয়েছে। এখানে বরফ তাপ গ্রহণ করে জলে পরিণত হয়েছে কিন্তু তার উষ্ণতার পরিবর্তন হয়নি। ঘটনাটিকে বলে **গলন**।

এভাবে বেশিরভাগ কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তা গলে তরলে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রেও ঘটনাটি কোনো না কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতাতেই ঘটে। এক এক ধরনের কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা এক এক রকমের হয়। এই নির্দিষ্ট উষ্ণতা ওই কঠিন পদার্থগুলির গলনাঙ্ক।
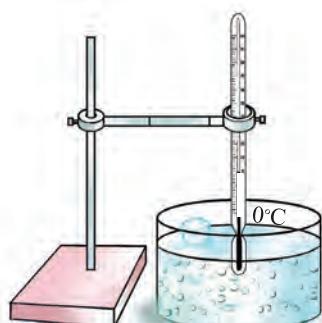
তোমরা দেখেছ যে গলানো মোমকে তরল অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দিলে তা নিজে নিজেই জমে শক্ত হয়ে যায়। আবার ফ্রিজে রাখা জল জমে বরফ হয়, তাও তোমরা জানো। তরল পদার্থ জমে কঠিন হবার সময় তরলটি তাপ ছেড়ে দেয়। তরল পদার্থ তাপ বর্জন করে যখন কঠিনে পরিণত হয় সেই ঘটনাকে বলে কঠিনীভবন। অবস্থার এই পরিবর্তনের সময়েও তরলটির উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হয় না।

তরল পদার্থ তাপ বর্জন করলে তা একসময়ে জমে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রেও ঘটনাটি কোনো না কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতাতেই ঘটে। এক এক ধরনের তরল পদার্থের ক্ষেত্রে এই উষ্ণতা এক এক রকমের হয়। ওই নির্দিষ্ট উষ্ণতা ওই তরল পদার্থগুলির হিমাঙ্ক।

পাশের সারণিতে কয়েকটি পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক দেখানো হয়েছে। লক্ষ করে দেখো যে পদার্থগুলির গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্কের মান সমান।

পদার্থ	গলনাঙ্ক °C	হিমাঙ্ক °C
পারদ	– 39.5	– 39.5
বরফ	0	0
সোনা	1063	1063
তামা	1083	1083
ঢালাই লোহা	1200 (প্রায়)	1200 (প্রায়)

কয়েকটি পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক

মনে রাখবে,

কাচ, মাখন, চর্বি, মোম, পিচ ইত্যাদির কোনো নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক থাকে না। এইসব পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্কের মান সমানও হয় না।

গলনে ও কঠিনীভবনে আয়তনের পরিবর্তন

কঠিন থেকে তরলে পরিণত হলে কোনো পদার্থের আয়তন বাড়বে না কমবে?

যদি তরল কঠিনে পরিণত হয় তবে আয়তন কমবে না বাড়বে?

নির্দিষ্ট ভরের কোনো পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের সময় আয়তন কমলে ওই পদার্থের ঘনত্ব বাড়ে। ফলে কঠিনীভবনের পর পদার্থের ঘনত্ব সাধারণত বাড়ে।

চলো এবার একটি পরীক্ষা করা যাক।

দুটি টেস্টটিউবের একটিতে কিছুটা মোম এবং অন্যটিতে একটা বরফের টুকরো নেওয়া হলো। দুটি টেস্টটিউবকে গরম করে মোম ও বরফকে গলানো হলো। এবার যে টেস্টটিউবে গলানো মোম আছে তাতে একটা ছোটো মোমের টুকরো ফেলে দাও, আর যে টেস্টটিউবে জল আছে তাতে একটা বরফের টুকরো ফেলে দাও। কী দেখা গেল?

পাশের 1নং চিত্রের মতো কঠিন মোমের টুকরো তরল মোমের মধ্যে ডুবে যাবে। যদিও গরম তরল মোমের সংস্পর্শে কঠিন মোমের টুকরো খুব তাড়াতাড়ি গলে যাবে। কিন্তু 2 নং চিত্রের মতো বরফের টুকরো বরফগলা জলের উপর ভেসে থাকবে।
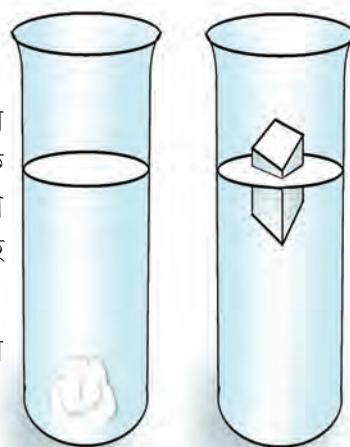
চিত্র 1 চিত্র 2

কঠিন মোমের ঘনত্ব তরল মোমের ঘনত্বের তুলনায় বেশি। কিন্তু কঠিন বরফের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের তুলনায় কম।

এবার নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করো।

জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে না কমে?

তরল মোম কঠিন মোমে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে না কমে?

জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বাড়ে। এই ঘটনার সুবিধা ও অসুবিধা দুই আছে।

শীতপ্রধান দেশে মোটরের রেডিয়েটারে থাকা জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বেড়ে যায়। অনেকক্ষেত্রে ওই পাইপ ফেটে যায়। শীতের দেশে বাড়ির জল সরবরাহের পাইপগুলিও কখনো-কখনো ফেটে যায়।

এই কারণে পাথরের মাঝখানে থাকা জল বরফে পরিণত হলে আয়তনে বেড়ে যায়। এতে অনেক সময় পাথর ফেটে যায়। এই কারণেও পাহাড়ে মাঝে মাঝে ধস নামে।

আবার বরফের ঘনত্ব জলের তুলনায় কম। জলের উপর বরফ ভেসে থাকে। বরফের তলায় জল থাকে। তাতে মাছেরা বেঁচে থাকে।

কোনো কোনো তরল কঠিনে পরিণত হলে আয়তনে বেড়ে যায় অর্থাৎ ঘনত্ব কমে যায়। এইরকম আরো কয়েকটি পদার্থ হলো ঢালাই লোহা, পিতল ইত্যাদি।

বাড়িতে যদি ছাঁচে ঢালা ধাতুর তৈরি মূর্তি থাকে তাহলে জানার চেষ্টা করোতো মূর্তিটি কোন ধাতু দিয়ে তৈরি। ধাতু গলিয়ে আর ছাঁচে ঢেলে যে মূর্তিগুলি তৈরি করা হয় তা বিশেষ ধাতু ব্যবহার করে তৈরি করা হয় কেন?

এবার দেখা যাক, কোনো পদার্থের গলনাঙ্ক কীভাবে বদলায়।

বরফের দুটি টুকরোকে একসঙ্গে কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখলে তারা জোড়া লেগে যায়। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। কিন্তু কেন এমন হয়?

বরফের গলনের ফলে যে জল উৎপন্ন হয়, তার আয়তন বরফের আয়তনের তুলনায় কমে যায়। চাপ বাড়ালে গলনে সাহায্য হয়। তাই চাপ বাড়ালে বরফের গলনাঙ্ক কমে যায়। ফলে চেপে ধরার সময় দুটি বরফের সংযোগস্থলে গলনাঙ্ক কমে ও বরফ গলে জল হয়। যখন চাপ সরিয়ে নেওয়া হয় তখন গলনাঙ্ক আবার বাড়ে ও গলে যাওয়া অংশ আবার বরফে পরিণত হয়। ফলে বরফের টুকরো দুটো জুড়ে যায়।

গলনের সময় বরফ, ঢালাই লোহা ইত্যাদি পদার্থের আয়তন কমে। এইসব পদার্থের ক্ষেত্রে চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক কমে যায়। অর্থাৎ বেশি চাপে ওরা কম উষ্ণতায় গলে।

গলনাঙ্ক যেহেতু চাপ বাড়লে বা কমলে বদলে যায়, তাই কোনো পদার্থের গলনাঙ্ক নির্ধারণ করার সময় চাপ কত ছিল তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যদি কোনো পদার্থের গলনাঙ্ক 76 সেমি পারদস্তম্ভের চাপের সমান

চাপে নির্ধারণ করা হয় তবে তা হলো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে পদার্থটির গলনাঙ্ক। একে পদার্থটির স্বাভাবিক গলনাঙ্ক বলে। এইভাবে স্বাভাবিক হিমাঙ্কও ঠিক হয়।

বরফের উপরে এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান পরিমাণ চাপ বাড়ালে বরফের গলনাঙ্ক প্রায় $0.0007^{\circ}C$ কমে যায়।

গলনের সময় সিসা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি পদার্থের আয়তন বাড়ে। এদের ক্ষেত্রে চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক বেড়ে যায়, অর্থাৎ ওরা আগের চেয়ে বেশি উষ্ণতায় গলে।

গলনের সময় মোম প্রসারিত হয়। চাপ বাড়ালে গলন প্রক্রিয়া বাধা পায়, তাই গলনাঙ্ক বেড়ে যায়। এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সমান পরিমাণ চাপ বাড়ালে মোমের গলনাঙ্ক প্রায় $0.04^{\circ}C$ বেড়ে যায়।

বৈদ্যুতিক লাইনে যে ফিউজ তার ব্যবহার করা হয়, তার গলনাঙ্ক খুব কম হওয়া দরকার। প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশি তড়িৎ প্রবাহিত হলে তার উত্তপ্ত হয়ে আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। ফিউজ তারের গলনাঙ্ক কম হওয়ায় ওই তার অল্প উত্তাপেই গলে যায় ও তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ওই ফিউজ তার সিসা ও টিন মিশিয়ে তৈরি করা হয়। সিসা ও টিনের মিশ্র ধাতুর গলনাঙ্ক সিসা ও টিন দুটি ধাতুরই গলনাঙ্কের তুলনায় কম হয়।

চলো এবার একটি পরীক্ষা করা যাক।

দুটি বাটিতে দুটি একই আকৃতি ও আয়তনের বরফ রাখো। যে-কোনো একটি বাটিতে বরফের গায়ে নুন ছড়িয়ে দাও। দেখোতো দুটি বরফ একইসঙ্গে গলে জল হলো কিনা? ভেবে বলোতো নুন মেশানোর ফলে বরফের গলনাঙ্ক বেড়েছে না কমেছে?

হিমমিশ্র : বরফের সঙ্গে নুন মেশালে মিশ্রণের উষ্ণতা কমে। এই কম উষ্ণতার মিশ্রণ মাছ সংরক্ষণে, ওষুধ ঠান্ডা অবস্থায় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে ব্যবহার করা হয়। বরফ ও নুন নির্দিষ্ট ভরের অনুপাতে মিশিয়ে হিমমিশ্র তৈরি করা হয়।

এবার ভেবে বলোতো, পদার্থের গলনাঙ্ক কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

সপ্তম শ্রেণিতে আমরা জেনেছি যে উষ্ণতার পরিবর্তন না করে যখন কোনো পদার্থ এক অবস্থা থেকে অন্য কোনো অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তখন ওই পদার্থ কিছু পরিমাণ তাপ নেয় বা ছেড়ে দেয়। একক ভরের পদার্থের ক্ষেত্রে তাপের ওই পরিমাণকে বলা হয় অবস্থার পরিবর্তনের **লীনতাপ**।

বরফ গলনের লীনতাপ 80 ক্যালোরি/ গ্রাম। এর অর্থ হলো প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে $0^{\circ}C$ উষ্ণতার 1 গ্রাম বরফকে $0^{\circ}C$ উষ্ণতার 1 গ্রাম জলে পরিণত করতে 80 ক্যালোরি তাপ প্রয়োগ করতে হবে।

- বরফের টুকরোর মধ্যে গর্ত করে জল রাখলে ওই জল জমে বরফ হয় না কেন?

তোমরা জেনেছ, $0^{\circ}C$ উষ্ণতার 1 গ্রাম জলকে $0^{\circ}C$ উষ্ণতার 1 গ্রাম বরফে পরিণত করতে হলে জল থেকে 80 ক্যালোরি তাপ নিষ্কাশন করা প্রয়োজন।

$0^{\circ}C$ উষ্ণতার জল থেকে তাপ শোষণ করতে পারবে সেই বস্তু যার উষ্ণতা $0^{\circ}C$-এর কম। বরফের টুকরোর মধ্যে গর্ত করে যে জল রাখা হলো, তার উষ্ণতা প্রথমে ঘরের উষ্ণতার সমান ছিল অর্থাৎ $0^{\circ}C$-এর বেশি।

এবার কে তাপ নেবে? জল না বরফ? কিছুটা বরফ জল থেকে তাপ নিয়ে গলে

যাবে। কিন্তু বরফের উষ্ণতা 0°C ই থাকবে। জল থেকে তাপ চলে যেতে যেতে একসময় জলের উষ্ণতা হবে 0°C। এবার, জল ও বরফ দুয়ের উষ্ণতাই 0°C।

এবার কি জল থেকে বরফ আর তাপ শোষণ করতে পারবে? জল যেহেতু লীনতাপ বর্জন করতে পারবে না তাই তা কঠিনও হবে না।

বাষ্পীভবন

জল দিয়ে হাত ধুলে। ধোয়া হাত না মুছে খোলা হাওয়ায় ধরে রাখলে। কিছুক্ষণ পর হাত শুকিয়ে যায়। হাতে লেগে থাকা জল কোথায় যায়? একটি পাত্রে জল নিয়ে তা উনুনে বসিয়ে ফোটাতে থাকলে একসময় সমস্ত জল ফুটতে ফুটতে শেষ হয়ে যায় ও পাত্রটি খালি হয়ে যায়। এই জলই বা কোথায় যায়?

তোমাদের জানা আছে ওই জল বাষ্প হয়ে বাতাসে মেশে। একই কারণে ভিজে যাওয়া জামাকাপড় শুকিয়ে যায়। জল দিয়ে ঘর মুছলে তাও শুকিয়ে যায়। নদী-নালা, পুকুরের জল গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়।

কিন্তু আমরা জানি জল বাষ্পে পরিণত হতে হলে জলকে তাপ গ্রহণ করতে হয়। হাতে লাগা তরলের বাষ্পে পরিণত হওয়ার জন্য বাইরে থেকে আলাদা করে আমরা তাপ প্রয়োগ করিনি। ওই তরল সম্ভবত চারপাশ থেকে বা নিজের মধ্য থেকেই দরকারি তাপ পেয়ে গেছে। খেয়াল করলে দেখবে এই পদ্ধতিতে জল বাষ্পীভূত হওয়ার প্রক্রিয়াটা খুবই মন্থর।

শুধু জলই যে এভাবে বাষ্পীভূত হয় তা নয়। স্পিরিট বা ওই ধরনের কোনো উদ্‌বায়ী তরল এই পদ্ধতিতে খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়। যে-কোনো উষ্ণতায় কোনো তরলের উপরিতল থেকে ধীরে ধীরে বাষ্পে রূপান্তরিত হবার এই ঘটনাকে বলে **বাষ্পায়ন**।

দুটি একই মাপের কাপড়কে একই রকমভাবে জলে ডোবাও। দুটি টুকরোকেই একই রকম ভাবে নিংড়ে নাও। এবার একটি কাপড়ের টুকরোকে কয়েকটি ভাঁজ করে শুকোতে দাও। তার পাশে অন্য কাপড়ের টুকরোটিকে না ভাঁজ করে সম্পূর্ণ খুলে শুকোতে দাও।

- কোন কাপড়টা আগে শুকিয়ে গেল? তাহলে বলা যেতে পারে ওই জল তার উপরিতল থেকে বাষ্পে পরিণত হয়েছে। তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল যত বাড়ে তরল তত তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়।

- বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। কিন্তু শীতকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্প কম থাকে। শীতকালে ভিজে জামাকাপড় থেকে জল তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়ে যায় বলে ভিজে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। এছাড়াও বাষ্পায়নের হার তরলের উপরের চাপ, বায়ু চলাচল প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে।
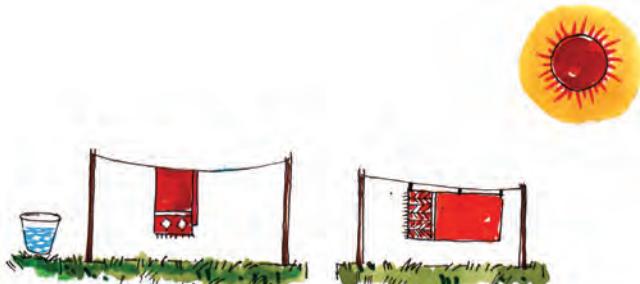
- **তবে এবার দেখা যাক বাষ্পায়ন সম্বন্ধে আমরা কী কী জানলাম—**

(1) যদি তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেশি হয় তবে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়।

(2) বাষ্পায়ন হবার জন্য কোনো বিশেষ উষ্ণতা অর্জনের প্রয়োজন হয় না। তরলের উষ্ণতা বেশি হলে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়।

(3) তরলের ওপর বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়।

(4) তরলের প্রকৃতির ওপর বাষ্পায়নের হার নির্ভর করে। যেমন স্পিরিট খুব তাড়াতড়ি বাষ্পীভূত হয়।

- **গরমকালে ঘামে ভেজা শরীরে হাওয়ার সামনে দাঁড়ালে আরাম হয়। কেন?**

সেইসময় ঘাম কি শুকিয়ে যায়?

ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার অর্থ ঘামের জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হওয়া।

ওই জলের এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কীসের দরকার?

বাষ্প হবার জন্য যে তাপের দরকার হয়, তা ওই জল কোথা থেকে শোষণ করবে?

জলের বাষ্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লীনতাপ দেহ থেকে শোষিত হলে দেহে শীতলতার অনুভূতি হয়। তাই আরাম লাগে।

এই একই কারণে হাতে স্পিরিট বা ইথার ঢাললে খুব ঠান্ডা বোধ হয়।

- গ্রীষ্মকালে কুকুরকে জিভ বার করে লালা ঝরাতে তোমরা অনেকেই দেখেছো। জিভের ওপরের ভেজা তল থেকে জল বাষ্পীভূত হয়। জল বাষ্পীভূত হওয়ার সময় বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় লীনতাপ জিভ থেকেই সংগৃহীত হয়। কুকুরের দেহ ঠান্ডা রাখার এটি অন্যতম একটি উপায়।

এবার ভেবে বলোতো,

পারদ থার্মোমিটারের কুণ্ডে ভিজে কাপড় জড়িয়ে রাখলে থার্মোমিটারের পাঠ কমে যায় কেন?

স্ফুটন

তোমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানো যে একটি পাত্রে জল নিয়ে তা যদি জ্বলন্ত উনুনের উপর রাখো, তাহলে জল ফুটতে শুরু করে ও খুব দ্রুত বাষ্পীভূত হয়। জল যখন টগবগ করে ফোটে তখন সমগ্র জলের মধ্যেই একটা উথাল-পাথাল অবস্থা চলতে থাকে, কিন্তু থার্মোমিটার দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে ওইসময় জলের উষ্ণতার কোনো পরিবর্তন হয় না।

একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরলের সমগ্র অংশ থেকে অতি দ্রুত বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়াকে **স্ফুটন** বলা হয়।

যে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটন শুরু হয় ও যতক্ষণ স্ফুটন চলে ততক্ষণ ওই উষ্ণতা স্থির থাকে, সেই উষ্ণতাকে ওই তরলের **স্ফুটনাঙ্ক** বলা হয়।

- **তরলের স্ফুটনাঙ্ক যে যে বিষয়ের ওপর নির্ভর করে:**

(1) তরলের প্রকৃতি। বিভিন্ন তরলের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন।

(2) তরলে দ্রবীভূত পদার্থের উপস্থিতি। তরলে যদি কোনো পদার্থ দ্রবীভূত করা হয়, সাধারণত তরলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। যেমন বিশুদ্ধ জল ফোটে 100°C তাপমাত্রায়। কিন্তু জলে নুন মেশালে সেই দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক জলের স্ফুটনাঙ্কের চেয়ে বাড়ে।

কয়েকটি তরলের স্ফুটনাঙ্ক

পদার্থের নাম	স্ফুটনাঙ্ক (°C)
জল	100
ডাই ইথাইল ইথার	35
পারদ	357
তরল হাইড্রোজেন	-253

(3) তরলের উপরিস্থিত চাপ। স্ফুটনের সময় তরল বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। তরল বাষ্পে রূপান্তরিত হলে তার আয়তন বেড়ে যায়।

এবার ভেবে বলো, চাপ বাড়ালে স্ফুটন প্রক্রিয়া বাধা পাবে না কি স্ফুটন প্রক্রিয়ায় সাহায্য হবে?

চাপ বাড়ালে স্ফুটন প্রক্রিয়া বাধা পায় বলে স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। ফলে কোনো পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক ঠিক করার সময় তা একটি নির্দিষ্ট চাপে ঠিক করা হয়। যেমন প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C।

রান্নার সময় পাত্রের মুখ ঢাকনা দিয়ে চেপে রান্না করলে খাদ্যবস্তু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। কেন?

পাত্রের ঢাকনা তার মধ্যে উৎপন্ন জলীয় বাষ্পকে কি বের হতে দেবে?

পাত্রের মধ্যে যত বাষ্প জমা হতে থাকবে জলীয় বাষ্পের চাপ তত বাড়তে থাকবে। এতে জলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যাবে এবং জল খোলা হাওয়ায় যে উষ্ণতায় ফুটত তার চেয়ে বেশি উষ্ণতায় ফুটবে। ফলে খাদ্যবস্তু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে। প্রেসার কুকার যন্ত্রে এই নীতি অনুযায়ী 100°C উষ্ণতার থেকে বেশি উষ্ণতায় জল ফোটানো হয়। ফলে খাদ্যদ্রব্য তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়।

তরলের উপর চাপ কমালে তরলের স্ফুটনাঙ্ক কি বেড়ে যাবে না কি কমে যাবে?

স্ফুটনের সময় চাপ কমালে তরলের অবস্থার পরিবর্তন কি বাধা পাবে না সহজ হবে?

তরলের চাপ কমালে তরলের বাষ্পে রূপান্তরে সুবিধা হয়, ফলে তরলের স্ফুটনাঙ্ক কমে যায়।

ওষুধের দোকানে যে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ পাওয়া যায় তা একটা জোগাড় করো। এবার তার সুচটা সরিয়ে রাখো। ওই ইনজেকশনের সিরিঞ্জের মুখটা জলে ডুবিয়ে অন্য পাশের পিস্টনটা যদি তোমার দিকে টানো তাহলে পিস্টনটা দিয়ে জল সিরিঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করবে। তারপর যদি ওই পিস্টনটা আবার উলটো দিকে ঠেলো তবে জল আবার বেরিয়ে যাবে। এবার মা যখন জল গরম করে চা করেন, জলটা ফুটতে শুরু হবার আগেই ইনজেকশনের সিরিঞ্জটা দিয়ে সেখান থেকে কিছুটা জল নিয়ে নাও।
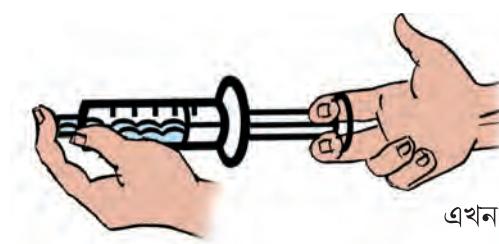
এবার সিরিঞ্জের মুখটা ছবির মতো আঙুল দিয়ে বন্ধ করে ইনজেকশনের সিরিঞ্জের পিস্টনটা পিছনের দিকে টেনে দেখোতো জল ফুটতে শুরু করল কিনা?

এখন সিরিঞ্জের ভিতরের জলের উষ্ণতা তো 100°C-এর চাইতে কম। তা সত্ত্বেও ওই জল ফুটতে শুরু করল কেন?

সিরিঞ্জের সুচোলো মুখ আঙুল দিয়ে আটকে, পিস্টন ধরে টানার সময়, সিরিঞ্জের ভিতরের বাষ্প প্রসারিত হয়। তার আয়তন বেড়ে যায়, ফলে চাপ কমে যায়। কম চাপে স্ফুটনাঙ্ক কমে যাওয়ার একটি সুন্দর উদাহরণ হলো সিরিঞ্জের জলের ফুটতে শুরু করা।

উষ্ণতা স্থির রেখে স্ফুটনাঙ্কে কোনো তরলের একক ভরকে বাষ্পীভূত করার জন্য যে তাপের প্রয়োজন, সেই তাপকে ওই তরলের স্ফুটনের লীনতাপ বলা হয়।

স্টিমের লীনতাপ 537 ক্যালোরি/গ্রাম বলতে বোঝায় প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 100°C উষ্ণতায় এক গ্রাম জলকে একই উষ্ণতায় এক গ্রাম স্টিমে রূপান্তরিত করতে 537 ক্যালোরি তাপ প্রয়োগ করতে হয়।

ঘনীভবন

কাচের গ্লাসের ভিতর বরফ রাখলে কাচের গ্লাসের বাইরে জলকণা তৈরি হয়। এটি বাষ্পীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া। বাষ্প থেকে তরল হওয়ার ঘটনাকে বলে **ঘনীভবন**।

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবন হয় বলেই মেঘ, শিশির, কুয়াশা তৈরি হয়।

মেঘ : পুকুর, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, ভিজে মাটি, ও জীব দেহ থেকে জল বাষ্পীভূত হয়। এই জলীয় বাষ্প মেশে পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি উষ্ণ বায়ুর সঙ্গে। উষ্ণ ও বেশি জলীয় বাষ্পে ভরা বায়ু শীতল ও কম জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ুর তুলনায় হালকা। উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু তাই উপরের দিকে উঠতে থাকে। উচ্চতা বাড়লে চাপ কমে যায় বলে ওই বায়ুর কণাগুলির নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে ও বায়ু শীতল হয়। তখন বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্প বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা ও অন্যান্য কণাকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হয় ও জলকণারূপে তা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। একেই আমরা মেঘ বলি।
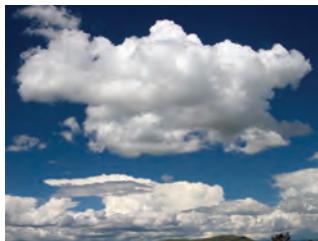
জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত বায়ু : একটি চা খাওয়ার কাপে কিছুটা জল নিয়ে তাতে অল্প খাবার নুন মেশাও। একটি চামচ দিয়ে নাড়ো। কিছুক্ষণ পর দেখতে পাবে, নুনের কঠিন দানাগুলি আর দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ নুন জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে গেলো। এভাবে ওই দ্রবণে নুন গুলতে থাকলে নিশ্চয়ই একটা সময় আসবে যখন ওই পরিমাণ জলে যতটা নুন গুলতে পারে ততটাই নুন গুলে যাবে। ওই দ্রবণকে তখন বলা হয় নুনের সম্পৃক্ত দ্রবণ। এবার আরো নুন মেশালে তা ওই দ্রবণের তলায় থিতিয়ে পড়বে। কিন্তু ওই দ্রবণটিতে যদি আবার কিছুটা জল মিশিয়ে দাও তবে ওই নুন আবার ওই দ্রবণের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যাবে। অথবা যদি দ্রবণের উষ্ণতা বাড়িয়ে দাও তাহলেও ওই নুন দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে যাবে। এবার ধরো তোমাকে $50^\circ C$ উষ্ণতার সম্পৃক্ত নুনের দ্রবণ দেওয়া হলো। তুমি ওই দ্রবণের উষ্ণতা ধীরে ধীরে কমাতে থাকলে।

কী হবে ভেবে বলোতো? নিশ্চয়ই কিছুটা নুন থিতিয়ে পড়বে।

একইভাবে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ কোনো বায়ু যদি তাতে সবচেয়ে বেশি যতটা পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকতে পারে তা দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সেই বায়ু জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়েছে বলা যায়।

কুয়াশা : শীতকালে ভোরবেলায় কুয়াশা দেখা যায়। বেলা বাড়তে থাকলে একসময় কুয়াশা মিলিয়ে যায়। রাতে বাতাস প্রায় স্থির থাকলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অনেকখানি জায়গার বায়ু ধীরে ধীরে শীতল হয়ে জলীয় বাষ্প দিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ওই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার উপর জলকণারূপে জমা হয়ে ভাসতে থাকে। একেই কুয়াশা বলে।

কুয়াশা
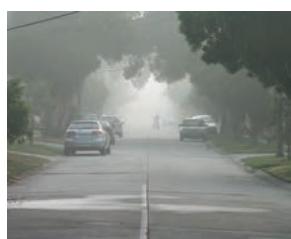
তাহলে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা মিলিয়ে যায় কেন? বড়ো বড়ো শহরে বা শিল্পাঞ্চলে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয় কেন?

শিশির : শীতকালে ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে গাছের পাতা বা ঘাসের ডগায় শিশির জমে থাকতে তোমরা অনেকেই দেখেছ। সন্ধেবেলায় শিশির পড়ে না অথচ গভীর রাতে বা ভোরের দিকে শিশির পড়ে কেন?

দিনের বেলায় সূর্যের তাপে পৃথিবীপৃষ্ঠের কাছাকাছি বস্তুগুলি উত্তপ্ত হয়। ফলে ওই বস্তুগুলির সংলগ্ন বায়ুস্তরও উত্তপ্ত হয়। সূর্যাস্তের পর ভূপৃষ্ঠ তাপ বর্জন করে ঠান্ডা হতে শুরু করে। তখন ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরও ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে থাকে। উষ্ণতা কমতে থাকলে একসময় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু জলীয় বাষ্প দিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে । উষ্ণতা আরো কমলে কী হবে বলোতো? যেভাবে জল থেকে নুন থিতিয়ে পড়েছিল সেভাবে বায়ু থেকে জলীয় বাষ্প জলকণা হিসেবে আলাদা হয়ে শিশির তৈরি হবে। শিশির পড়ার জন্য এই উপযুক্ত অবস্থা তৈরি হতে বেশ কিছু সময় লাগে। তাই সন্ধেবেলায় শিশির পড়ে না অথচ গভীর রাতে শিশির পড়ে।

তাপের প্রবাহ : পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ

ফুটন্ত জলের মধ্যে একটা কাঠের স্কেল ডুবিয়ে দেওয়া হলো। বেশ কিছুক্ষণ পর ওই কাঠের স্কেলের যে দিকটা জল থেকে বেরিয়ে আছে সেই দিকটা হাত দিয়ে ধরতে পারা যাবে কি?

ওই ফুটন্ত জলে একটি স্টিলের চামচের এক প্রান্ত ডোবালে কিছুক্ষণ পর অন্য প্রান্তটা ধরে থাকা যাবে কি? কাঠের স্কেলের একপ্রান্তের উষ্ণতা বেশি ও অন্যপ্রান্তের উষ্ণতা কম থাকা সত্ত্বেও বেশি গরম প্রান্ত থেকে কম গরম প্রান্তে খুবই কম তাপ প্রবাহিত হয়েছে। ফলে কাঠের স্কেলের অন্য প্রান্তটি ধরে থাকা গেছে। কিন্তু স্টিলের চামচের বেশি উষ্ণতার প্রান্ত থেকে কম উষ্ণতার প্রান্তে অনেক বেশি তাপ প্রবাহিত হয়েছে। ফলে কম গরম প্রান্তটিও ধীরে ধীরে অনেক গরম হয়ে গেছে ও ধরে থাকা যায়নি। একই বস্তুর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের তাপ গ্রহণ তাপের প্রবাহের জন্য সম্ভব হয়।

অতএব দেখা গেল যে কাঠের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে প্রবাহিত হতে পারে না, কিন্তু স্টিলের মধ্য দিয়ে তাপ সহজেই প্রবাহিত হয়।

কোনো কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ প্রবাহিত হওয়ার এই পদ্ধতিটির নাম **পরিবহণ**। এই পদ্ধতিতে পদার্থটির নিজের কোনো সরণ হয় না, বা পদার্থটির কোনো কণার কোনো সরণ হয় না, শুধু তাপ একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে প্রবাহিত হয়। যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে প্রবাহিত হতে পারে তারা তাপের সুপরিবাহী। যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়ে তাপ সহজে প্রবাহিত হতে পারে না তারা তাপের কুপরিবাহী।

তামা, অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল তাপের সুপরিবাহী। তাই রান্না করার পাত্র এইসব ধাতু দিয়ে তৈরি হয়।

নীচের সারণিতে লিখে ফেলো।

	রান্না করার পাত্রের নাম	তাপের সুপরিবাহী করবার জন্য কী বা কী কী ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে	পাত্রটি গরম অবস্থায় ধরবার জন্য তাপের কুপরিবাহী কী কী পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে।

● **তাপের সুপরিবাহী পদার্থ ও কুপরিবাহী পদার্থ নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা।**

একটি কাঠের তৈরি পেনসিল নাও। তার একটা প্রান্তে একটা পাতলা কাগজকে একবার জড়াও। আগুনের শিখায় পেনসিলের ওপর জড়ানো কাগজটাকে ধরো। দেখবে কাগজের টুকরোটা খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে গেল।
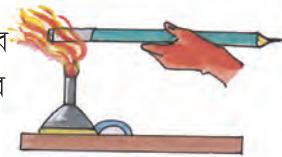
এবার ধাতুর তৈরি কোনো দণ্ড যেমন সাঁড়াশির হাতল, খুন্তির হাতল ইত্যাদি নাও। তার ওপর ওই একই ধরনের একটা পাতলা কাগজ একবার জড়াও। আগের মতো করে আগুনের শিখায় ধাতুর ওপর জড়ানো কাগজটাকে ধরো। দেখবে এবার কিন্তু কাগজের টুকরোটা পেনসিলের ওপরে জড়ানো কাগজের টুকরোর মতো অত তাড়াতাড়ি পুড়ে গেল না।

এরকম হয়, কারণ ধাতু তাপের সুপরিবাহী। ধাতু জ্বলন্ত শিখা থেকে তাপ নিয়ে তা দ্রুত দূরে পাঠিয়ে দেয়। তাই ধাতুর ওপর জড়ানো কাগজ গরম হতে দেরি হয়। তাই কাগজটা তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে না।

● **তাহলে কাঠের ওপরের কাগজ কেন তাড়াতাড়ি পুড়ে গেল তা বোঝার চেষ্টা করো।**

খাতার পৃষ্ঠার মাপে পাতলা কাগজের টুকরোকে চার ভাঁজ করা হলো। তার তিনটি ভাঁজকে একদিকে রেখে তার মাঝখানে সামান্য কিছুটা জল রাখা হলো। আগুনের শিখায় জল সহ কাগজের পাতলা দিকটা ধরলে কিছুক্ষণের মধ্যে ওই জল ফুটতে থাকে অথচ কাগজে আগুন ধরেনি। কাগজ জ্বলার জন্য কমপক্ষে যত উষ্ণতা প্রয়োজন তা জলের স্ফুটনাঙ্কের তুলনায় অনেক বেশি। যে কাগজের টুকরোটি ব্যবহার করা হয়েছে তা খুব পাতলা হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে তাপ খুব তাড়াতাড়ি জলে প্রবাহিত হয়। ফলে জল ফুটতে থাকে কিন্তু ওই উষ্ণতায় কাগজ পোড়ে না।
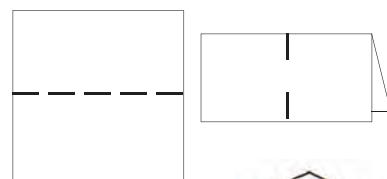
মোটা কাগজের এই ধরনের ঠোঙা বানিয়ে তার মধ্যে জল রেখে আগের পরীক্ষাটি করলে কাগজটা পুড়ে

যাবে। মোটা কাগজের মধ্যে দিয়ে তাপ তাড়াতাড়ি জলে যেতে পারবে না। ফলে আগুনের শিখার সংস্পর্শে থাকা কাগজের অংশের উষ্ণতা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়ে এমন হবে যে কাগজটি পুড়ে যাবে।

একটি টেস্টটিউবের চারভাগের তিনভাগ জল দিয়ে ভরতি করা হলো। একটি বরফের টুকরোর গায়ে লোহার তার জড়িয়ে টেস্টটিউবের জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। লোহার তারের ভর এমন হওয়া দরকার যাতে বরফের টুকরোটি জলে ডুবে যায়। ছবির মতো করে টেস্টটিউবে রাখা জলের উপরিতলকে তীব্র আগুনের শিখায় ধরে তা যতক্ষণ না ফুটছে ততক্ষণ গরম করা হলো। কী পর্যবেক্ষণ করা যাবে? টেস্টটিউবে রাখা জলের উপরিতল যখন ফুটে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে, তখন ওই টেস্টটিউবের নীচে পড়ে থাকা বরফ কি দ্রুত গলে যাচ্ছে? দেখা যায় টেস্টটিউবের ওপরে থাকা জল যখন ফুটছে টেস্টটিউবের তলায় থাকা বরফ প্রায় গলছেই না। তাহলে জল কি তাপের সুপরিবাহী?
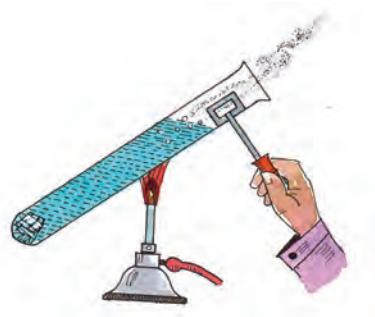
তোমাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতায় আছে শীতকালে সুতোর তৈরি একটা মোটা জামা পরলে গরম লাগে। কিন্তু তার বদলে একই ধরনের সুতো দিয়ে তৈরি দুটি পাতলা জামা পরলে আরও বেশি গরম লাগে। এখন কেন বেশি গরম লাগে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা যাক।

বরফ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, বরফের গায়ে কাঠের গুঁড়ো মাখানো হয়। কখনো-কখনো চট জড়িয়ে দেওয়া হয়। কাঠের গুঁড়োর মাঝখানে যে জায়গা থাকে তাতে বায়ু ঢুকে যায়। বায়ু তাপের কুপরিবাহী। কাঠের গুঁড়ো বা চটও তাপের কুপরিবাহী। বাইরের থেকে তাপ কাঠের গুঁড়োর ভেতর দিয়ে বরফের মধ্যে যেতে পারবে না, তাই বরফ গলতে পারে না।

হাতি গায়ে ধুলো মাখে। তার একটা কারণ হলো, ধুলো মাখলে, ধূলোর কণাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বায়ু আটকে থাকে। বায়ু তাপের কুপরিবাহী। তাই দেহ থেকে বেরিয়ে আসা তাপ বায়ু দিয়ে ভালোভাবে পরিবাহিত হতে পারে না। তাই শীতকালে হাতির আরাম লাগে।

- শীতকালে আমরা উলের তৈরি পোশাক পরি কেন?
- শীতকালে গায়ে কম্বল চাপা দিলে আরাম লাগে কেন?
- শীতকালে পাখিরা কখনো-কখনো পালক ফুলিয়ে বসে থাকে কেন?

খেয়াল করলে বোঝা যায় ওপরের সব ক্ষেত্রেই বায়ু তাপের কুপরিবাহী বলে তাপ সঞ্চালন হয় না।

বাড়ি বানানোর উপাদানগুলি তাপের কুপরিবাহী হওয়া দরকার।

খড় ও মাটি তাপের কুপরিবাহী। সেই কারণে খড়ের চালওয়ালা মাটির বাড়ি গ্রীষ্মকালে যেমন ঠান্ডা, শীতকালে তেমনি গরম।

বরফ তাপের কুপরিবাহী। সেই কারণে ইগলু বরফ দিয়ে তৈরি করা হয়। ইগলুর ভেতরটা বেশ গরম। পুকুরের জলে ডুব দিয়ে যাদের স্নান করার অভিজ্ঞতা আছে তারা জানে গ্রীষ্মকালে পুকুরের জলের ওপরটা যতটা গরম হয় পুকুরের জলের নীচের দিকটা ততটা গরম হয় না।

ইগলু: গ্রিনল্যান্ডের থুলে অঞ্চলের এস্কিমোদের বাসস্থান হিসেবে পরিচিত। ইগলু বরফ দিয়ে তৈরি করা হয়।

আবার শীতকালে ঠিক এর উলটোটা। জল তাপের কুপরিবাহী বলে এইরকম হয়।

- **যে সমস্ত প্রাণীরা জলে থাকে তারা তাহলে গ্রীষ্মকালে এবং শীতকালে জলের কোন স্তরে থাকতে আরাম বোধ করে? জলের ওপরের স্তরে নাকি জলের নীচের স্তরে?**

তাপের পরিচলন
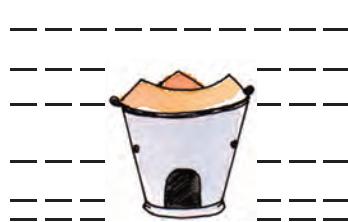
উনুনটি জ্বলছে না। তাই উনুনের চারদিকের সব অংশের বায়ুর ঘনত্ব একই।

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, জলন্ত উনুনের পাশের দিকে হাত রাখলে যত গরম লাগে উনুনের ওপরের দিকে হাত রাখলে অনেক বেশি গরম লাগে। কেন এমন হয় বলোতো?

উনুনের খুব কাছের বায়ু উনুন থেকে তাপ নিয়ে গরম হয় ও আয়তনে প্রসারিত হয়। ফলে ওই বায়ুর ঘনত্ব কমে যায় ও বায়ু হালকা হয়ে যায়। কিন্তু বেশি ওপরের বায়ুর ঘনত্ব একই থাকে। অর্থাৎ আগুনের কাছ থেকে ওপরের দিকে উঠতে থাকলে বায়ু ভারী হতে থাকবে। ভারী বায়ু পৃথিবীর টানে নীচের দিকে নেমে আসে। অপেক্ষাকৃত গরম ও হালকা বায়ু ওপরের দিকে উঠে গিয়ে সেই জায়গা নেয়। অর্থাৎ বেশি উষ্ণতার বায়ু নিজেই এখানে তাপ বহন করে নিয়ে যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালনের সময় পদার্থের উত্তপ্ত অংশের কণাগুলো নীচের উষ্ণতর অংশ থেকে ওপরের শীতলতর অংশের দিকে নিজেরাই তাপ নিয়ে যায়। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় তাপের সঞ্চালন কোনো বস্তুমাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়। আবার অভিকর্ষহীন স্থানেও সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে তাপ কখনও ওপর থেকে নীচের দিকে বা পাশের দিকে সঞ্চালিত হয় না।

একটি বিকারে কিছুটা জল নিয়ে তার মধ্যে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কয়েকটি টুকরো ফেলে দেওয়া হলো। এবার বিকারের যে জায়গায় পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের টুকরোগুলি আছে সেই স্থানটিকে আস্তে আস্তে গরম করলে বেগুনি রঙের জলের (পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণ) স্রোত কোনদিকে উঠছে লক্ষ করো। তারপর ওই বেগুনি রঙের জল কি আবার নীচের দিকে নামছে?

জলের মধ্যে বেগুনি রঙের জলের স্রোত তাপ ছড়িয়ে পড়ার পরিচলন প্রক্রিয়াটি বুঝতে সাহায্য করছে।
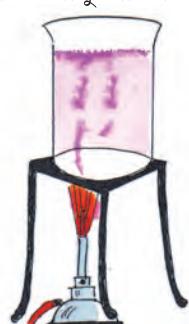
পরিচলন স্রোত : তরল বা গ্যাসের গরম অংশ তুলনামূলকভাবে হালকা বলে ওপরে ওঠে ও ঠান্ডা অংশ ভারী বলে নীচে নামে। এর ফলে তরল বা গ্যাসের মধ্যে যে চক্রাকার স্রোতের সৃষ্টি হয়, তাকে পরিচলন স্রোত বলে।

একটা পাত্রে একটি মোমবাতি লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। পাত্রটিতে কিছুটা জল ঢালা হলো। মোমবাতিটিকে মাঝখানে রেখে একটা চিমনি বসিয়ে দিলে দেখা যাবে মোমবাতিটি নিভে গেল। মোমবাতি ও চিমনির নীচের দিকটায় জল থাকায় কোনো বাতাস প্রবেশ করতে পারেনি। আরো বোঝা যাচ্ছে চিমনির ওপরের ফাঁকা অংশ দিয়েও বাতাস প্রবেশ করেনি। যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন না থাকায় মোমবাতিটি নিভে যাবে। যদি T-এর আকারের টিনের পাত চিমনিটির মুখে লাগিয়ে দেওয়া হয় তাতে মোমবাতিটি আর নিভে যায় না। T আকারের পাতটি মুখে লাগানোয় তার একদিক দিয়ে ভারী ও ঠান্ডা বায়ু চিমনির মুখে প্রবেশ করবে অপরদিক দিয়ে উত্তপ্ত হালকা বায়ু নির্গত হবে। ফলে বায়ুর একটি পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হবে। সেই জন্য বাতিটি জ্বলতে থাকে।

বায়ুচলন (Ventilation) : আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে বায়ু ত্যাগ করি তা ঘরের বায়ুর থেকে বেশি উয় এবং আর্দ্র বলে অপেক্ষাকৃত হালকা হয়। ফলে এই হালকা বায়ু ওপরে উঠে যায়। ঘরের দেয়ালের ওপরের দিকে ঘুলঘুলি বা ফাঁক থাকে। এই ঘুলঘুলি দিয়ে ওই গরম অস্বাস্থ্যকর বায়ু ঘরের বাইরে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের থেকে শীতল বায়ু দরজা বা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে যাতে অক্সিজেনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। এভাবে পরিচলন স্রোতকে কাজে লাগিয়ে ঘরে বায়ু চলাচল অব্যাহত রাখা হয়। শীতকালে বন্ধ ঘরে হ্যারিকেন বা আগুন জ্বালিয়ে শোয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। বায়ু চলাচলের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে ঘরের ভেতরের অক্সিজেনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কমে যায়। তখন কেরোসিন বা কয়লার দহনে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়াও বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস তৈরি হতে পারে। ফলে নিদ্রিত অবস্থায় ঘরের বাসিন্দাদের মৃত্যু ঘটতে পারে। আবার পরিচলন স্রোত আছে বলেই বায়ুপ্রবাহ হয়। সমুদ্রবায়ু, স্থলবায়ু, বাণিজ্যবায়ু পরিচলন স্রোতের জন্যই সৃষ্টি হয়।

বিকিরণ

একটি জ্বলন্ত মোমবাতি দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। ছবির মতো করে একটি থার্মোমিটারকে মোমবাতির শিখার তলায় ধরা হলো।

থার্মোমিটারের পাঠ কি উয়তার পরিবর্তন দেখাবে?

বায়ু কি তাপের সুপরিবাহী?

তাহলে তাপ কি বায়ু মাধ্যমে পরিবহণ প্রক্রিয়ায় ওই থার্মোমিটারের কুণ্ডটি পর্যন্ত যেতে পারবে?

আবার পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ কোন দিকে যায়?

ওপর থেকে নীচের দিকে না কি নীচ থেকে ওপরের দিকে? তাহলে কি এই পরীক্ষায় তাপ পরিচলন প্রক্রিয়ায় থার্মোমিটারের কুণ্ডটিতে পৌঁছোতে পারবে?

ওপরের আলোচনা অনুযায়ী থার্মোমিটারের কুণ্ডটির উয়তার পরিবর্তন হলো। কিন্তু পরিবহন বা পরিচলন পদ্ধতিতে তাপ থার্মোমিটারের কুণ্ডে গেল না।

তাহলে তাপ প্রবাহিত হলো কোন প্রক্রিয়ায়?

তাপ প্রবাহিত হবার এই পদ্ধতিকে বলে বিকিরণ। পরিবহণ বা পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ প্রবাহের জন্য মাধ্যমের দরকার হয়। কিন্তু সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে অনেকটা অংশেই কোনো বস্তু মাধ্যম নেই। তাহলে সূর্য থেকে

পৃথিবীতে কোন পদ্ধতিতে তাপ আসে? সেই পদ্ধতির নাম **বিকিরণ**।

শীতকালে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসলেই আমাদের গরম লাগে। বালব জ্বালালে সব দিকেই কি তার তাপ ছড়িয়ে যায়?

এখানে কোন প্রকিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে?

এই তাপ সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে পরিবহণ বলা যাবে না কারণ বায়ু তাপের কুপরিবাহী।

যেহেতু পাশের দিকেও তাপ প্রবাহিত হচ্ছে এবং একই সঙ্গে সবদিকেই তাপ প্রবাহিত হচ্ছে তাই এই ধরনের তাপ সঞ্চালন পরিচলনও নয়। তাহলে এইভাবে তাপপ্রবাহ বিকিরণ প্রকিয়াতেই হয়েছে।

বিকিরণ : যে প্রক্রিয়ায় তাপ উষ্ণবস্তু থেকে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে ও ছড়িয়ে পড়ার জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না তাকে বিকিরণ বলে।

থার্মোফ্লাস্‌ক

কোনো বস্তুকে একই উষ্ণতায় অনেকক্ষণ রেখে দিতে চাইলে আমরা ওই বস্তুকে থার্মোফ্লাস্‌কে রাখি। ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার জেমস ডিওয়ার এই ফ্লাস্‌ক্ উদ্ভাবন করেন। তাই এই ফ্লাস্‌কের আর এক নাম ডিওয়ার ফ্লাস্‌ক। ডিওয়ার ফ্লাস্‌কে ঠান্ডা পানীয় রাখলে তা যেমন অনেকক্ষণ ঠান্ডা থাকে, তেমনি গরম জল রাখলে তা অনেকক্ষণ গরম থাকে।

গঠন : এটি দুই দেয়াল বিশিষ্ট একটি কাচের পাত্র। ভেতরের দেয়ালের বাইরের তলে এবং বাইরের দেয়ালের ভেতরের তলে রুপোর প্রলেপ দেওয়া থাকে। ফলে দেয়াল দুটি চকচকে হয়। দেয়ালদুটির মাঝখানে যতদূর সম্ভব কম ভরের বায়ু রাখা হয়। ফ্লাস্‌কটির মুখ একটি কুপরিবাহী পদার্থের (যেমন কর্ক বা পলিথিন) তৈরি ছিপি দিয়ে বন্ধ করা হয়। যাতে সহজে না ভাঙে তার জন্য পাত্রটিকে স্প্রিং-এর উপর বসিয়ে একটি ধাতব বা প্লাস্টিকের পাত্রের মধ্যে রাখা হয়। এই পাত্র ও কাচের পাত্রের মাঝের অংশ ফেল্ট, তুলো, গ্লাসউল ইত্যাদি কুপরিবাহী পদার্থ দিয়ে ভরতি থাকে।
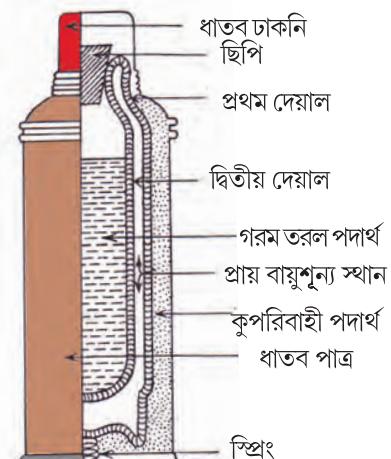
কার্যনীতি : পাত্রের কাচ তাপের কুপরিবাহী। পাত্রটির খোলা মুখের ছিপিও তাপের কুপরিবাহী। পাত্রটির কাচ দিয়ে তৈরি অংশটির চারপাশ কুপরিবাহী পদার্থ দিয়ে ঘেরা। ফলে পরিবহণের সাহায্যে তাপ সঞ্চালন ব্যাহত হয়। আবার দুই দেয়ালের মাঝখান প্রায় বায়ুশূন্য থাকায় পরিবহণ ও পরিচলন পদ্ধতিতে পাত্রটির বাইরের তাপ ভেতরে এবং ভেতরের তাপ বাইরে যেতে পারে না। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় বাইরের থেকে তাপ ভেতরে প্রবেশ করার সময় প্রথম দেওয়াল দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। ভেতর থেকে বাইরে যাবার সময় দুই দেয়ালের চকচকে পৃষ্ঠের জন্য পাত্রের ভেতর থেকে তাপ প্রতিফলিত হয়ে পাত্রের মধ্যেই ফিরে যায়। তাপের বিকিরণ অনেক কম হয়। এখানে তাপের এই আচরণ আলোর প্রতিফলন ধর্মের মতো। এভাবে তাপ সঞ্চালনের সমস্ত প্রক্রিয়াই ব্যাহত হয়। ফলে অনেকক্ষণ ধরে ফ্লাস্‌কে শীতল বস্তু শীতল ও উষ্ণ বস্তু উষ্ণ থাকে।

1.4 আলো

প্রতিবিম্ব

এক মুখ খোলা একটা বাক্স নাও। ছবির মতো করে বাক্সের ভেতর একটা ইরেজার রেখে তা একটা সমতল আয়নার সামনে রাখো। খেয়াল রেখো বাক্সের খোলা মুখ যেন আয়নার দিকে থাকে। এখন বাক্সটার পেছন দিক থেকে কী বাক্সের ভেতরে রাখা ইরেজারটা দেখতে পাচ্ছ? কেন দেখতে পাচ্ছ না? এবার আয়নার দিকে দেখোতো। এখন কি ইরেজারটা দেখতে পাচ্ছ?

তুমি জানো যে, তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ আসলে তা ইরেজারের 'প্রতিবিম্ব'। আর এই প্রতিবিম্বকে কি প্রকৃত ইরেজারের অবস্থানেই দেখতে পাচ্ছ?

এক্ষেত্রে ইরেজার থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে তোমার চোখে এসে পৌঁছেছে। সরাসরি তোমার চোখে এসে পৌঁছোয়নি।

আবার, খালি বালতিতে জল ঢালার পর বালতির তলদেশ ওপরে উঠে এসেছে মনে হয়। এক্ষেত্রেও বালতির তলদেশ থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ ঘনতর আলোক মাধ্যম জল পেরিয়ে লঘুতর আলোক মাধ্যম বায়ুতে প্রবেশ করে। সেইসময় আলোকরশ্মিগুচ্ছ জল ও বায়ু মাধ্যমের বিভেদতল থেকে গতিপথ পরিবর্তন করে ও নির্দিষ্ট অবস্থানে দর্শকের থাকা চোখে পড়ে। এক্ষেত্রেও আলো সরাসরি চোখে এসে পৌঁছোয় না। ফলে বালতির তলদেশ কিছুটা ওপরে দেখা যায়। এটা বালতির তলদেশের প্রতিবিম্ব। তোমরা জানো এর কারণ হলো আলোর প্রতিসরণ।
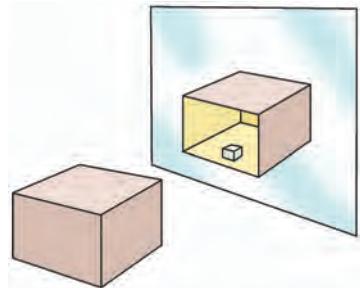
তাহলে, দেখা যাচ্ছে কোনো বস্তু থেকে আলোকরশ্মিগুচ্ছ সরাসরি যদি আমাদের চোখে পৌঁছোতে পারে, তখন সেই বস্তুকে আমরা তার নিজের অবস্থানেই দেখতে পাই। কখনো-কখনো বস্তু থেকে আলোকরশ্মিগুচ্ছ সোজাসুজি আমাদের চোখে এসে পৌঁছোয় না। প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হয়ে আমাদের চোখে এসে পৌঁছোয়। তখন চোখ আলোকরশ্মিগুচ্ছের এই বাঁকাপথ অনুসরণ করতে পারে না। ফলে আমাদের চোখ অন্য কোনো স্থানে বস্তুর **প্রতিবিম্বকে** দেখে।

তাহলে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির পেছনে মূলত দুটি কারণ —

(i) প্রতিফলন ও (ii) প্রতিসরণ।

তুমি আয়নার পেছনে যদি একটা পর্দা রাখো তবে কি আয়নায় সৃষ্ট প্রতিবিম্বকে তুমি পর্দায় দেখতে পাবে? কিন্তু, সিনেমা হলে সিনেমা চালু হলে পর্দার ওপর যা দেখতে পাও তা প্রতিবিম্ব। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব পর্দায় গঠিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কিছু প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় আবার কিছু প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় না।

যে প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় তাকে **সদবিম্ব** বলে। আর যে প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় না তা **অসদবিম্ব**।

তাহলে সমতল দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্ব **অসদবিম্ব**।

একটা আতস কাচ নাও। এবার রোদের মধ্যে মেঝের ওপরে রাখা একটি সাদা কাগজ থেকে একটু ওপরে ধরো। দেখোতো কাগজটিতে একটা ছোট্ট গোল আলোক চাকতি দেখতে পাচ্ছ কি না? এটাই সূর্যের প্রতিবিম্ব। তাহলে এই প্রতিবিম্ব সদবিম্ব। কারণ তা কাগজের ওপর তৈরি হয়েছে। এখানে কাগজটিই আমাদের 'পর্দা'।

এবারে পাশের চিত্রটি খেয়াল করো।

A বিন্দু থেকে আসা আপতিত আলোকরশ্মি AB, MM′ সমতল আয়নাতে প্রতিফলনের পর BA পথ ধরে ফিরে যায়। আবার AC ও AD রশ্মিদুটি প্রতিফলনের পর যথাক্রমে CE ও DF পথ ধরে ফেরত যায়। AB, EC, ও FD কে বর্ধিত করলে তারা A′ বিন্দুতে মিলিত হয়। দর্শকের কাছে তাই মনে হয় A′ বিন্দু থেকেই আলো এসে তার চোখে পড়ছে। A′ হলো A বিন্দুর অসদবিম্ব।

কোনো বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হওয়ার পর একটা বিন্দুতে এসে মিলিত হলে, দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর **সদবিম্ব** বলে।

আবার, কোনো বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হওয়ার পর যদি অন্য কোনো একটি বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয়, তখন দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অসদবিম্ব বলে।

একটি স্কেলের 0 (zero) চিহ্নিত দাগে ছবির মতো করে একটা সমতল আয়না বসাও। এবার '5' চিহ্নিত দাগে তোমার পেনের অগ্রভাগটা বসাও।

এবার নীচের সারণিটা পূরণ করো

কোথা থেকে কার দূরত্ব	দূরত্বের পরিমাপ
আয়না থেকে পেনের অগ্রভাগের দূরত্ব	.... cm
আয়না থেকে পেনের প্রতিবিম্বের অগ্রভাগের দূরত্ব	.... cm
পেনের অগ্রভাগ ও তার প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব	.... cm

তাহলে সমতল আয়না থেকে বস্তু ও সমতল আয়না থেকে তার প্রতিবিম্বের দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক কী?

এবার, পেনের অগ্রভাগ আয়না থেকে 3 cm দূরে অর্থাৎ 8cm -এর ঘরে নিয়ে যাও

এখন, দেখোতো পেনের অগ্রভাগ ও আয়নার মধ্যে দূরত্ব কত?

তাহলে বলো, পেনের অগ্রভাগ আয়না থেকে 3 cm দূরে সরালে, পেনের অগ্রভাগ ও তার প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব কতটা বাড়ল?

এবার, আয়নার দিকে পেনের অগ্রভাগ 3 cm এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কমিয়ে পরীক্ষাটি করো।

তাহলে বোঝা গেল, আয়নার থেকে বস্তুর দূরত্ব কমলে বা বাড়লে বস্তু ও প্রতিবিম্বের মধ্যেকার দূরত্ব তার দ্বিগুণ বাড়ে বা কমে।
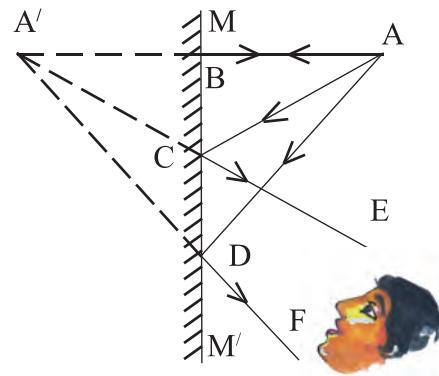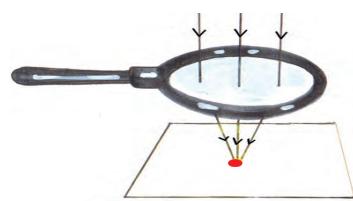
একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কি নিজের পিছনদিকটা আয়নাতে দেখতে পাও? যদি দেখতে চাও তবে কী করতে হবে?

তখন কি আর একটি আয়না দিয়ে তা সম্ভব? তোমরা তো জানো একটি সমতল আয়না শুধু একটি প্রতিবিম্বই গঠন করতে পারে। ভেবে দেখোতো তুমি যখন সেলুনে চুল কাটাও তখন তোমার পেছনেও একটা আয়না থাকে কিনা? এসো এখন আমরা দেখি একসঙ্গে দুটো আয়না ব্যবহার করলে কী হয়।

দুটো সমতল আয়না নাও। ছবির মতো করে একটা সমান টেবিলের ওপর একটা সাদা কাগজ পাতো। ছবির মতো করে কাগজের ওপর একেকবার একেক কোণ করে আয়না দুটোকে বসাও। আয়না দুটোর মাঝে একটি ইরেজার রাখো।
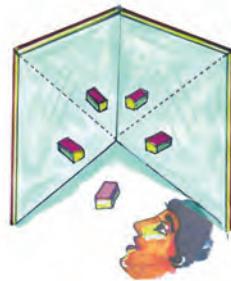
আয়না দুটির মধ্যে কোণ	30°	60^{0}	90^{0}
আয়না দুটিতে গঠিত হওয়া প্রতিবিম্বের সংখ্যা			

এবার আয়না দুটোয় গঠিত হওয়া প্রতিবিম্বগুলো লক্ষ করো। আর ওপরের সারণিটা পূরণ করো।

প্রতিবিম্ব সংখ্যা $= \dfrac{360}{\text{দর্পণ দুটির মাঝের কোণের মান}} - 1$; সূত্রটির সাহায্যে টেবিলে লেখা ফলগুলি মিলিয়ে দেখো।

এখন আয়নাদুটোকে সামনাসামনি পরস্পরের সমান্তরাল করে একটু ব্যবধানে বসাও। ইরেজারটা আবার আয়না দুটোর মাঝে বসাও। এবার লক্ষ করোতো তুমি ইরেজারের কটা প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছ? প্রতিবিম্বের সংখ্যা গুণে শেষ করা যাচ্ছে কি? এবার চলো দেখি ছবি এঁকে প্রতিবিম্ব তৈরির এই ব্যাপারটিকে বোঝা যায় কিনা। তোমরা দেখেছ যে আয়না থেকে বস্তুর দূরত্ব এবং আয়না থেকে প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান হয়। নীচের ছবিটিতে আমরা বস্তুর দূরত্ব ও প্রতিবিম্ব দূরত্বের এই সমান হওয়াকে ব্যবহার করেপ্রতিবিম্বগুলো আঁকার চেষ্টা করেছি। দেখোতো এভাবে প্রতিবিম্ব আঁকা কখনও শেষ হয় কিনা।
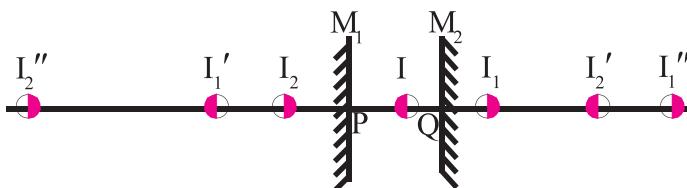
$IQ = QI_1$
$IP = PI_2$
$I_2Q = QI_2'$
$I'_1Q = QI_1''$
$I'_2P = PI_2''$

M_1 ও M_2 সমতল আয়না

I বস্তু

$I_1, I_2', I_1'', I_2'', I_1'$ ও I_2 প্রতিবিম্ব

চলো আয়না নিয়ে একটি মজার খেলনা বানাই।
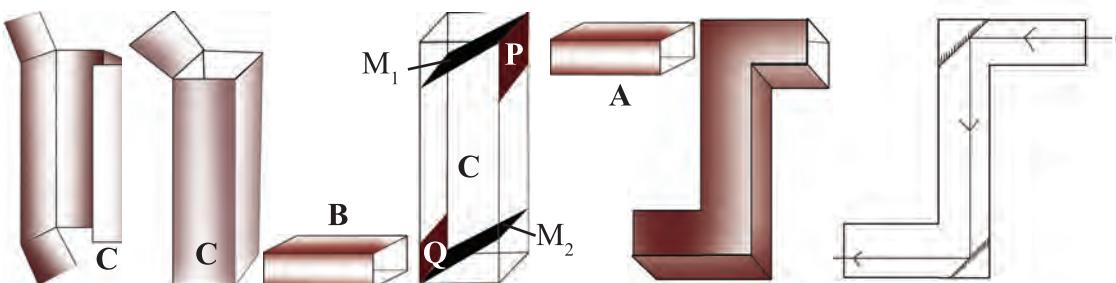
একই প্রস্থচ্ছেদের তিনটি পিচবোর্ডের বাক্স তৈরি করো। দুটি ছোটো (A ও B)। অপরটির (C) দৈর্ঘ্য অন্য দুটির চেয়ে বেশি। C বাক্সটির খোলা দুই মুখে দুটি সমতল আয়না (M_1 ও M_2) পরস্পরের সমান্তরালে বসাও (ছবিতে দেখো)। আয়নাদুটির প্রতিফলক তল (চকচকে তল) পরস্পরের মুখোমুখি থাকবে। এবার খোলা মুখদুটি ঢেকে দাও। বাক্সটি থেকে P ও Q অংশ কেটে নাও। এই অংশের মাপ বাক্সগুলির মুখের মাপের সমান। এবার ওই স্থানে A ও B বাক্সদুটি জুড়ে দাও। — ব্যাস তুমি বানিয়ে ফেলেছ তোমার **পেরিস্কোপ**। এখন একটি সুন্দর রঙিন কাগজ তোমার পেরিস্কোপের গায়ে আটকিয়ে পেরিস্কোপটিকে আকর্ষণীয় করে তোলো।

কোনো বস্তু থেকে আসা আলোকরশ্মিগুচ্ছ পেরিস্কোপের প্রথম বাক্সের ভিতর প্রবেশ করলে তা প্রথম আয়নায় (M_1) প্রতিফলিত হয়। ওই প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ দ্বিতীয় আয়নায় (M_2) আবার প্রতিফলিত হয়, তারপর দর্শকের চোখে এসে পড়ে। তখন দর্শক তা দেখতে পায়।

আগেকার দিনে খেলার মাঠের বাইরের দর্শক পেরিস্কোপের সাহায্যে খেলা দেখতো। এছাড়া পেরিস্কোপ ব্যবহার হতো সাবমেরিন, ট্যাঙ্ক ইত্যাদিতে।

এসো এবার আরো একটি মজার খেলনা বানাই।

তিনটে সমান মাপের আয়তাকার সমতল আয়নার টুকরো নাও (দৈর্ঘ্য : প্রস্থ = 4 : 1)। এখন আয়না তিনটের কাচ জোড়া দেওয়ার আঠা দিয়ে প্রিজম আকৃতির করে জোড়া দাও (ছবিতে দেখো)। প্রতিফলক তলগুলো ভেতর দিকে থাকবে। এবার একটা পিচবোর্ড গোল করে (পাইপের মতো করে) প্রিজম আকারটির চারপাশে জড়িয়ে দাও। এরপর একটা ঘষা কাঁচ মাপ মতো গোল করে কেটে যে-কোনো একমুখে লাগিয়ে দাও। কিছু ভাঙা রঙিন চুড়ি, কিছু সুন্দর সুন্দর রঙিন চুমকি, কয়েকটা থার্মোকলের রঙিন বল প্রিজম আকারের গর্তের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। খোলা মুখটিকে এবার একটি পিচবোর্ডের টুকরো দিয়ে বন্ধ করো ও ওই বন্ধ মুখের মাঝখানে একটি ফুটো করে দাও।

ক্যালেইডোস্কোপ

এবার, বৃত্তাকার ছিদ্র বাদে পুরোটা একটা সুন্দর রঙিন কাগজ দিয়ে জড়িয়ে নাও। তৈরি হলো তোমার ক্যালেইডোস্কোপ।

এবার খেলনাটিকে আলোর দিকে তাক করে ছিদ্রের ভেতর দিয়ে দেখো ও খেলনাটিকে ঘোরাতে থাকো আর রঙিন রঙিন নকশা দেখার মজা নাও।

আলোর প্রতিসরণের সূত্র

একটা সাদা কাগজে **'প্রতিসরণ'** কথাটি লিখে তার ওপর একটা স্বচ্ছ কাচের পেপারওয়েট বসাও। এবার পেপারওয়েটের ওপর থেকে দেখোতো পৃষ্ঠার তল থেকে লেখাটি কিছুটা ওপরে উঠে এসেছে বলে মনে হচ্ছে কিনা?

কেন এমন হলো?

কাচ ও বায়ু মাধ্যমে আলোকরশ্মিগুচ্ছের প্রতিসরণই এর কারণ। তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে সে সম্পর্কে অনেক কথা জানতে পেরেছ। এসো আমরা প্রতিসরণ সংক্রান্ত কিছু বিষয় মনে করার চেষ্টা করি।

পাশের ছবিটা লক্ষ করো ও নীচের শব্দগুলো দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো।

AO = ...

OB = ...

$\angle$AOC = ...

$\angle$BOD = ...

EOF = ...

COD = ...

[প্রতিসৃত রশ্মি, আপতন কোণ, অভিলম্ব, (মাধ্যমদ্বয়ের) বিভেদ তল, প্রতিসরণ কোণ, আপতিত রশ্মি।]
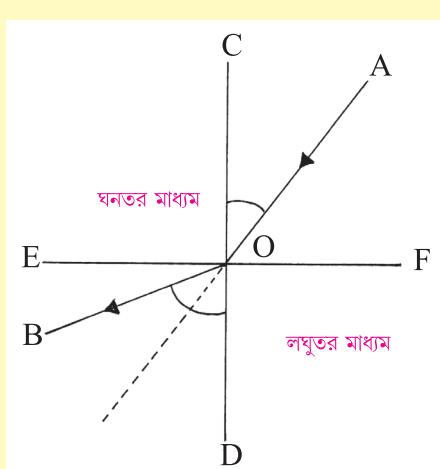
পাশের ছবিতে তুমি দেখতে পাচ্ছ, AO আপতিত রশ্মি লঘুতর মাধ্যম (a) পেরিয়ে, OB পথ ধরে ঘনতর মাধ্যমে (b) প্রবেশ করেছে। ফলে প্রতিসৃত রশ্মি OB অভিলম্ব EOF-এর দিকে সরে এসেছে।

O বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে-কোনো ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকা হলো যা OA-কে X ও OB-কে Y বিন্দুতে ছেদ করে। X ও Y থেকে EOF-এর ওপর যথাক্রমে XC ও YD লম্ব টানা হলো।

AO আলোক রশ্মির আপতন কোণ বদলালে OB রশ্মির প্রতিসরণ কোণও বদলাবে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই XC ও YD-এর ভাগফল $\frac{XC}{YD}$-এর মান একই থাকবে।

প্রতিসরণের সময় যদি মাধ্যমদুটি একই থাকে ও একই রঙের আলো তির্যকভাবে একটি মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যায়, তাহলে আপতন কোণ বা প্রতিসরণ কোণ বদলালেও $\frac{XC}{YD}$ -এর মান বদলায় না। এই মানটিকে মাধ্যম a-এর সাপেক্ষে মাধ্যম b-এর প্রতিসরাঙ্ক বলে।

যখন, আলোকরশ্মি শূন্যস্থান থেকে অন্য মাধ্যমে প্রতিসৃত হয় তখন ওই মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ককে মাধ্যমটির পরম **প্রতিসরাঙ্ক** বলে।
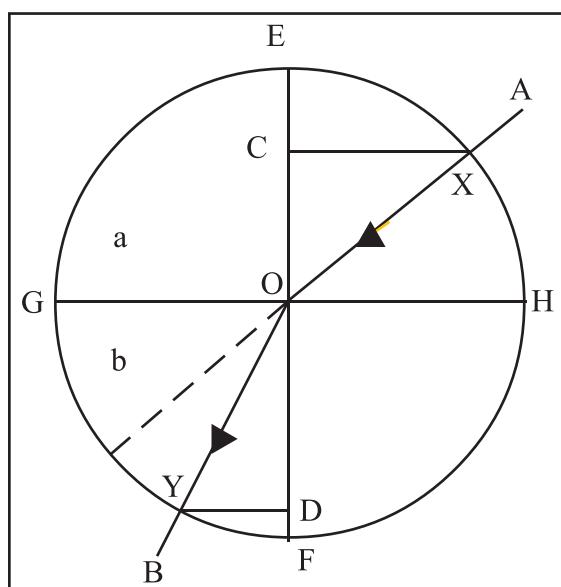
মনে রাখার বিষয় :

দুই মাধ্যমের আপেক্ষিক প্রতিসরাঙ্ক আলোর রঙের ও মাধ্যম দুটির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। লালরঙের আলোর ক্ষেত্রে লঘুতর আলোক মাধ্যম a -এর সাপেক্ষে ঘনতর আলোক মাধ্যম b -এর প্রতিসরাঙ্কের মান যত হবে,সবুজ বা নীল বা বেগুনি রঙের আলোর ক্ষেত্রে সেই প্রতিসরাঙ্কের মান বেশি হবে।

আলোর ক্ষেত্রে একটি মাধ্যমের চাইতে অন্য একটি মাধ্যম বেশি ঘন না লঘু তা ঠিক হয় ওই মাধ্যম দুটির পরম **প্রতিসরাঙ্কের** মান দিয়ে, মাধ্যম দুটির ঘনত্বের মান দিয়ে নয়।

আলোর প্রতিসরণ দুটি নিয়ম মেনে চলে :
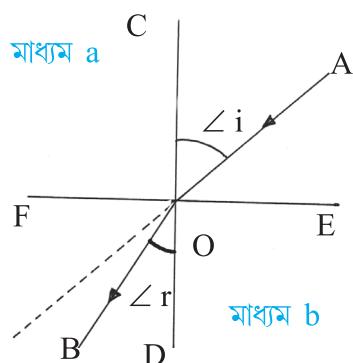
AO - আপতিত রশ্মি
OB - প্রতিসৃত রশ্মি
O - আপতন বিন্দু
FE - দুই মাধ্যমের বিভেদতল
CD - অভিলম্ব
$\angle AOC = \angle i$ = আপতন কোণ
$\angle BOD = \angle r$ = প্রতিসরণ কোণ

1. আপতিত রশ্মি ও দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে আপতন বিন্দুতে আঁকা অভিলম্ব যে সমতলের ওপর থাকে (যেমন তোমার খাতার পাতা, বা আমাদের এই বইয়ের পাতা), প্রতিসরণের পর প্রতিসৃত রশ্মিটিও ওই একই সমতলে থাকবে।

2. প্রতিসরণের সময়, যদি আলোর রং ও মাধ্যম দুটি একই থাকে, তাহলে প্রতিসরাঙ্কের মানও একই থাকবে অর্থাৎ আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের মান পরিবর্তিত হলেও প্রতিসরাঙ্কের মান পরিবর্তিত হবে না।

একটা কচুপাতা নাও। তার মধ্যে সামান্য একটু জল নাও। এবার দেখোতো জলের তলটা চকচক করছে কিনা?

কাচের ফাটলে আলো পড়লেই বা সেই স্থান চকচক করে কেন?

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা জানতে পেরেছ যে আলোকরশ্মি ঘনতর মাধ্যম পেরিয়ে, লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করলে, প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়। অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণের মান আপতন কোণ অপেক্ষা বড়ো হয়।

যদি আপতন কোণ $\angle i$ এর মান ক্রমশ বড়ো হতে থাকে, তাহলে ভেবে বলোতো প্রতিসরণ কোণের মানের কী পরিবর্তন হবে? ঠিক ধরেছ। প্রতিসরণ কোণ $\angle r$-এর মানও ক্রমশ বাড়তে থাকবে। এভাবে আপতন কোণের কোনো না কোনো মানের জন্য প্রতিসরণ কোণের মান 90^0 হবে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে প্রতিসৃত রশ্মিটি মাধ্যম দুটির বিভেদতল ঘেঁষে চলতে থাকবে। আপতন কোণের সেই মানকে ওই মাধ্যমদুটির সংকট কোণ বলা হয়। (চিত্র A)
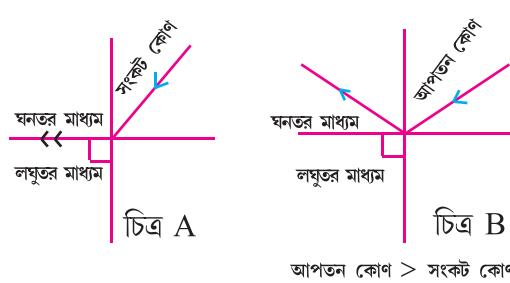
চিত্র A

চিত্র B

আপতন কোণ > সংকট কোণ

এখন ভাবো, আপতন কোণের মান যদি মাধ্যম দুটির সংকট কোণের চেয়েও বড়ো হয়, তখন কী হবে? সেক্ষেত্রে, আলোকরশ্মির কোনো অংশই দ্বিতীয় মাধ্যমে

প্রতিসৃত হবে না। আলোকরশ্মিটি মাধ্যমদুটির বিভেদতল থেকে প্রতিফলিত হয়ে প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসবে। এই ঘটনাকে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বলে। (চিত্র B)

এবার ভেবে বলো দেখি, আলোকরশ্মি লঘুতর মাধ্যম থেকে ঘনতর মাধ্যমে যাত্রা করলে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন সম্ভব কি?

সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা দেখেছ যে এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় দুই মাধ্যমের বিভেদতল থেকে আলোর একটি অংশ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে ও অন্য একটি অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়। কিন্তু যখন অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন হয় তখন ওই প্রতিসৃত অংশটিও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। ফলে আপতিত আলোর পুরোটাই ফিরে পাওয়া যায়। ফলে সেক্ষেত্রে প্রতিফলিত আলোর তীব্রতাও সাধারণ প্রতিফলনের চাইতে বেশি হয়। অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের কারণে বস্তুকে তাই চকচকে দেখায়।

কচুপাতার ওপর জলের যে ফোঁটাটি নড়াচড়া করে বেড়ায় তার ওপর পড়া আলো বায়ু থেকে জলে প্রবেশ করে। আবার যখন জল থেকে বায়ুতে বেরিয়ে আসতে চায় তখন জল ও বায়ুর বিভেদতলে ওই মাধ্যমদুটির সংকট কোণের চেয়ে বেশি কোণে আপতিত হয়। ফলে ওই স্থানে আলোকরশ্মির অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। প্রতিফলিত রশ্মি দর্শকের চোখে এসে পৌঁছোলে দর্শক ওই স্থান চকচকে দেখে।

এবার নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করো।

i) জলের ভেতর বুদবুদ চকচকে দেখায় কেন?

ii) হিরে চকচকে দেখায় কেন?

বায়ু সাপেক্ষে হিরের প্রতিসরাঙ্ক খুব বেশি। ফলে বায়ু সাপেক্ষে হিরের সংকট কোণ খুবই কম, মাত্র 24.5°। এমন কৌশলে হিরে কাটা হয় যাতে হিরে থেকে বায়ুমাধ্যমে যাত্রাকালে যে সমস্ত আলোকরশ্মির আপতন কোণের মান 24.5° অপেক্ষা বেশি হয় অর্থাৎ সংকট কোণকে ছাপিয়ে যায়, তাদের অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে।

অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের প্রাকৃতিক উদাহরণ :

মরুভূমিতে দিনের বেলায় সূর্যের প্রখর তাপে বালি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে বালিসংলগ্ন বায়ুস্তরও উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে বাড়ে ও তার ঘনত্ব কমে হালকা হয়ে পড়ে। কিন্তু বায়ুর স্তরগুলির উষ্ণতা নীচ থেকে ওপর দিকে ক্রমশ কম হতে থাকে। ফলে নীচ থেকে ওপর দিকে বায়ুর স্তরগুলি ক্রমশ ঘন থেকে ঘনতর হতে থাকে।

ধরা যাক, দূরের কোনো এক গাছের S বিন্দু থেকে আলোকরশ্মিগুচ্ছ ক্রমশ নীচের দিকে নামতে থাকছে। ফলে ওই আলোকরশ্মিগুচ্ছ ক্রমান্বয়ে ঘনতর বায়ুস্তর থেকে লঘুতর বায়ুস্তরগুলি অতিক্রম করতে থাকে এবং ক্রমশই অভিলম্ব থেকে দূরে সরতে থাকে। এভাবে আপতন কোণের মান ক্রমশ বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে একসময়, পরপর অবস্থিত কোনো দুটি স্তরের সংকট কোণের মানকে ছাপিয়ে যায়। ফলে ওই স্তরদুটির বিভেদতলে আলোকরশ্মিগুচ্ছের অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে এবং প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ ওপর দিকে যাত্রা করে। এবার কিন্তু রশ্মিগুচ্ছ যথাক্রমে লঘুতর মাধ্যম থেকে ঘনতর মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে, ফলে তারা ক্রমশ অভিলম্বের

দিকে সরতে থাকে ও অবশেষে দর্শকের চোখে এসে পৌঁছোয়। চোখ এত আঁকাবাঁকা পথ অনুসরণ করতে পারে না ও S′ বিন্দুতে S বিন্দুর অসদ প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। এভাবে গোটা গাছটারই উলটানো অসদবিম্ব দর্শক দেখে।

আবার, নীচের অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত স্তরের বায়ু হাল্কা হয়ে উপরে উঠে আসে ও উপরের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা স্তরের বায়ু নীচে নেমে আসে। এর ফলে ঐ স্তরগুলোর মধ্যে একটি পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। প্রতি মুহূর্তে উষ্ণতার পরিবর্তনের ফলে বায়ুস্তরগুলোর ঘনত্ব ও প্রতিসরাঙ্ক অনবরত পরিবর্তিত হতে থাকে। ওই স্তরগুলোর মধ্য দিয়ে চলতে থাকা আলোকরশ্মিগুচ্ছের গতিপথ বারবার পরিবর্তন হয়। ফলে গঠিত প্রতিবিম্বের অবস্থানেরও প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটে। ফলে দর্শকের মনে হয় গাছের প্রতিবিম্ব কাঁপছে। দর্শক ভাবে, বুঝি গাছটি জলাশয়ের পাড়ে অবস্থিত যার প্রতিবিম্ব জলে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কাছে এসে দেখে কোথাও জল নেই। —মরুভূমির এই দেখার ভুলকেই **মরীচিকা** বলে।

1) গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত দুপুরবেলায় দূর থেকে পিচরাস্তার ওপর জল চকচক করছে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সামনে এসে দেখা যায় কোথাও কোনো জল নেই।

— ভেবে দেখোতো কেন এমন হয়।

2) ধরা যাক, শীতপ্রধান কোনো এক দেশে, জেটির ওপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে। একটি নৌকা জেটি ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেছে। হঠাৎ ওই ব্যক্তি অবাক হয়ে দেখে আকাশের বুকে ওই নৌকাটা উলটোভাবে ভেসে যাচ্ছে! — এমন ঘটনা শীতপ্রধান দেশে দেখা যায়। কিন্তু কেন এমন হয়?

শীতপ্রধান দেশে নীচ থেকে ওপর দিকে বায়ুস্তরের ঘনত্ব ক্রমশ কমতে থাকে। বায়ুস্তরের ওপরের দিকের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাই দূরে অবস্থিত কোনো বস্তুর S বিন্দু থেকে আসা উর্ধ্বগামী আলোকরশ্মিগুচ্ছ ক্রমশ ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমের দিকে যাত্রা করে। ফলে তা ক্রমশ অভিলম্ব থেকে দূরে সরতে থাকে। ফলে আপতন কোণের মান বাড়তেই থাকে ও একসময় পরপর অবস্থিত কোনো দুটি স্তরের সংকট কোণের চেয়ে বেশি কোণে আপতিত হয়। ফলে সেই মাধ্যমদুটির বিভেদতলে আলোকরশ্মিগুচ্ছের অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে ও রশ্মিগুচ্ছ নীচের দিকে নামতে থাকে এবং ক্রমশ লঘুতর মাধ্যম থেকে ঘনতর মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এগোতে থাকে। ফলে অভিলম্বের দিকে সরতে থাকে ও দর্শকের চোখে পড়ে। দর্শকের কাছে মনে হয় ওপরে অবস্থিত S বিন্দু থেকেই রশ্মিগুচ্ছ আসছে। ফলে দর্শক S′ বিন্দুতে S বিন্দুর অসদবিম্ব দেখে। এভাবে গোটা বস্তুটারই উলটানো প্রতিবিম্বকে আকাশে দেখতে পায়।
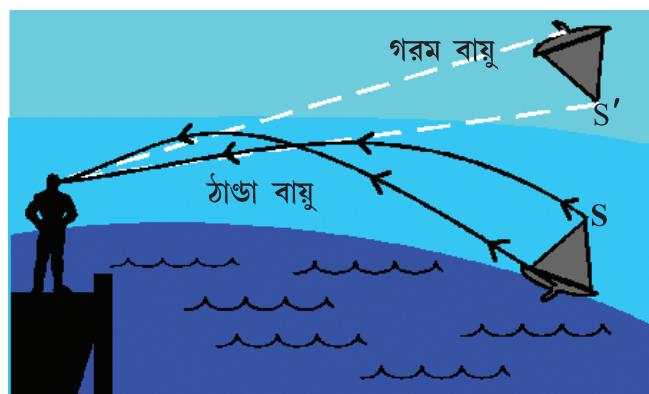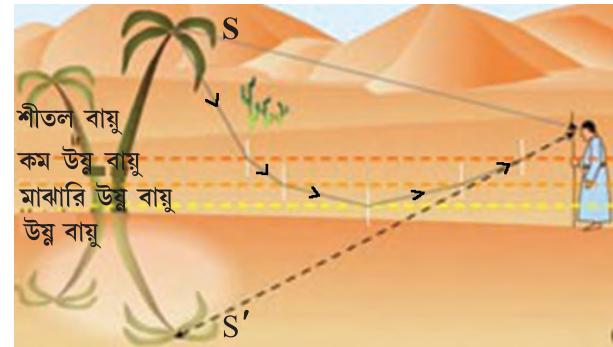
2.1 পদার্থের প্রকৃতি

পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম

আমাদের চারপাশে সমস্ত বস্তুই কোনো না কোনো পদার্থ দিয়ে তৈরি। পদার্থ বলতে তোমরা জেনেছ — পদার্থ মাত্রেরই ভর আছে, আয়তন আছে। এছাড়াও পদার্থের জাড্য ধর্ম (যে ধর্মের জন্য পদার্থ তার গতিশীল বা স্থিতিশীল অবস্থার পরিবর্তনে বাধা দেয়) বর্তমান।

এবার তোমরা নিম্নলিখিত পদার্থগুলো সাধারণ অবস্থায় কোনটা কঠিন কোনটা তরল আর কোনটা গ্যাসীয় তা নীচের প্রথম সারণিতে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও। এদের মধ্যে যেগুলোর বিশিষ্ট বর্ণ বা গন্ধ আছে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে সেগুলোর নাম, বর্ণ/গন্ধ দ্বিতীয় সারণিতে লেখো।

সাধারণ অবস্থায় থাকা পদার্থ — পারদ, সোনা, অক্সিজেন, বরফ, জল, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড; রুপো, কয়লা, তামা, গ্রানাইট, গ্লিসারিন, আলকাতরা, তুঁতে, সালফার(গন্ধক); ফসফিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, হাইড্রোজেন সালফাইড, আয়োডিন, মোম, নিকেল, কেরোসিন; বেঞ্জিন, স্পিরিট, অ্যামোনিয়া, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ; পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ; ন্যাপথালিন, কর্পূর, পেট্রোল, হাইড্রোজেন; পোড়া চুন, নিশাদল, সোডিয়াম, ক্লোরোফর্ম, চুনাপাথর।

পদার্থের নাম	সাধারণ অবস্থায়		
	কঠিন	তরল	গ্যাস

পদার্থের নাম	বর্ণ	গন্ধ

তাহলে তোমরা দেখলে ভৌত অবস্থা অনুযায়ী পদার্থকে তিনটে শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। মূলত পদার্থের অণুপরমাণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণের তারতম্যের কারণেই আমরা পদার্থের তিনরকম অবস্থা দেখতে পাই।

পদার্থ কি তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে?

আমরা প্রত্যেকেই আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি জল তিনটে অবস্থায় থাকতে পারে।

- কঠিন অবস্থায়........... তরল অবস্থায়............ গ্যাসীয় অবস্থায়..................

তাপের প্রভাবে কীভাবে জলের তিনটে অবস্থার পরিবর্তন হয় তা আমরা হাতেকলমে করে দেখতে পারি।

একটা বিকারে প্রায় 10 g বরফ নাও। পরের পৃষ্ঠার ছবির মতো করে একটা পরীক্ষাগারের জন্য ব্যবহৃত থার্মোমিটার বরফের মধ্যে ডোবাও। ভালো করে লক্ষ রেখো থার্মোমিটারের পারদ কুণ্ড যেন বরফের মধ্যে ডোবানো থাকে। এবার পরপর ধাপগুলো ভালোভাবে সম্পন্ন করো।

- বিকারটাকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করতে থাকো।
- যখন বরফ গলতে শুরু করল তখন তাপের উৎস সরিয়ে নাও এবং থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা লিখে রাখো।

- আরও কিছুটা তাপ দাও। সব বরফ যখন গলে জলে পরিণত হলো তখনকার তাপমাত্রা লিখে রাখো।
- কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় যেতে যা যা ঘটনা ঘটছে তা তুমি লক্ষ করো এবং লিখে রাখো।
- একটি কাচদণ্ড বিকারের মধ্যে রাখো। এবার বিকারের জলকে তাপ দাও ও কাচদণ্ড দিয়ে জলকে নাড়তে থাকো, যতক্ষণ না বিকারের জল ফুটতে শুরু করে। যখন সমস্ত জল ফুটতে শুরু করবে তখন থার্মোমিটারকে নীচের ছবির মতো করে ফুটন্ত জলের বাষ্পের সংস্পর্শে রাখতে হবে।
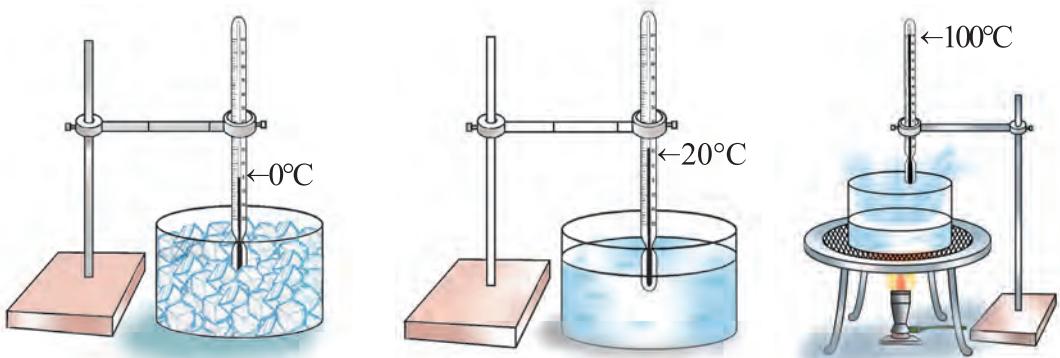
- তরল অবস্থা থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হবার সময় যা যা ঘটনা ঘটল তা তুমি লিখে রাখো।

পরীক্ষায় দেখা যাবে যে যতক্ষণ না সমস্ত বরফ (অর্থাৎ কঠিন) গলে জলে (অর্থাৎ তরলে) পরিণত হয়, ততক্ষণ তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না।

তোমরা নিশ্চয় এও লক্ষ করেছ সমস্ত কঠিন যখন গলে তরল হলো তারপর তাপ দিলে তরলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এক সময় তরলের সমস্ত অংশেই স্ফুটন শুরু হয়। যতক্ষণ না সমস্ত তরল ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়, ততক্ষণ ওই তরলের তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না।

- কোনো তরলের উপরিস্থিত চাপ পরিবর্তিত হলে তরলের স্ফুটনাঙ্ক পরিবর্তিত হয়।
- নির্দিষ্ট চাপে বিভিন্ন বিশুদ্ধ কঠিনের যেমন নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক থাকে, তেমনি বিভিন্ন বিশুদ্ধ তরলের নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক থাকে।

নীচের সারণিতে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কিছু বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক দেওয়া হলো।

বিশুদ্ধ কঠিনের নাম	গলনাঙ্ক (°C)	বিশুদ্ধ তরলের নাম	স্ফুটনাঙ্ক (°C)
জিঙ্ক	420	জল	100
সোনা	1063	ক্লোরোফর্ম	61
খাদ্যলবণ	801	বেঞ্জিন	80.1
লোহা	1530	ইথাইল অ্যালকোহল	78.3
রুপো	962	পারদ	357
অ্যালুমিনিয়াম	659	অ্যাসিটোন	56

নীচের ছবির ফাঁকা অংশ তোমাদের পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে পূরণ করো এবং এর থেকে বোঝার চেষ্টা করো, পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে হয়।
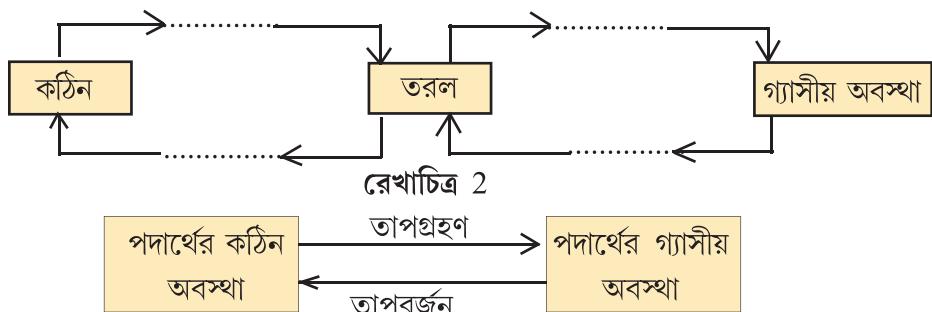
হাতেকলমে

সবসময়ে কঠিনকে তাপ দিলে তরল পাওয়া যায় কি? এসো একটা পরীক্ষা করে দেখি।

- পাশের ছবির মতো কিছুটা কর্পূরের গুঁড়ো চিনামাটির তৈরি প্লেটে নাও।
- প্লেটের উপর রাখা কর্পূরের গুঁড়োকে ছবির মতো করে একটা ফানেল দিয়ে ঢাকা দাও। ফানেলের মুখটা তুলো দিয়ে বন্ধ করো। তারপর ফানেলের গায়ে একটা জলে ভেজানো ফিল্টার কাগজ জড়িয়ে দাও।
- এবার চিনামাটির তৈরি প্লেটকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করো।
- কী ঘটতে দেখছ তা খাতায় লিখে রাখো।
- ওই একই পরীক্ষা কর্পূরের বদলে ন্যাপথালিন, আয়োডিন, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (নিশাদল) নিয়ে পৃথকভাবে করলে দেখবে প্রতি ক্ষেত্রেই উপরে বর্ণিত রেখাচিত্র-2-এর মতো ঘটনা ঘটছে। কারণ এই পদার্থগুলোর সাধারণ উষ্ণতা ও চাপে কেবলমাত্র দুটো অবস্থা দেখা যায়, কঠিন অবস্থা ও গ্যাসীয় অবস্থা।
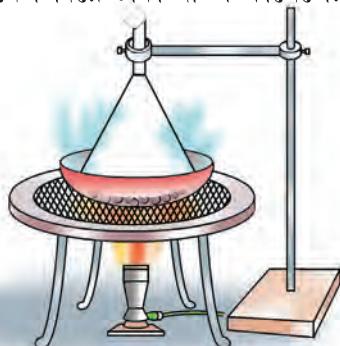
এবার তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নীচের সারণিটি পূরণ করো :

পদার্থের ভৌত অবস্থা	নির্দিষ্ট আকার আছে/ নেই	নির্দিষ্ট আয়তন আছে/ নেই	প্রবাহী ধর্ম কেমন	স্থির উষ্ণতায় চাপ প্রয়োগ করলে আয়তনের পরিবর্তন হয় / কম হয়/প্রায় হয় না	স্থির চাপে তাপ প্রয়োগ করলে কী ঘটে	স্থির চাপে তাপ নিষ্কাশন করলে কী ঘটে
কঠিন						
তরল						
গ্যাসীয়						

আমাদের চারপাশে অসংখ্য কঠিন , তরল ও গ্যাসীয় পদার্থ রয়েছে। সব কঠিন পদার্থের ধর্ম যেমন এক নয়, তেমনি সব তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের ধর্মও এক নয়। প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব কিছু কিছু বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে যার সাহায্যে একটা পদার্থকে অন্য একটা পদার্থ থেকে আলাদা করে চেনা যায়। পদার্থের এইসব গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলোকে **পদার্থের ধর্ম** বলে।

পদার্থের ধর্মগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন (i) ভৌত ধর্ম (ii) রাসায়নিক ধর্ম

(i) ভৌত ধর্ম — পদার্থের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণ যেমন ভৌত অবস্থা, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক, চৌম্বক ধর্ম, দ্রাব্যতা প্রভৃতি ধর্মগুলোর সাহায্যে শুধু পদার্থের বাহ্যিক অবস্থার ও প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু অভ্যন্তরীণ অণুর গঠনের পরিচয় পাওয়া যায় না। পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে কি করবে না তা এই ধর্ম দিয়ে বোঝা যায় না। এই ধর্মগুলোকে ভৌত ধর্ম বলে।

(ii) রাসায়নিক ধর্ম — যে ধর্ম থেকে কোনো পদার্থের অন্য পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার প্রবণতা ও ক্ষমতা লক্ষ করা যায় তাকেই ওই পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম বলে।

তড়িৎ প্রবাহের ফলে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে বিশ্লিষ্ট হয়। এটা জলের রাসায়নিক ধর্ম। আবার সালফারকে বাতাসে পোড়ালে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটা সালফারের রাসায়নিক ধর্ম। লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে জিঙ্ক ধাতুর টুকরো যোগ করলে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এটা জিঙ্কের একটা রাসায়নিক ধর্ম।

ভৌত ধর্মের সাহায্যে পদার্থের শনাক্তকরণ

- পাশের ছবির মতো তিনটে পাত্রে কিছুটা লোহার টুকরো, জল ও অক্সিজেন গ্যাস রাখা আছে। ছবি দেখে বলো কোন পাত্রে লোহার টুকরো, কোন পাত্রে জল এবং কোন পাত্রে অক্সিজেন আছে। কোন অনুভূতির দ্বারা ওই পদার্থগুলোকে তুমি শনাক্ত করলে তা যুক্তি দিয়ে লেখো।

A B C

A পাত্রে ....। B পাত্রে.......................। C পাত্রে..

তাহলে তোমরা দেখলে পদার্থের অবস্থা ভিন্ন হলে তাদের একটা থেকে অন্যটাকে দেখে সহজে চেনা যায়।

- তোমাকে চারটে পাত্রের একটাতে পেনসিলের শিস; একটাতে পেনসিলের শিসের মতো সরু লোহার তারের টুকরো, একটাতে গ্লিসারিন এবং অন্যটাতে জল দেওয়া হলো। তুমি চোখ বন্ধ করে হাতের দুটো আঙুলের মাঝে নিয়ে ঘষে দেখো। এইভাবে স্পর্শের সাহায্যে কোন পাত্রে কি পদার্থ আছে বলতে পারবে? পদার্থগুলো স্পর্শ করে তোমার কী অনুভূতি হলো তা পরের পৃষ্ঠার সারণিতে লিখে ফেলো।

পদার্থ	স্পর্শের অনুভূতি
লোহা	
পেনসিলের শিস	
গ্লিসারিন	
জল	

তাহলে তুমি দেখলে স্পর্শের দ্বারা অনেক পদার্থকে শনাক্ত করা যায়। এবার তুমি বিভিন্ন ধরনের পদার্থ সংগ্রহ করো এবং তাদের স্পর্শ করে ওইসব পদার্থের বিশেষ ভৌত ধর্ম চিনে রাখো।

- তোমাকে দুটো পাত্রের একটাতে ন্যাপথালিনের গুঁড়ো অন্যটায় কর্পূরের গুঁড়ো দেওয়া আছে। তুমি পদার্থের অন্য কোন ভৌতধর্মকে ব্যবহার করে পদার্থদুটোকে শনাক্ত করবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

....

....

আবার তোমাকে চারটে পাত্রে কেরোসিন, পেট্রোল, সরষের তেল ও নারকেল তেল দেওয়া হলো। তুমি কি ন্যাপথালিন ও কর্পূরকে যে ধর্মের সাহায্যে শনাক্ত করেছ সেই ধর্মের দ্বারাই এদের শনাক্ত করতে পারবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

....

অ্যামোনিয়া (NH_3) ও হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) প্রত্যেকেই গ্যাসীয় পদার্থ কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বিশিষ্ট গন্ধ আছে। অ্যামোনিয়া গ্যাসের গন্ধ ঝাঁঝালো, অনেক সময় প্রস্রাবাগারে এই গন্ধ পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন সালফাইডের গন্ধ পচা ডিমের মতো। তাহলে তুমি পদার্থগুলোর এই বিশেষ ভৌত ধর্ম গন্ধকে ব্যবহার করে সহজেই পদার্থগুলোকে শনাক্ত করতে পারবে।

A

B
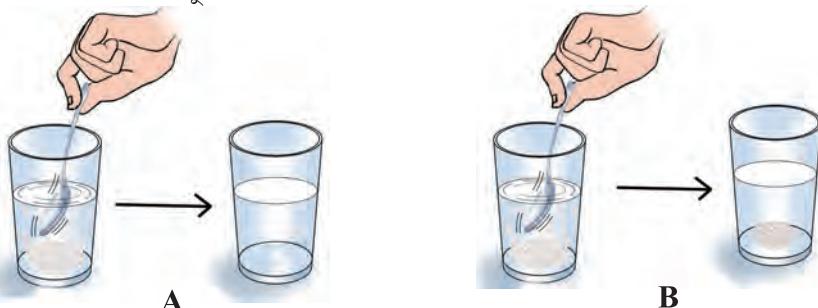
হাতেকলমে

ওপরের ছবির মতো করে দুটো কাচের গ্লাসে (A ও B) সমপরিমাণ জল নাও। এবার A গ্লাসের জলে এক চামচ চিনির গুঁড়ো এবং B গ্লাসের জলে এক চামচ চকের গুঁড়ো যোগ করো, এবার চামচ দিয়ে ভালো করে দুটো গ্লাসের জলই নাড়তে থাকো। কিছুক্ষণ পর তোমার পর্যবেক্ষণ পরের পৃষ্ঠার সারণিতে লেখো।

কোন গ্লাসে	জলে পদার্থ যোগ করার পর কী দেখলে?	জলে পদার্থ যোগ করে চামচ দিয়ে নাড়ার পর কী দেখলে?	এর থেকে তুমি পদার্থগুলোর দ্রাব্যতার সম্বন্ধে কী ধারণা করতে পারো?
A			
B			

ওই একই রকম পরীক্ষা চিনি ও ন্যাপথালিনের গুঁড়ো, নুন ও কর্পূরের গুঁড়ো, তুঁতের গুঁড়ো ও সালফারের গুঁড়ো নিয়ে করে দেখো। এবার তুমি ওপরের পরীক্ষাগুলো জলের বদলে কেরোসিন বা পেট্রোল নিয়ে করে দেখো। তোমাদের পর্যবেক্ষণ নীচের সারণিতে দেওয়া পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মেলে কিনা দেখো। (যদিও পরের সারণিতে কার্বন ডাইসালফাইডে দ্রাব্য/অদ্রাব্য পদার্থের তালিকা দেওয়া আছে তবুও তোমরা কখনওই কার্বন ডাইসালফাইড নিয়ে এই পরীক্ষা করতে যাবে না।)

পদার্থ	জলে দ্রাব্য/অদ্রাব্য	কেরোসিনে দ্রাব্য/অদ্রাব্য	পেট্রোলে দ্রাব্য/অদ্রাব্য	কার্বন ডাইসালফাইডে দ্রাব্য/অদ্রাব্য
চিনি	দ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য
নুন	দ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য
কর্পূর	সামান্য দ্রাব্য	দ্রাব্য	দ্রাব্য	দ্রাব্য
তুঁতের গুঁড়ো	দ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য
সালফার	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য	অদ্রাব্য	দ্রাব্য

তাহলে আমরা দেখলাম বিভিন্ন দ্রাবকে দ্রবীভূত হবার ক্ষমতা বা দ্রাব্যতা দিয়েও বেশ কিছু পদার্থকে শনাক্ত করা যায়।

- তোমাকে A ও B একই রকম রং করা একটা তামার টুকরো এবং একটা লোহার টুকরো দেওয়া হলো। তুমি চৌম্বক ধর্মের সাহায্যে দুটো পদার্থকে শনাক্ত করো। তোমার পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত নীচের সারণিতে লিপিবদ্ধ করো।

পদার্থ	চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়/হয় না	পদার্থটা কী
A	হয় না	
B	হয়	

B

A
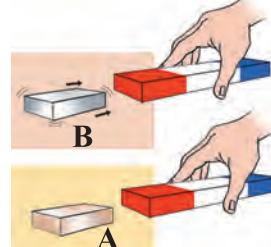
চুম্বকের সাহায্যে ওই একই রকম পরীক্ষা তুমি নিকেল, রুপা, সোনা, দস্তা, সিসা ও অ্যালুমিনিয়ামের টুকরো নিয়ে করে দেখো এবং নীচের মতো সারণিতে তোমার পর্যবেক্ষণ লেখো।

পদার্থ	চৌম্বক ধর্ম আছে/নেই	পদার্থ	চৌম্বক ধর্ম আছে/নেই
নিকেল	আছে	কোবাল্ট	আছে
রুপো		অ্যালুমিনিয়াম	

- তোমরা আগেই জেনেছ প্রত্যেক বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট গলনাঙ্ক আছে। আবার এও জেনেছ প্রত্যেক বিশুদ্ধ তরল পদার্থের নির্দিষ্ট স্ফুটনাঙ্ক আছে।

A, B, C, D চারটে পাত্রের মধ্যে A ও B পাত্রে দুটো কঠিন পদার্থ আছে এবং C ও D পাত্রে দুটো বিশুদ্ধ তরল পদার্থ আছে। A ও B পাত্রের পদার্থের গলনাঙ্ক যথাক্রমে $659^{\circ}C$ এবং $1063^{\circ}C$। তাহলে A ও B পাত্রের পদার্থ দুটো কী কী? (আগে দেওয়া গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক সারণির সাহায্য নাও)

A পাত্রের কঠিন পদার্থের নাম ....

B পাত্রের কঠিন পদার্থের নাম ....

অনুরূপভাবে C ও D পাত্রের তরল দুটোর স্ফুটনাঙ্ক দেওয়া আছে। স্ফুটনাঙ্ক দুটো ব্যবহার করে পদার্থ দুটোকে শনাক্ত করো।

C ও D পাত্রের তরলের স্ফুটনাঙ্ক যথাক্রমে $78.3^{\circ}C$ এবং $56^{\circ}C$।

C পাত্রের তরলের নাম .... এবং D পাত্রের তরলের নাম.................।

সুতরাং বিশুদ্ধ কঠিন পদার্থের গলনাঙ্ক এবং বিশুদ্ধ তরলের স্ফুটনাঙ্ক জানা থাকলে সহজেই বিভিন্ন বিশুদ্ধ কঠিন ও তরলকে শনাক্ত করতে পারি।

রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে পদার্থের শনাক্তকরণ

নির্দিষ্টভাবে কোনো পদার্থকে শনাক্ত করতে হলে অনেক সময়েই সেই পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের পরীক্ষা করা দরকার। কোনো পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ণয় করার জন্য তাকে খোলা হাওয়ায় উত্তপ্ত করলে কী হয় তা দেখা হয়। আবার জল, অ্যাসিড, ক্ষার ও অন্যান্য নানান পদার্থের সংযোগে পরীক্ষণীয় পদার্থের কী পরিবর্তন হয় এবং কী কী নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয় তা পরীক্ষা করে দেখতে হয়।

- নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস বর্ণহীন কিন্তু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) বাদামি বর্ণের।

একটি গ্যাসজারে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস আছে। গ্যাসজারের মুখ খুললে দেখা যায় বাদামি বর্ণের গ্যাস নির্গত হচ্ছে। তুমি তোমার শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সমীকরণের শূন্যস্থান পূরণ করো। তার থেকে তুমি বলো এই ঘটনার জন্য দায়ী কে?

$2NO + ... = 2NO_2$

তাহলে তোমরা দেখলে বাতাসের সংস্পর্শে এসে কোনো কোনো পদার্থের নানা ধরনের পরিবর্তন হয়। এর সাহায্যে একটা পদার্থকে অন্য পদার্থ থেকে আলাদা করে শনাক্ত করা যেতে পারে।

তোমাকে কিছুটা চিনির গুঁড়ো ও কিছুটা পোড়াচুনের গুঁড়ো দেওয়া হলো। জলের সঙ্গে মিশিয়ে কীভাবে তাদের মধ্যে পার্থক্য করবে?

দুটো গ্লাসে জল নিয়ে একটার মধ্যে খানিকটা চিনির গুঁড়ো আর অন্যটার মধ্যে কিছুটা পোড়াচুনের গুঁড়ো মেশাও। গ্লাস দুটোকে হাত দিয়ে চেপে ধরো ও তোমার পর্যবেক্ষণ লেখো।

জলের মধ্যে কী মেশালে	কী দেখলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়
চিনির গুঁড়ো		
পোড়াচুনের গুঁড়ো		

জলের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যদি কোনো পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবর্তন আনে তবে সেই পদার্থকে অন্য পদার্থ থেকে সহজে চেনা যায়। তোমাদের জেনে রাখা দরকার সোডিয়াম বা পটাশিয়াম-এর মতো ধাতু জলের সংস্পর্শে এলেই তীব্র বিক্রিয়া ঘটে এবং প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয়ে আগুন জ্বলে ওঠে।

- তোমাকে দুটো পাত্রে (A ও B) একটাতে নুনের গুঁড়ো অন্যটাতে চিনির গুঁড়ো দেওয়া হলো। তুমি স্বাদ না নিয়ে কোনটা নুন এবং কোনটা চিনি কীভাবে চিনবে? এসো একটা পরীক্ষা করা যাক।

হাতেকলমে

প্লাস্টিকের বা কাঠের হাতল লাগানো দুটো স্টিলের চামচের একটায় কিছুটা চিনির গুঁড়ো, আর অন্যটায় কিছুটা নুন নিয়ে বড়ো মোমবাতির সাহায্যে ভালো করে গরম করো। তুমি যা দেখতে পাবে তা থেকে কীভাবে পদার্থ দুটোকে চেনা যাবে তা দেখো।

কোনো পদার্থকে তীব্রভাবে গরম করলে	কী ঘটতে দেখবে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়
চিনির গুঁড়ো	প্রথমে বাদামি রং নেবে তারপর আরো গরম করলে কালো হয়ে যাবে	
নুন	চোখে দেখা যাবে এমন কোনো পরিবর্তন হবে না।	শুধু গরম হবে, সামান্য জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু অন্য কোনো পরিবর্তন হবে না।

এবার তোমরা তোমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্য নিয়ে নীচের পদার্থগুলোকে সাবধানে টেস্টটিউবে গরম করে দেখো। তোমাদের পর্যবেক্ষণ নীচের সারণিতে লেখো।

যে পদার্থকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করা হলো	কী পরিবর্তন হলো
1) জলযুক্ত কিউপ্রিক নাইট্রেট	
2) কঠিন আয়োডিন	
3) ম্যাগনেশিয়াম তার	তীব্র আলোর সৃষ্টি করে। প্রধানত সাদা রঙের ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড (MgO) উৎপন্ন হয়।

ওপরের ঘটনাগুলো থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন পদার্থের উপর তাপের প্রভাব আছে। অনেক পদার্থ আছে

যাদের ওপর তাপ প্রয়োগ করলে বিক্রিয়া ঘটে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাপ প্রয়োগ দ্বারা আমরা বেশ কিছু পদার্থকে শনাক্ত করতে পারি।

- আলাদা আলাদা পদার্থসহ তিনটে টেস্টটিউব A, B, ও C তোমাকে দেওয়া হলো। টেস্টটিউবগুলোয় জিঙ্কের গুঁড়ো, লোহার গুঁড়ো এবং ফেরাস সালফাইডের টুকরো আছে। তুমি কীভাবে কোন টেস্টটিউবে কী আছে তা শনাক্ত করবে?

হাতেকলমে

তিনটে টেস্টটিউবের মধ্যেই তুমি লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করো। তোমার পর্যবেক্ষণ নীচের সারণিতে দেওয়া পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলছে কিনা দেখো এবং সেখান থেকে পদার্থগুলোকে শনাক্ত করো।
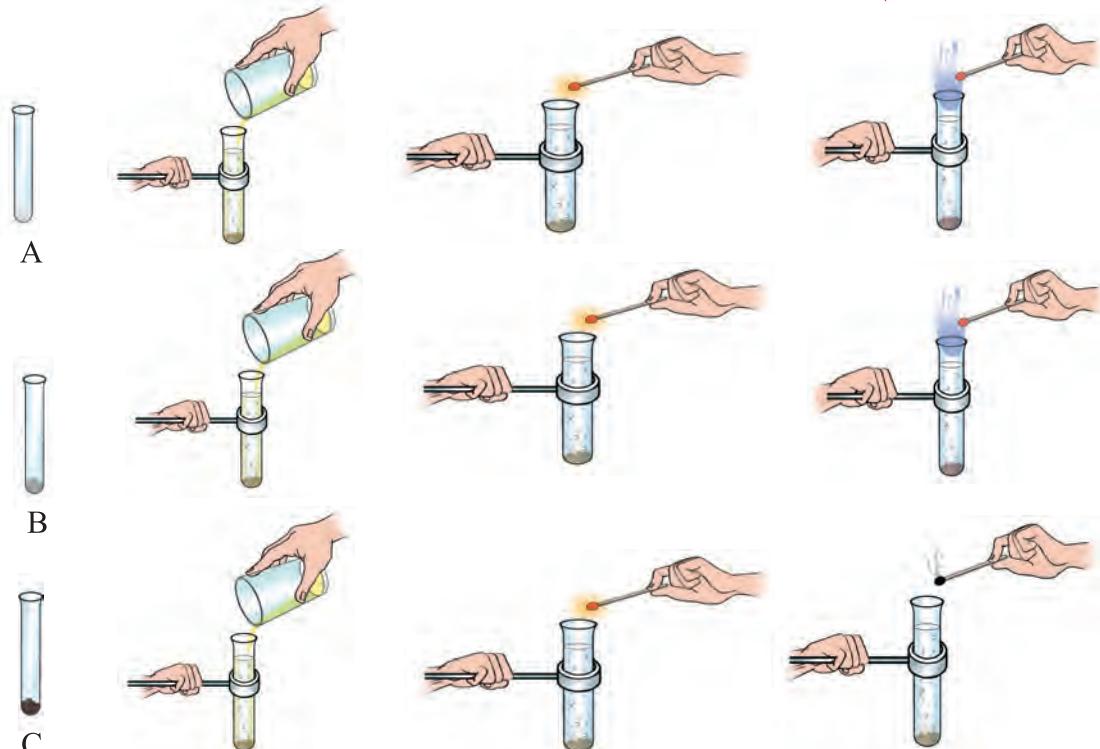
পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ ও সমীকরণ
টেস্টটিউবে জিঙ্কের (Zn) গুঁড়োর সঙ্গে লঘু H_2SO_4 যোগ করা হলো।	বুদবুদ আকারে বর্ণহীন, গন্ধহীন হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। নির্গত গ্যাসে জ্বলন্ত পাটকাঠি প্রবেশ করালে গ্যাস শব্দসহ নীল শিখায় জ্বলে উঠেই নিভে যায়। $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$
টেস্টটিউবে লোহার (Fe) গুঁড়োর সঙ্গে লঘু H_2SO_4 যোগ করা হলো।	বুদবুদ আকারে যে বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস নির্গত হয় তা আগুনের স্পর্শে শব্দসহ নীলাভ শিখায় জ্বলে উঠেই নিভে যায়। উৎপন্ন দ্রবণের বর্ণ খুব ফিকে সবুজ হয়। $Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2$
টেস্টটিউবে ফেরাস সালফাইডের (FeS) সঙ্গে লঘু H_2SO_4 যোগ করা হলো।	বুদবুদ সৃষ্টি করে পচা ডিমের মতো গন্ধযুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাস বের হয়। $FeS + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2S$

তাহলে তোমরা দেখলে বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া ভিন্ন হয়। সুতরাং অ্যাসিড যোগ করে বিভিন্ন পদার্থকে শনাক্ত করা যায়। অ্যাসিড যোগ করে আর কোন কোন পদার্থকে শনাক্ত করা যায় তা জানার চেষ্টা করো।

অ্যাসিড দিয়ে যেমন কোনো পদার্থকে চেনা যায়, ক্ষারকীয় পদার্থ দিয়ে কোনো জিনিসকে কীভাবে শনাক্ত করা যায়?

হাতেকলমে

একটা খলের (Mortar) মধ্যে কিছুটা নুন নাও। তার সঙ্গে কিছুটা খাবার সোডা মেশাও। এবার নুড়ির (Pestle) সাহায্যে ভালো করে মিশ্রণটাকে ঘষে গন্ধ নাও। একইভাবে কিছুটা নিশাদল বা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নিয়ে তার মধ্যে খাবার সোডা মিশিয়ে ঘষে সাবধানে তার গন্ধ নাও। তোমার অনুভূতি নীচে লেখো। পরীক্ষা শেষে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

খাবার সোডার সঙ্গে কোন পদার্থের বিক্রিয়া করানো হলো	কীরকম গন্ধ পেলে
নুন	
নিশাদল	

টেস্টটিউবে নমুনা নিয়ে তার মধ্যে কলিচুন বা কস্টিক সোডা মিশিয়ে সাবধানে গরম করলে এই পরীক্ষায় আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে।

- এবার তোমরা বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্বন্ধে যা জানলে তা থেকে নীচের সারণির বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিককে মেলাও।

বাঁদিক	ডানদিক
(i) সাধারণ অবস্থায় ব্রোমিন	(a) বাদামি বর্ণের গ্যাস
(ii) পারদ	(b) গাঢ় লাল রঙের তরল পদার্থ
(iii) নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড	(c) গরম করলে কালো হয়ে যায়
(iv) ক্লোরিন	(d) জলে মেশালে ঠান্ডা হয়ে যায়
(v) অ্যামোনিয়া	(e) সবুজাভ হলুদ বর্ণের ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস
(vi) গন্ধক /সালফার	(f) তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত গ্যাস
(vii) নিশাদল	(g) চকচকে রুপোলি ভারী তরল পদার্থ
(viii) চিনি	(h) ফিকে হলুদ রঙের কঠিন পদার্থ

ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

তোমরা আগেই জেনেছ প্রায় 92 টি প্রকৃতিজাত মৌল আবিষ্কৃত হয়েছে। ওই প্রকৃতিজাত মৌলগুলোর প্রায় 70টিই ধাতু, কিছু অধাতু এবং নিষ্ক্রিয় মৌল আছে। আবার কিছু মৌল আছে যাদের মধ্যে ধাতু এবং অধাতু উভয়ের ধর্মই বর্তমান; তাদের ধাতুকল্প বলা হয়। তোমাদের চেনা কতকগুলো পদার্থের নাম ও চেনা জিনিসের নাম নীচের সারণিতে দেওয়া হলো। তার মধ্যে কী কী মৌল থাকতে পারে তা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিয়ে লেখো।

জিনিস/পদার্থের নাম	কী কী মৌল দিয়ে তৈরি
1. ইলেকট্রিকের তার	
2. দা, কুড়ুল, শাবল	
3. গহনা	
4. কেটলি, ডেকচি, বাসনপত্র	
5. গাড়ির ব্যাটারির ভেতরের পাত	

তাহলে তোমরা দেখলে সব মৌল দিয়ে একইরকম জিনিস তৈরি করা যায় না। আমাদের দৈনন্দিন কাজে শক্ত জিনিস কাটতে হলে দা বা কুড়ুল ব্যবহার করা হয়। দা বা কুড়ুল লোহা দিয়ে তৈরি, অ্যালুমিনিয়ামের নয়। আবার চায়ের কেটলি তৈরি করা হয় অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে, কার্বন দিয়ে নয়। এসো আমরা বিভিন্ন কার্যকলাপের মাধ্যমে ধাতু আর অধাতুর বৈশিষ্ট্য জানার চেষ্টা করি। আমরা আগেই জেনেছি মৌলগুলোর ধর্ম জানতে হলে তাদের বাহ্যিক কিছু ধর্ম জানা দরকার, যাকে আমরা ভৌত ধর্ম বলে থাকি। আবার সেইসমস্ত পদার্থের অন্য পদার্থের সঙ্গেও বিভিন্ন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার প্রবণতা ও ক্ষমতা লক্ষ করা যায়। এই ধর্মগুলোকে তাদের রাসায়নিক ধর্ম বলে।

মৌলগুলির ভৌতধর্ম জানার জন্য তোমরা কিছু পরীক্ষা করতে পারো। এই পরীক্ষাগুলো করার জন্য যেগুলি সহজেই পাওয়া যায় যেমন লোহা, কপার (তামা), অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লেড (সিসা), জিঙ্ক (দস্তা), সোডিয়াম প্রভৃতি ধাতু এবং কার্বন, সালফার, আয়োডিন প্রভৃতি অধাতু নমুনা হিসাবে ব্যবহার করতে পারো।

ধাতু ও অধাতুদের উজ্জ্বলতা (Lustre) ধর্মের পরীক্ষা

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : পুরোনো লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, কার্বন, গ্রাফাইট, সালফারের টুকরো, শিরীষ কাগজ।

কি করলে	মৌলের ক্ষেত্রে	শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষার আগে দেখতে কেমন ছিল	শিরীষ কাগজ দিয়ে ঘষার পর দেখতে কেমন হলো
প্রথম অবস্থায় আনা মৌলগুলিকে নিয়ে শিরীষ কাগজ দিয়ে ভালো করে ওদের বাইরের তল পরিষ্কার করা হলো। পরিষ্কার করার পর পদার্থগুলোকে রোদে ধরা হলো।	লোহা	অনুজ্জ্বল	চকচকে
	অ্যালুমিনিয়াম		
	তামা		
	সিসা		
	কার্বন		
	সালফার	অনুজ্জ্বল	অনুজ্জ্বল

আগের পরীক্ষা থেকে নিশ্চয় তোমাদের এই ধারণা হয়েছে যে ধাতুগুলি উজ্জ্বল ও চকচকে। আয়োডিন অধাতু হলেও তা উজ্জ্বল। অন্যান্য অধাতুগুলো অনুজ্জ্বল।

ধাতু ও অধাতুদের কাঠিন্যের (Hardness) পরীক্ষা :

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

- লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, জিঙ্ক, সিসা, কাঠকয়লা, সালফার প্রভৃতির টুকরো
- একটা ছুরি
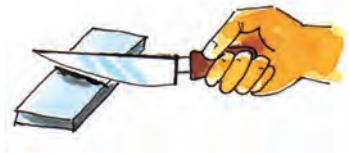
এই পরীক্ষাটি শিক্ষক/শিক্ষিকা করে দেখাবেন।

কী করা হলো	মৌল	কী দেখলে
একটি ছুরি দিয়ে উপরে দেওয়া নমুনাগুলোর টুকরো কাটার চেষ্টা করা হলো।	লোহা	
	অ্যালুমিনিয়াম	
	তামা	
	জিঙ্ক	
	সিসা	
	কাঠকয়লা (কার্বন)	

ওপরের পরীক্ষা থেকে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে সাধারণত ধাতুগুলো কঠিন। সব ধাতুদের কাঠিন্য এক নয়। তবে মনে রাখা দরকার পারদ ধাতু হলেও তরল এবং ব্রোমিন অধাতু হলেও তরল। তবে সাধারণ উষ্ণতা ও চাপে বেশিরভাগ অধাতু গ্যাসীয় যেমন — অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

নমনীয়তা (Malleability) ধর্মের পরীক্ষা:

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

- লোহা, তামা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম, সিসা, কার্বন, সালফার প্রভৃতি ধাতু ও অধাতুর টুকরো
- একটা নিরেট লোহার ব্লক
- একটা লোহার তৈরি ভারী হাতুড়ি

কী করলে	মৌল	কী দেখলে
লোহার ব্লকের উপর একে একে লোহা, জিঙ্ক, অ্যালুমিনিয়াম .... প্রভৃতির টুকরো রাখো এবং হাতুড়ি দিয়ে জোরে জোরে কয়েকবার আঘাত করো।	লোহা	
	তামা	
	জিঙ্ক	
	অ্যালুমিনিয়াম	
	সিসা	
	কার্বন	
	সালফার	

তাহলে দেখলে ধাতুগুলোকে পিটিয়ে পাতে পরিণত করা যায়। সোনা ও রুপার এই ধর্ম সব থেকে বেশি। অধাতুগুলোর এই রকম ধর্ম নেই। তারা গুঁড়ো হয়ে যায়।

ধাতু ও অধাতুদের প্রসারণশীলতা (Ductility) ধর্মের পরীক্ষা:

প্রত্যেক ধাতুর প্রসারণশীলতা (ductility) এক নয়। সব ধাতু থেকে যেমন তার তৈরি করা যায় না, তেমনি শুধু একটা অধাতুকে ব্যবহার করেও তার তৈরি করা যায় না। সামান্য এক গ্রাম সোনা থেকে খুব সরু লম্বা তার তৈরি করা যায়, এক গ্রাম লোহা থেকে কিন্তু তা করা যায় না। এর থেকে সোনার প্রসারণশীলতা (ductility) লোহার চেয়ে কম না বেশি বলে তোমার মনে হয়?

....।

পদার্থের তাপ পরিবাহিতার (Conduction of Heat) পরীক্ষা :

প্রয়োজনীয় দ্রব্য :

(i) একটু মোটা ধরনের অ্যালুমিনিয়াম বা তামার তার (অথবা দণ্ড), (ii) একটা স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প যা দিয়ে ছবির মতো করে তারকে আটকানো যায়, (iii) একটা স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বাতি, (iv) একটা ধাতব পিন।

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়
অ্যালুমিনিয়াম দণ্ডের একদিকের মাথায় মোম দিয়ে ছবির মতো করে পিনটা আটকাও এবং দণ্ডের অন্য দিকটা ক্ল্যাম্প দিয়ে স্ট্যান্ডের সঙ্গে আটকে দাও। এবার ছবির মতো করে একটা বার্নার জ্বালিয়ে ক্ল্যাম্পের কাছে অ্যালুমিনিয়াম দণ্ডের নীচে বেশ কিছুক্ষণ ধরো। লক্ষ করো কতক্ষণ পর মোম গলে পিনটা খসে পড়ল।		

আগের পরীক্ষার মতো একই মাপের লোহা, তামা, সিসা, জিঙ্ক, কার্বন দণ্ড (টর্চের ব্যাটারি থেকে নাও) নিয়ে পরীক্ষা করে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পিন খসে পড়তে কত সময় লাগল তা লিপিবদ্ধ করো।

মৌল	প্রত্যেক ক্ষেত্রে পিনের খসে পড়তে কত সময় লাগল	এর থেকে তুমি কী কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারো
লোহা		
তামা		
সিসা		
জিঙ্ক		
কার্বন দণ্ড		

তাহলে তোমরা দেখলে ধাতুগুলোর সবক্ষেত্রে প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটছে। গ্রাফাইট অধাতু হলেও ধাতুদের মতো তাপের সুপরিবাহী। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে পদার্থগুলোকে তাপ পরিবহন করার ক্ষমতা অনুসারে সাজাও।
....।

অধাতুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা করতে গেলে কার্বন, সালফার পুড়ে যাবে এবং কার্বনের ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফারের ক্ষেত্রে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হবে। তাই ধাতু ও অধাতুর তাপ পরিবাহিতার তুলনা করতে নিম্নলিখিতভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য :

- ছবির মতো দুটো ধাতুর তৈরি পাত্র
- লোহার গুঁড়ো, কার্বন গুঁড়ো
- কয়েক টুকরো মোম
- বুনসেন বার্নার
- তারজালি

কী করলে	কী দেখলে	এর থেকে ধাতু ও অধাতুদের তাপ পরিবাহিতার সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হলো
ছবির মতো দুটো পাত্রের একটার মধ্যে লোহার গুঁড়ো ও অন্যটার মধ্যে কার্বন গুঁড়ো রাখো। এবার কার্বন গুঁড়ো ও লোহার গুঁড়োর মাঝে ছবির মতো করে এক টুকরো করে মোম রাখ। বার্নার দিয়ে পাত্রদুটো গরম করো। বেশ কিছুক্ষণ গরম করার পর পাত্রে রাখা মোমের অবস্থা লক্ষ করো।	• লোহার গুঁড়োর উপর রাখা মোমের অবস্থা কী হলো? • কার্বন গুঁড়োর উপর রাখা মোমের অবস্থা কী হলো?	

সাধারণভাবে ধাতুগুলো তাপের সুপরিবাহী ও অধাতুগুলো তাপের কুপরিবাহী। তবে মনে রাখতে হবে হিরে কিংবা গ্রাফাইট অধাতু হলেও তাপের সুপরিবাহী।

ধাতু ও অধাতুর তড়িৎ পরিবাহিতার (Conduction of Electricity) পরীক্ষা:

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

- একটা ব্যাটারি
- হোল্ডার সমেত একটা বালব
- তিন টুকরো তামার তার
- দুটো ধাতুর তৈরি ক্লিপ
- লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক, কাঠকয়লা, গ্রাফাইট, সালফার (গন্ধক) প্রভৃতির টুকরো
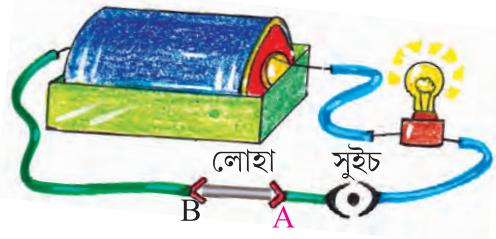
কী করলে	কী দেখলে	এর থেকে কারা বিদ্যুতের সুপরিবাহী ও কারা বিদ্যুতের কুপরিবাহী বলে তোমার মনে হয়
ছবির মতো করে ব্যাটারি, বালব ও তার আটকাও। তারের দুই প্রান্তে A ও B দুটি ধাতুর তৈরি ক্লিপ যোগ করো। এবার বিভিন্ন ধাতু ও অধাতুর টুকরোগুলোর একটি প্রান্তে A ও অন্য প্রান্তে B দিয়ে সংযোগ করো। প্রতিক্ষেত্রে বালব জ্বলল কি জ্বলল না তা লক্ষ করো।	লোহার ক্ষেত্রে:	
	তামার ক্ষেত্রে:	
	অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে:	
	জিঙ্কের ক্ষেত্রে:	
	কাঠকয়লার ক্ষেত্রে:	
	গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে:	
	সালফারের ক্ষেত্রে:	

তুমি নিশ্চয়ই ইলেকট্রিক তার দিয়ে লাইট জ্বালাতে দেখেছ। ঐ তারগুলোর ওপর একটা PVC (পলিভিনাইল ক্লোরাইড) কিংবা রাবারের আস্তরণ দেওয়া থাকে। কেন ধাতব তারের ওপর এই ধরনের আস্তরণ দেওয়া থাকে বলোতো? ....।

ধাতব শব্দ ও অধাতব পদার্থের শব্দের (Sonority) তুলনা :

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

- লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি একটা করে প্লেট
- কাঠের বারকোশ
- একটা ছোটো কাঠের হাতুড়ি
- একটা ক্লিপ
- কিছুটা দড়ি

কী করলে	কী শুনলে	এর থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পারো
ছবির মতো করে এক একটা প্লেটকে ঝোলাও এবং হাতুড়ি দিয়ে কয়েকবার আঘাত করো। ধাতুগুলোর তৈরি পাত্রের ও কাঠের তৈরি পাত্রের শব্দ কেমন।		

এবার তুমি ওপরের ঘটনা থেকে বলোতো স্কুলের ঘন্টা কী দিয়ে তৈরি (ধাতু/অধাতু) এবং কেন এমন পদার্থ দিয়ে তৈরি? ....।

ওপরের পরীক্ষাগুলো থেকে তুমি দেখলে শুধুমাত্র পদার্থের ভৌত ধর্ম দিয়ে ধাতু ও অধাতুকে শনাক্ত করা যায় না। কেন-না ধাতু ও অধাতুদের ভৌত ধর্মের নানা ধরনের মিলও যেমন আছে আবার কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন —

সাধারণ তাপমাত্রায় বেশিরভাগ ধাতু উচ্চ গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কঠিন পদার্থ হলেও পারদ সাধারণ তাপমাত্রায় তরল ধাতু। গ্যালিয়াম (Ga) ও সিজিয়াম (Cs) ধাতু হলেও এদের গলনাঙ্ক যথাক্রমে 29.78ºC এবং 28.4ºC।

- লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ধাতু হলেও অন্য ধাতুদের মতো কঠিন নয় অপেক্ষাকৃত নরম। এদের সামান্য ধারালো ছুরি দিয়ে কাটা যায়।
- অধাতুরা সাধারণত অনুজ্জ্বল হয়, কিন্তু কেলাসিত আয়োডিনের উজ্জ্বলতা আছে।
- কার্বন অধাতু। কার্বন বিভিন্ন রূপে থাকতে পারে। এদের কার্বনের রূপভেদ বলে। কার্বনের দুটি রূপভেদ হলো হিরে ও গ্রাফাইট। হিরে উজ্জ্বল এবং প্রকৃতিজাত পদার্থের মধ্যে সবথেকে কঠিন। হিরে তাপের সুপরিবাহী কিন্তু তড়িতের কুপরিবাহী। গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল অধাতু হলেও তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী।

ভেবে দেখো

- এমন কোনো ধাতুর কথা বলতে পারো কী যাকে বোতল, কাপ আর প্লেটে রাখলে এক একবার এক একরকম আকৃতির দেখাবে?
- ওপরে তোমরা যেসব ধাতুর কথা জানলে তার মধ্যে এমন কোন ধাতু আছে যা মে এবং ডিসেম্বর মাসে একই ভৌত অবস্থায় নাও থাকতে পারে?
- পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণায় বিজ্ঞানী রাদারফোর্ডের খুব পাতলা ধাতব পাতের প্রয়োজন হয়েছিল। তোমার কী মনে হয় নিচের কোন ধাতু তিনি সেই উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছিলেন— দস্তা / তামা / লোহা / সোনা?
- ধরো হিরে গ্রাফাইটের চেয়েও সস্তা হয়ে গেছে। তাহলে কি তুমি ব্যাটারির তড়িৎ দ্বার তৈরি করতে গ্রাফাইটের বদলে হিরে ব্যবহার করবে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
- ইলেকট্রিকের বাল্ব জ্বললে খুব গরম হয়ে যায়। বাল্বের মধ্যের সরু তার (ফিলামেন্ট) তৈরি হয় টাংস্টেন ধাতু দিয়ে। এই কাজে টাংস্টেনের কোন কোন ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ বলে তোমার মনে হয়?

ব্যতিক্রম নিয়ে আলোচনা থেকে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ধাতু ও অধাতুদের সঠিকভাবে শনাক্ত করতে হলে তাদের ভৌত ধর্মই যথেষ্ট নয়। রাসায়নিক ধর্মও জানা প্রয়োজন।

আমরা ধাতু ও অধাতুদের ভৌতধর্ম জানার জন্য যেমন নানা পরীক্ষা করেছি, এসো তেমনই কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের রাসায়নিক ধর্ম জানার চেষ্টা করি।

ধাতু ও অধাতুগুলিকে বায়ুতে দহন করলে কী ঘটে :

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

(i) ম্যাগনেশিয়াম ফিতা, সালফার গুঁড়ো, (ii) পাতিত জল, (iii) লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, (iv) দুটো 100 mL বিকার, (v) দুটো পোর্সেলিনের বাটি, (vi) একটা কাচের ফানেল, (vii) ত্রিপদ স্ট্যান্ড, (viii) একটা কাচের নল, (ix) একটা কাচদণ্ড (আলোড়ক), (x) কিছুটা রবার নল, (xi) একটা স্ট্যান্ড ও ক্ল্যাম্প।

কী করলে	কী দেখলে	লিটমাসের রং দেখে উৎপন্ন অক্সাইডগুলোর প্রকৃতি কেমন বলে মনে হয়
ছবির মতো করে পোর্সেলিনের পাত্রে ম্যাগনেশিয়াম ফিতাকে জ্বালাও। ফিতা জ্বলে নিভে যাবার পর ওই পাত্রে পড়ে থাকা ছাইয়ে পাতিত জল যোগ করো। দ্রবণে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ পর্যায়ক্রমে ডুবিয়ে তাদের রং লক্ষ করো।	• লাল লিটমাসের বর্ণ .... •নীল লিটমাসের বর্ণ	ক্ষারকীয় না আম্লিক ....
দ্বিতীয় ছবির মতো করে পোর্সেলিনের পাত্রে সালফার গুঁড়ো নাও। পোর্সেলিনের পাত্রের উপর ফানেলটাকে ছবির মতো করে আটকাও। ফানেলের সরু দিক ও কাচের নল একটা রবার নল দিয়ে যুক্ত করো। কাচ নলের অপর প্রান্ত বিকারে রাখা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। এবার সালফার গুঁড়োকে আগুন দিয়ে জ্বালাও। সালফার পুড়ে যে গ্যাস উৎপন্ন হলো তা কিছুটা জলে দ্রবীভূত হবার পর লাল ও নীল লিটমাস কাগজ পর্যায়ক্রমে ডুবিয়ে তাদের রং লক্ষ করো।	• লাল লিটমাসের বর্ণ .... • নীল লিটমাসের বর্ণ	

কোনো মৌল থেকে উৎপন্ন অক্সাইডের প্রকৃতি থেকেও আমরা মৌলটি ধাতু না অধাতু তা চিনতে পারি। কারণ বেশিরভাগ ধাতব অক্সাইডই ক্ষারকীয় এবং বেশিরভাগ অধাতব অক্সাইডই আম্লিক প্রকৃতির। তবে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) এবং জিঙ্ক অক্সাইডের (ZnO) ক্ষারকীয় ও আম্লিক উভয় গুণই বর্তমান। তাই এদের উভধর্মী অক্সাইড বলে। আবার কার্বন মনোক্সাইডের (CO) মতো কিছু অক্সাইডের আম্লিক বা ক্ষারকীয় কোনো ধর্মই নেই, তারা প্রশম প্রকৃতির।

জলের সঙ্গে ধাতু ও অধাতুর বিক্রিয়া

নীচের পরীক্ষা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্য ছাড়া করা যাবে না।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য:

(i) লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, কার্বন, সালফার, (ii) পাতিত-জল, (iii) গ্লাস উল, (iv)একটা শক্ত কাচের টেস্টটিউব (A), (v) একটা রবারের ছিপি, (vi) একটা কাচের নির্গম নল, (vii) একটা সাধারণ টেস্টটিউব (B), (viii) একটা ক্ল্যাম্প, (ix) একটা স্পিরিট ল্যাম্প

কী করলে	কী দেখলে	কী সিদ্ধান্ত নিলে
• ম্যাগনেশিয়ামের ফিতার টুকরো নিয়ে ছবির মতো করে পরীক্ষা করা হয়। জলে ভেজানো গ্লাসউলকে স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপের ফলে গ্লাসউলে সঞ্চিত জল থেকে উৎপন্ন গরম জলীয় বাষ্প ম্যাগনেশিয়ামের সংস্পর্শে আসে। • গ্যাসটাকে নিয়ে আগুনে ধরা হলো।	• কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যাবে B টেস্টটিউবে বুদবুদ আকারে গ্যাস বেরোচ্ছে যা জলকে সরিয়ে গ্যাসজারে জমা হচ্ছে। • গ্যাসটা আগুনের শিখার সংস্পর্শে এলেই নীলচে শিখায় খুব অল্প সময় শব্দসহ দপ করে একবার জ্বলেই নিভে যায়।	গ্যাসটা কী বলে তোমার মনে হয় ? ....। ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার সমীকরণে শূন্যস্থান পূরণ করে সমতা বিধান করো। $Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 +$ _____

জলের সঙ্গে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালশিয়াম, সোনা, রুপো, তামা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি ধাতু এবং কার্বন, সালফার, আয়োডিন প্রভৃতি অধাতু নিয়ে একইভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে —

- সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম ঠান্ডা জলের সঙ্গে তীব্রভাবে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। ওই তাপে ধাতুতে আগুনও লেগে যেতে পারে।
- Ca-এর ক্ষেত্রে ঠান্ডা জলের বিক্রিয়ার তীব্রতা অনেক কম এবং লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক — এরা ঠান্ডা বা গরম জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না। কিন্তু লোহা, জিঙ্ক স্টিমের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ধাতব অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।
- সিসা, তামা, সোনা এবং রুপো কোনো অবস্থাতেই জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না।

জলের সঙ্গে ধাতুগুলোর বিক্রিয়াগুলোর সমীকরণে শূন্যস্থান পূরণ করে সমতা বিধান করো :

$Ca + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2$

$3Fe + 4H_2O$(স্টিম) $\longrightarrow Fe_3O_4 +$ ______

$Zn + H_2O$(স্টিম) $\longrightarrow ZnO +$ ______
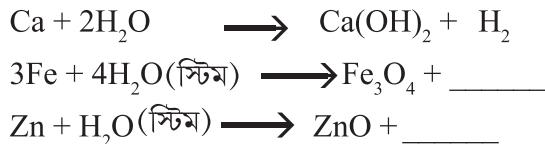
ধাতু ও অধাতুর সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়া

প্রয়োজনীয় দ্রব্য

- লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)
- লোহা, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক, তামা প্রভৃতি ধাতু এবং কয়লা, সালফার প্রভৃতি অধাতুর টুকরো
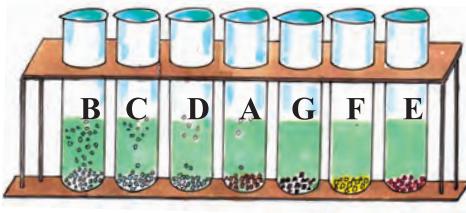
কী করলে	কী দেখলে	কী গ্যাস নির্গত হলো? বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো
7 টা টেস্টটিউব A, B, C, D, E, F, G নাও। প্রত্যেকটার অর্ধেক পর্যন্ত লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দাও। এবার A, B, C, D, E, F, G টেস্টটিউবে. যথাক্রমে Fe, Mg, Al, Zn, Cu, S এবং C-এর সম ওজনের খুব ছোটো টুকরো যোগ করো। কোন টেস্টটিউব থেকে গ্যাস নির্গত হলো এবং গ্যাস নির্গত হবার হার লক্ষ করো। গ্যাসটা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং আগুন দিলে একবার নীল শিখায় জ্বলেই শব্দ করে নিভে যায়।	A , B, C ও D টেস্টটিউব থেকে বুদবুদ আকারে গ্যাস নির্গত হলো। E, F এবং G থেকে কোনো গ্যাস নির্গত হলো না। B থেকে সবচেয়ে দ্রুত গ্যাস নির্গত হলো।	নির্গত গ্যাসটি হলো .... A টেস্টটিউবে যা ঘটছে : $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$ B টেস্টটিউবে যা ঘটছে : Mg + ... → .... + ... C টেস্টটিউবে যা ঘটছে : Al + ... → .... + ... D টেস্টটিউবে যা ঘটছে : Zn + ... → .... + ...

তোমরা আগেই জেনেছ Zn ধাতুর সঙ্গে লঘু হাইড্রোক্লোরিক (বা সালফিউরিক) অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জিঙ্কের লবণ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বদলে নাইট্রিক অ্যাসিড নিলে কিন্তু হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হবে না। এই পরীক্ষা Na বা K নিয়ে করা উচিত নয়। কারণ Na বা K-এর সঙ্গে জল বা অ্যাসিডের বিক্রিয়া এত তীব্র হয় যে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

বিভিন্ন ধরনের ধাতুদের লঘু অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদনের ক্ষমতা থেকে দেখা যায় সব ধাতুর সক্রিয়তা সমান নয়। হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে ধাতুদের সক্রিয়তার ক্রম নীচে দেওয়া হলো। তালিকার সবচেয়ে বাঁদিকে যে ধাতু আছে সেটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয়।

K Na Ca Mg Al Zn Fe Pb (H) Cu Hg Ag Au

সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ⟶ সবচেয়ে কম সক্রিয়

সক্রিয়তার ক্রম থেকে জানা যায় যারা হাইড্রোজেনের বাঁদিকে আছে তারাই লঘু অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন উৎপন্ন করতে পারে। আবার তালিকার বাঁদিকে থাকা কোনো মৌল ডানদিকের মৌলের যৌগ থেকে তাকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। যেমন — কপার সালফেট দ্রবণে একটা লোহার পেরেক ডুবিয়ে রাখলে দেখা যাবে যে লোহার পেরেকের গায়ে ধাতব কপারের লালচে বাদামি রঙের একটা আস্তরণ পড়েছে।

$$Fe + CuSO_4 \longrightarrow FeSO_4 + Cu$$

তোমরা ধাতু ও অধাতুর বেশ কিছু ধর্মের কথা জানলে। এবার তোমরা ধাতু ও অধাতুদের তৈরি বিভিন্ন জিনিসের নাম লেখো এবং কোন ক্ষেত্রে ওদের কোন ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা নীচের সারণিতে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকা তোমাকে সাহায্য করবেন।

মৌলের নাম	মৌল দিয়ে তৈরি কিছু জিনিসের নাম	এক্ষেত্রে মৌলের কোন ধর্ম মানুষ কাজে লাগিয়েছে	ওই জিনিস কোন কাজে ব্যবহার করা হয়
1. লোহা			
2. তামা বা কপার			
3. অ্যালুমিনিয়াম			
4. সিসা			
5. সোনা	1. গহনা 2. মুদ্রা	1. প্রসারণশীলতা, নমনীয়তা, রং ও উজ্জ্বলতা 2. সাধারণ অবস্থায় সহজে বিক্রিয়া করে না।	1. অলংকার হিসাবে। 2. দ্রব্যাদি আদানপ্রদানের জন্য
6. দস্তা বা জিঙ্ক			
7. কার্বন (গ্রাফাইট)	1. তেল কিংবা জলের সঙ্গে গ্রাফাইট চূর্ণ মিশিয়ে পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 2. পেনসিলের শিস তৈরিতে । 3. উচ্চতাপ সহনকারী মুচি তৈরি করতে। 4. তড়িৎ দ্বার তৈরি করতে।	1. উচ্চ গলনাঙ্ক 2. পিচ্ছিলকারক পদার্থ 3. বিদ্যুৎ ও তাপের সুপরিবাহী	

মানবজীবনে ও পরিবেশে ধাতু ও অধাতুর ব্যবহার

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার বয়স কত জানো? প্রায় 450 কোটি বছর। আর পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় 350 কোটি বছর আগে। পৃথিবী সৃষ্টির পর আজ পর্যন্ত নানা সময়ে নানা পরিবর্তন হয়েছে। যেমন — সমুদ্র সৃষ্টি, আবহাওয়ার পরিবর্তন (গরম থেকে ঠান্ডা, তারপর আবার গরম), ঠান্ডা যুগের আবির্ভাব, অপুষ্পক থেকে সপুষ্পক উদ্ভিদের সৃষ্টি, অমেরুদণ্ডী থেকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের উৎপত্তি ও বিবর্তন। এই বিবর্তনের প্রভাবেই প্রায় 1 লক্ষ 20 হাজার বছর আগে আবির্ভাব হয়েছিল মানুষের। অন্ধকার গুহায় থাকা, অত্যধিক ঠান্ডায় কাঁপা, কাঁচা মাংস ও ফল খাওয়া, কথা বলার ভাষা না জানা, বন্য জন্তুদের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ এবং অসহায়ভাবে নানা রোগে ভুগে মারা যাওয়া — এসবই ছিল তখনকার মানুষের জীবনসংগ্রাম।

তারপর হাজারো বাধাবিপত্তি কাটিয়ে মানুষ আজকের জীবনযাত্রায় পৌঁছোল। মাটি থেকে একখণ্ড পাথর তুলে সে জীবনযাত্রার শুরু, নানা ধাতব ও অধাতব মৌল দিয়ে তৈরি নানা উপকরণ ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তার ব্যাপ্তি।

নীচে কতকগুলি যৌগের সংকেত দেওয়া হলো এতে উপস্থিত ধাতু ও অধাতুগুলি শনাক্ত করো:

যৌগের সংকেত	ধাতু ও অধাতুর নাম	যৌগের সংকেত	ধাতু ও অধাতুর নাম
1. $NaCl$		9. $ZnCl_2$	
2. KOH		10. MnO_2	
3. $Pb(NO_3)_2$		11. $CoCl_2$	
4. $Ca(OH)_2$		12. PbO	
5. $MgCl_2$		13. $HgCl_2$	
6. Fe_2O_3		14. As_2O_3	
7. CuO		15. H_3PO_4	
8. $CdCl_2$		16. H_2SO_4	

একজন আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রার দিকে তাকালে এই ধাতু বা অধাতুগুলোর নানা ব্যবহার চোখে পড়ে। একজন আধুনিক মানুষের একটা দিন কীভাবে কাটে?

প্রাত্যহিক জীবনে প্রায় প্রত্যেককেই ধাতু এবং অধাতুর তৈরি নানা উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। পরের পাতার সারণিতে এরকম কিছু ব্যবহার দেখানো হলো।

প্রতিদিনের জীবনে ব্যবহৃত পদার্থ/বস্তু		প্রধান প্রধান ধাতু এবং অধাতু (যৌগরূপে থাকে)
1.	ইট, সিমেন্ট	অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, অক্সিজেন
2.	কলিচুন	ক্যালশিয়াম,অক্সিজেন, হাইড্রোজেন
3.	স্টেইনলেস স্টিল	লোহা, ক্রোমিয়াম
4.	প্লাস্টিক	কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন,ক্লোরিন
5.	গহনা	রুপা, সোনা, তামা
6.	রাসায়নিক সার	নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম
7.	দাঁত মাজার পেস্ট	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম
8.	ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম	সিলভার, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ব্রোমিন
9.	চেয়ার, টেবিলের কাঠ	কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন
10.	দেশলাই কাঠির বারুদ	লাল ফসফরাস, ক্লোরিন, অক্সিজেন, পটাশিয়াম
11.	উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ খাদ্য	কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন,নাইট্রোজেন, S, P, Na, Ca, Mg, Fe, K
12.	ওষুধ	সালফার, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফ্লুওরিন, সোডিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম

মানুষ যেমন তার নানা কাজে খনিজ মৌল (ধাতু ও অধাতু)-দের ব্যবহার করেছে, তেমনি মানবদেহ গঠন ও তার বিবর্তনের জন্য (করোটি, মেরুদণ্ড, পেশি, রক্ত, নানারকম দেহতরল, ত্বক, চুল, নখ ইত্যাদি) মোট 16টা ধাতব ও অধাতব মৌলগুলোর নানা যৌগ নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখন দেখা যাক মানবদেহের প্রতি 100 গ্রাম ওজনে বিভিন্ন ধাতব ও অধাতব মৌল কী কী পরিমাণে উপস্থিত থাকে।

ধাতুর নাম	উপস্থিতি (শতাংশের হিসেবে)	অধাতুর নাম	উপস্থিতি (শতাংশের হিসেবে)
1. ক্যালশিয়াম	1.43	1. অক্সিজেন	61.42
2. সোডিয়াম	0.14	2. কার্বন	22.85
3. পটাশিয়াম	0.14	3. হাইড্রোজেন	9.99
		4. নাইট্রোজেন	2.57
		5. ফসফরাস	1.11

তাহলে কি এই অনুপাতে মৌলগুলো একজায়গায় যোগ করলেই মানবদেহ তৈরি করা সম্ভব? তোমরা অবশ্যই উত্তর দেবে — কিছুতেই সম্ভব নয়। তার কারণ মৌলগুলো সবসময় জটিল, শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে চলেছে। এই জটিল প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো মৌলের পরিমাণ কম-বেশি হলেই মানবশরীরে নানারকম সমস্যা হতে পারে।

এসো আমরা এবার জেনে নিই পরিপোষক হিসেবে খুব বেশি বা অল্প পরিমাণে কাজে লাগে এমন কতকগুলি মৌল কীভাবে আমাদের শরীরে নানান ভারসাম্য রক্ষা করে বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে।

1. দেহের জলের ভারসাম্য

দেহের আন্তঃকোশীয় ও বহিঃকোশীয় তরলের প্রধান ক্যাটায়ন হলো Na^+ ও K^+। বহিঃকোশীয় তরলে থাকা সোডিয়াম আয়নের উপস্থিতি অভিস্রবণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী বহিঃকোশীয় ও অন্তঃকোশীয় প্রকোষ্ঠে জলের বন্টনে সাহায্য করে। মূত্র তৈরির সময় জল ধরে রাখে ও তাকে পুনরায় রক্তে পাঠিয়ে রক্তের আয়তন সঠিক রাখতে সাহায্য করে। তাই কাঁচা নুন বেশি খেলে কোশ মধ্যস্থ তরল থেকে রক্ত জল শোষণ করতে শুরু করে ও রক্তে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। এর ফলে রক্তচাপ বেড়ে গিয়ে হৃৎপিণ্ড ও বৃক্কে নানা বিপত্তি ডেকে আনে। আবার প্রচুর ঘাম কিংবা ডায়ারিয়ার সময় দেহ তরলে Na^+ -এর পরিমাণ কমে গেলে রক্তচাপ হঠাৎ কমে গিয়ে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

2. হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা

হৃৎপেশির উত্তেজিতা ও ছন্দোবদ্ধ সংকোচন-প্রসারণ Ca^{2+} ও K^+-এর গাঢ়ত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। K^+-এর গাঢ়ত্ব কমে গেলে হৃৎপিণ্ডের কাজ স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। Ca^{2+} সংকোচনের মাত্রার বল বৃদ্ধি করে। Ca^{2+}-এর গাঢ়ত্ব কমে গেলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের হার কমে যায়।

3. অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য

খাদ্যের মাধ্যমে K^+ গ্রহণ কম হলে ফলে কোশে অম্লত্ব বেড়ে যায় এবং কোশের বাইরের তরলে ক্ষারের পরিমাণ বেড়ে যায়। অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য নষ্ট হলে অস্থিসন্ধির ক্ষয় শুরু হয় (আর্থ্রাইটিস) ও হাড়ের ঘনত্ব কমতে শুরু করে (অস্টিওপোরোসিস)।

4. দাঁত ও হাড় গঠন

দাঁত ও হাড়ের দৃঢ়তা, ভার বহনক্ষমতা এবং কংক্রিটের মতো গঠনের জন্য দায়ী হলো ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাস। হাড় ও দাঁতের বিভিন্ন অংশ ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ফসফরাসের নানা যৌগ দিয়ে তৈরি হয়।

5. উৎসেচকের কার্যকারিতা

খাদ্যনালীতে শর্করা ও লিপিড জাতীয় খাদ্যের পরিপাক করে অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ উৎসেচক (এনজাইম)। আবার হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে সাধারণ তাপমাত্রায় ভেঙে দেয় ক্যাটালেজ উৎসেচক। কোশের মাইটোকনড্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন করতে লাগে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ উৎসেচক। ক্যাটালেজের চাই Fe^{2+}, আবার সাইটোক্রোম অক্সিডেজের কাজে Fe^{2+}, Cu^+ অপরিহার্য। অ্যামাইলেজ উৎসেচক গঠনে Cl^- আয়নের প্রয়োজন।

6. রক্ত জমাট বাঁধা

কোনো আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করলে কয়েক মিনিটের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। রক্ত তঞ্চনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন উপাদানকে সক্রিয় করতে Ca^{2+} গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

7. পেশির সংকোচন ও স্নায়ুস্পন্দন পরিবহণ

পেশি সংকোচনে দুটি প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরা হলো অ্যাকটিন ও মায়োসিন। মসৃণ পেশির সংকোচন মায়োসিন নির্ভর ও অমসৃণ পেশির সংকোচন অ্যাকটিন নির্ভর। উভয় প্রকার সংকোচনেই Ca^{2+} গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া পেশির উত্তেজিতা Mg^{2+}, Na^{+} ও K^{+} দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি স্নায়ুকোশ থেকে পরবর্তী স্নায়ুকোশে উদ্দীপনা পরিবহণ Ca^{2+} দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

8. কলাকোশের জারণ-বিজারণ

শ্বাসকার্যের সময় গৃহীত অক্সিজেনকে ব্যবহার করে মাইটোকনড্রিয়ার শক্তি উৎপাদনের সময় যে ইলেকট্রন পরিবহণ ঘটে তার জন্য বহু প্রোটিন প্রয়োজন হয়। এই প্রোটিন গঠনে আয়রন ও সালফার ব্যবহৃত হয়।

9. অক্সিজেন পরিবহণ, সঞ্চয় ও ব্যবহার

হিমোগ্লোবিন ও মায়োগ্লোবিন যথাক্রমে রক্তে অক্সিজেন পরিবহণ করে ও ধীরে ধীরে সংকোচনক্ষম লোহিত পেশিতন্তুতে অক্সিজেন সঞ্চয় করে। ওই দুটো প্রোটিনের অন্যতম উপাদান হলো আয়রন। তাছাড়া আয়রন ইলেকট্রন গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে ইলেকট্রন পরিবহণে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে মাইটোকনড্রিয়ার ATP সংশ্লেষ ও জল উৎপাদনের মতো কার্য সম্পন্ন হয়। কপারও নানা উৎসেচক গঠনে অংশ নেয় যারা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।

10. অতিরিক্ত জারণ প্রতিরোধ ও বার্ধক্য আসতে বাধা দেওয়া

কপার, সেলেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্কের বিশেষ বিশেষ জৈব যৌগ বিশেষ বিশেষ ক্ষতিকর যৌগের (যথা সুপার অক্সাইড অ্যানায়ন) ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমিত করে। ফলে ক্যানসার, আর্থ্রাইটিস-এর মতো রোগের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

11. হরমোন গঠন

ডায়াবেটিস রোগ ইনসুলিন নামক হরমোনের অভাবে হয়। খাদ্যনালীর সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থি অগ্ন্যাশয়ের কোশে ইনসুলিন হরমোনকে সুস্থিত ও সঞ্চয় করতে Zn^{2+} গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত থাইরক্সিন হরমোন মানবদেহের কোশে কোশে O_2 গ্রহণ, তাপ উৎপাদন-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরক্সিন হরমোন সংশ্লেষে আয়োডিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

12. রক্ত গঠন

অস্থিমজ্জায় রক্তের লোহিত রক্তকণিকার পরিণতি প্রাপ্তিতে ও লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে উপস্থিত অক্সিজেন পরিবহণকারী প্রোটিন হিমোগ্লোবিন তৈরিতে কোবাল্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

13. দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যৌগ গঠন

মানবদেহের বিভিন্ন কোশ, কলা, অঙ্গাণু গঠনে নানা গুরুত্বপূর্ণ যৌগ বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যেমন — ফসফোলিপিড, নিউক্লিক অ্যাসিড, মেটালোপ্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি। এসব যৌগ গঠনে C, H, O, N, P, S-এর মতো অধাতব মৌল এবং Fe, Cu, Se, Mn -এর মতো ধাতব মৌল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ওপরে আমরা জানলাম যে বিভিন্ন ধাতু ও অধাতু মানবদেহ গঠনে ও বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ চালাতে নানা ভূমিকা পালন করে।

আবার কিছু ধাতু ও অধাতু আছে যারা মানবদেহে সহনীয় মাত্রার ওপরে থাকলে নানা রোগের সূচনা করে। মস্তিষ্ক, বৃক্ক, যকৃৎ, জিভ, ফুসফুস, হৃৎপিন্ড, হাড়, ত্বক ইত্যাদি নানা অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এরা দেহে ক্রমাগত প্রবেশ করতে ও জমা হতে থাকলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এরকম ধাতব ও অধাতব মৌলগুলো হলো লেড, মার্কারি, ক্যাডমিয়াম, নিকেল ,অ্যালুমিনিয়াম, ফ্লুওরিন ও আর্সেনিক।

বিভিন্ন উৎস থেকে এই ধাতু ও অধাতুগুলো বা তাদের বিভিন্ন যৌগ মানবদেহে প্রবেশ করে। নীচের সারণিতে এই ধাতু ও অধাতুগুলো যে যে উৎস থেকে মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে তা দেওয়া হলো।

কোন ধাতু/অধাতু বা তার যৌগ	যেসব উৎস থেকে এগুলো মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে
লেড (সিসা)	পেট্রোল, কীটনাশক, রং, লেড পাইপ, লেড ব্যাটারি
পারদ	ব্যাটারি তৈরির কারখানা, মার্কারি ভেপার ল্যাম্প কারখানা, কাগজ শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, থার্মোমিটার, থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের ফ্লাইঅ্যাশ ও ছাই
ক্যাডমিয়াম	ছত্রাকনাশক যৌগ, সুপার ফসফেট সার, মাটি, মানুষের খাদ্য (আলু), তামাক পাতা, খেলনা, সিগারেটের ধোঁয়া, মাছ, সবজি
নিকেল	খাদ্য (চিংড়ি, মার্জারিন, বনস্পতি), সিগারেটের ধোঁয়া, গহনা, শল্যচিকিৎসা
অ্যালুমিনিয়াম	প্রসাধনী দ্রব্য, অ্যান্টাসিডজাতীয় ওষুধ, রান্নার বাসনপত্র, মোড়ক, কাচের কারখানা ইত্যাদি
ফ্লুওরিন	গভীর নলকূপের জল (ফ্লুওরাইড যৌগরূপে), প্লাস্টিক, ওষুধ
আর্সেনিক	অগভীর নলকূপের জল (প্রধানত আর্সেনেট ও আর্সেনাইট যৌগরূপে) , খাদ্য, কীটনাশক, থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের ছাই

তোমাদের অঞ্চলে বা পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে বা অন্যত্র ধাতু বা অধাতুঘটিত কোনো রোগ বা দুর্ঘটনার কোনো কথা তোমার জানা থাকলে সে বিষয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করো।

2.2 পদার্থের গঠন

পরমাণু ও অণুর ধারণা

আজ থেকে প্রায় 2500 বছর আগে প্রাচীন গ্রিসে দার্শনিক লিউসিপ্পাস ও তাঁর ছাত্র ডিমোক্রিটাস বললেন যে কোনো জিনিসকে ক্রমাগত ভাঙতে থাকলে এক সময় তাকে আর ভাঙা যাবে না। যে অতিক্ষুদ্র কণাকে আর ভাঙা যাবে না ডিমোক্রিটাস তার নাম দিলেন atomos (অ্যাটোমোস)। গ্রিক ভাষায় atomos মানে 'যাকে আর ভাঙা যায় না'। এখান থেকেই atom কথাটা এসেছে। বাংলায় আমরা অ্যাটমকে বলি পরমাণু। লিউসিপ্পাস ও ডিমোক্রিটাস কিন্তু পরমাণুদের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি। আরো পরে গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস ও রোমান দার্শনিক লুক্রেশিয়াস ডিমোক্রিটাসের কথাগুলোই বললেন। কিন্তু পরীক্ষা করে পরমাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে ইউরোপ প্রায় ভুলেই গেল লিউসিপ্পাস-ডিমোক্রিটাসের কথা। শুধু গ্রিক দার্শনিকরাই নন, ভারতীয় দার্শনিক কণাদ-ও পরমাণুর অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন।

1660 খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি ব্রিটেনে আইজ্যাক নিউটন ও রবার্ট বয়েল কল্পনা করলেন পদার্থ কিছু অতিক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। পরবর্তী প্রায় একশো বছরে ইউরোপে রসায়নবিদরা নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, অক্সিজেন, ফসফরাস-সহ বেশ কিছু মৌল আবিষ্কার করলেন। বিভিন্ন মৌলের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগল। বিক্রিয়াগুলোর ধরনে বেশ কিছু মিলও আবিষ্কৃত হলো। কিন্তু কেন সেসব ঘটছে তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না।

তারপর কী হলো? 1808 খ্রিস্টাব্দে জন ডালটন তাঁর পরমাণুবাদ (atomic theory) প্রকাশ করলেন। তিনি ধরে নিলেন (1) মৌলের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণা হলো পরমাণু (atom) যা সৃষ্টিও করা যায় না ধ্বংসও করা যায় না; (2) একই মৌলের পরমাণুরা ভর ও রাসায়নিক ধর্মে একই রকম ; (3) ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুরা ভর ও ধর্মে আলাদা; (4) রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় বিভিন্ন মৌলের পরমাণুরা পূর্ণসংখ্যার সরলানুপাতে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। ডালটনের এই পরমাণুবাদের সাহায্যে তাঁর নিজের ও সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কিছু পরীক্ষার ফলাফল বোঝা সম্ভব হলো। 1811 খ্রিস্টাব্দে অ্যামেদেও অ্যাভোগাড্রো ডালটনের মতবাদের ত্রুটি সংশোধন করলেন। তিনি কল্পনা করলেন মৌলের পরমাণুরা জুড়ে অণু (molecule) তৈরি হতে পারে। বোঝা গেল রসায়নে পরমাণুর ধারণা কাজে লাগবে।

উনবিংশ শতকে রসায়নবিদরা নানান মৌল আবিষ্কার, তাদের রাসায়নিক ধর্মের পরীক্ষানিরীক্ষা, যৌগের সংকেত নির্ণয় - এইসব কাজ করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে রসায়নে পরমাণুর গুরুত্বের কথা বোঝা গেল।

আইজ্যাক নিউটন

জন ডালটন

অ্যামেদেও অ্যাভোগাড্রো

পরমাণু কী দিয়ে তৈরি

আজকে তোমরা অনেকেই হয়তো জেনে ফেলেছ যে পরমাণুকেও ভাঙা যায়। এর মানে হলো ডিমোক্রিটাস থেকে ডালটন পরমাণুকে যেমন অবিভাজ্য কণা বলে ভেবেছিলেন পরমাণু আসলে তা নয়। পরমাণু তৈরি হয় কী দিয়ে? পরমাণু তৈরি হয় প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন এই তিনধরনের আরো ছোট্ট কণা দিয়ে। এদের মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। প্রোটন আর নিউট্রন কিন্তু ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দু-হাজার গুণ ভারী। এরা কবে আবিষ্কৃত হলো জানতে চাও?

1897 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জে. জে. থমসনের পরীক্ষা থেকে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়। থমসন অবশ্য 'ইলেকট্রন' নাম দেননি, ইলেকট্রন নাম দিয়েছিলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী জর্জ স্টোনী। ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জবাহী কণা তা বোঝার পর বিজ্ঞানীরা বুঝলেন যে পরমাণুতে নিশ্চয়ই সমপরিমাণ ধনাত্মক চার্জবাহী কণাও আছে। (তা নইলে পরমাণু নিস্তড়িৎ হয় কী করে?) 1913 সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে প্রমাণ করলেন যে, পরমাণুতে ইলেকট্রনের সমান কিন্তু ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণাও থাকে। 1920 খ্রিস্টাব্দে তিনি এই কণার নাম দিলেন 'প্রোটন'।

আজ আমরা জানি নিউট্রন হলো আধানহীন কণা। 1932 খ্রিস্টাব্দে রাদারফোর্ডের ছাত্র স্যাডউইক পরীক্ষামূলকভাবে নিউট্রন আবিষ্কার করেন।

পরমাণুর মডেল

পরমাণুরা ভীষণ ছোট্ট, কোনোভাবেই তাদের মধ্যের কণাগুলোর কোনটা কোথায় আছে তা সরাসরি দেখা সম্ভব নয়। তবুও বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে রাদারফোর্ড পরমাণু সম্বন্ধে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন —

(1) পরমাণুর মধ্যে বেশিরভাগ জায়গাই ফাঁকা। (2) পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভরই তার মাঝখানে অতি অল্প জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। তিনি এই ভারী অংশের নাম দিলেন নিউক্লিয়াস (Nucleus) বা কেন্দ্রক। (3) পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যেই তার সমস্ত ধনাত্মক চার্জ সীমাবদ্ধ থাকে। (4) নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো নানান বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে। পরমাণু সম্বন্ধে রাদারফোর্ডের এই পরীক্ষালব্ধ ধারণাকেই 'রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল' বলা হয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী নীলস বোর পরমাণু সম্বন্ধে যা বললেন আমরা সেই মডেল অনুসারে হাইড্রোজেন, কার্বন ও অক্সিজেন পরমাণুর চিত্র এঁকেছি।
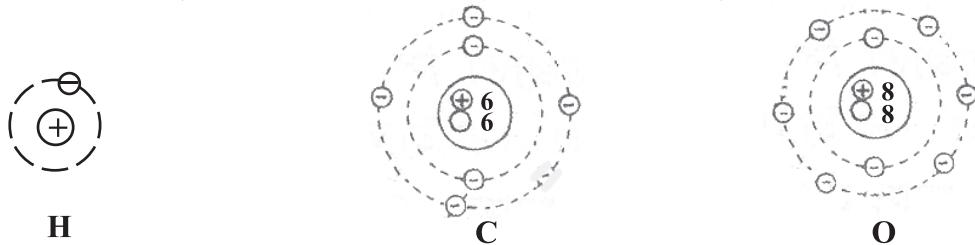
এখানে ⊕ দিয়ে প্রোটন, ⊖ দিয়ে ইলেকট্রন ও ○ দিয়ে নিউট্রন বোঝানো হয়েছে। ছবিতে (+)6 মানে 6টি প্রোটন, ○ 8 মানে 8টি নিউট্রন... এভাবে বুঝতে হবে। নিউক্লিয়াসে একাধিক প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একসঙ্গে থাকতে পারে। এর কারণ এখানে 'নিউক্লীয় বল' নামে একটি শক্তিশালী আকর্ষণ বল কাজ করে যেটি বিকর্ষণ বল অপেক্ষা অনেক জোরালো।

কোনো মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন সংখ্যাকে তার পরমাণু ক্রমাঙ্ক (Atomic Number)

বলে। নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার যোগফলকে ভরসংখ্যা (Mass Number) বলা হয়।

মৌলের চিহ্নের বাঁদিকে একটু ওপরে ভরসংখ্যা ও বাঁদিকে একটু নীচে পরমাণু ক্রমাঙ্ক লেখা হয়। যেমন নাইট্রোজেন পরমাণুতে 7 টা প্রোটন ও 7 টা নিউট্রন আছে তাই একে লেখা হবে $^{14}_{7}N$।

- আগের পাতার ছবি থেকে বলো কার্বন ও অক্সিজেনের পরমাণু ক্রমাঙ্ক ও ভরসংখ্যা কত। চিহ্নের মাধ্যমে এই তথ্য তুমি কীভাবে প্রকাশ করবে দেখাও।

- নীচে তোমাদের লিথিয়াম,সোডিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও ক্লোরিন পরমাণুর ছবি দেখানো হলো। প্রত্যেক ক্ষেত্রে পরমাণুতে বিভিন্ন কণার সংখ্যা, পরমাণু ক্রমাঙ্ক ও ভরসংখ্যা কত হবে তা নীচের সারণিতে লেখো।

পরমাণু	প্রোটন	ইলেকট্রন	নিউট্রন	পরমাণু ক্রমাঙ্ক	ভরসংখ্যা	মৌলের চিহ্ন
Li						
Na						
Mg						
Cl						
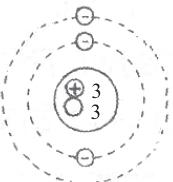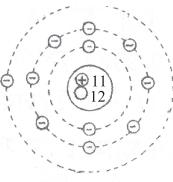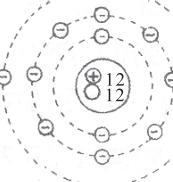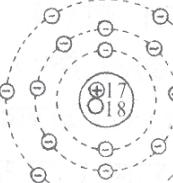
আইসোটোপ ও আইসোবার

যেসব পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা (= পরমাণু ক্রমাঙ্ক) সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা ভিন্ন তাদের পরস্পরের আইসোটোপ (Isotope) বলে। উদাহরণ : $^{1}_{1}H$(প্রোটিয়াম), $^{2}_{1}H$(ডয়টেরিয়াম), $^{3}_{1}H$(ট্রিশিয়াম)।

ভিন্ন মৌলের যেসব পরমাণুর ভরসংখ্যা (= নিউট্রনসংখ্যা + প্রোটনসংখ্যা) সমান তাদের পরস্পরের আইসোবার (Isobar) বলা হয়। উদাহরণ : $^{3}_{1}H$ ও $^{3}_{2}He$; $^{14}_{6}C$ ও $^{14}_{7}N$।

আগের পাতায় তোমরা যেসব বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কথা জানলে নীচে তাঁদের ছবি দেওয়া হলো

জোসেফ জে. থমসন

আর্নস্ট রাদারফোর্ড

নীলস বোর

জেমস স্যাডউইক

- **পরমাণুরা কত ছোটো?**

তোমার জ্যামিতি বক্সের মিলিমিটার স্কেলটা বার করে দেখোতো এক মিলিমিটার জায়গাটা কতটুকু। এই স্কেল দিয়ে সবচেয়ে ছোট্ট কতটুকু দৈর্ঘ্য মাপতে পারবে বলোতো? এক মিলিমিটার, তাই তো? ওই এক মিলিমিটার দৈর্ঘ্য তোমার কাছে কিছুই নয়, কিন্তু একটা হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসের তুলনায় সেটা এক কোটি গুণ বড়ো! তাহলে বোঝা গেল পরমাণুরা কত ছোট্ট হয়?

এবার পরমাণুদের ভরের কথায় আসা যাক। পদার্থবিজ্ঞানীদের সূক্ষ্ম ওজন যন্ত্রে এক মিলিগ্রাম সোনার ওজনও নেওয়া যায়। ওই এক মিলিগ্রাম সোনাতেও প্রায় 3×10^{18} সংখ্যক সোনার পরমাণু আছে। সোনা বেশ ভারী ধাতু, যদি তার চেয়ে হালকা হিলিয়াম পরমাণু হতো? তাহলে এক মিলিগ্রামে থাকত ওর প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশি পরমাণু ($50 \times 3 \times 10^{18}$)!

আমরা খালি চোখে কোনো বস্তুর যতটুকু দেখতে পাই, হাতে নিতে পারি, ওজন করতে পারি তাতে বহু কোটি কোটি পরমাণু থাকে। খুব ছোট্ট হলেও পরমাণুদের একটুখানি ভর আর আয়তন আছে, না হলে চোখে দেখার মতো কোনো জিনিসের ভর আর আয়তন থাকত না। কোনো দাঁড়িপাল্লা দিয়েই পরমাণুদের ওজন সরাসরি মাপা যায় না। বিজ্ঞানীরা অনেক অন্য পরীক্ষা থেকে পরমাণুর ভর এবং আয়তন হিসেব করে বার করেছেন। পরমাণু জুড়ে জুড়েই অণু তৈরি হয়। যে-কোনো অণুই হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে বড়ো, কিন্তু তাদেরও চোখে দেখা যায় না। অণুদের ভর বা আয়তনও সরাসরি মাপা যায় না।

- লোহার একটা পরমাণুর চেয়ে সোনার একটা পরমাণুর ভর বেশি। তাহলে এক মিলিগ্রাম লোহা না এক মিলিগ্রাম সোনা—কোথায় বেশি সংখ্যক পরমাণু থাকবে?

- **পরমাণুর তুলনায় নিউক্লিয়াস কতটা ছোটো?**

নিউক্লিয়াসের ব্যাসের তুলনায় পরমাণুর ব্যাস প্রায় এক লক্ষ গুণ বেশি। এর মানে হলো নিউক্লিয়াসকে যদি এক সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা মার্বেলের মতো বড়ো করে দেখা যেত তাহলে পরমাণুটা হতো একটা মস্ত বড়ো গোলক, যার ব্যাস এক কিলোমিটার!

পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা

- **পদার্থের মধ্যে অণু-পরমাণুরা থাকে কীভাবে?**

তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ বন্ধ ঘরে ধূপ জ্বালালে হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ধূপ জ্বালালে কিছু উদবায়ী যৌগ বাষ্প হয়ে বাতাসে মেশে। এইসব যৌগদের কোনো কোনোটার অণুরা যখন আমাদের নাকে ঢোকে তখন আমরা সুগন্ধের অনুভূতি পাই। তাহলে ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার মানে হলো গ্যাস অবস্থায় অণুদের ছড়িয়ে পড়া। একটা কাঁচের গ্লাসে কিছুটা জল নিয়ে তাতে এক ফোঁটা কালি ফেলো। জলটা রেখে দিলে দেখবে রংটা ধীরে ধীরে জলের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। রং নিশ্চয়ই কোনো না কোনো যৌগের অণু দিয়ে তৈরি। তাহলে দেখা গেল তরলের মধ্যে দিয়েও অণুরা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

- **এই দুটো পরীক্ষা থেকে তুমি কী বলতে পারো?**

এথেকে তুমি অন্তত বলতে পারো যে গ্যাসীয় এবং তরল অবস্থায় অণুরা থেমে থাকে না, তাদেরও গতি আছে। কঠিনের ক্ষেত্রে খালি চোখে দেখে বোঝার মতো এমন কোনো পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অণুদের নড়াচড়া বোঝা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে কঠিনের মধ্যেও অণু-পরমাণুরা থেমে থাকে না। কঠিনের মধ্যেও অণু-পরমাণুরা নড়াচড়া করে।

কঠিন

কঠিন : কঠিনের মধ্যে অণু-পরমাণুরা থাকে বেশ সুশৃঙ্খলভাবে, আর পরস্পরের অনেক কাছাকাছি। ছবিতে অণু-পরমাণুরা ঠেসাঠেসি করে আছে বলে মনে হলেও আসলে পাশাপাশি থাকা অণু বা পরমাণুদের মধ্যে কিছুটা ফাঁক থাকে। কঠিনের মধ্যে অণু-পরমাণুরা কিন্তু মোটেই স্থিরভাবে থাকে না। যে যেখানে আছে সেখানে থেকেই কিছুটা কাঁপতে পারে মাত্র। কঠিনের নিজস্ব আয়তন ও আকৃতি আছে।
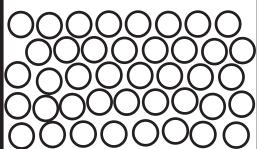
তরল
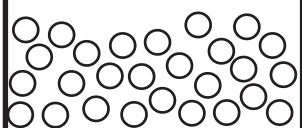
তরল: তরলের মধ্যে অণুরা কঠিনের মতো ততটা সুশৃঙ্খলভাবে নেই। অণুরা এখন অল্প কিছুদূর যেতে, কাঁপতে আর পাক খেতে পারে। কঠিনের চেয়ে তরলের মধ্যে অণুদের মধ্যে দূরত্ব একটু বেশি। অণুদের চলাচলের স্বাধীনতা কঠিনের চেয়ে একটু বেশি তাই তরলের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই, যদিও নিজস্ব আয়তন আছে।

গ্যাস

গ্যাস : গ্যাস হলো প্রায় বাঁধনছাড়া অবস্থা — অণুরা পরস্পরের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, আর অনেক জোরে দৌড়োচ্ছে,কাঁপছে আর পাক খাচ্ছে। অণুদের দৌড়োদৌড়ির কোনো নির্দিষ্ট দিক্ নেই, একেবারেই এলোমেলো গতি। দৌড়োতে দৌড়োতে অণুরা একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে, ছিটকে সরে যাচ্ছে, পাত্রের দেয়ালে গিয়েও ধাক্কা দিচ্ছে। এই অবিশ্রান্ত গতির জন্যই গ্যাসের কোনো নির্দিষ্ট আয়তন বা আকৃতি নেই।
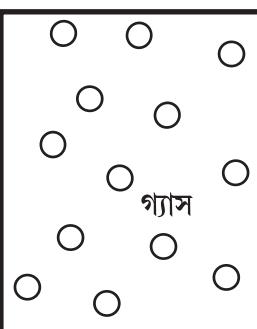
টুকরো কথা

পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন : উষ্ণতা বাড়লে পদার্থের যে-কোনো অবস্থাতেই অণু-পরমাণুদের গতিশক্তি বাড়ে। তাহলে দেখা যাক কোনো কঠিন বা তরলের উষ্ণতা ক্রমশ বাড়াতে থাকলে কী ঘটবে।

কঠিনের উষ্ণতা বৃদ্ধি : কঠিনের মধ্যে অণু-পরমাণুরা যেকোনো উষ্ণতাতেই কাঁপে। কঠিনকে গরম করতে থাকলে অণু-পরমাণুদের কম্পনের মাত্রা এবং গতিশক্তিও বাড়ে। এক সময় সেই কম্পন এতই বেড়ে যায় যে অণু-পরমাণুদের আর কঠিন অবস্থায় ধরে রাখা যায় না। কঠিন তখন গলে গিয়ে তরল তৈরি হয়। এই পরিবর্তনকে বলে গলন (melting)।

তরলের উষ্ণতা বৃদ্ধি: তরলকে গরম করতে থাকলে তরলের অণুদের গতিশক্তি বাড়তে থাকে। এক সময় অণুদের গতিশক্তি এতই বেড়ে যায় যে অণুদের মধ্যে আকর্ষণ বল আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। তরল ফুটে তখন বাষ্প তৈরি হয়। এই পরিবর্তনকে আমরা বলব স্ফুটন (Boiling)।

কোনো কোনো কঠিন পদার্থকে খোলা হাওয়ায় গরম করলে তরল অবস্থাটা পাওয়া যায় না। খোলা হাওয়ায় গরম করা হলে এরা সরাসরি বাষ্প হয়ে যায়। এই জাতীয় পদার্থ হলো কর্পূর, আয়োডিন, ন্যাপথালিন, কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি। কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্প হওয়াকে বলে উর্ধ্বপাতন (Sublimation)। উপযুক্ত উষ্ণতায় খুব কম চাপে রাখলে বরফেরও উর্ধ্বপাতন ঘটে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। কর্পূর, আয়োডিন, ন্যাপথালিন, কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড খোলা হাওয়ায় উর্ধ্বপাতিত হয় মানে কখনোই এদের তরল অবস্থায় পাওয়া যায় না,তা কিন্তু নয়—উপযুক্ত উষ্ণতা ও চাপে এইসব পদার্থের তরল অবস্থা পাওয়া যেতে পারে।

কঠিন আর তরলের উষ্ণতা বাড়াতে থাকলে কী ঘটে তা তোমরা জানলে। কিন্তু যদি আমরা গ্যাসের উষ্ণতা আরও বাড়াতে থাকি তখন কী ঘটবে? খুব বেশি উষ্ণতায় গ্যাসের অণুরা ভেঙে পরমাণু হয়ে যাবে, তারপর এক সময় পরমাণু ছেড়ে ইলেকট্রনরাও আলাদা হয়ে যাবে। নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল তখন আর পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনদের ধরে রাখতে পারবে না। এই যে প্রচণ্ড গরম গ্যাসীয় অবস্থা যার মধ্যে আলাদা আলাদা হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে পরমাণুর নিউক্লিয়াস আর ইলেকট্রন— একে বলা হয় প্লাজমা (Plasma)। প্লাজমাকে বলা যেতে পারে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। সূর্য এবং তারাদের উপাদান হলো এই উত্তপ্ত প্লাজমা। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন সূর্যের কেন্দ্রে এই প্লাজমার উষ্ণতা প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস। পাশে তোমাদের সূর্যের বাইরের দিকের ছবি দেখানো হলো।

আমাদের চেনা অনেক যৌগ — নুন, পোড়াচুন, কস্টিক সোডা, কলিচুন, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট — এরাও কঠিন পদার্থ। এরা কিন্তু অণু দিয়ে তৈরি নয়। এইসব যৌগ তৈরি হয় আয়ন দিয়ে। পরবর্তী অংশে আমরা আয়ন দিয়ে তৈরি যৌগদের কথা জানব।

যোজ্যতা ও রাসায়নিক বন্ধন

আয়নীয় যৌগ

তোমরা সকলেই নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড দেখেছ। প্রথম ছবির নুনের একটা দানাকে যদি অনেকটা বড়ো করে দেখানো যায় তাহলে কী রকম দেখাবে? নীচের দ্বিতীয় ছবিটা দেখো—

দ্বিতীয় ছবিতে যে বেশ সুন্দর জ্যামিতিক আকৃতির নুনের দানাটাকে দেখা যাচ্ছে তাকে বলে কেলাস বা ক্রিস্টাল (Crystal)। নুন তো আমরা বাজার থেকে কিনে আনি। কিন্তু যদি আমরা পরীক্ষাগারে নুন তৈরি করতে চাই? তাহলে ধাতব সোডিয়ামের সঙ্গে ক্লোরিন গ্যাসের বিক্রিয়া ঘটাতে হবে। বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো:

$$\underset{\text{কঠিন}}{2Na} + \underset{\text{গ্যাস}}{Cl_2} \longrightarrow \underset{\text{কঠিন}}{2NaCl}$$
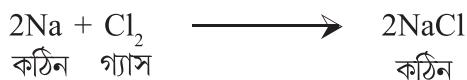
নুন তৈরিতে কী কী মৌল লাগে সে তো জানা গেল। এবার আমরা জানতে চাইব নুনের ওই ক্রিস্টালে কী থাকে। তার আগে নুনের একটা ধর্মের কথা জেনে নেওয়া যাক।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে প্রায় 800^0C তাপমাত্রায় নুনকে গলিয়ে তরল করে ফেলা যায়। গলে যাওয়া নুনের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠানো সম্ভব। ধাতুর মতো অতো ভালো পরিবাহী না হলেও গলে-যাওয়া নুনের মধ্যে দিয়ে বেশ ভালোভাবেই বিদ্যুৎ যেতে পারে। কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যেতে হলে কোনো-না-কোনো আধানযুক্ত কণাকে যেতেই হবে। যেমন ধরো, ধাতুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাওয়া মানে ইলেকট্রন চলাচল। তাহলে কী গলে-যাওয়া সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল ইলেকট্রনের মাধ্যমে ঘটে? — না; ইলেকট্রন চলাচল নয়; তাহলে?

এই বইয়ের 'স্থির তড়িৎবল ও আধানের ধারণা' অংশে তোমরা জেনেছো যে, কোনো পরমাণু ইলেকট্রন নিলে বা ছেড়ে দিলে কী হয়। সেক্ষেত্রে মোট প্রোটন সংখ্যা আর ইলেকট্রন সংখ্যার সমান থাকে না; পরমাণু তখন তড়িৎযুক্ত হয়ে পড়ে। তড়িৎযুক্ত পরমাণুকে বলে আয়ন(ion)। আয়ন দু-ধরনের —ধনাত্মক আয়ন (ক্যাটায়ন) আর ঋণাত্মক আয়ন (অ্যানায়ন)। তাহলে কী গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ পরিবাহিতা তড়িতের প্রভাবে আয়নদের চলাচলের জন্যে?

— হ্যাঁ। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে কঠিন কেলাসে, গলে-যাওয়া অবস্থায় এবং জলীয় দ্রবণে সবসময়েই নুনের উপাদান হলো Na^+ আর Cl^- আয়ন। বিদ্যুৎ পাঠাবার ব্যবস্থা করলে এই তড়িৎগ্রস্ত আয়নরাই সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলিত অবস্থায় বা, জলীয় দ্রবণে তড়িৎ পরিবহণ করে।

এবারে আমরা দেখব কীভাবে সোডিয়াম পরমাণু থেকে Na^+ আর ক্লোরিন পরমাণু থেকে Cl^- আয়ন তৈরি হয়।
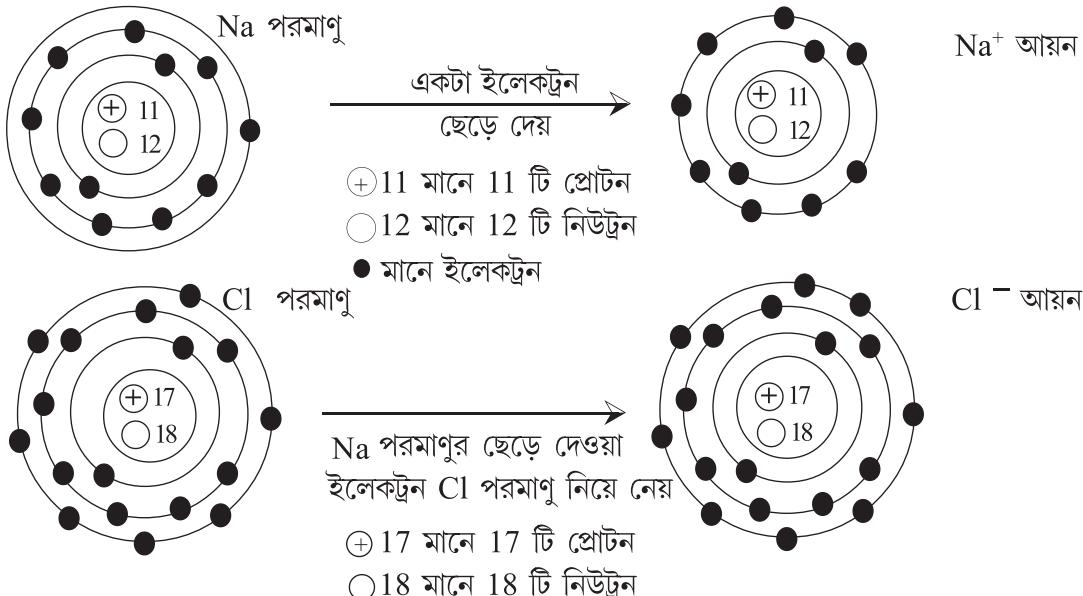
Na^+ আর Cl^- তো তৈরি হলো; কিন্তু কতগুলো আয়ন হয়েছে? শুধু দুটো আয়নই কী?

না; তোমরা জেনেছ যে চোখে দেখতে পাবার মতো যে-কোনো বিক্রিয়ায় বহু লক্ষ কোটি অণু-পরমাণু অংশগ্রহণ করে। এখানেও তাই হয় ; আমরা তোমাদের বিষয়টা সহজে বোঝাতে একটা Na^+ আর একটা Cl^- আয়নের মডেল দেখিয়েছি। আসলে কিন্তু বহু কোটি Na^+ আর সমসংখ্যক Cl^- আয়ন দিয়ে ওই ক্রিস্টালটা তৈরি হয়েছে। বিপরীত আধানযুক্ত আয়নদের মধ্যে তাড়িতিক আকর্ষণই আয়নদের একত্রে ধরে রাখে।

নীচে তোমাদের NaCl ক্রিস্টালের মধ্যে Na^+ আর Cl^- আয়নগুলো কেমনভাবে থাকে তার একটা মডেল দেখানো হলো।

সোডিয়াম ক্লোরাইড হলো একটা ধাতু (Na) আর একটা অধাতুর (Cl_2) যৌগ। ধাতু ও অধাতু দিয়ে তৈরি আরো বহু যৌগই ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন দিয়ে তৈরি বলে প্রমাণ আছে। এদের বলা হয় আয়নিক যৌগ (ionic compound)। যেসব আয়নিক যৌগ জলে দ্রাব্য হয় তাদের জলীয় দ্রবণ তড়িতের পরিবাহী হয়।

আমরা এবার আরো কিছু আয়নিক যৌগের সংকেত লেখার বিষয়টা শিখব। এখানে দুটো কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যা পাশের পাতায় বলা হলো।

(1) কোনো আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে অণুর অস্তিত্ব নেই। তাই আমরা বলব $NaCl$, $CaCl_2$ ইত্যাদি হলো এইসব যৌগের সংকেত।

(2) যৌগ তৈরির সময় ক্যাটায়নদের মোট পজিটিভ চার্জ আর অ্যানায়নদের মোট নেগেটিভ চার্জ সমান হতেই হবে। এর মানে হলো যৌগে কোনো বাড়তি (+) বা (−) চার্জ থাকা চলবে না।

এবার আমরা নীচের সারণির ফাঁকা জায়গাগুলো পূরণ করব।

ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	মোট চার্জ শূন্য হলো কীভাবে	যৌগের সংকেত	যৌগের নাম
Na^+	Cl^-	প্রত্যেক Na^+ -এর জন্য 1টি Cl^- আয়ন	$(+1)+(-1)=0$	$NaCl$	সোডিয়াম ক্লোরাইড
K^+	F^-	প্রত্যেক K^+ -এর জন্য — টি F^- আয়ন	————	————	পটাশিয়াম ফ্লুওরাইড
Mg^{2+}	O^{2-}	প্রত্যেক Mg^{2+} -এর জন্য 1 টি O^{2-} আয়ন	$(+2)+(-2)=0$	MgO	ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড
Zn^{2+}	S^{2-}	প্রত্যেক Zn^{2+} -এর জন্য — টি S^{2-} আয়ন	————	————	জিঙ্ক সালফাইড
Ca^{2+}	Cl^-	প্রত্যেক Ca^{2+} -এর জন্য 2 টি Cl^- আয়ন	$(+2)+2\times(-1)=0$	$CaCl_2$	ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড
Na^+	O^{2-}	প্রতি দুটি Na^+ -এর জন্য --- টি O^{2-} আয়ন	————	————	সোডিয়াম অক্সাইড
Al^{3+}	O^{2-}	প্রতি দুটি Al^{3+} -এর জন্য 3 টি O^{2-} আয়ন	$2\times(+3)+3\times(-2)=0$	————	অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড

. এবার তোমরা এই সারণির সাহায্য নিয়ে নীচের আয়নীয় যৌগদের সংকেত লেখো- অ্যালুমিনিয়াম ফ্লুওরাইড, জিঙ্ক অক্সাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালশিয়াম অক্সাইড, সোডিয়াম সালফাইড।

আগের পাতার যেসব ধাতুর যৌগের কথা বলা হলো তারা একরকমের ক্যাটায়ন দেয়। আরো কিছু ধাতুর কথা আমরা জানব যারা একাধিক রকমের ক্যাটায়ন দেয়। এইরকম চারটে ধাতুর নাম হলো লোহা (Fe), তামা(Cu), মার্কারি (Hg) এবং টিন (Sn)। এইসব ধাতুর কম চার্জের আয়নের নামে 'আস্' ও বেশি চার্জের আয়নের নামে 'ইক' যোগ করে চার্জ কম-বেশির ব্যাপারটা বোঝানো হয়। নীচের সারণি দেখো। লক্ষ করো মারকিউরাস আয়ন হলো Hg_2^{2+} অর্থাৎ এখানে দুটো Hg পরমাণু পরস্পর যুক্ত থাকে।

মৌল	কম চার্জের আয়ন ও তার নাম	বেশি চার্জের আয়ন ও তার নাম
Fe	Fe^{2+}, ফেরাস	Fe^{3+} ফেরিক
Cu	Cu^{+}, কিউপ্রাস	Cu^{2+}, কিউপ্রিক
Hg	Hg_2^{2+}, মারকিউরাস	Hg^{2+}, মারকিউরিক
Sn	Sn^{2+}, স্ট্যানাস	Sn^{4+}, স্ট্যানিক

এবার তোমরা আগের মতো উপায়ে নীচের সারণি পূরণ করো

যৌগের নাম	ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	চার্জের হিসেব	যৌগের সংকেত
ফেরাস ক্লোরাইড	Fe^{2+}	Cl^-	প্রত্যেক Fe^{2+} -এর জন্য 2 টি Cl^- আয়ন	$(+2)+2\times(-1)=0$	$FeCl_2$
ফেরিক ক্লোরাইড	Fe^{3+}	Cl^-	________	________	________
কিউপ্রাস অক্সাইড	Cu^{+}	O^{2-}	প্রতি দুটি Cu^{+} -এর জন্য 1 টি O^{2-} আয়ন	$2\times(+1)+(-2)=0$	Cu_2O
কিউপ্রিক অক্সাইড	Cu^{2+}	O^{2-}	________	________	________
মারকিউরাস ক্লোরাইড	Hg_2^{2+}	Cl^-	প্রত্যেক Hg_2^{2+} -এর জন্য 2 টি Cl^- আয়ন	________	________

এবার তোমরা উপরের সারণি দুটি কাজে লাগিয়ে পাশের যৌগদের সংকেত লেখো: কিউপ্রাস ক্লোরাইড, ফেরিক অক্সাইড, মারকিউরিক অক্সাইড, স্ট্যানাস ক্লোরাইড।

মূলক:

আমরা এতক্ষণ যেসব ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নদের কথা জেনেছি তাদের মধ্যে Hg_2^{2+} ছাড়া সবকটাই এক -পরমাণুক। অ্যানায়ন বা ক্যাটায়ন যে সবসময়েই এক-পরমাণুক হবে তা নয়। একাধিক পরমাণু জোটবদ্ধ হয়ে যে আয়ন তৈরি করে তাকে বলা হয় মূলক বা র‍্যাডিক্যাল (Radical)। নীচের সারণিতে কয়েকটি মূলকের নাম ও সংকেত বলা হলো।

মূলক	সংকেত	মূলক	সংকেত
অ্যামোনিয়াম	NH_4^+	হাইড্রক্সাইড	OH^-
নাইট্রেট	NO_3^-	বাইকার্বনেট	HCO_3^-
কার্বনেট	CO_3^{2-}	ফসফেট	PO_4^{3-}
সালফেট	SO_4^{2-}	সালফাইট	SO_3^{2-}

এবার আমরা আগের এবং উপরের সারণি কাজে লাগিয়ে কিছু যৌগের সংকেত লেখা শিখব।

যৌগের নাম	ক্যাটায়ন	অ্যানায়ন	মোট চার্জ শূন্য হতে হলে কী চাই	চার্জের হিসেব	যৌগের সংকেত
ফেরাস সালফেট	Fe^{2+}	SO_4^{2-}	প্রত্যেক Fe^{2+} -এর জন্য 1 টি SO_4^{2-} আয়ন	$(+2)+(-2)=0$	$FeSO_4$
অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেট	Al^{3+}	NO_3^-	প্রত্যেক Al^{3+}-এর জন্য --- টি NO_3^- আয়ন	________	________
অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	NH_4^+	NO_3^-	প্রত্যেক NH_4^+ -এর জন্য 1টি NO_3^- আয়ন	$(+1)+(-1)=0$	NH_4NO_3
ক্যালশিয়াম ফসফেট	Ca^{2+}	PO_4^{3-}	প্রতি 3টি Ca^{2+} -এর জন্য 2 টি PO_4^{3-} আয়ন	$3\times(+2)+2\times(-3)=0$	$Ca_3(PO_4)_2$

এবার তোমরা নীচের যৌগগুলোর সংকেত লেখো : অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, ফেরিক সালফেট, কিউপ্রিক নাইট্রেট, ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট, ক্যালশিয়াম বাইকার্বনেট, সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালশিয়াম সালফাইট।

মনে রেখো : সারণিতে প্রত্যেক Ca^{2+}-এর জন্য 2টি Cl^- জাতীয় কথা হলো আনুপাতিক হিসেবের কথা। এরা সকলেই আয়নীয় যৌগ, অণু দিয়ে তৈরি নয়। সেই কারণেই সংকেত লেখার সময় আনুপাতিক হিসেবের কথা বলতে হচ্ছে।

সমযোজী যৌগ

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা বেশ কিছু যৌগের কথা জেনেছ। এদের মধ্যে যেমন ধাতুর যৌগ ছিল তেমনই ছিল অধাতুদের যৌগ। অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা ধাতুদের কিছু যৌগের সংকেত লেখার বিষয়টি শিখলে। এই যৌগগুলো হলো আয়নীয় যৌগ। আয়নীয় যৌগদের বৈশিষ্ট্য হলো (i) তারা আয়ন দিয়ে তৈরি (ii) সেখানে অণুর কোনো প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তোমরা নাম শুনেছ এমন অনেক পদার্থই এই শ্রেণিতে পড়ে না — এরা (i) আয়ন দিয়ে তৈরি নয়, এবং (ii) এদের অণুর অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এইসব পদার্থের মধ্যে আছে —

তোমার সবচেয়ে চেনা তরল	—	জল (H_2O)
কিছু মৌলিক গ্যাস	—	হাইড্রোজেন (H_2), নাইট্রোজেন (N_2), ক্লোরিন (Cl_2)
কিছু গ্যাসীয় যৌগ	—	মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), ফসফিন (PH_3), কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)

এই অনুচ্ছেদে আমরা এইসব অণুদের অনেকের গঠনের কথা জানব। এইসব অণুদের মধ্যে সবচেয়ে সরল হলো হাইড্রোজেন অণু। তাই প্রথমে আমরা জানব কী করে হাইড্রোজেন অণু তৈরি হয়।

কী করে হাইড্রোজেন পরমাণু জুড়ে হাইড্রোজেন অণু তৈরি হয়:
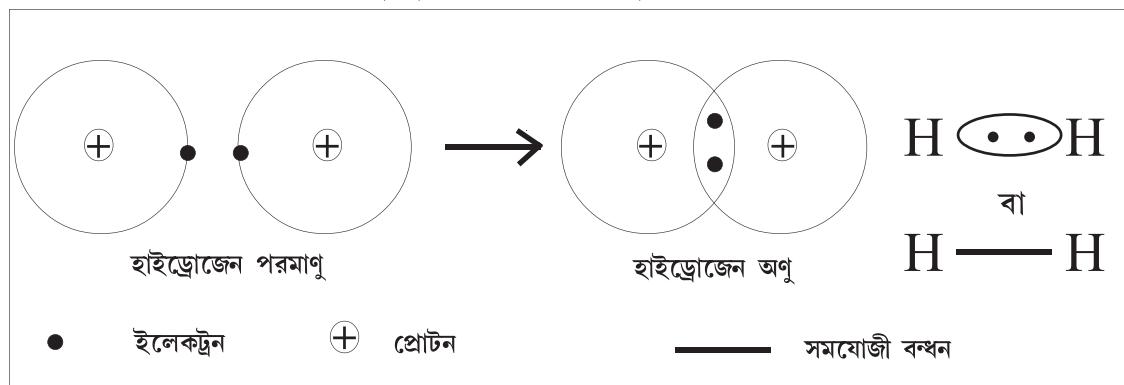
এই ছবিতে বোঝানো হয়েছে যে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু যখন যুক্ত হয়ে H_2 অণু তৈরি করে তখন প্রত্যেকের 1টা করে ইলেকট্রন মিলে একটা ইলেকট্রন জোড় গঠিত হয়। এই ইলেকট্রন জোড়কে ছবিতে (••) বা — দিয়ে বোঝানো হয়েছে। ইলেকট্রন জোড়টা দুটো H পরমাণুর নিউক্লিয়াস দিয়েই সমানভাবে আকৃষ্ট হয়, অর্থাৎ দুটো পরমাণুই ইলেকট্রন জোড়টা সমানভাবে ব্যবহার করে। এই কথাটাকে আমরা বলি 'সমযোজী বন্ধন' (covalent bond) গঠিত হওয়া। তাহলে দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটা হাইড্রোজেন অণু তৈরির বিষয়টা বোঝা গেল।

তোমরা আগে যোজ্যতা বিষয়ে যা পড়েছ তার সঙ্গে এই লেখার সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছ কি? 'হাইড্রোজেন সাপেক্ষে মৌলের যোজ্যতা' প্রসঙ্গে তোমরা জেনেছিলে যে হাইড্রোজেনের যোজ্যতা 1। এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা H পরমাণু একটাই H পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ক্লোরিন সাপেক্ষে মৌলের যোজ্যতার কথাও তোমরা জেনেছ।

যখন দুই বা তিনধরনের মৌলের দুইয়ের বেশি পরমাণু একত্রিত হয়ে সমযোজী অণু গঠন করে তখন তাদের মধ্যে সাধারণত সব মৌলেরই যোজ্যতা সমান হয় না। সেক্ষেত্রে অণুর মধ্যে যে মৌলের যোজ্যতা বেশি নিশ্চয়ই সেই মৌলের পরমাণু মাঝখানে ও অন্যান্য মৌলের পরমাণুরা তার চারপাশে থাকবে। এই মধ্যবর্তী পরমাণুকে বলা যেতে পারে কেন্দ্রীয় পরমাণু । এই নিয়ম মনে রাখলে তোমরা সহজেই কিছু সমযোজী যৌগের অণুর গঠন প্রাথমিকভাবে কীরকম হবে তা বলতে পারবে। এখানে একটা '—'এর অর্থ একটা বন্ধন বা বন্ড (Bond)। একটা বন্ড মানে একজোড়া ইলেকট্রন—এইভাবে বুঝতে হবে।

নীচের সারণিতে তোমাদের বেশ কিছু সমযোজী যৌগের অণুর গঠন প্রাথমিকভাবে কীরকম তা বোঝানো হলো। মিল লক্ষ করে তোমরা সারণি পূরণ করলে অপেক্ষাকৃত সহজে বিষয়টি বুঝতে পারবে।

সারণি

যৌগের নাম	যৌগের সংকেত	কোন মৌলের যোজ্যতা কত	কেন্দ্রীয় পরমাণু	কেন্দ্রীয় পরমাণুর যোজ্যতা	অণুর প্রাথমিক গঠন	অণুতে কটি সমযোজী বন্ধন আছে
জল	H_2O	O 2, H 1	O	2	H—O—H	2টি
হাইড্রোজেন সালফাইড	H_2S	S 2, H 1	S	2	....	__টি
অ্যামোনিয়া	NH_3	N 3, H 1	N	3	H, H, H bonded to N	__টি
ফসফিন	PH_3	P 3, H 1	P	3	....	__টি
মিথেন	CH_4	C 4, H 1	C	4	4 H bonded to C	__টি
কার্বন টেট্রাক্লোরাইড	CCl_4	C 4, Cl 1	C	4	....	__টি
নাইট্রোজেন ট্রাইক্লোরাইড	NCl_3	N 3, Cl 1	N	3	....	__টি
ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড	PCl_3	P 3, Cl 1	P	3	....	__টি

এই পদ্ধতিতে অণুতে কেন্দ্রীয় পরমাণুর বন্ধনসংখ্যার সাহায্যে অণুর প্রাথমিক গঠন কী হবে তা বার করা যায়। কিন্তু অণুর ত্রিমাত্রিক গঠন কেমন হবে তা বলা যায় না। এছাড়াও এই পদ্ধতির আরো সীমাবদ্ধতা আছে।

2.3 রাসায়নিক বিক্রিয়া

রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবক

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থদের বলে 'বিক্রিয়ক'। রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটতে হলে বিক্রিয়কদের মিশতে দিতেই হবে, কিন্তু **শুধু মিশতে দিলেই কী সবসময় বিক্রিয়া ঘটা শুরু হয়?** নীচের ঘটনাগুলো দেখো

(1) কেরোসিন বা কয়লা পুড়তে অক্সিজেন চাই। কিন্তু খোলা হাওয়ায় কেরোসিন বা কয়লা কী নিজে নিজে জ্বলে ওঠে?

(2) যথেষ্ট জল, হাওয়ার কার্বন ডাইঅক্সাইড, মাটির খনিজ— সব পেলেও একটা টবের গাছ অন্ধকারে খাদ্য তৈরি করতে পারবে কী?

(3) খেলনা বন্দুকের ক্যাপ কী রেখে দিলেই ফেটে যায়, না, জোরে আঘাত করতে হয়?

এবার তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে শুধু মিশতে পেলেই বিক্রিয়া হবে না; কোথাও গরম করতে বা আগুন জ্বালাতে হবে, কোথাও বা আলো চাই। কোথাও বেশি চাপ দিতে হয়, কোথাও দ্রাবকও দরকার।

তাপ : উপযুক্ত উষ্ণতা না থাকায় অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়াই শুরু হতে পারে না। যে-কোনো জ্বালানি পোড়াতে হলে তাই যথেষ্ট অক্সিজেন থাকলেই হবে না, উষ্ণতা বাড়াতে হবেই।

পরীক্ষা: জলযুক্ত কিউপ্রিক নাইট্রেটের বিয়োজন বিক্রিয়ার ওপর তাপের প্রভাব

পরীক্ষা	কী দেখবে	কী বুঝবে
দুটো টেস্টটিউবে জলযুক্ত কিউপ্রিক নাইট্রেটের নীল ক্রিস্টাল রাখা হলো।		
একটা টিউব ঘরের উষ্ণতায় রইল	ঘরের উষ্ণতার ক্রিস্টাল-গুলোর কিছু হলো না।	
অন্যটা স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে গরম করা হলো	গরম করলে নীল ক্রিস্টাল কালো গুঁড়োয় পরিণত হচ্ছে, বাদামি ধোঁয়া বেরোচ্ছে।	
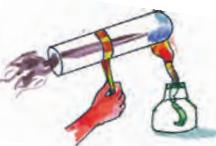
বিক্রিয়ার সমীকরণ হলো : $2Cu(NO_3)_2 \rightarrow 2\ CuO + 4NO_2 + O_2$

(বাদামি গ্যাস)
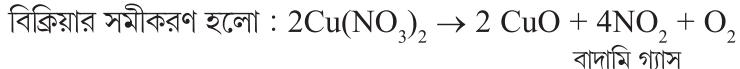
> বিক্রিয়া শুরু করতে শক্তি প্রয়োজন। উষ্ণতা বাড়লে অণুদের গতিশক্তি বাড়ে, তখন বেশিরভাগ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাড়াতাড়ি।

আলো: সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সবুজ উদ্ভিদ ও কিছু ব্যাকটেরিয়া সূর্যের আলোর শক্তিকে খাদ্যের রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত করে। সরলীকৃত সমীকরণটি হলো:

$$6CO_2 + 6H_2O \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

সালোকসংশ্লেষ একটা অতি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া। আলোর অনুপস্থিতিতে তা শুরু হতে পারে না।

ফোটো তোলার ফিল্ম আলো পড়লে নানান বিক্রিয়া ঘটে, ফলে ফিল্ম কালো হয়ে যায়। কালো কাগজে মোড়া ফিল্ম কিন্তু এভাবে নষ্ট হয় না।

আলোর মাধ্যমেও কোনো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হতে পারে। আলোই এসব ক্ষেত্রে বিক্রিয়া শুরু করতে প্রয়োজনীয় শক্তি জোগায়।

- ছবি তোলার দোকানে (স্টুডিয়ো) ‘ডার্ক রুম’ (Dark Room) থাকার দরকার কী?

চাপ: খেলনা বন্দুকের ক্যাপকে জোরে আঘাত করলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে শব্দ, তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় চাপের ভূমিকা কী? — এই ক্ষেত্রে খুব জোরে আঘাত করে (অর্থাৎ ক্যাপের উপর চাপ বাড়িয়ে) আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দিচ্ছি।

দ্রাবক : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দ্রাবক যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে নীচের পরীক্ষাটা করো। তোমার লাগবে দুটো টেস্টটিউব, শুকনো খাবার সোডা ($NaHCO_3$), টারটারিক অ্যাসিডের ক্রিস্টাল আর জল।

পরীক্ষা	কী দেখবে	কী বুঝবে
টেস্টটিউবে শুকনো খাবার সোডা আর টারটারিক অ্যাসিডের ক্রিস্টাল মিশিয়ে টেবিলে রাখা হলো	কোনো বুদবুদ বেরোয় না	
টেস্টটিউবে শুকনো খাবার সোডা আর টারটারিক অ্যাসিডের ক্রিস্টাল মিশিয়ে জল দেওয়া হলো	দ্রুত বুদবুদ বেরোতে থাকে	
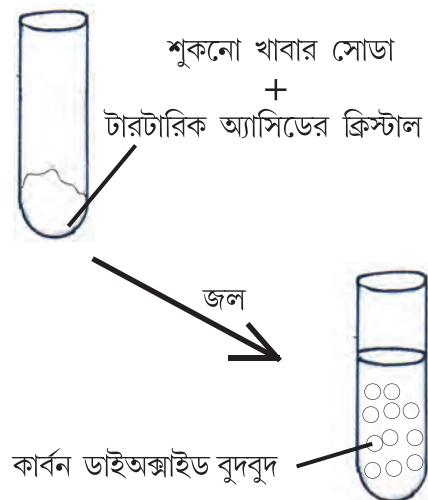
জল একটা তরল যা দ্রাবকরূপে কাজ করছে। দুটো কঠিনের গুঁড়োকে মেশালেই তাদের অণু বা আয়নরা পরস্পর মেশবার সুযোগ পায় না। দ্রাবকের অণুরা এসে বিক্রিয়কের মধ্যে থাকা অণু বা আয়নদের আলাদা করে ফেলে, তখন বিক্রিয়া শুরু হয়।

জলই একমাত্র দ্রাবক নয়। নানা কাজে কেরোসিন, বেঞ্জিন, তারপিন তেলও দ্রাবকরূপে ব্যবহার করা হয়।

- খাবার সোডা আর টারটারিক অ্যাসিডের পরীক্ষায় টেস্টটিউবে জল না দিয়ে খানিকটা কেরোসিন বা বেঞ্জিন দিয়ে ঝাঁকালে কোনো বুদবুদ বেরোতে দেখা যায় না। কেন এমন হয়?

খাবার সোডা আয়নীয় যৌগ। কেরোসিন, বেঞ্জিন বা তারপিন তেলের মতো দ্রাবক আয়ন দিয়ে তৈরি জিনিসকে দ্রবীভূত করতে পারে না। আবার টারটারিক বা অন্য অ্যাসিডকে বিক্রিয়া করতে হলে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) দিতেই হবে। সেই ঘটনা জলে ঘটতে পারে, কেরোসিন, পেট্রোল বা তারপিন তেলের মতো দ্রাবকে ঘটবে না। তাই বিক্রিয়া শুরুই হবে না।

নীচের ছবিতে জলের উপস্থিতিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টালের ক্রমশ দ্রবীভূত হওয়া বোঝানো হলো
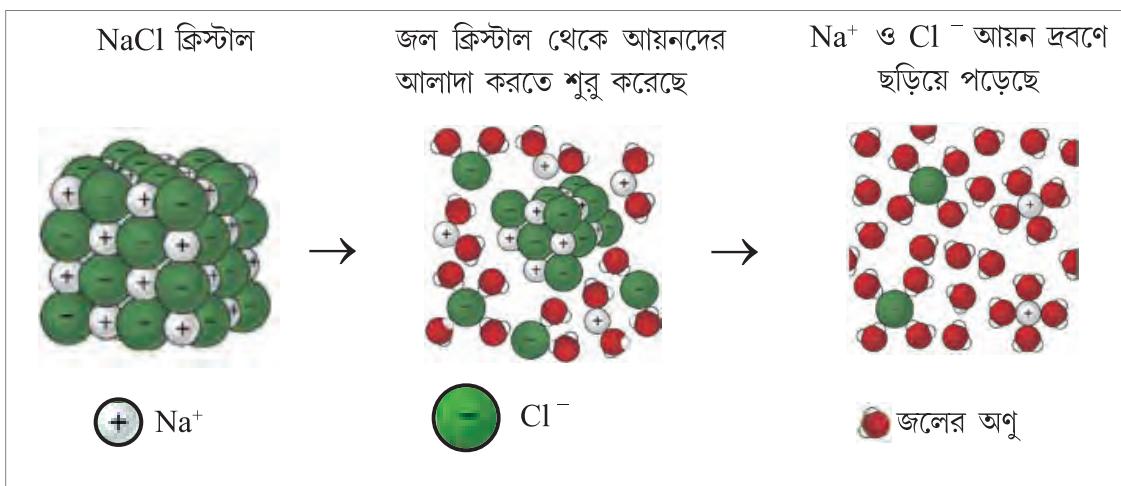
● যেসব যৌগ আয়ন দিয়ে গঠিত তারা বিভিন্ন জৈব দ্রাবকের (ইথার, বেঞ্জিন, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি) চেয়ে জলে বেশি দ্রাব্য। তাহলে বলো সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সোডিয়াম নাইট্রেট নিয়ে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে হলে তুমি উপরোক্ত দ্রাবকগুলোর কোনটা বেছে নেবে।

তড়িৎ: জলে একটু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তার মধ্যে ব্যাটারির সাহায্যে তড়িৎ পাঠালে দেখা যাবে দুটো তড়িৎ দ্বারেই বুদবুদ আকারে গ্যাস নির্গত হচ্ছে। এর মধ্যে একটা গ্যাস হলো হাইড্রোজেন ও অন্যটা অক্সিজেন। এক্ষেত্রে জল বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করে :

$$\underset{\text{তরল}}{2H_2O} \longrightarrow \underset{\text{গ্যাস}}{2H_2} + \underset{\text{গ্যাস}}{O_2}$$
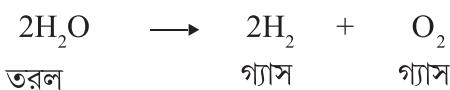
এখানে তড়িৎ না পাঠালে কিন্তু গ্যাস তৈরি হয় না। এর মানে হলো তড়িতের শক্তিই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। তোমরা কিন্তু এই পরীক্ষা কখনোই বাড়ির ইলেকট্রিক লাইনের সঙ্গে তার যুক্ত করে করবে না, তা খুব বিপজ্জনক।

রাস্তাঘাটে চলতে-ফিরতে তোমরা কখনও 'ইলেকট্রোপ্লেটিং'-এর কারখানা দেখেছ? এখানে তড়িৎকে কাজে লাগিয়ে রাসায়নিক পদ্ধতিতে লোহার তৈরি থালা, চামচ, বাটির ওপর নিকেলের সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়া হয়। নিকেলের আস্তরণ দেওয়ার ফলে জিনিসগুলোয় সহজে মরচে পড়ে না। আস্তরণ দেবার কাজটাও একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং সেখানেও বিক্রিয়া ঘটাতে তড়িৎশক্তি ব্যবহৃত হয়।

অনুঘটক

অনেক সময় দেখা যায় কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন খুবই ধীরে ধীরে ঘটছে। অথচ সেই মিশ্রণে সামান্য পরিমাণে অন্য একটি পদার্থ মেশাবার পর বিক্রিয়া ঘটছে খুব তাড়াতাড়ি। যেসব পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ বাড়ায় তাদের বলে অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট (Catalyst)। অনুঘটকের কাজকে বলে অনুঘটন বা ক্যাটালিসিস (Catalysis)। হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) হলো একটি বর্ণহীন তরল। এটি খুব সুস্থিত নয়। সাধারণ তাপমাত্রায় খুব ধীরে ধীরে ভেঙে যায়, আর জল ও অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করে :

$$2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$$
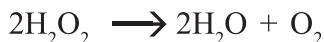
আমরা এই ধীর বিক্রিয়াটির উপর অনুঘটকের প্রভাব লক্ষ করব।

পরীক্ষা করো : তোমাদের চাই দুটো টেস্টটিউব, পাতলা হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ, সামান্য ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2) গুঁড়ো আর খানিকটা জল।

পরীক্ষা	কী দেখবে	কী বুঝবে
একটা টেস্টটিউবে অল্প হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে রেখে দেওয়া হলো	বুদবুদ বেরোবার হার খুবই কম	মিশ্রণে MnO_2 থাকলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ বেড়ে যায়। অতএব (MnO_2) এখানে অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে। বিক্রিয়ার সমীকরণ :
অন্য টেস্টটিউবে অল্প হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে খুব সামান্য MnO_2 গুঁড়ো দেওয়া হলো	দ্রুত অক্সিজেনের বুদবুদ বেরোতে থাকে	$2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2$

সাবধানতা : হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ চোখ ও চামড়ার পক্ষে ক্ষতিকারক। নিজেরা এই পরীক্ষা না করে শিক্ষক/শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে দেখে বোঝার চেষ্টা করা উচিত। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের (MnO_2) গুঁড়ো যেন চোখে বা নাকে না ঢোকে সে বিষয়ে সাবধান হতে হবে।

অনুঘটকের বৈশিষ্ট্য

(1) অনুঘটক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, কিন্তু বিক্রিয়া শেষে আবার তাকে ফিরে পাওয়া যায়।
(2) এমন কোনো অনুঘটক হয় না যা সব বিক্রিয়ার বেগ বাড়াতে পারবে।
(3) কোনো বিক্রিয়ায় কোন অনুঘটক উপযোগী হবে তা পরীক্ষা করে বার করতে হয়, বিক্রিয়ার সমীকরণ দেখেই বলা যায় না।

রাসায়নিক শিল্পে নানান প্রয়োজনীয় যৌগ (অ্যামোনিয়া, নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি) তৈরি করতে বিভিন্ন অনুঘটক অপরিহার্য।

- দুটো একই রকমের চক নাও। একটাকে ভেঙে টুকরো করো, অন্যটা থাকুক পাশাপাশি। কী দেখবে?

দেখতেই পাচ্ছ বড়ো টুকরোকে ভেঙে ফেললে ক্ষেত্রফল কীভাবে বাড়ে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ কয়লার বড়ো টুকরোর চেয়ে সমান ওজনের ছোটো ছোটো টুকরো বেশি তাড়াতাড়ি পোড়ে। এর কারণ হলো কঠিনের উপরিতলে যত বেশি সংখ্যক অণু, পরমাণু বা আয়ন বিক্রিয়ার সুযোগ পায় বিক্রিয়া ঘটে তত তাড়াতাড়ি।

- ওপরে হাইড্রোজেন পারক্সাইডে MnO_2 গুঁড়ো দেওয়ার যে পরীক্ষার কথা পড়লে সেখানে MnO_2-র বড়ো ডেলা, না সমান ভরের সূক্ষ্ম গুঁড়ো — কোনটা দিলে বেশি তাড়াতাড়ি অক্সিজেনের বুদবুদ বেরোবে?

সূক্ষ্ম গুঁড়ো; কারণ গুঁড়ো করলে অনুঘটকের ক্ষেত্রফল বাড়ে, অনুঘটকের কাজও ঘটে তাড়াতাড়ি। তাই রাসায়নিক কারখানায় কঠিন অনুঘটক ব্যবহার করলে তা সূক্ষ্ম গুঁড়ো বা, সরু তারজালি আকারে রাখা হয়।

- **নীচের ঘটনাগুলোর মধ্যে কী মিল আছে আবিষ্কার করার চেষ্টা করো**

(1) বাড়িতে ধুনো দেবার সময় বড়ো টুকরোর চেয়ে সমান ওজনের গুঁড়ো ধুনো তাড়াতাড়ি জ্বলে ওঠে। (2) বড়ো টুকরোর চেয়ে গুঁড়ো মশলা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে রান্নায় সুগন্ধ আনে। আস্ত আলুর চেয়ে ছোটো টুকরো সেদ্ধ হতে কম সময় লাগে। (3) বড়ো দানার চিনির চেয়ে গুঁড়ো চিনি জলে তাড়াতাড়ি গোলে।

জৈব অনুঘটক : উৎসেচক বা এনজাইম (Enzyme)

বিশেষ বিশেষ ধরনের জৈব অনুঘটক বা এনজাইম না থাকলে জীবকোশে বেশিরভাগ রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে পারত না। এই জৈব অনুঘটকগুলো প্রধানত প্রোটিনজাতীয় যৌগ। তুমি কী এদের কাজ দেখতে চাও? তাহলে তোমার লাগবে পাতলা হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণ, কিছু সদ্য কাটা আলুর টুকরো, দুটো টেস্টটিউব আর খানিকটা জল।

পরীক্ষা	কী দেখবে	কী বুঝতে পারবে
একটা টেস্টটিউবে হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণে সমপরিমাণ জল মিশিয়ে রাখা হলো	অক্সিজেনের বুদবুদ বেরোবার হার খুবই কম	বিক্রিয়ার হার খুবই কম।
অন্য টেস্টটিউবে পাতলা হাইড্রোজেন পারক্সাইড দ্রবণে অল্প জল দিয়ে তাতে একটা সদ্য কাটা আলুর টুকরো দেওয়া হলো	তাড়াতাড়ি বুদবুদ বেরোতে শুরু করেছে	আলুর ক্যাটালেজ (catalase) এনজাইম হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে ভেঙে অক্সিজেন গ্যাস দিয়েছে। $2H_2O_2 \longrightarrow 2H_2O + O_2$

মেটে বা লিভারেও ক্যাটালেজ এনজাইম থাকে, তা নিয়েও এই পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব।

● আরো একটা এনজাইমের কাজ দেখতে চাও? তাহলে একটু জল, ইউরিয়া, অড়হর ডালের গুঁড়ো বা তরমুজের বীজের মধ্যের সাদা অংশ আর একটু ফেনলথ্যালিন দ্রবণ লাগবে।

কাঁচের গ্লাসে সামান্য জলে খানিকটা ইউরিয়া গুলে এক চামচ অড়হর ডালের গুঁড়ো দিয়ে মিনিট দশেক ভিজিয়ে রাখো। সাবধানে শুঁকলে অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাবে, ফেনলথ্যালিন দিলে দ্রবণ গোলাপি হয়ে যাবে। কেন এমন হয়? অড়হর ডাল বা তরমুজের বীজে ইউরিয়েজ (urease) বলে একরকম এনজাইম থাকে। ইউরিয়েজ ইউরিয়ার সঙ্গে জলের বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি করে [$CO(NH_2)_2 + H_2O \rightarrow CO_2 + 2NH_3$] অ্যামোনিয়া দ্রবণকে ক্ষারীয় করে দিচ্ছে। তাই ফেনলথ্যালিন গোলাপি হয়ে যাচ্ছে।

প্রস্রাবাগারের ঝাঁঝালো গন্ধ অ্যামোনিয়ার। নর্দমার জীবাণুরা প্রস্রাবের ইউরিয়া ভেঙে অ্যামোনিয়া দেয়।

খাবারের বিভিন্ন উপাদান — প্রোটিন, শর্করা, লিপিড — হজম করতে নানান এনজাইম অপরিহার্য। তোমার দেহে খাদ্য থেকে শক্তি তৈরিতে, নতুন নতুন প্রোটিন তৈরি করতে, ডিএনএ তৈরিতে, হরমোন, কোশপর্দার নানান প্রয়োজনীয় লিপিড তৈরিতে, কোশের মধ্যে ক্ষতিকারক যৌগকে নষ্ট করতে কতরকমের এনজাইম লাগে। এনজাইম ছাড়া কোনো কোশই বাঁচতে পারবে না।

পদ্যে আর ছবিতে এনজাইমদের কিছু কাজের কথা বলা হলো। দেখোতো বুঝতে পারো কিনা।

কেউ বা জোড়ে ছোট্ট অণু,
কেউ বা ভাঙে বড়ো;
ইলেকট্রনের আদান-প্রদান,
কেউ সে কাজে দড়ো।

কোথাও চলে লিপিড গড়া,
কোথাও ভাঙে প্রোটিন—
এনজাইমেই করছে সেকাজ,
নইলে ভারি কঠিন।

কেউ বা জোড়ে ছোট্ট অণু

কেউ বা ভাঙে বড়ো

তাপগ্রাহী ও তাপমোচী পরিবর্তন

তাপমোচী পরিবর্তন

যেসব রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপ উৎপন্ন হয় তাদের বলে তাপমোচী রাসায়নিক পরিবর্তন (exothermic reaction)। তোমরা কী কী তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা জানো ভেবে বলো তো:
1. কয়লা পোড়ানো 2. ————————— 3. পোড়াচুনে জল দেওয়া 4. ——————

যে-কোনো জ্বালানির দহন তাপমোচী পরিবর্তন। নীচে কিছু তাপমোচী বিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হলো। এখানে সমীকরণের ডানদিকে '(+) তাপ' মানে বুঝতে হবে বিক্রিয়া ঘটলে তাপ মুক্ত হচ্ছে।

কার্বনের দহন : $C + O_2 \rightarrow CO_2$ + তাপ

পোড়াচুন ও জলের বিক্রিয়া : $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ + তাপ

মিথেন গ্যাসের দহন : $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ + তাপ
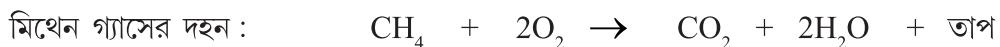
রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ মুক্ত হওয়ার সময় কখনো-কখনো আলোও উৎপন্ন হতে পারে। গ্যাস, কয়লা, কাঠ, কেরোসিন, মোম এসব পোড়ালে তাপ ও আলো দুইই পাওয়া যায়।

তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগ

রান্না করতে রোজই আমরা কোনো না কোনো জ্বালানি পোড়াই। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা বা গ্যাস পুড়িয়ে যে তাপশক্তি পাওয়া যায় তা দিয়ে জল ফুটিয়ে স্টিম তৈরি করা হয়। বেশি চাপের এই গরম স্টিম যখন ধাক্কা দিয়ে টারবাইনের পাখা ঘোরায় তখন বিদ্যুৎ তৈরি হয়। তোমরা যে ওয়েলডিং বা ধাতু ঝালাই করতে দেখো সেও একরকমের তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রয়োগ। এখানে অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) গ্যাসকে পুড়িয়ে তাপ পাওয়া যায় এবং এত বেশি উষ্ণতা সৃষ্টি হয় যে লোহা গলে যায়।

ওয়েলডিং

সতর্কতা : যেসব তাপমোচী রাসায়নিক পরিবর্তনে দ্রুত বিক্রিয়া ঘটে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস তৈরি হয় সেগুলো খুব বিপজ্জনক। যে-কোনো বিস্ফোরকের বিস্ফোরণে প্রচুর তাপ ও প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন গ্যাস মুক্ত হয়। গরম গ্যাস দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সময় যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তার ধাক্কায় ক্ষয়ক্ষতি হয়।

তাপগ্রাহী পরিবর্তন

যেসব রাসায়নিক পরিবর্তনে বিক্রিয়া ঘটলে পরিবেশ থেকে তাপ শোষিত হয় তাদের বলে তাপগ্রাহী পরিবর্তন (endothermic reaction)। নীচে কয়েকটি তাপগ্রাহী বিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হলো: এখানে সমীকরণের ডানদিকে '(-) তাপ' মানে বুঝতে হবে বিক্রিয়া ঘটলে পরিবেশ থেকে তাপ শোষিত হচ্ছে।

তাপগ্রাহী একটা বিক্রিয়ার উদাহরণ হলো কঠিন বেরিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলযুক্ত ক্রিস্টাল ($Ba(OH)_2.8H_2O$) ও কঠিন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের (NH_4Cl) বিক্রিয়া। এই দুটো কঠিনকে একটা

বিকারে রেখে মেশালে দ্রুত বিক্রিয়া ঘটে এবং একটা কাদাকাদা মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়ার সমীকরণ

$$\underset{\text{কঠিন}}{Ba(OH)_2.8H_2O} + \underset{\text{কঠিন}}{2NH_4Cl} \rightarrow \underset{\text{কঠিন}}{BaCl_2 . 2H_2O} + \underset{\text{(দ্রবণ)}}{2NH_3} + \underset{\text{(তরল)}}{8\ H_2O} - \text{তাপ}$$

এটা এতই তাপগ্রাহী পরিবর্তন যে বিকারের বাইরে জলের ফোঁটা থাকলে তা জমে বরফ হয়ে যায়। এই পরীক্ষায় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের বদলে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটও ব্যবহার করা যেতে পারে।

চুনাপাথর ($CaCO_3$) থেকে পোড়াচুন (CaO) তৈরিও একটি তাপগ্রাহী পরিবর্তন :

$$CaCO_3 \xrightarrow{1000°C} CaO + CO_2 - \text{তাপ}$$

- ভৌত পরিবর্তনও তাপগ্রাহী বা তাপমোচী হতে পারে। তোমার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে তিনটি তাপগ্রাহী ভৌত পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করো।

- জলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) দ্রবীভূত হবার মিনিট দুয়েকের মধ্যে দেখা গেল টেস্ট টিউবের বাইরের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল জমেছে। দ্রবীভূত হওয়া কী ধরনের পরিবর্তন? এই দ্রবণে থার্মোমিটার ডোবালে কী দেখতে পেতে?

- একটি পরিবর্তন যে রাসায়নিক পরিবর্তন তা বুঝবে কী করে?

যদি পরিবর্তনটির সময় (a) কোনো অধঃক্ষেপ পড়ে বা, (b) গ্যাস নির্গত হয় বা, (c) রঙের পরিবর্তন হয় এবং (d) তাপ মুক্ত বা শোষিত হয়, তাহলে প্রাথমিকভাবে মনে করা যেতে পারে সেটি রাসায়নিক পরিবর্তন।

- পোড়াচুনে (CaO) জল দিলে কলিচুন তৈরি হওয়া ছাড়াও প্রচুর স্টিম (উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প) নির্গত হয়। কেন এমন হয় ব্যাখ্যা করো।

- চাপে রাখা অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন গ্যাসের উচ্চ গতিতে নির্গত মিশ্রণের দহনে ঝালাই করার সময় আলোকশক্তি আসে কোথা থেকে?

ঝালাইয়ের সময় তাপ ও আলোকশক্তি আসে তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে :

$$2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O + \text{তাপ}$$

এতে প্রায় দু-হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উষ্ণতা সৃষ্টি হতে পারে। এত উষ্ণতায় যে আলো উৎপন্ন হয় তাতে খানিকটা অতিবেগুনি রশ্মিও থেকে যায়। অতিবেগুনি রশ্মি চোখের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। তাই যাঁরা ওয়েলডিং করেন তাঁদের বিশেষ ধরনের ফিল্টার লাগানো চশমা পরে কাজ করতে হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় কিছু রাসায়নিক বন্ধন ভাঙে এবং নতুন বন্ধন গঠিত হয়; কোথাও আয়নীয় যৌগ গঠিত হয়, কোথাও আয়নীয় যৌগের কেলাস ভেঙে নতুন পদার্থ উৎপন্ন হয়; কোথাও আবার আয়নদের বিক্রিয়ায় নতুন পদার্থ গঠিত হয়। সাধারণভাবে বললে বলা যায় যে এইসব ভাঙা-গড়ার সামগ্রিক ফলাফলরূপে কোথাও তাপ মুক্ত হয় (তাপমোচী বিক্রিয়া) আবার কোথাও তাপ শোষিত হয় (তাপগ্রাহী বিক্রিয়া)।

জারণ-বিজারণের ধারণা

আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা জানি যে কাঠ, কয়লা ইত্যাদিতে খোলা বাতাসে আগুন দিলে তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। মোমবাতি, কেরোসিন তেল, রান্নার গ্যাসও খোলা বাতাসে একইভাবে জ্বলে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে। এই ঘটনাকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় দহন বলে থাকি। ওপরে যেসব পদার্থের দহনের উদাহরণ দেওয়া হলো, তাদের দহনের ফলে কী হয়?

মোম, কেরোসিন তেল ও রান্নার গ্যাসের মূল উপাদান হলো কার্বন ও হাইড্রোজেন। দহনের সময়ে বাতাসের অক্সিজেন এই দুটো মৌলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল (জলীয় বাষ্প) উৎপন্ন করে।

জ্বালানির জৈব অণুতে থাকা কার্বন $+ O_2 \rightarrow CO_2$

জ্বালানির জৈব অণুতে থাকা হাইড্রোজেন $+ O_2 \rightarrow H_2O$ (জলীয় বাষ্প)

নীচের পরীক্ষার বর্ণনা থেকে ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করো :

একটা প্রজ্জ্বলন (দহন) চামচে একটুকরো কাঠকয়লা (মূলত কার্বন) রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে লাল হওয়া পর্যন্ত গরম করা হলো। তারপর একটা অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারে পাশের ছবির মতো করে ঢুকিয়ে রাখলে দেখা যাবে কাঠকয়লা পুড়ে ছাই উৎপন্ন হয়েছে। দহনে উৎপন্ন গ্যাসকে স্বচ্ছ চুনজলের মধ্যে পাঠালে দেখা যাবে স্বচ্ছ চুনজল ঘোলা হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে নীচের সারণি পূরণ করো।

কী করলে	কী দেখলে ও তার কারণ	কী সিদ্ধান্ত নিতে পারো
লাল হয়ে ওঠা কাঠকয়লার টুকরো অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করানো হলো	কাঠকয়লা পুড়ে ছাই হলো কারণ কাঠকয়লা (কার্বন) দাহ্য পদার্থ	
ঠান্ডা করা জারের মধ্যে স্বচ্ছ চুনজল ঢেলে ঝাঁকানো হলো	স্বচ্ছ চুনজল ঘোলা হয়ে গেল। কারণ CO_2 স্বচ্ছ চুনজলকে ঘোলা করে।	

এক্ষেত্রে কাঠকয়লার (কার্বন) দহন ঘটে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) উৎপন্ন হয়েছে, যা স্বচ্ছ চুনজলকে ঘোলা করে। তাই কার্বন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়েই এই কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়েছে।

একটা টিনের কৌটোর ঢাকনির সঙ্গে একটু মোটা ও কিছুটা লম্বা একটা তার পেঁচিয়ে জুড়ে নাও। ছবির মতো করে বাঁকিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল তোমার নিজের তৈরি প্রজ্জ্বলন চামচ।

একইভাবে দহন চামচে হলুদ রং-এর সালফার গুঁড়ো নিয়ে পোড়ালে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত সালফার ডাইঅক্সাইড পাওয়া যায়। আবার ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর ফিতে আগুনে পোড়ালে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের সাদা গুঁড়ো উৎপন্ন হয়। এই দুটো বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ যথাক্রমে

$S + O_2 \rightarrow SO_2$ $\qquad$ $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$
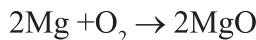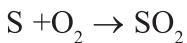
আবার যদি কোনো বড়ো বনের শুকনো গাছে গাছে ঘষা লেগে দাবানল সৃষ্টি হয় তবে গাছের দেহে থাকা নানা উপাদান পুড়ে CO_2, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস উৎপন্ন হয়ে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। কয়লা বা কাঠ পোড়ানোর সময় CO, CO_2, জলীয় বাষ্প ছাড়াও অন্যান্য গ্যাস যথা SO_2, N_2 ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এইসময় বিক্রিয়ায় কোনো যৌগের বা বিভিন্ন যৌগের মিশ্রণের সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হয়।

এগুলোকে জারণ (Oxidation) বলা হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ধাতু বা অধাতু অক্সিজেনের সঙ্গে দহন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে অক্সাইড যৌগে পরিণত হয়। কোনো মৌলের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হবার বিক্রিয়াকেই আমরা জারণ বলে থাকি। দহনও এক ধরনের জারণ বিক্রিয়া—তা প্রাকৃতিকভাবেও হতে পারে, আবার মনুষ্যসৃষ্টও হতে পারে।

বিভিন্ন ধাতু যে সমস্ত আকরিক থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে বের করা হয়, সেই আকরিকগুলোর অনেকগুলোই ওই সমস্ত ধাতুর অক্সাইড যৌগ। এই সমস্ত অক্সাইড যৌগ পৃথিবীতে অক্সিজেন গ্যাস উৎপত্তির পরেই হয়তো উৎপন্ন হয়েছিল। তাহলে দেখো জারণ বিক্রিয়া একটা খুবই সাধারণ ও স্বাভাবিক বিক্রিয়া। জীবদেহেও খাবারের সরলতম উপাদান শ্বসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।

খোলা বাতাসে লোহা পড়ে থাকলে তার গায়ে একটা লালচে বাদামি আস্তরণ পড়ে যায়। একে আমরা মরচে বলি। লোহার মরচে পড়া একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া। একটা সাধারণ পরীক্ষা করে দেখো, মরচে পড়ার জন্য কী কী পদার্থের উপস্থিতি একান্তভাবেই প্রয়োজন।

হাতেকলমে

তিনটি কাচের গ্লাসের প্রথমটায় কয়েকটা চকচকে লোহার পেরেক খোলা বাতাসে রেখে দাও। দ্বিতীয় গ্লাসে সাধারণ জল এমনভাবে ঢালো যাতে পেরেকগুলো জলে ডুবে থাকে। অন্য একটা পাত্রে বেশ কিছুক্ষণ ধরে জল নিয়ে ফোটাও। তারপর সেই ফোটানো জল তৃতীয় গ্লাসটায় একইভাবে ঢালো। এবার মোম গলিয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্লাসের জলের ওপর ঢেলে এমন একটা স্তর তৈরি করো যাতে কোথাও ফাঁক না থাকে।

কয়েকদিন পর তিনটে গ্লাসের মধ্যে লোহার পেরেকের কেমন পরিবর্তন লক্ষ করছ তা লেখো।

কোন গ্লাসে	কেমনভাবে পেরেক আছে	কী পরিবর্তন ঘটতে দেখছ
প্রথম গ্লাসে		
দ্বিতীয় গ্লাসে		
তৃতীয় গ্লাসে		

তৃতীয় গ্লাসে জল ঢালার আগে জলটাকে বেশ কিছুক্ষণ ফোটানো হয়েছিল। জলের মধ্যে বেশ কিছুটা অক্সিজেন গুলে থাকে এটা তো আমরা জানি (এই অক্সিজেনই জলজ উদ্ভিদ বা জলে বসবাসকারী প্রাণীদের বাঁচতে সাহায্য করে)। কিন্তু জল ফোটাবার ফলে কী হলো?

যেহেতু ওপরের পরীক্ষায় তৃতীয় গ্লাসের জলের মধ্যে গুলে থাকা অক্সিজেন ছিল না, তাই এই গ্লাসের পেরেকের গায়ে মরচে পড়েনি। ওপরের পরীক্ষা থেকে স্পষ্ট যে, মরচে গঠনের জন্য শুধু লোহা আর জল উপস্থিত থাকলেই হবে না। অক্সিজেনও প্রয়োজন। আবার বিক্রিয়াটাতে জলের প্রয়োজন হলেও তা লোহার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়নি। এই বিক্রিয়ায় লোহার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছে অক্সিজেন।

এরকম বিক্রিয়া যেখানে কোনো মৌল বা যৌগের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয় তাকে জারণ বলা হয়।

- মৌলের সঙ্গে অক্সিজেন যোগ হওয়া : $2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$
  কপার → কিউপ্রিক অক্সাইড
- যৌগের সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হওয়া : $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$
  কার্বন মনোক্সাইড → কার্বন ডাইঅক্সাইড

আবার কোনো বিক্রিয়ায় অক্সিজেনের পরিবর্তে ক্লোরিন যুক্ত হওয়াকেও জারণ বলা হয়।

$$2Fe + 3Cl_2 \rightarrow 2FeCl_3$$

আয়রন → ফেরিক ক্লোরাইড

সমস্ত জারণ বিক্রিয়াতেই যে অক্সিজেন বা ক্লোরিনের মতো মৌল যুক্ত হয়েছে তা দেখা যায় না। তাই বিকল্প হিসাবে বলা হয় যদি কোনো পদার্থ থেকে হাইড্রোজেনের অপসারণ ঘটে তবে সেই বিক্রিয়াটিও একটি জারণ বিক্রিয়া। যেমন—ক্লোরিন জলের মধ্যে দিয়ে পচা ডিমের গন্ধবিশিষ্ট হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস (H_2S) পাঠানো হলে দ্রবণটা ঘোলা হয়ে কিছুটা সালফার থিতিয়ে পড়ে বা অধঃক্ষিপ্ত হয়।

$$H_2S + Cl_2 \rightarrow 2HCl + S\downarrow$$
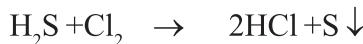
এই সমীকরণ থেকে স্পষ্ট যে হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে হাইড্রোজেন বেরিয়ে গিয়ে সালফার উৎপন্ন হয়েছে। তাই বলা হয় এক্ষেত্রে H_2S-এর জারণ ঘটেছে।

তাহলে জারণের বিপরীত প্রক্রিয়া যাকে বিজারণ বলা হয়, দেখা যাক সেটা কী ধরনের বিক্রিয়া।

কালো রঙের উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের ওপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস পাঠালে অবশেষ হিসাবে লালচে বাদামি রঙের ধাতব কপার পাওয়া যায়।

$$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$$
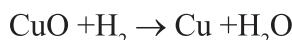
বোঝা যাচ্ছে যে, কিউপ্রিক অক্সাইড থেকে অক্সিজেন বেরিয়ে গিয়ে কপার উৎপন্ন হয়েছে। এরকম বিক্রিয়ায় যাতে কোনো যৌগ থেকে অক্সিজেন অপসারিত হয় তাকে বিজারণ (Reduction) বলা হয়।

বিজারণ বিক্রিয়ায় যে সবসময়েই অক্সিজেনের অপসারণ ঘটবে তা নয়। তাই অন্যভাবে বলা হয় যেসব বিক্রিয়ায় কোনো মৌলের বা যৌগের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয় তাদের বিজারণ বিক্রিয়া বলে। যেমন—লোহাচুর অনুঘটকের উপস্থিতিতে (550°C) উষ্ণতা ও 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে নাইট্রোজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$
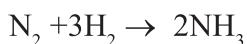
এই বিক্রিয়ায় নাইট্রোজেনের বিজারণের ফলে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। পরের পৃষ্ঠায় কয়েকটা বিক্রিয়ার সমীকরণ দেওয়া হলো। ওপরের পদ্ধতিতে কোন পদার্থের জারণ ঘটেছে ও কোন পদার্থের বিজারণ হয়েছে তা চিহ্নিত করো।

বিক্রিয়ার সমীকরণ	কোন পদার্থের জারণ হয়েছে	কোন পদার্থের বিজারণ হয়েছে	কোন যুক্তিতে তুমি জারণ বা বিজারণ বলবে
i) $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$ ii) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$			
iii) $ZnO + C \rightarrow Zn + CO$			
iv) $2FeCl_3 + H_2S \rightarrow 2FeCl_2 + 2HCl + S$			
v) $FeO + H_2 \rightarrow Fe + H_2O$			
vi) $Fe_2O_3 + Al \rightarrow Fe + Al_2O_3$			

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্ত বিক্রিয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে— যে পদার্থের জারণ ঘটেছে তা অন্য পদার্থকে বিজারিত করেছে। তাই প্রথম পদার্থকে বিজারক বলা হয়। আবার যে পদার্থের বিজারণ ঘটেছে তা অন্য পদার্থকে জারিত করেছে। এরকম পদার্থকে বলা হয় জারক। আরো একটা বিষয় এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সবসময়েই একইসঙ্গে ঘটে। কিন্তু শুধু অক্সিজেন (বা ক্লোরিন) অথবা হাইড্রোজেন সংযোগ বা অপসারণ থেকেই সব জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করা কি সম্ভব?

হাতেকলমে

একটা ছোটো কাচের গ্লাসে (বা বিকারে) কিছুটা তুঁতের জলীয় দ্রবণ নাও। তার মধ্যে একটা মাঝারি মাপের চকচকে লোহার পেরেক ডুবিয়ে দাও। কিছু পরে কী দেখতে পেলে তা নীচে লেখো।
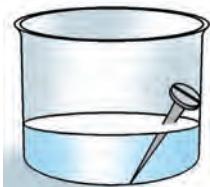
কী করলে	কী দেখতে পেলে

কিছুক্ষণ পরে তুঁতের দ্রবণে ডোবানো পেরেকটা শুকিয়ে নিয়ে ভালো করে লক্ষ করলে দেখতে পাবে পেরেকের যতটা অংশ তুঁতের দ্রবণে ডোবানো ছিল সেই অংশে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে। অন্য পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় লোহার পেরেকের ওপর পড়া লালচে বাদামি আস্তরণটা ধাতব কপারের বা তামার। আবার এও প্রমাণ করা যাবে যে বিক্রিয়ার পরে পাওয়া দ্রবণে ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) উপস্থিত।

আমরা জানি যে ধাতব কপার তৈরি হয় কপার (Cu) পরমাণু দিয়ে, আর লোহা তৈরি হয় লোহার (Fe) পরমাণু দিয়ে। তাহলে দেখা যাক বিক্রিয়ার আগে কী কী ছিল, আর বিক্রিয়ার পরে কী কী পাওয়া গেল।

বিক্রিয়ার আগে	বিক্রিয়ার পরে
(i) দ্রবণে ছিল : কিউপ্রিক আয়ন (Cu^{2+})	(i) পেরেকের ওপর পড়া আস্তরণে আছে : Cu পরমাণু
(ii) লোহার পেরেকে ছিল : Fe পরমাণু	(ii) দ্রবণে তৈরি হয়েছে : ফেরাস আয়ন (Fe^{2+})

তাহলে এখানে কী কী মূল বিক্রিয়া ঘটেছে?

(i) $Cu^{2+} \rightarrow Cu$ আর (ii) $Fe \rightarrow Fe^{2+}$

এই বিক্রিয়া দুটোতেই বাঁদিক ও ডানদিক সংখ্যাগতভাবে Cu বা Fe-এর কোনো তফাত নেই। কিন্তু একটা জিনিস এখনও সমতায় নেই— তা হলো চার্জ বা আধান।

যদি প্রথম বিক্রিয়ার বাঁদিকে 2 টো ইলেকট্রন ও দ্বিতীয় বিক্রিয়ার ডানদিক 2 টো ইলেকট্রন যোগ করা হয় তবেই বিক্রিয়া দুটোর চার্জ বা আধানের সমতা আসবে। অর্থাৎ সমতাযুক্ত সমীকরণ দুটো হলো :

(i) $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ এবং (ii) $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ (e^- দিয়ে ইলেকট্রন বোঝানো হয়েছে)

মনে রেখো : কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াতেই ইলেকট্রন সৃষ্টি বা ধ্বংস হতে পারে না। তাই বিক্রিয়ার আগে ও পরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যা বা চার্জ সমান থাকতে হবে। বিক্রিয়ার সমীকরণের উপযুক্ত দিকে '+' চিহ্ন দিয়েই শুধু ইলেকট্রন লেখা হয়।

ওপরের বিক্রিয়া দুটোকে একটু অন্যভাবে বলা যায়— Fe পরমাণু দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) উৎপন্ন করেছে, আর কিউপ্রিক আয়ন (Cu^{2+}) দুটো ইলেকট্রন নিয়ে Cu পরমাণুতে পরিণত হয়েছে।

এই ধরনের বিক্রিয়াকেও জারণ-বিজারণ বলা যেতে পারে, যেখানে জারণের অর্থ ইলেকট্রন ত্যাগ ও বিজারণের অর্থ হলো ইলেকট্রন গ্রহণ; তাহলে ওপরের বিক্রিয়ায় জারণ ঘটেছে Fe পরমাণুর এবং বিজারণ ঘটেছে Cu^{2+}-এর।

কিন্তু সব জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াতেই সবসময় পরমাণু ও তার থেকে তৈরি হওয়া আয়নের মধ্যেই ইলেকট্রনের দেওয়া-নেওয়া ঘটবে তা নয়। এই ইলেকট্রন আদান-প্রদানের ফলে আরো কী কী ঘটনা ঘটা সম্ভব তার কয়েকটা দেখা যাক।

(a) অপেক্ষাকৃত কম ধনাত্মক আয়ন বা মূলক (ক্যাটায়ন) $\xrightarrow[\text{ইলেকট্রন ত্যাগ করলে}]{\text{এক বা একাধিক}}$ অপেক্ষাকৃত বেশি ধনাত্মক আয়ন বা মূলক

যেমন— $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ $\qquad$ $Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+} + 2e^-$

(b) অপেক্ষাকৃত কম ঋণাত্মক আয়ন বা মূলক (অ্যানায়ন) $\xrightarrow[\text{ইলেকট্রন গ্রহণ করলে}]{\text{এক বা একাধিক}}$ অপেক্ষাকৃত বেশি ঋণাত্মক আয়ন বা মূলক

যেমন— $O^- + e^- \rightarrow O^{2-}$ $\qquad$ $MnO_4^- + e^- \rightarrow MnO_4^{2-}$
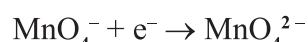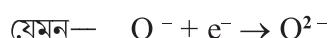
একইভাবে নীচের সারণিতে দেওয়া বিক্রিয়াগুলোতে কী কী ঘটছে তা বলো। কোনটা জারণ আর কোনটা বিজারণ তা লেখো।

বিক্রিয়ার সমীকরণ	কী ঘটছে জারণ না বিজারণ
(i) $Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$ (ii) $Cl^- \rightarrow Cl + e^-$ (iii) $MnO_4^{2-} \rightarrow MnO_4^- + e^-$ (iv) $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	

হাতেকলমে

তুঁতের জলীয় দ্রবণে কয়েকটা জিঙ্কের (দস্তার) টুকরো ফেলে দিলে কিছুক্ষণ পর জিঙ্কের টুকরোর রুপোলি বা ধূসর রঙের গায়ে লালচে বাদামি রঙের ছোপ পড়তে দেখা যায়।

এই পরীক্ষায় উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে দুটো জিনিস অন্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায়:
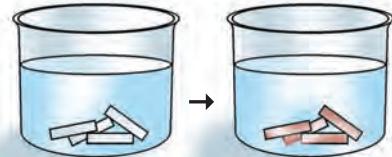
(i) জিঙ্কের ওপর জমা হওয়া আস্তরণটা ধাতব কপারের।

(ii) দ্রবণের মধ্যে জিঙ্ক আয়ন (Zn^{2+}) তৈরি হয়েছে।

ওপরের দুটো তথ্য থেকে এই বিক্রিয়ায় কী কী ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে নীচের সারণিতে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

প্রধান দুটি বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো	কোনটা জারণ ও কোনটা বিজারণ চিহ্নিত করো

একটা কাচের বিকারে বা টেস্টটিউবে সালফিউরিক অ্যাসিডের পাতলা জলীয় দ্রবণ নিয়ে কয়েক টুকরো জিঙ্কের ছিবড়ে ওই দ্রবণের মধ্যে ফেলে দিলে কী দেখা যাবে?

H_2 গ্যাসের বুদবুদ

অ্যাসিড দ্রবণ

জিঙ্কের ছিবড়ে

বর্ণহীন, গন্ধহীন একটা গ্যাস জিঙ্কের টুকরোর গা থেকে বুদবুদ আকারে বেরিয়ে আসছে। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে এই উৎপন্ন গ্যাসটা হলো হাইড্রোজেন। আবার উৎপন্ন দ্রবণ নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার মধ্যে জিঙ্ক আয়ন (Zn^{2+}) আছে।

এখানে অ্যাসিড দ্রবণে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) [আসলে হাইড্রক্সোনিয়াম আয়ন (H_3O^+)] থেকেই হাইড্রোজেন গ্যাস H_2 উৎপন্ন হয়েছে। আবার ধাতব জিঙ্কের টুকরোয় থাকা Zn পরমাণু থেকে দ্রবণ জিঙ্ক আয়ন (Zn^{2+}) এসেছে। তাহলে এখানে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমীকরণ দুটো কী কী?

বিজারণ বিক্রিয়া : $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$ জারণ বিক্রিয়া : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

হলুদ রং-এর ফেরিক ক্লোরাইড ($FeCl_3$) দ্রবণে বর্ণহীন স্ট্যানাস ক্লোরাইড ($SnCl_2$) দ্রবণ যোগ করলে খুব ফিকে সবুজ রং-এর ফেরাস ক্লোরাইড ($FeCl_2$) দ্রবণ উৎপন্ন হয়। একইসঙ্গে স্ট্যানিক ক্লোরাইড ($SnCl_4$) উৎপন্ন হয়।

$$2FeCl_3 + SnCl_2 \rightarrow 2FeCl_2 + SnCl_4$$

এই বিক্রিয়াটিতে শুধু ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়নগুলোরই আধানের (চার্জের) পরিবর্তন ঘটে। তাই বিক্রিয়াটিকে যদি নীচের মতো করে লেখা যায় —

$$2Fe^{3+} + Sn^{2+} \rightarrow 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$$

তাহলে এই বিক্রিয়ায় ফেরিক আয়ন (Fe^{3+}) একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে ফেরাস আয়নে (Fe^{2+}) পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ ফেরিক আয়নের বিজারণ ঘটেছে।

$$2Fe^{3+}+2e^{-} \rightarrow 2Fe^{2+}$$

আবার স্ট্যানাস আয়ন (Sn^{2+}) দুটো ইলেকট্রন ত্যাগ করে স্ট্যানিক আয়নে (Sn^{4+}) পরিণত হয়েছে। তাই এই বিক্রিয়ায় স্ট্যানাস আয়নের জারণ ঘটেছে।

$$Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+}+2e^{-}$$

এই বিক্রিয়ায় তাহলে জারক-বিজারক কী করে চেনা যাবে?

যে পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে অর্থাৎ নিজে বিজারিত হয়েছে, সেই পদার্থটা হলো জারক। আর যে পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে তা নিজে জারিত হয়েছে। সেই পদার্থটা হলো বিজারক। তাহলে ওপরের বিক্রিয়ায় ফেরিক ক্লোরাইড (আরো ভালোভাবে বললে Fe^{3+}) হলো জারক, আর স্ট্যানাস ক্লোরাইড (অর্থাৎ তার মধ্যে থাকা Sn^{2+}) হলো বিজারক।

এতক্ষণ পর্যন্ত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া চেনা ও তার বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হলো তার থেকে সাধারণভাবে লেখা যায়—

জারণ

(i) অক্সিজেন (অথবা ক্লোরিন) যুক্ত হওয়া
(ii) হাইড্রোজেন বেরিয়ে যাওয়া
(iii) কোনো মৌলের পরমাণু বা আয়ন বা কোনো মূলক থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়া

এবং

বিজারণ

(i) অক্সিজেন (অথবা ক্লোরিন) বেরিয়ে যাওয়া
(ii) হাইড্রোজেন যুক্ত হওয়া
(iii) কোনো মৌলের পরমাণু বা আয়ন বা কোনো মূলকে ইলেকট্রন যুক্ত হওয়া

তাহলে জারক ও বিজারক পদার্থ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বলা যায় যে—

জারক পদার্থ

(i) কোনো পদার্থে অক্সিজেন (অথবা ক্লোরিন) যুক্ত করে
(ii) কোনো পদার্থ থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ করে
(iii) কোনো পরমাণু বা আয়ন বা মূলক থেকে ইলেকট্রন অপসারণ করে

এবং

বিজারক পদার্থ

(i) কোনো পদার্থ থেকে অক্সিজেন (অথবা ক্লোরিন) অপসারণ করে
(ii) কোনো পদার্থে হাইড্রোজেন যুক্ত করে
(iii) কোনো পরমাণু বা আয়ন বা মূলকে ইলেকট্রন যুক্ত করে

পরের পৃষ্ঠায় কতকগুলো বিক্রিয়ার সমীকরণ দেওয়া আছে। তা থেকে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া ও জারক-বিজারক চিহ্নিত করো। প্রতিক্ষেত্রে ওপরের কোন ধারণাটির সাহায্য তুমি নিলে তা লেখো।

বিক্রিয়ার সমীকরণ	জারণ বিক্রিয়া	বিজারণ বিক্রিয়া	জারক	বিজারক	কোন ধারণার সাহায্যে এমন বলা যায়
(i) $H_2S + 2FeCl_3 \rightarrow 2HCl + S + 2FeCl_2$					
(ii) $2Na + H_2 \rightarrow 2NaH$	$2Na \rightarrow 2Na^+ + 2e^-$	$H_2 + 2e^- \rightarrow 2H^-$			
(iii) $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$					
(iv) $FeO + CO \rightarrow Fe + CO_2$					
(v) $FeSO_4 + Zn \rightarrow ZnSO_4 + Fe$					

জারক ও বিজারক দ্রব্য

বহু প্রাচীন যুগের শিল্পীরা যাঁরা মৃৎপাত্র তৈরির যুগ থেকে কালক্রমে ধাতুর পাত্র তৈরির কৌশল রপ্ত করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীগণ যাঁরা ধাতুর আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতেন এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ধাতুর আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা বিজারণ প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। অতি পুরোনো দিনে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার এত উন্নতি হয়নি। তাই মনে করা হয় এই সমস্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়া যাঁরা রপ্ত করেছিলেন তাঁদের জারক-বিজারক দ্রব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা, অন্তত হাতেকলমে হলেও, ছিল।

আমরা জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার সময় দেখেছি যে, কোনো পদার্থ জারিত হলে তা অন্য পদার্থকে বিজারিত করে। একইভাবে কোনো পদার্থ বিজারিত হলে তার বিজারণের জন্য দায়ী পদার্থটি (বিজারক দ্রব্য) জারিত হয়।

অর্থাৎ জারণের সময় জারক দ্রব্য নিজে বিজারিত হয় এবং বিজারণের সময় বিজারক দ্রব্য নিজে জারিত হয়।

নীচের বিক্রিয়াগুলো থেকে এই বিষয়টা সহজেই বোঝা যায়।

(i) উত্তপ্ত কালো রং-এর কিউপ্রিক অক্সাইডের ওপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে কিউপ্রিক অক্সাইড বিজারিত হয়ে লাল ধাতব কপারে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেন জারিত হয়ে জল উৎপন্ন করে।
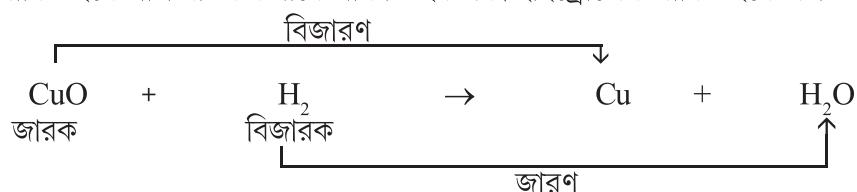
(ii) কালো রঙের কঠিন ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণের বিক্রিয়া করালে HCl জারিত হয়ে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ক্লোরিন গ্যাস বেরিয়ে আসে। আর ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড বিজারিত হয়ে ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

বিজারণ

$$\underset{\text{জারক}}{MnO_2} + \underset{\text{বিজারক}}{4HCl} \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$$

জারণ
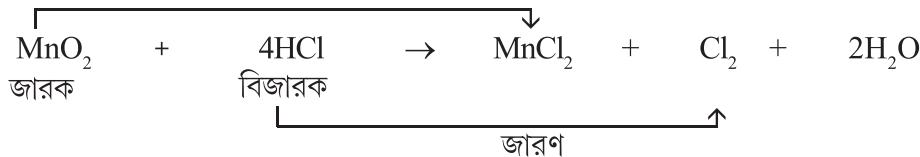
(iii) বর্ণহীন তরল হাইড্রোজেন ব্রোমাইডের মধ্য দিয়ে ঝাঁঝালো ক্লোরিন গ্যাস পাঠালে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড জারিত হয়ে লাল রং-এর তরল ব্রোমিনে পরিণত হয়। আর ক্লোরিন বিজারিত হয়ে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন করে।

বিজারণ

$$\underset{\text{জারক}}{Cl_2} + \underset{\text{বিজারক}}{2HBr} \rightarrow 2HCl + Br_2$$

জারণ
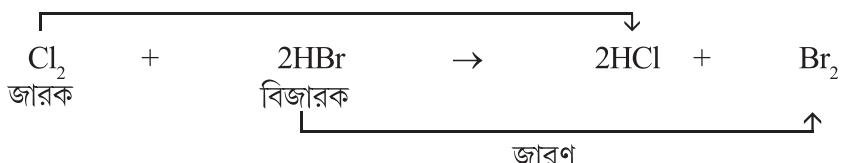
ওপরের উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট যে জারক বা বিজারক মৌলিক পদার্থও হতে পারে অথবা যৌগিক পদার্থও হতে পারে। এই উদাহরণগুলোতে যেসব জারক-বিজারক পদার্থের কথা জানলে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচে লেখো।

জারক না বিজারক	নাম ও সংকেত	মৌলিক না যৌগিক পদার্থ

এমন আরও অনেক জারক-বিজারক পদার্থের উদাহরণ পাওয়া যাবে যারা নিজেদের ধর্ম অনুসারে প্রকৃতিতে, এমনকি জীবদেহের মধ্যেও বিক্রিয়া করে চলেছে।

এই যে তোমরা খোলা বাতাসে পড়ে থাকা লোহার জিনিসে মরচে পড়তে দেখো, জানো কি তাতে বছরে কত কোটি টাকা নষ্ট হয়? আমরা আগেই জেনেছি যে খোলা হাওয়ায় আর জলের সংস্পর্শে পড়ে থাকতে থাকতেই লোহায় ধীরে ধীরে মরচে ধরে। মরচে হলো জলযুক্ত ফেরিক অক্সাইড ($Fe_2O_3.nH_2O$; n মানে জলের অণুর সংখ্যা, যা নির্দিষ্ট নয়)। মরচে ধরার সময় লোহার জারণ ঘটে; প্রথমে ফেরাস আয়ন (Fe^{2+}) ও পরে আরো জারণ ঘটে ফেরিক আয়ন (Fe^{3+}) উৎপন্ন হয়। আমরা দেখেছি যে কোনো বিক্রিয়ায় শুধু জারণ
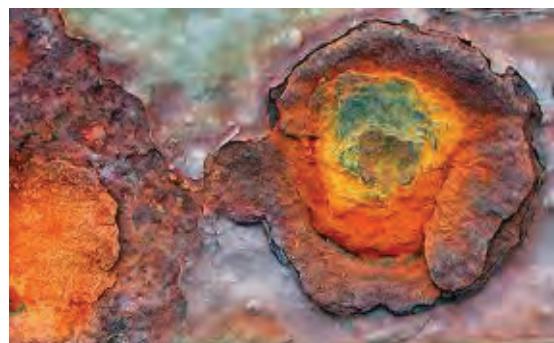
ঘটে না। তার সঙ্গে বিজারণও ঘটে। তাহলে এখানে বিজারণ বিক্রিয়াটা কী? মরচে ধরার সময় দুটো বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে:

(1) জলের হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) বিজারণে H_2 গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং

(2) অক্সিজেন গ্যাসের বিজারণে জল তৈরি হয়।

মরচে ধরা আটকাতে কী কী করা হয়?

- লোহার উপরে তেল রং বা আলকাতরার প্রলেপ দিলে লোহা জল ও বাতাসের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ফলে সহজে মরচে ধরে না।
- লোহার উপরে জিঙ্কের আস্তরণ দিলে জিঙ্ক লোহার মরচে ধরায় বাধা দেয়। এই পদ্ধতিকেই গ্যালভানাইজেশন বলে।

অনেকদিন পড়ে থাকা নারকেল তেল বা সরষের তেলের গন্ধ শুঁকে দেখেছ কখনও? সাধারণ কথায় আমরা বলি 'তেলচিটে গন্ধ বেরোচ্ছে।' এই গন্ধ হয় তেলের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া কিছু যৌগের জন্য। এই ঘটনাও একধরনের জারণ। অবশ্য, বাতাসের জলীয় বাষ্পও তেলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং তা থেকে উৎপন্ন পদার্থও 'তেলচিটে' গন্ধের জন্য দায়ী।

কোনো কোনো ফল যেমন আপেল, ডাব কেটে রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যে তার কাটা অংশে বাদামি ছোপ ধরে। নীচের ছবি দুটো ভালো করে লক্ষ করো। এই বিক্রিয়াগুলো ফলের মধ্যে থাকা কিছু কিছু জৈব যৌগের জারণ। অনেক সময় ফলের মধ্যে থাকা কিছু উৎসেচক অক্সিজেনের সাহায্যে বিশেষ কিছু জৈব যৌগের জারণ ঘটায়। তার ফলেই ওই বাদামি ছোপ ধরে।
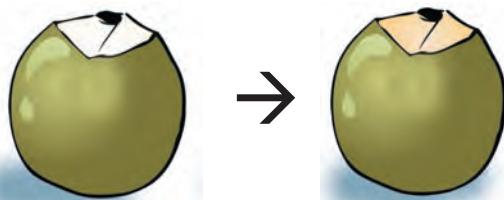
ডাবের কাটা মুখে বাদামি ছোপ ধরছে

কাটা আপেলে বাদামি ছোপ ধরছে

নীচের ছবিগুলোতে তোমার চেনা দুটো দৃশ্য দেখতে পাচ্ছো। এর সঙ্গে জারণ-বিজারণের সম্পর্ক কোথায়?

তড়িতের রাসায়নিক প্রভাব

তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ লেপন

কারা তড়িতের পরিবাহী ?

হাতেকলমে বিভিন্ন বস্তুর তড়িৎ পরিবাহিতা কেমন তা বোঝার জন্য ধাতু-অধাতুর তড়িৎ পরিবাহিতা ধর্ম পরীক্ষা করার জন্য একটা সহজ বর্তনী পরীক্ষক বা টেস্টার তৈরি করার পদ্ধতি আমরা জেনেছি।

হাতেকলমে

আগের তৈরি টেস্টারের খোলা তারের দু-প্রান্ত এবার তোমার চেনা কয়েকটা কঠিন পদার্থে তৈরি জিনিসের দু-প্রান্তে স্পর্শ করে দেখো তারা কতটা পরিবাহী। যখন বালব জ্বলবে তখন বুঝতে পারবে ওই বস্তুটার মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। অর্থাৎ, বস্তুটা তড়িতের সুপরিবাহী। আর যখন বালব জ্বলবে না তখন বোঝা যাবে যে ওই বস্তুর মধ্যে দিয়ে তড়িৎ সহজে যেতে পারে না অর্থাৎ ওই বস্তু তড়িতের কুপরিবাহী বা অন্তরক।
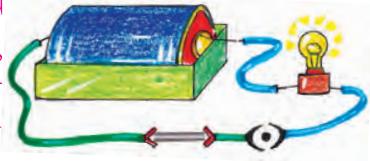
তোমার তৈরি টেস্টার ব্যবহার করে নীচের বস্তুগুলোর পরিবাহিতা সম্বন্ধে তোমার ধারণা নীচে লেখো।

টেস্টারে স্পর্শ করা বস্তুর নাম	টেস্টারের বালব জ্বলছে, না জ্বলছে না	বস্তুটার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ যেতে পারে কী	বস্তুটা তড়িতের সুপরিবাহী না কুপরিবাহী
কাগজের টুকরো			
পাথর বা ইটের টুকরো			
কাঠের টুকরো			
রাবার বা ইরেজার			
লোহার পেরেক			

তোমরা লক্ষ করে থাকবে যখন ইলেকট্রিকের মিস্ত্রিরা চালু লাইনে কাজে করেন, তখন বাঁশ বা কাঠের সিঁড়িতে অথবা কোনো কাঠের জিনিসের ওপর দাঁড়িয়ে কাজটা করেন। তাঁরা কেন এমন করেন বলে মনে হয়?

এভাবে পরীক্ষা করে তুমি বিভিন্ন কঠিন বস্তুর তড়িৎ পরিবাহিতা কেমন তা বুঝতে পারবে। কিন্তু তরল পদার্থের পরিবাহিতাও কি একইভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব?

একটু খেয়াল করলেই দেখবে তোমাদের বাড়ির বড়োরা ভিজে হাতে ইলেকট্রিকের সুইচ বা কোনো জিনিসে হাত দিতে বারণ করেন। আবার কোনো সময়ে তুমি যদি ভুল করে ভিজে হাত দিয়েও থাকো সামান্য শক লেগেছে এমন অভিজ্ঞতাও তোমাদের থাকতে পারে। তাহলে জল কি কোনোভাবে সামান্য হলেও তড়িৎ পরিবহণ করে?

এমন প্রশ্ন তোমাদের মনে আসাই স্বাভাবিক। জল বা অন্য তরলের তড়িৎ পরিবাহিতা তোমার তৈরি টেস্টারের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখো। তবে এবারে কিন্তু একটা সাধারণ সেল নিলে হবে না। দুটো বা তিনটে সেলের একটা ব্যাটারি নিতে হবে পরীক্ষার জন্য। এই ধরনের পরীক্ষা বাড়ির ইলেকট্রিকের লাইন থেকে অথবা ইনভার্টার থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে কখনোই করতে যাবে না।

হাতেকলমে

একটা বড়োমুখের প্লাস্টিকের বোতলের ঢাকনা নাও। তার মধ্যে কিছুটা ছেঁকে নেওয়া পাতিলেবুর রস বা ভিনিগার নাও। তারপর তোমার তৈরি টেস্টারের খোলা তার দুটোর প্রান্ত ওই লেবুর রস বা ভিনিগারের মধ্যে ডোবাও। এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।
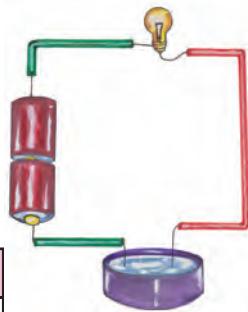
কী দেখলে	তরলটা তড়িতের ভালো পরিবাহী, না তা নয়

কোনো তরল যদি তড়িতের সুপরিবাহী না হয়ে, কম মাত্রায় পরিবাহী হয় তবে তোমার তৈরি টেস্টারের দুটো খোলা প্রান্তের মধ্যের তরলের মধ্যে দিয়ে কম পরিমাণে তড়িৎ যাবে। কিন্তু আমরা জানি তড়িতের প্রভাবেই বালবের ফিলামেন্টটা গরম হয়ে আলো জ্বলে। কম মাত্রায় তড়িৎ গেলে বালব জ্বলবে না । তার অর্থ এই নয় যে তরলটার মধ্যে দিয়ে তড়িত প্রবাহিত হচ্ছে না। এই অসুবিধা দূর করে আমরা কীভাবে কোনো তরল কম মাত্রায় তড়িতের পরিবাহী হলেও বুঝতে পারব?

একটা উপায় হলো তোমার তৈরি টেস্টারে বালবের বদলে টর্চে ব্যবহারের উপযুক্ত LED ব্যবহার করা। কারণ কম তড়িৎ প্রবাহিত হলেও LED জ্বলতে পারে।
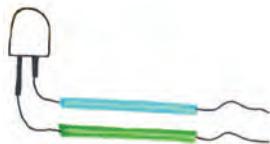
তবে সামান্য বিদ্যুৎ যদি তারের মধ্যে দিয়ে যায় তা কিন্তু LED লাগানো টেস্টার দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। তখন তাহলে কী করা হবে?

যে তারের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ যাচ্ছে বলে পরীক্ষা করতে হবে, বর্তনীতে যুক্ত অবস্থায় ওই তারকে দু-হাত দিয়ে একটু উঁচু করে ধরো। তারপর উত্তর-দক্ষিণ বরাবর স্থির হয়ে থাকা একটা চুম্বক শলাকার ওপর তারটা ধরো। যদি ওই তারের মধ্যে দিয়ে একটুও তড়িৎ প্রবাহিত হয় তবে ওই তারের চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। আর তার প্রভাবে চুম্বক শলাকাটা তার স্থির অবস্থা থেকে একটু হলেও সরে যাবে অর্থাৎ শলাকাটার বিক্ষেপ হবে। এভাবেই একটা প্লাস্টিকের বোতলের ঢাকনিতে বিভিন্ন তরল নিয়ে

তাদের পরিবাহিতা পরীক্ষা করো। যা দেখতে পেলে তা নীচের সারণিতে লেখো।
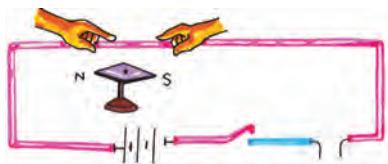
তরলের নাম	শলাকার বিক্ষেপ কেমন	তরলটা তড়িতের খুব বেশি পরিবাহী, না পরিবাহিতা কম
(i) পাতিলেবুর রস		
(ii) পানীয় জল		
(iii) ভিনিগার দ্রবণ		
(iv) নারকেল তেল		
(v) মধু		

হাতেকলমে

একটা প্লাস্টিকের বোতলের ঢাকনি নিয়ে তার মধ্যে দু-চামচ পাতিত জল নাও। (যদি স্কুলে না পাও তবে ডাক্তারখানা বা ওষুধের দোকান থেকেও জোগাড় করতে পারো এই জল)। এরপর তোমার তৈরি টেস্টারের দু-প্রান্ত ওই জলের মধ্যে ডোবাও । চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ ঘটেছে কিনা লক্ষ করো। তারপর ওই জলের মধ্যে এক চিমটে খাবার নুন মিশিয়ে একইভাবে ওই দ্রবণের তড়িৎ পরিবাহিতা পরীক্ষা করো। এই কাজে ওপরের মতোই চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ দেখে তোমার পর্যবেক্ষণ লেখো।

কোন তরলের	পরিবাহিতা কেমন
পাতিত জল	
পাতিত জলে নুনের দ্রবণ	
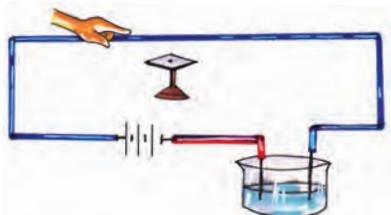
ওপরের পরীক্ষা থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে নুন মেশানো পাতিত জল তড়িতের সুপরিবাহী। যে-কোনো উৎস থেকে পাওয়া জলেও একাধিক লবণ বা ধাতব যৌগ মিশে থাকে, যেগুলো পানীয় জলকে তড়িৎ পরিবাহী করে তুলতে সাহায্য করে। আবার পানীয় জলে মিশে থাকা এইসব খনিজ পদার্থ আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়। তাছাড়াও, খাবার নুনের মাধ্যমেও আমরা একাধিক লবণ গ্রহণ করি। তাহলে আমাদের শরীর কেমন হবে — তড়িতের সুপরিবাহী না কুপরিবাহী?

এই কারণেই ভিজে হাতে বা খালি পায়ে ভিজে মেঝেতে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিকচালিত জিনিসপত্র বা সুইচবোর্ডে হাত দিলে শক লাগার সম্ভাবনা থাকে।

তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎ বিশ্লেষ্য

তোমরা জেনেছ যে সালফিউরিক অ্যাসিড-মেশানো জলের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালে জল বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন গ্যাস তৈরি হয় ($2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$)। তোমরা এও জেনেছ যে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠানো যায়। গলিত অবস্থায় বা দ্রবণে কোনো পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটানোর নাম তড়িৎ বিশ্লেষণ (electrolysis)। তড়িৎ বিশ্লেষণ আমাদের অনেক কাজে লাগে, তাই একটু জেনে নেওয়া যাক।

তড়িৎ বিশ্লেষণের গোড়ার কথা

কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যেতে হলে কোনো-না-কোনো আধানযুক্ত কণার চলন হতেই হবে। যেমন ধরো ধাতুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাওয়া মানে হলো ইলেকট্রন চলাচল। কিন্তু অ্যাসিড মেশানো জল বা গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের (NaCl, নুন) মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যায় আয়নদের মাধ্যমে, ইলেকট্রনের মাধ্যমে নয়।

কোনো যৌগ দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম হলে তাকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য বা ইলেকট্রোলাইট (Electrolyte) বলা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষ্যের উদাহরণ হলো অ্যাসিড বা ক্ষার দ্রবণ, কোনো লবণের জলীয় দ্রবণ, গলিত NaCl ইত্যাদি।

কিছু তড়িৎ বিশ্লেষ্য আছে যারা দ্রবণে পুরোটাই আয়ন হয়ে থাকে। এদের বলে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য। উদাহরণ হলো NaCl, KOH, H_2SO_4, $CuSO_4$ ইত্যাদি। আবার কিছু তড়িৎবিশ্লেষ্য আছে যারা দ্রবণে সামান্য মাত্রায় আয়নিত হয় যেমন অ্যাসিটিক অ্যাসিড (CH_3COOH)। এদের বলা হয় মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য।

আমাদের চেনা অনেক জলে দ্রাব্য পদার্থ তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয়। যেমন ধরো চিনি, গ্লুকোজ, অ্যালকোহল ইত্যাদি। আবার জলে দ্রাব্য নয় কিন্তু সহজেই গলিয়ে ফেলা যায় এমন অনেক জিনিস — মোম, মাখন, ঘি— এরাও তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয়। কেন এরা তড়িৎ বিশ্লেষ্য হলো না? কারণ তড়িৎ বিশ্লেষ্য হতে গেলে গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় আয়ন দিতেই হবে। এইসব যৌগেরা কেউই আয়ন দেয় না, তাই এরা তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয়। এরা তড়িৎ অবিশ্লেষ্য (Non-electrolyte)।

নীচের সারণিতে তোমাদের চেনা বেশ কিছু যৌগ এবং জলে গুললে আয়ন দেয় কিনা বলা হলো। তুমি এই তথ্য থেকে কোনটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য আর কোনটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয় তা চিহ্নিত করো ঃ

যৌগের নাম	জলীয় দ্রবণে যৌগগুলি যথেষ্ট আয়ন দেয় কি? যদি দেয় তবে কী কী আয়ন দেয়?	জলীয় দ্রবণ কি তড়িৎ পরিবাহী হওয়া উচিত?	তড়িৎ বিশ্লেষ্য, না তড়িৎ অবিশ্লেষ্য?
সোডিয়াম ক্লোরাইড	হ্যাঁ; Na^+ ও Cl^-	হ্যাঁ	তড়িৎ বিশ্লেষ্য
চিনি	না	না	তড়িৎ অবিশ্লেষ্য
পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড	হ্যাঁ; K^+ ও OH^-		
অ্যালকোহল	না		
অ্যামোনিয়াম সালফেট	হ্যাঁ; NH_4^+ ও SO_4^{2-}		
সালফিউরিক অ্যাসিড	হ্যাঁ; H^+ ও SO_4^{2-}		
পটাশিয়াম নাইট্রেট	হ্যাঁ; K^+ ও NO_3^-		
কপার সালফেট	হ্যাঁ; Cu^{2+} ও SO_4^{2-}		
গ্লুকোজ	না		

তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে তড়িৎ বিশ্লেষ্য যৌগ মানে জলীয় দ্রবণে বা গলিত অবস্থায় যথেষ্ট সংখ্যক আয়ন উৎপন্ন করার ক্ষমতা থাকবে।

তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে হলে কী কী চাই?

প্রথমে নিশ্চয়ই চাই একটা উপযুক্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণ অথবা গলিত তড়িৎ বিশ্লেষ্য। চাই বিদ্যুৎ পাঠাবার জন্য ব্যাটারি, আর দুটো ধাতুর তার (বা ধাতুর পাত বা গ্রাফাইটের রড) যাদের মধ্যে দিয়ে ব্যাটারি থেকে তড়িৎ যাবে। এদের বলা হয় তড়িৎ দ্বার [তড়িৎ দ্বার মানে যার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাবে, ইংরেজিতে 'ইলেকট্রোড' (Electrode)]। তড়িৎ দ্বার দুটোকে দ্রবণে ডুবিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ শুরু করতে হবে। বিদুৎ যাবার জন্য প্লাস্টিকের আস্তরণ দেওয়া তামার তারও চাই।

হাতেকলমে

পাশের ছবির মতো করে ব্যাটারি সংযোগ করো। সামান্য সালফিউরিক অ্যাসিড-মেশানো জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ করার জন্য দ্রবণে তড়িৎ দ্বার দুটো ডোবাও। ব্যাটারির (+) প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত তড়িৎ দ্বারকে অ্যানোড (anode) আর (–) প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত তড়িৎ দ্বারকে

বলে ক্যাথোড (cathode)। একটু পরে দেখতে পাবে যে তড়িৎ দ্বারটা ব্যাটারির (–) প্রান্তের সঙ্গে যেখানে যুক্ত সেখানে বুদবুদ বেরোচ্ছে। এই গ্যাসটা কী? পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় এটা হলো হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2)। ব্যাটারির (+) প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত তড়িৎ দ্বারেও আরেকটা গ্যাসের বুদবুদ তৈরি হচ্ছে। এটা হলো অক্সিজেন।

তাহলে কী হলো : $2H_2O$ (তরল) $\xrightarrow[\text{তড়িৎ}]{}$ $2H_2$ (গ্যাস) + O_2 (গ্যাস)

এই হলো তোমাদের হাতেকলমে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ। তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে বিশুদ্ধ জল নিয়ে এই পরীক্ষা করা হলো না কেন? আসলে বিশুদ্ধ জলে আয়ন সংখ্যা এতই কম যে তা তড়িতের সুপরিবাহী নয়। তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে হলে তাই জলের মধ্যে আয়ন সংখ্যা বাড়াতেই হবে। এই উদ্দেশ্যে জলের সঙ্গে সামান্য ক্ষার (NaOH বা KOH) কিংবা সামান্য অ্যাসিড (H_2SO_4) মেশাতে হয়। এরা তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য, তাই এগুলো মেশালে দ্রবণে আয়নের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। তখন তড়িৎ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় গলিত পদার্থ বা দ্রবণের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ পরিবহণ করে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন গুলো। কোনো সময়েই গলিত অবস্থা বা দ্রবণের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন চলাচল করে না।

জলীয় দ্রবণে থাকা অবস্থায় পদার্থের তড়িৎ পরিবহণ ও তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা আমরা পেয়েছি। কিন্তু গলিত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ কীভাবে তড়িৎ পরিবহণ করে ও তাদের তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটে?

স্বাভাবিক অবস্থায় কঠিন অথচ গলিত অবস্থায় তড়িৎ বিশ্লেষ্য এমন পদার্থের উদাহরণ হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)। এই গলিত NaCl-এর মধ্যে দিয়ে উপযুক্ত তড়িৎ দ্বার ব্যবহার করে তড়িৎ চালনা করলে কী ঘটবে?

NaCl থেকে উৎপন্ন সোডিয়াম (Na^+) ও ক্লোরাইড (Cl^-) আয়নগুলো যথাক্রমে ক্যাথোড ও অ্যানোডের দিকে এগোবে। তারপর তড়িৎ দ্বারের সংস্পর্শে এসে মৌলরূপে মুক্ত হবে।

ক্যাথোডে ঘটা বিক্রিয়া : $Na^+ + e^- \rightarrow Na$ (ধাতু) (বিজারণ)

অ্যানোডে ঘটা বিক্রিয়া : $Cl^- \rightarrow Cl + e^-$ (জারণ)

$2Cl \rightarrow Cl_2$ (গ্যাস)

তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আরও কয়েকটা বিশেষত্ব

(i) লক্ষ করো জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে যেখানে ক্যাথোডে ও অ্যানোডে উৎপন্ন দুটো পদার্থই গ্যাসীয় হয়, সেখানে গলিত NaCl-এর তড়িৎ বিশ্লেষণে তড়িৎ দ্বারে উৎপন্ন পদার্থের মধ্যে একটা ধাতু (গলিত Na) অন্যটা কিন্তু গ্যাস। তাহলে আমরা বলতে পারি যে তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে তড়িৎদ্বারে বিভিন্ন অবস্থা বা প্রকৃতির পদার্থই উৎপন্ন হতে পারে।

(ii) আবার লক্ষ করে দেখো যে গলিত NaCl-এর তড়িৎবিশ্লেষণের জন্য 'উপযুক্ত তড়িৎ দ্বার' শব্দটা সতর্কভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, তড়িৎ দ্বারের প্রকৃতিও অনেকসময় তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। কখনো কখনো তড়িৎ বিশ্লেষণের আগে-পরে তড়িৎ বিশ্লেষ্যের দ্রবণের রং-এর পরিবর্তনও ঘটে যেতে পারে।

যেহেতু ক্যাথোডে ইলেকট্রন গ্রহণ বিক্রিয়া ঘটে তাই ক্যাথোডে বিজারণ ঘটে। আর অ্যানোডে ইলেকট্রন ত্যাগ করার বিক্রিয়া ঘটে, তাই অ্যানোডে জারণ ঘটে।

ওপরে আমরা দেখলাম যে গলিত NaCl-এর তড়িৎ বিশ্লেষণ করে সোডিয়াম ধাতু পাওয়া যায়। এভাবেই
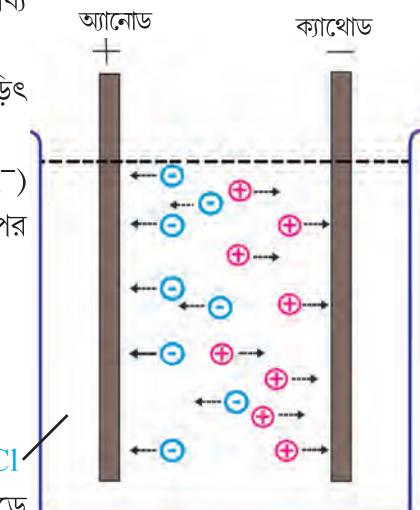
ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম ধাতুও তাদের ক্লোরাইড যৌগ থেকে পাওয়া যায়। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো কীভাবে এই ধাতুগুলো পাওয়া সম্ভব।

তড়িৎ বিশ্লেষ্যের নাম	কোন ধাতু পাওয়া সম্ভব	ক্যাথোডে বিক্রিয়া	অ্যানোডে বিক্রিয়া
গলিত ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড			
গলিত ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড			

গলিত ধাতব যৌগ থেকে ক্যাথোডে ধাতুটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানোডেও একটা প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপন্ন হতে পারে। যেমন — গলিত NaCl- এর তড়িৎ বিশ্লেষণে অ্যানোডে ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2) উৎপন্ন হয়। প্রয়োজনীয় মূল পদার্থের সঙ্গে উৎপন্ন এরকম পদার্থকে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপজাত পদার্থ বলে। এধরনের উপজাত পদার্থও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে অনেকসময়েই রসায়নবিদদের উৎসাহিত করে।

এসো আমরা কোনো কিছু লেখার জন্যে একটা নতুন ধরনের বোর্ড ব্যবহার করি। একটা পাতলা টিনের পাত নাও (সুবিধামতো অন্য ধাতুর পাতও নিতে পারো যা তড়িতের পরিবাহী)। পাতটার ওপর জলের সঙ্গে স্টার্চ (অ্যারারুট) ও পটাশিয়াম আয়োডাইডের একটা লেই তৈরি করে পাতলা করে মাখিয়ে নাও। এবার পাশের ছবির মতো করে একটা ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত তার দিয়ে পাতে যোগ করো। ব্যাটারির অন্য প্রান্তে অন্য একটু শক্ত তার যোগ করে তার খোলা প্রান্তটা পাতটার ওপরের লেইতে স্পর্শ করাও। এরপর ধীরে ধীরে তোমার পছন্দমতো কোনো শব্দ লেখো ওই লেইটার ওপর। কেমন লেখা পড়ছে! কেন এমন ঘটল তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো ও শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করো।
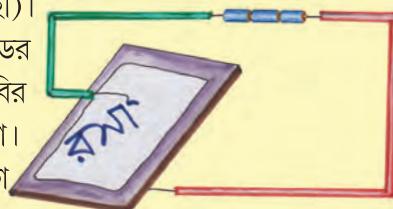
তড়িৎ বিশ্লেষণের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার

(ক) ধাতু নিষ্কাশন : তড়িৎ বিশ্লেষণ করে কিছু কিছু ধাতুর যৌগ থেকে ধাতুকে আলাদা করা হয়। এইরকম তিনটি ধাতু হলো সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালশিয়াম। এদের ক্লোরাইড লবণগুলোকে গলিত অবস্থায় রেখে তড়িৎ বিশ্লেষণ করে ধাতুকে পাওয়া যায়। জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করে এই পদ্ধতিতে সোডিয়াম, পটাশিয়াম বা ক্যালশিয়াম ধাতু তৈরি করা যায় না তাই গলিত ক্লোরাইড লবণ নেওয়া হয়।

(খ) ধাতু পরিশোধন : তামা (কপার) আমাদের অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। প্রায় সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তামার তার লাগে। তামার যৌগ থেকে প্রথমে যে তামা নিষ্কাশিত হয় তা অশুদ্ধ। অশুদ্ধিগুলোকে দূর না করলে তড়িৎ পরিবাহিতা কম হবে। তাহলে কী করা দরকার? অশুদ্ধিগুলোকে দূর করা। অশুদ্ধ কপারকে তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে শুদ্ধ করা হয়।

(গ) তড়িৎ লেপন : তোমরা লক্ষ করে থাকবে বাড়ির চাল তৈরি করার জন্যে যে ঢেউ খেলানো ধাতব শিট (বা চাদর বা পাত) ব্যবহার করা হয় অথবা সাইকেলে বা রিকশায় যে হ্যান্ডেল, বেল, চাকার রিম লাগানো থাকে সেগুলো বেশ কিছুদিন ব্যবহার করলে তাদের চকচকে ভাব বা জৌলুস কমে যায়। এগুলোর নতুন অবস্থাতেও কোথাও একটু আঁচড়

লেগে গেলে ভেতর থেকে অপেক্ষাকৃত কম চকচকে একটা ধাতু বেরিয়ে পড়ে। এর কারণ কী?

এই জিনিসগুলো তৈরি করতে যে ধাতু ব্যবহার করা হয়েছে তাকে আবহাওয়ার বা আরো ভালোভাবে বলতে গেলে পরিবেশের বাতাস ও জলের হাত থেকে ধাতুকে রক্ষা করার জন্যে ও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী অন্য কোনো কম সক্রিয় ধাতুর একটা প্রলেপ দেওয়া থাকে। অন্য একটা কারণ হলো, জিনিসগুলোকে আমাদের চোখে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা। একটা ধাতুর জিনিসের ওপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেবার জন্য তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। তাই একে আমরা তড়িৎ লেপন বলি।

কিন্তু কীভাবে করা হয় এই তড়িৎ লেপন

হাতেকলমে

একটা পরিষ্কার বিকারে কিছুটা পাতিত জল নিয়ে তার মধ্যে দু-চামচ তুঁতে ও কয়েক ফোঁটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মেশাও। এবার দুটো বা তিনটে সাধারণ সেল জুড়ে তৈরি ব্যাটারির ঋণাত্মক (—) প্রান্তের সঙ্গে একটা পরিষ্কার লোহার পেরেক তারের সাহায্যে জুড়ে দাও। ব্যাটারির ধনাত্মক (+) প্রান্তের সঙ্গে তার দিয়ে একটা পরিষ্কার ও খুব পাতলা তামার পাত যুক্ত করো। এবার লোহার পেরেক ও তামার পাত পাশের ছবির মতো করে তুঁতের দ্রবণে ডুবিয়ে 15-20 মিনিট ব্যাটারির সাহায্যে তড়িৎ চালনা করো। তারপর সাবধানে লোহার পেরেক ও তামার পাত দ্রবণ থেকে তুলে নিয়ে শুকনো করো। তারপর ভালো করে দুটোকেই লক্ষ করো। যা দেখলে তা লেখো।
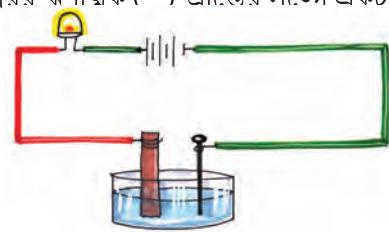
কোন জিনিসে	এখানে ক্যাথোড না অ্যানোড	কেমন পরিবর্তন ঘটেছে
লোহার পেরেক		
তামার পাত		

ভালো করে লক্ষ করলে দেখতে পাবে তুঁতের দ্রবণের মধ্যে লোহার পেরেকের যতটা অংশ ডোবানো ছিল সেই অংশে লালচে বাদামি রং-এর তামার একটা আস্তরণ তৈরি হয়েছে, যেটা আগে ছিল না।

এখানে কী ঘটল? লোহার পেরেকে (ক্যাথোডে) লালচে বাদামি আস্তরণ পড়ছে মানে সেখানে তামা তৈরি হয়েছে। দ্রবণের কিউপ্রিক আয়নগুলোই (Cu^{2+}) পেরেকের গায়ে এসে ইলেকট্রন নিয়ে তামার পরমাণু উৎপন্ন করেছে।

$$Cu^{2+} + 2e^{-} \rightarrow Cu \text{ (বিজারণ)}$$

খানিকক্ষণ তড়িৎ পাঠালে দেখতে পাবে তামার পাতটা একটু ক্ষয়ে যায়। কারণ তামার পাত থেকে কিছু Cu পরমাণু ইলেকট্রন ছেড়ে দ্রবণে কিউপ্রিক আয়ন (Cu^{2+}) হিসেবে এসেছে।

$$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^{-} \quad \text{(জারণ)}$$
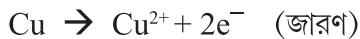
তড়িৎ লেপনের সময় যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তাকে অ্যানোডরূপে আর যে বস্তুর উপরে প্রলেপ দিতে হবে তাকে ক্যাথোডরূপে ব্যবহার করতে হবে। যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হয় তারই জলে দ্রাব্য কোনো যৌগের দ্রবণ তড়িৎ বিশ্লেষ্যরূপে ব্যবহার করতে হয়। অনেকেই ব্রোঞ্জ বা রুপোর তৈরি কিন্তু সোনার মতো দেখতে গয়না পরেন। চলতি কথায় আমরা এইসমস্ত গয়নাকে বলি সোনার-জল-করা। ভেবে দেখো তো — সোনার কি জল হয় বা সোনা কি জলে গুলে যায়? — এর কোনোটাই নয়। এগুলো হলো অন্য ধাতুর তৈরি গয়নাকে আকর্ষণীয়

করে তোলার জন্যে তড়িৎ লেপন পদ্ধতিতে তাদের ওপর সোনার একটা প্রলেপ দেওয়া। অনেক সময় সোনালি রং-এর রোল্ড-গোল্ড-এর গয়নার কথাও তোমরা শুনে থাকবে। আবার জলের পাইপ অথবা বাড়ির চাল তৈরির শীট তৈরির সময় লোহার মতো শক্ত ধাতু ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু জল আর বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় লোহায় মরচে পড়ে। তাই তার ওপর অপেক্ষাকৃত কম ক্ষয় হয় এমন একটা ধাতু, জিঙ্ক (Zn)-এর প্রলেপ দেওয়া থাকে। একে বলে জিঙ্ক-প্রলিপ্ত বা গ্যালভানাইজড লোহা।

একইভাবে গাড়ি বা সাইকেলের লোহার তৈরি অংশ অথবা পিতলের তৈরি জলের কলের ওপর ক্রোমিয়ামের মতো চকচকে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া থাকে যাতে সেগুলো আকর্ষণীয় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। লোহার তৈরি সেতুতে বা বাড়ির গ্রিল তৈরিতে ব্যবহার করা লোহার ওপরেও জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়া হয় একই কারণে ।

লোহার যন্ত্রপাতি-বাসনপত্রকে মরচে ধরা থেকে বাঁচাতে তড়িৎ লেপনের সাহায্যে নিকেলের সূক্ষ্ম আস্তরণ দেওয়া হয়। এই আস্তরণ রুপোলি। একে স্টেইনলেস স্টিল বলে ভুল হতে পারে। কী করে চিনবে? নিকেল প্লেটিং করা জিনিস চুম্বক দিয়ে তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয়, স্টেইনলেস স্টিলে তা হয় না। তাহলে দেখো, আমাদের পরিচিত অনেক জিনিসেই এই তড়িৎ লেপন প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধাতুর প্রলেপ দেওয়া আছে, যার ভিতরে আসল ধাতুর তৈরি জিনিসটা বর্তমান।

তড়িৎ লেপন করা যে সমস্ত পরিচিত জিনিসের কথা আমরা জানলাম তা কীভাবে করা হয়? নীচের সারণিটা পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

কোন ধাতুর তৈরি কোন জিনিসের ওপর	কোন ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে	এই কাজে কী ব্যবহার করা হবে	
		ক্যাথোড হিসেবে	অ্যানোড হিসেবে
লোহার পাইপ	জিঙ্ক		
লোহার তৈরি সাইকেলের হ্যান্ডেল	ক্রোমিয়াম		
পিতলের তৈরি জলের কল	ক্রোমিয়াম		
রুপোর তৈরি গয়না	সোনা	রুপোর গয়না	বিশুদ্ধ সোনার পাত
জার্মান সিলভারের তৈরি বাসনপত্র	রুপো		
লোহার চামচ	নিকেল		

3 কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি

পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির পরিচিতি

পরীক্ষাগার হলো শিক্ষালয়ের সেই কক্ষ যেখানে বিজ্ঞানের (বা কখনো-কখনো ভূগোলের মতো অন্য বিষয়েরও) বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা হাতেকলমে করার ব্যবস্থা থাকে। অবশ্য নতুন পাঠক্রমে শ্রেণিকক্ষকেই পরীক্ষাগারে পরিণত করে একইসঙ্গে শিক্ষণ-শিখন ও বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা হাতেকলমে করা যায় এমন ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে।

পাশের ছবিতে রসায়নাগারের মধ্যে অনেকরকম যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ছবি দেখা যাচ্ছে। এসো তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সরঞ্জাম সম্পর্কে আমরা পরিচিত হই।

1. সাধারণ থার্মোমিটার : বিভিন্ন বস্তু বা পরীক্ষাধীন পদার্থ অথবা বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা মাপতে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা হলো থার্মোমিটার। থার্মোমিটারের গায়ে যে দাগ কাটা থাকে তাকে তার স্কেল বলে। এই স্কেল সেন্টিগ্রেড, ফারেনহাইট বা কেলভিন এককে যেমন হতে পারে, তেমনি স্কেলের বিস্তারও (range) বিভিন্ন হতে পারে। যেমন— কোনো থার্মোমিটার $0^{0}C$ থেকে $100^{0}C$ পর্যন্ত হতে পারে, আবার কোনোটা $0^{0}C$ থেকে $200^{0}C$ হতে পারে, কোনোটা আবার $300^{0}C$ বা $350^{0}C$ পর্যন্ত হতে পারে।

2. তড়িৎ কোশ : এখন সাধারণত কোশ অর্থাৎ তড়িতের উৎস হিসাবে নির্জলকোশ ব্যবহার করা হয় (যাকে আমরা ভুল করে ব্যাটারি বলে থাকি)। দুই বা তার বেশি সংখ্যক প্রয়োজনমতো শক্তির নির্জলকোশ জুড়ে ব্যাটারি তৈরি করে নেওয়া হয়। লক্ষ করে থাকবে ব্যাটারির ওপরের দিকে যেখানে পিতলের একটা টুপি থাকে সেদিকের গায়ে '+' চিহ্ন ও নীচের সমতল দিকটার গায়ে (-) চিহ্ন দেওয়া থাকে। ব্যাটারি তৈরির সময় একাধিক নির্জলকোশের (+) ও (-) প্রান্ত ক্রমান্বয়ে থাকা জরুরি, নতুবা তড়িৎপ্রবাহ ঘটবে না।

3. সুইচ : তড়িৎ বর্তনীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সুইচ, যা প্রয়োজনমতো তড়িৎপ্রবাহ চালু ও বন্ধ করতে পারে। সাধারণত যে দু-ধরনের সুইচ ব্যবহার করা হয় তা হলো — প্লাগ ধরনের ও টেপা ধরনের। আমাদের বাড়িতে যে ধরনের সুইচ ব্যবহার হতে আমরা দেখি তাদের ক্রিয়াকৌশলও প্রায় একইরকম। তবে তা ভেতরের অংশে থাকায় বাইরে থেকে দেখা যায় না।

4. তার : পিভিসি জাতীয় পলিমার দিয়ে মোড়া (অন্তরিত) তামার সাধারণ তার দিয়েই বিভিন্ন সংযোগ করা হয়। এরজন্য বিভিন্ন মাপের তার ব্যবহৃত হয়।

5. বালব : কোনো তড়িৎ বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ হচ্ছে কিনা তা জানার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হলো বর্তনীতে একটা বালব যুক্ত করা। তাই এই কাজে প্রয়োজনীয় শক্তি অনুসারে বিভিন্ন ছোটো ছোটো বালব ব্যবহার করা হয়। এর বদলে LED-ও ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ বালবের থেকে এর আয়ু অনেক বেশি নাড়াচাড়াতে কেটে যাবার ভয় নেই।

6. রাসায়নিক তুলাযন্ত্র : রাসায়নিক তুলাযন্ত্র হলো কোনো নমুনা পদার্থের ঠিক ভর মাপার অথবা ঠিক ভরের পদার্থ নেবার জন্য ব্যবহৃত একটা যন্ত্র। এই তুলার সাহায্যে সামান্য ভরের পার্থক্যও মাপা যায়। এটাই সাধারণ তুলাযন্ত্রের সঙ্গে এই তুলাযন্ত্রের পার্থক্য। এই তুলার বাঁদিকের তুলাপাত্রে পদার্থের নমুনা ও ডানদিকে প্রয়োজনীয় ভরের বাটখারা চাপানো হয়। বাটখারা চাপানোর জন্য একটা চিমটে ব্যবহার করা হয়। কারণ হাতে ধরে বসালে বাটখারায় হাতের লেগে থাকা নোংরা বা ধুলো লেগে বাটখারার প্রকৃত ভর বেড়ে যেতে পারে।

7. ক্ল্যাম্প ও স্ট্যান্ড : বিভিন্ন পরীক্ষায় ধারক হিসাবে ভারী পাদদেশ বিশিষ্ট বিভিন্ন মাপের লোহার স্ট্যান্ড এবং বিভিন্ন মাপের ও আকৃতির ক্ল্যাম্প ব্যবহৃত হয়।

8. বুনসেন বার্নার ও স্পিরিট ল্যাম্প : এল পি জি ব্যবহার করে আগুনের উৎস হিসাবে বুনসেন বার্নার জ্বালানো হয়। গ্যাসের উৎস হিসাবে পেট্রোলিয়াম গ্যাস প্ল্যান্টের সাহায্যও কখনো-কখনো নেওয়া হয়। তবে খুব নির্দিষ্ট কিছু পরীক্ষা ছাড়া তাপের উৎস হিসাবে স্পিরিট ল্যাম্পের ব্যবহারই চালু ব্যবস্থা।

9. টেস্টটিউব বা পরীক্ষানল, গোলতল ফ্লাস্ক, কনিক্যাল ফ্লাস্ক, বিকার, উলফ বোতল, গ্যাসজার ও ওয়াচ গ্লাস: পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হয় নানা মাপের ও নানা আকৃতির কাচের তৈরি পাত্র। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় টেস্টটিউব বা পরীক্ষানল। এগুলো পাতলা কাচের তৈরি সরু একমুখ খোলা নল। তবে এর দেয়াল মোটা ও শক্ত কাচের হলে তাকে হার্ডগ্লাস টেস্টটিউব বলে। আবার কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তরল পদার্থ বা কোনো দ্রবণ গরম করার জন্য একটা সরু গলার গোলাকার তলদেশের পাত্র ব্যবহার করা হয়। এগুলোকে বলে গোলতল ফ্লাস্ক। আবার শঙ্কু আকৃতির ছোটো গলার কাচপাত্রটা হলো কনিক্যাল ফ্লাস্ক।

চোঙাকৃতির, মুখের কাছে একটু ছুঁচালো পাত্রটা হলো বিকার। আবার গ্যাস তৈরির জন্য দু-মুখবিশিষ্ট পাত্রটা হলো উলফ বোতল। এর একটা মুখে বিক্রিয়ক ঢালা যায়, আর অন্য মুখ দিয়ে গ্যাস বের হতে পারে। পরীক্ষাগারে তৈরি গ্যাস সংগ্রহ করা হয় চোঙাকৃতির, ঢাকনাবিশিষ্ট একটু বড়ো কাচপাত্রে; এর নাম গ্যাসজার। কোনো

পদার্থ বা কম পরিমাণ দ্রবণ অথবা ছোটো কোনো নমুনা রাখার জন্য একটু মোটা কাচের অনুচ্চ গোলাকার পাত্র হলো ওয়াচ গ্লাস।

10. ফানেল: এটা একটা কাচনির্মিত সরঞ্জাম, যার ওপরটা শঙ্কু আকৃতির ও নীচে সরু নল লাগানো। নল প্রয়োজনমতো লম্বা হতে পারে। বেশি লম্বা নলযুক্ত ফানেলকে দীর্ঘনল ফানেল বলে। দীর্ঘনল ফানেলের ওপরের দিকের আকৃতি ছোটো কলশি বা ঘটির মতো হতে পারে।

11. টেস্টটিউব র‍্যাক : টেস্টটিউবে পরীক্ষণীয় নমুনা নিয়ে তা খাড়াভাবে বসিয়ে রাখার জন্যে কাঠের বা প্লাস্টিকের র‍্যাক ব্যবহার করা হয়।

12.টেস্টটিউব হোল্ডার: পরীক্ষা করার সময় টেস্টটিউব যাতে হাত দিয়ে ধরতে না হয় তাই পাতলা পাতের তৈরি সাঁড়াশির মতো এই সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়।

13. মাপক চোং : তরল পদার্থের আয়তন মাপার জন্যে বিভিন্ন মাপের মাপক চোং ব্যবহার করা হয়। যেমন — 50 mL, 100 mL , 200 mL , 500 mL ইত্যাদি।

14. ত্রিপদ স্ট্যান্ড ও তারজালি : কোনো পাত্রকে গরম করার সময় তিনপায়া বিশিষ্ট ঢালাই লোহার স্ট্যান্ডের ওপর তা বসানো হয়। ত্রিপদ স্ট্যান্ডের ওপরের বৃত্তাকার রিং-এর থেকে পাত্রের মাপ ছোটোও হতে পারে। তাই ত্রিপদ স্ট্যান্ডের ওপর পাত্র বসানোর সময় মাঝখানে লোহার তারজালি ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় তারজালির মাঝখানে বৃত্তাকারে অ্যাসবেস্টসের প্রলেপ দেওয়া থাকে, যাতে এর ওপরে রাখা পাত্র সমানভাবে উত্তপ্ত হতে পারে।

15. কাচনল ও কাচদণ্ড: গ্যাস প্রস্তুতি বা অন্যান্য পরীক্ষার সময় নানা মাপের সোজা অথবা বাঁকা কাচনল কাজে লাগে। সোজা কাচনলকে বুনসেন বার্নারের শিখায় বাঁকিয়েও প্রয়োজনমতো বাঁকা কাচনল তৈরি করে নেওয়া যায়। কোনো মিশ্রণ বা দ্রবণ তৈরি করার সময় নাড়ানোর জন্যে বিভিন্ন মাপের সরু বা মোটা কাচদণ্ড ব্যবহার করা হয়।

16. পিপেট ও ব্যুরেট: প্রশমন বা টাইট্রেশান পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট আয়তনের বিক্রিয়ক তরল নেওয়া ও তার প্রশমনের জন্যে প্রয়োজনীয় তরলের সঠিক আয়তন জানার জন্যে যথাক্রমে পিপেট ও ব্যুরেট ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ব্যুরেটে 0 mL থেকে 50 mL পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে ও তরল নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে নীচে একটা স্টপককের মতো অংশ থাকে। সাধারণ পিপেটের মাঝখানে একটা স্ফীত অংশ থাকে ও ওপরের দিকে নির্দিষ্ট আয়তন নির্দেশ করার জন্যে একটা বলয়াকৃতি সরু দাগ কাটা থাকে। পিপেট 2 mL , 5 mL , 10 mL , 25 mL ইত্যাদি বিভিন্ন মাপের হতে পারে।
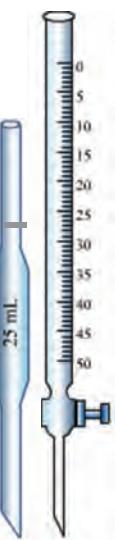
17. ফিলটার কাগজ : কোনো তরলে যদি অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ মিশে থাকে তবে তাদের পৃথক করার জন্য গোলাকার একটু মোটা ধরনের যে কাগজ ব্যবহার করা হয় সেটাই ফিলটার কাগজ।

অক্সিজেন

অক্সিজেন এল কোথা থেকে?

নানা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে আজ থেকে প্রায় 450 কোটি (4.5 বিলিয়ন) বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল আনুমানিক 350 কোটি বছর আগে। তখনকার বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ ছিল আজকের তুলনায় খুবই কম। বাতাসে বরং তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, মিথেন। আজকের পৃথিবীতে অনেক বায়ুজীবী (aerobic) জীবাণু আছে যারা অক্সিজেনকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তখনকার জীবাণুরা কিন্তু তা পারত না, তারা ছিল অবায়ুজীবী (anaerobic)। বেঁচে থাকার শক্তি তারা অন্যভাবে পেত। এইভাবে চলে গেল বহু কোটি বছর।

আজ থেকে প্রায় দুশো পঞ্চাশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সমুদ্রে দেখা যেতে লাগল একধরনের জীবাণু, বিজ্ঞানীরা যাদের নাম দিয়েছেন সায়ানোব্যাকটেরিয়া। সূর্যের আলো আর বিশেষ ধরনের প্রোটিনের সাহায্যে এরাই জলকে ভেঙে তৈরি করতে লাগল অক্সিজেন গ্যাস। ধীরে ধীরে পৃথিবীর বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়তে লাগল। আজও জলা জায়গায় (পুকুরের জলে, ধানক্ষেতে) সায়ানোব্যাকটেরিয়া দেখা যায়। আরো পরে এল সবুজ শৈবাল ও অন্যান্য উদ্ভিদ। তারাও সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরি করতে শুরু করল। কোটি কোটি বছর ধরে বাতাসে অক্সিজেনের আনুপাতিক পরিমাণ বাড়তে বাড়তে এক সময় তা আজকের অবস্থায় পৌঁছোল।

বাতাসে অক্সিজেন থাকার কী সুবিধে ?

অক্সিজেন কাজে না লাগালে কোশে গ্লুকোজ থেকে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, অক্সিজেন কাজে লাগালে তার পনেরো গুণেরও বেশি শক্তি পাওয়া সম্ভব। বেশি শক্তি পাওয়ার অর্থ নানাধরনের কাজ করার ক্ষমতা পাওয়া। বাতাসে অক্সিজেন বৃদ্ধি পাবার পর পৃথিবীতে অক্সিজেন কাজে লাগাতে পারে এমন নানা জীব (উদ্ভিদ ও প্রাণী) সৃষ্টি হলো।

পৃথিবীতে সব জীবেরই কী অক্সিজেন লাগে ?

জলাভূমির কাদার গভীরে বা শহরের নোংরা জলনিকাশি নালার পাঁকের নীচে অক্সিজেন ঢুকতে পারে না। এইসব জায়গায় এমন কিছু ব্যাকটেরিয়া থাকে যাদের অক্সিজেনে আনলেই মরে যায়। এদের বলে বাধ্যতামূলক অবায়ুজীবী। এদের কোশে শক্তি তৈরির রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো অক্সিজেন ব্যবহারকারী জীব-কোশের মতো নয়। বিভিন্ন অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া ও অবায়ুজীবী কিছু ছত্রাক বাদ দিলে পৃথিবীতে এখন বায়ুজীবীদেরই প্রাধান্য। মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদ সকলেই বায়ুজীবী, সকলেরই অক্সিজেন লাগে।

অক্সিজেনের কী শুধুই সুবিধে না সমস্যাও আছে ?

অক্সিজেন থাকলে খাদ্য থেকে কোশে বেশি শক্তি পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু কিছু অসুবিধেও আছে। অক্সিজেনকে কাজে লাগিয়ে শক্তি তৈরির সময় কোশে এমন কিছু কিছু জিনিস তৈরি হয় যারা অল্প পরিমাণে থাকলেও কোশের অনেক ক্ষতি করতে পারে। যেমন হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) বা সুপার অক্সাইড আয়ন (O_2^-)। এথেকে আরও ক্ষতিকারক পদার্থ তৈরি হয়ে কোশের ডিএনএ অণুর অনেক ক্ষতি করতে পারে।

এই সমস্যা থেকে কোশ বাঁচবে কী করে ?

সুপারঅক্সাইড বা হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে নষ্ট করে দিতে বিভিন্ন জীবকোশে বিশেষ বিশেষ এনজাইম থাকে। যেমন ধরো ক্যাটালেজ এনজাইম। ক্যাটালেজ হাইড্রোজেন পারক্সাইডকে ভেঙে জল আর অক্সিজেন তৈরি করে ($2H_2O_2 \xrightarrow{\text{ক্যাটালেজ}} 2H_2O + O_2$)।

খাদ্য থেকে শক্তি তৈরি আর জ্বালানি দহন ছাড়া আর কী কাজে লাগে অক্সিজেন?

রাসায়নিক শিল্পে অক্সিজেন খুবই দরকারি মৌল। তোমরা জানো যে আজকের সভ্যতা ইস্পাত ছাড়া অচল—বাড়ি, ব্রিজ, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, রেললাইন, অস্ত্রশস্ত্র—সবকিছু তৈরিতে লাগে নানাধরনের ইস্পাত। ইস্পাত তৈরিতে ভালো মানের লোহা চাই, অশুদ্ধ লোহায় খুব তাড়াতাড়ি মরচে ধরে। অশুদ্ধ লোহার অশুদ্ধি দূর করে প্রত্যেক বছর কোটি কোটি টন ইস্পাত তৈরি করতে অক্সিজেন চাই।

তোমরা যেসব অ্যাসিড আর সারের কথা জেনেছ তার মধ্যে অন্যতম দুটো হলো নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) আর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3)। নাইট্রিক অ্যাসিড তৈরিতে অক্সিজেন অপরিহার্য, আর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তৈরি হবে নাইট্রিক অ্যাসিড থেকেই। বিস্ফোরক তৈরিতেও নাইট্রিক অ্যাসিড চাই।

সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) হলো সবচেয়ে দরকারি অ্যাসিড — গাড়ির ব্যাটারি, রং, সার তৈরি, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, তামা, জিঙ্ক ধাতুর পরিশোধন — এসব কাজে সালফিউরিক অ্যাসিড চাই। সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির সবচেয়ে দরকারি ধাপে অক্সিজেন লাগে।

নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় শতকরা 5 ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশ্রিত অক্সিজেন (কার্বোজেন) ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শ্বাসকষ্ট উপশমে নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া হয়।

প্রত্যেক বছর তাহলে যে কোটি কোটি টন অক্সিজেন লাগে তা আমরা পাব কোথায়? নিশ্চয়ই সস্তার কোনো উৎস থেকেই? শিল্পের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমরা জোগাড় করি বাতাস থেকে। এটাই সবচেয়ে সুলভ উৎস।

তোমরা শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করো জীবমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কী কী উপায়ে অক্সিজেনের আদান-প্রদান হয় এবং কোন প্রাণী কীভাবে বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে।

অক্সিজেনের ভৌত ধর্ম

আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আয়তন হিসাবে প্রায় 20.6 শতাংশ অক্সিজেন আছে। অধিকাংশ জীব তার শ্বাসকার্যের জন্য বায়ু বা জল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। তাই অক্সিজেন আমাদের কাছে খুবই পরিচিত একটা গ্যাসের নাম। কিন্তু সাধারণ কয়েকটা ভৌত ধর্ম অর্থাৎ বাইরে থেকেই কি অক্সিজেন গ্যাসকে চেনা সম্ভব?

অক্সিজেনের কয়েকটা ভৌত ধর্ম হলো—

1. এটি বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন, সাধারণ উষ্ণতায় গ্যাসীয় পদার্থ।
2. বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী; প্রমাণ উষ্ণতা ও চাপে এর ঘনত্ব 1.428 গ্রাম প্রতি লিটার।
3. জলে সামান্য দ্রাব্য; প্রমাণ চাপে $0°C$ উষ্ণতায় বিশুদ্ধ জলে অক্সিজেনের দ্রাব্যতা 14.6 মিলিগ্রাম / লিটার।
4. তরল অক্সিজেনের হিমাঙ্ক $-218°$ C এবং তরল অক্সিজেনের স্ফুটনাঙ্ক $-183°$ C , যদিও এই উষ্ণতা দুটি সাধারণ কোনো পরীক্ষায় নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

   ঘনীভূত হলে $-183°$ C উষ্ণতায় অক্সিজেন হালকা নীল রং-এর তরলে পরিণত হয়। তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করে কঠিন করলে অক্সিজেন নীল রঙের কঠিন অবস্থা লাভ করে।
5. অক্সিজেনের তিনটি আইসোটোপ হলো $^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$ এবং $^{18}_{8}O$, যদিও প্রকৃতিতে শেষ দুটির পরিমাণ খুবই কম।

অক্সিজেনের রাসায়নিক ধর্ম

1. অক্সিজেন অণু দ্বি-পরমাণুক, কিন্তু উচ্চ উষ্ণতায় অক্সিজেন অণু ভেঙে পারমাণবিক অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এই পারমাণবিক অক্সিজেন খুবই শক্তিশালী জারক।

$$O_2 \rightarrow O + O - \text{তাপ}$$

2. **অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক সক্রিয়তা :** অক্সিজেন সক্রিয় মৌল। বেশি উষ্ণতায় এবং অনুঘটকের উপস্থিতিতে এর সক্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। দেখা গেছে যে নিষ্ক্রিয় মৌল, সোনা, প্ল্যাটিনাম প্রভৃতি নোবল মেটাল, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন ছাড়া প্রায় সমস্ত মৌলের সঙ্গেই অক্সিজেন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে।

3. অক্সিজেন নিজে দাহ্য নয়, কিন্তু বেশিরভাগ ধাতু ও অধাতুর সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হবার সময় তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়— এরকম বিক্রিয়াকেই দহন বলা হয়। দহনের ফলে দাহ্য পদার্থগুলোর কীরকম পরিবর্তন হয়?

দহনে দাহ্য পদার্থগুলো বা তার এক বা একাধিক উপাদান অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জারিত হয়।

হাতেকলমে

একটা শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে সাবধানে প্রবেশ করাও। কী দেখলে তা লেখো।

কী দেখলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়

4. **শ্বাসকার্য :** জীবের শ্বাসকার্যে অক্সিজেনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অল্প কিছু নিম্নশ্রেণির জীব ছাড়া সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী শ্বাসকার্যের সময় পরিবেশ থেকে অক্সিজেন নেয় ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। শর্করা জাতীয় খাদ্যের সরলীকৃত উপাদান গ্লুকোজ থেকে নানান রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জারণ ঘটে শক্তি উৎপন্ন হয়। এর ফলেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) থেকে জারণের মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন হওয়ার সামগ্রিক সমীকরণ হলো

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{তাপ}$$
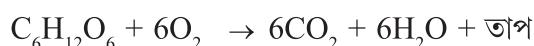
লক্ষ করে থাকবে কেউ অসুস্থ হয়ে শ্বাসকষ্ট হলে তাঁকে অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। আবার জিওল মাছ ডাঙাতেও দিব্যি বেঁচে থাকে তাদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের জন্য।

5. **অক্সাইড গঠন :** অধিকাংশ ধাতু ও অধাতুর সঙ্গে অক্সিজেন সরাসরি যুক্ত হতে পারে এটা আমরা আগেই জেনেছি। এর ফলে যে যৌগ উৎপন্ন হয় তাদের সংশ্লিষ্ট মৌলের অক্সাইড বলা হয়। কিন্তু অক্সিজেনের সঙ্গে সব মৌলই কি একই ধরনের যৌগ গঠন করে?— না, মৌলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার অক্সিজেনঘটিত যৌগ বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে — আম্লিক অক্সাইড, ক্ষারকীয় অক্সাইড, উভধর্মী অক্সাইড, পারক্সাইড ইত্যাদি।

(i) অধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া (আম্লিক অক্সাইড গঠন) :

হাতেকলমে : একটা প্রজ্বলন বা দহন চামচে একটুকরো কাঠকয়লা (কার্বন) রেখে লাল হওয়া পর্যন্ত গরম করে অক্সিজেনপূর্ণ একটা গ্যাসজারে পাশের ছবির মতো করে ঢুকিয়ে দাও। গ্যাসজারের ভিতরে কী ঘটছে দেখো। জারটা ঠান্ডা হলে গ্যাসজারের মুখে একটা ভিজে নীল লিটমাস ও একটা ভিজে লাল লিটমাস কাগজ ধরে দেখো তাদের রং কেমন হয়। এবার গ্যাসজারের মধ্যে স্বচ্ছ চুনজল ঢেলে ভালো করে ঝাঁকিয়ে দেখো চুনজলের কোনোরকম পরিবর্তন হলো কি? যা দেখলে তা নীচে লেখো :

কী করলে	কী দেখতে পেলে	কেন এমন হলো বলে মনে হয়
(i) যখন লাল হয়ে যাওয়া কাঠকয়লা অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে		
(ii) তারপর গ্যাসজারের মুখে ভিজে নীল ও লাল লিটমাস কাগজ ধরলে		
(iii) গ্যাসজারের মধ্যে স্বচ্ছ চুনজল দিয়ে ঝাঁকালে		

সম্ভব হলে সামান্য সালফার গুঁড়ো বা ফসফরাস নিয়ে দহনের পরে ভিজে লিটমাস দিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নিতে হবে।

ওপরে উল্লেখিত অধাতব মৌলগুলো পর্যাপ্ত অক্সিজেনে দহনের সময় নীচের অক্সাইডগুলো তৈরি করে।

$C + O_2 \rightarrow CO_2$ $\quad$ $S + O_2 \rightarrow SO_2$ $\quad$ $P_4 + 5O_2 \rightarrow P_4O_{10}$
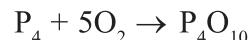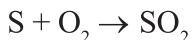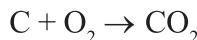
অবশ্য কম পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ও অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতায় কার্বন পুড়ে মূলত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় ($2C + O_2 = 2CO$)।
ওপরের বিক্রিয়াগুলোয় উৎপন্ন অক্সাইড (CO_2, SO_2 , P_4O_{10})জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অ্যাসিড উৎপন্ন করে। তাই এই অক্সাইডগুলোকে আম্লিক অক্সাইড বলা হয়।

$$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \qquad SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3$$
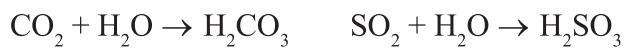
ওপরের বিক্রিয়াগুলোর সমীকরণ দেখে ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে নীচের সারণি পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

মৌলের নাম	পর্যাপ্ত অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সাইডের নাম ও সংকেত	জলের সঙ্গে উৎপন্ন অক্সাইডের বিক্রিয়ায় তৈরি হওয়া অ্যাসিডের নাম ও সংকেত
কার্বন		
সালফার		

(ii) ধাতুর সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়া :

(a) ক্ষারকীয় অক্সাইড গঠন : একটা ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর ফিতে নিয়ে তাতে আগুন ধরাও। দেখতে পাবে যে ম্যাগনেশিয়াম ফিতেটা ফুলঝুরির মতো উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে জ্বলছে। নীচে যে সাদা সাদা গুঁড়ো পড়ছে তা

সংগ্রহ করে পাতিত জলের মধ্যে ভালো করে ঝাঁকাও। উৎপন্ন মিশ্রণে নীল ও লাল লিটমাস কাগজ ডোবাও, যা দেখলে তা নীচে লেখো :

কোন লিটমাসের রং	কী হল	জলীয় মিশ্রণের প্রকৃতি কেমন
নীল লিটমাস		
লাল লিটমাস		
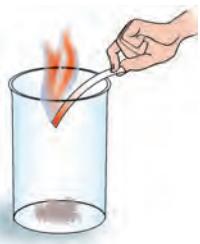
এখানে ম্যাগনেশিয়াম ফিতে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে দহনের ফলে সাদা গুঁড়োর মতো ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে। এই অক্সাইড জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্ষারকীয় ধর্ম প্রকাশ করে। তাই এটি ক্ষারকীয় অক্সাইড।

$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ $\quad\quad$ $MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$
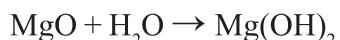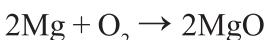
একইভাবে লিথিয়াম, ক্যালশিয়াম প্রভৃতি ধাতু অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যে অক্সাইড উৎপন্ন করে সেগুলোও পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তারা ক্ষারকীয় প্রকৃতির।

$2Ca + O_2 \rightarrow 2CaO$ $\quad\quad$ $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$
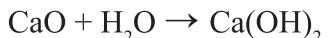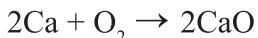
(b) উভধর্মী অক্সাইড গঠন : অ্যালুমিনিয়াম ও জিঙ্ক ধাতু অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় যথাক্রমে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও জিঙ্ক অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$ $\quad\quad$ $2Zn + O_2 \rightarrow 2ZnO$
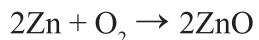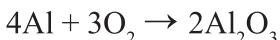
দেখা যায় এই অক্সাইডগুলো অ্যাসিড ও ক্ষার দু-ধরনের যৌগের সঙ্গেই বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করতে পারে।

$$Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow \underset{\text{অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড}}{2AlCl_3} + 3H_2O$$

$$Al_2O_3 + 2NaOH \rightarrow \underset{\text{সোডিয়াম অ্যালুমিনেট}}{2NaAlO_2} + H_2O$$
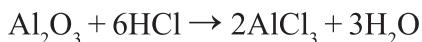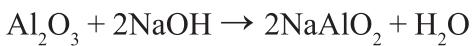
অ্যাসিড ও ক্ষার উভয় ধরনের যৌগের সঙ্গে প্রশমন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বলে এদের **উভধর্মী অক্সাইড** বলে। জিঙ্ক ও লেডের অক্সাইডও অ্যাসিড ও ক্ষার উভয়ের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। জিঙ্ক অক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও কস্টিক সোডার বিক্রিয়ার সমীকরণ নীচের সারণিতে লেখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

ধাতু	অক্সাইড গঠন বিক্রিয়ার সমীকরণ	HCl দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ার সমীকরণ	NaOH দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ার সমীকরণ
জিঙ্ক			$2NaOH + ZnO \rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2O$ সোডিয়াম জিঙ্কেট

(C) পারক্সাইড গঠন : উত্তপ্ত অবস্থায় সোডিয়ামের সঙ্গে অতিরিক্ত অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় প্রধানত সোডিয়াম পারক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$$2Na + O_2 \rightarrow Na_2O_2$$
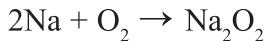
এই যৌগগুলোকে পারক্সাইড বলার কারণ কী? — এদের মধ্যে পারক্সো (– O – O –) বন্ধন থাকে এবং এরা জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) উৎপন্ন করে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অক্সিজেন কিছু অন্য ধরনের যৌগ (সুপার অক্সাইড) উৎপন্ন করে।

6. জারণ ক্রিয়া : বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড অক্সিজেনের সংস্পর্শে জারিত হয়ে বাদামি রং-এর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$
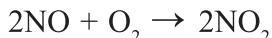
হাতেকলমে

একটা টেস্টটিউবে কপারের ছিবড়ে রেখে তার মধ্যে পাতিত জল মিশিয়ে 1 : 1 আয়তন অনুপাতে তৈরি করা নাইট্রিক অ্যাসিড দ্রবণ যোগ করো। এবার টেস্টটিউবটাকে গরম করো। যে বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন হলো তা অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের মধ্যে প্রবেশ করাও। কী ঘটতে দেখলে তা নীচে লেখো। এই পরীক্ষা করার সময় অবশ্যই শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

কী করলে	কী দেখলে
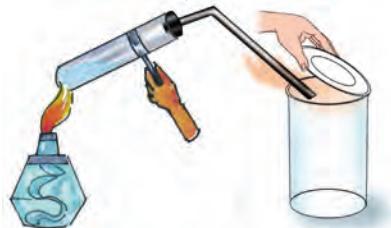
এখানে কপার ছিবড়ের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় বর্ণহীন নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়, যা অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে বাদামি রং-এর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়।

$$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$$

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$
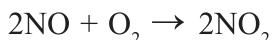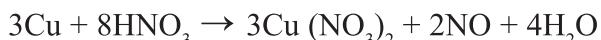
একটা টেস্টটিউবে সামান্য লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মেশানো ফিকে সবুজ রঙের ফেরাস সালফেট দ্রবণ নাও। তার মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস পাঠাও। কিছুক্ষণ পর দেখবে দ্রবণের বর্ণ হলুদ হয়ে গেল।

$$4FeSO_4 + 2H_2SO_4 + O_2 \rightarrow 4Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$$
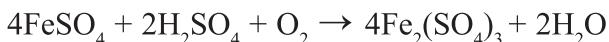
7. অক্সিজেনের শোষক :

(i) সাধারণ বা কম উষ্ণতায় Au, Ag, Pt, Pd প্রভৃতি অক্সিজেনকে অধিশোষণ করে অর্থাৎ ধাতবপৃষ্ঠে দুর্বলভাবে আটকে রাখে। ধাতুগুলোকে আবার গরম করলে O_2 বেরিয়ে যায়।

(ii) ক্ষারীয় পটাশিয়াম পাইরোগ্যালেট দ্রবণ O_2-কে শোষণ করে বাদামি বর্ণ ধারণ করে।

(iii) অ্যামোনিয়াযুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড দ্রবণ O_2 গ্যাসকে দ্রুত শোষণ করে নীল বর্ণ ধারণ করে।

অক্সিজেন (O_2) গ্যাস প্রস্তুতি

হাইড্রোজেন পারক্সাইড থেকে অক্সিজেন (O_2) গ্যাস প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2)-এর লঘু দ্রবণ, (ii) ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2), (iii) একটি মোমবাতি, (iv) পাট কাঠি, (v) একটি টেস্টটিউব, (vi) একটি টেস্টটিউব আটকাবার ক্ল্যাম্প

কী করলে	কী দেখলে	কী শিখলে
একটা টেস্টটিউবকে ক্ল্যাম্পের সাহায্যে ছবির মতো করে আটকাও। এবার টেস্টটিউবের মধ্যে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ঢালো। তোমার পর্যবেক্ষণ লিখে ফেলো। এই হাইড্রোজেন পারক্সাইডে সামান্য একটু MnO_2 মেশাও এবং একটি শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি টেস্টটিউবের মুখে ধরো। কী দেখলে?	হাইড্রোজেন পারক্সাইডে MnO_2 দেওয়ার আগে কী দেখলে? ______ MnO_2 যোগ করার পর কী দেখলে? ______	বিক্রিয়াটির সমীকরণ সম্পূর্ণ করে সমতা বিধান করো। $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O +$ ____ তুমি যা বুঝলে তা লেখো। ______ ______ ______

সোডিয়াম পারক্সাইড (Na_2O_2) থেকে অক্সিজেন (O_2) গ্যাস প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় দ্রব্য : (i) সোডিয়াম পারক্সাইড (Na_2O_2), (ii) জল(H_2O), (iii) কনিক্যাল ফ্লাস্ক, (iv) ফ্লাস্কের মুখে দুটি ছিদ্রযুক্ত ছিপি, (v) বিন্দুপাতি ফানেল, (vi) কাচের বাঁকানো নির্গমনল, (vii) গ্যাসজার।

কী করা হয়	কী দেখা যায়	সিদ্ধান্ত
একটা কনিক্যাল ফ্লাস্কের মুখে কর্কের মধ্যে দিয়ে বিন্দুপাতি ফানেল এবং একটা বাঁকানো নির্গমনল ছবির মতো করে আটকানো হয়। নির্গমনলের অপর প্রান্ত গ্যাসদ্রোণির সাহায্যে একটা জলপূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করানো হয়। কনিক্যাল ফ্লাস্কে কঠিন সোডিয়াম পারক্সাইড এবং বিন্দুপাতি ফানেলে জল নেওয়া হয়। এবার বিন্দুপাতি ফানেল থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল সোডিয়াম পারক্সাইডের উপর ফেলা হয়।	গ্যাসজারের মধ্যে কী ঘটনা ঘটল? ______ ______	বিক্রিয়ার সমীকরণে শূন্যস্থান পূর্ণ করে সমতা-বিধানের মাধ্যমে উৎপন্ন গ্যাসটি কী তা লেখো। $Na_2O_2 + H_2O \rightarrow 2NaOH +$ ____ এই পরীক্ষার জন্য বাইরে থেকে তাপ দিতে হয় কী? ______

জলের তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে অক্সিজেন (O_2) প্রস্তুতি

আমরা আগেই দেখেছি যে সামান্য খাবার নুন অথবা অ্যাসিড মেশানো জলের মধ্যে দিয়ে ব্যাটারির সাহায্যে তড়িৎ পাঠালে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটে। আর সেই সঙ্গে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস ও অ্যানোডে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। অ্যানোডে তৈরি হওয়া গ্যাসটাকে আবদ্ধ পাত্রে সংগ্রহ করেও অক্সিজেন প্রস্তুত করা যায়। কীভাবে এই গ্যাস সংগ্রহ করবে? ছবি দেখে বোঝার চেষ্টা করো।
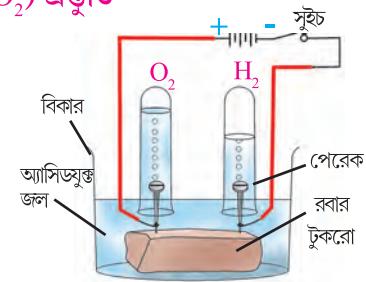
পরীক্ষাগারে পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে অক্সিজেন (O_2) গ্যাস প্রস্তুতি প্রণালী

দুটো শক্ত কাচের টেস্টটিউব নিয়ে একটার মধ্যে কিছুটা পটাশিয়াম ক্লোরেট নেওয়া হলো। অন্য টেস্টটিউবে পটাশিয়াম ক্লোরেটের সঙ্গে কিছুটা ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মেশানো হলো। দুটো টেস্টটিউবকেই বালিপাত্রে বসিয়ে 230°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করে টেস্টটিউব দুটোর মুখে জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরলে দেখা যাবে প্রথমটার মুখে তা জ্বলছে না। কিন্তু দ্বিতীয়টার মুখে পাটকাঠিটা শিখাসহ জ্বলে ওঠে। এর থেকে কী বোঝা গেল?

দ্বিতীয় টেস্টটিউবে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু দুটো টেস্টটিউবকেই 650°C উষ্ণতায় গরম করে তাদের মুখে শিখাহীন জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরলে দুটোই শিখাসহ জ্বলে উঠবে। এর থেকে বোঝা যায় যে বেশি উষ্ণতায় প্রথম টেস্টটিউবেও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় টেস্টটিউবে যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড মেশানো হলো তার ফলে কী সুবিধা হলো?

তাহলে পরীক্ষাগারে সহজে অক্সিজেন তৈরি করতে গেলে আমাদের কী কী প্রয়োজন?

প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য : পটাশিয়াম ক্লোরেট ($KClO_3$), অঙ্গারমুক্ত ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড (MnO_2)।

ব্যবহৃত সরঞ্জাম : একটি হার্ড গ্লাস টেস্টটিউব, একটি সচ্ছিদ্র কর্ক, একটি নির্গমনল, একটি স্ট্যান্ড, একটি গ্যাসদ্রোণি, একটি ছবির মতো জলপূর্ণ পাত্র।

কী করা হয়	কী দেখা যায়	কী ধরনের সতর্কতা নেওয়া হয়
চারভাগ ওজনের $KClO_3$ সঙ্গে একভাগ ওজনের বিশুদ্ধ MnO_2 ভালো করে মিশিয়ে শক্ত কাচের টেস্টটিউবে নিয়ে ছবির মতো করে একটু ঝুঁকিয়ে আটকানো হয়। তারপর টেস্টটিউবের মুখে ছিদ্রযুক্ত কর্কের সাহায্যে নির্গমনল লাগিয়ে স্পিরিট ল্যাম্প বা বুনসেন বার্নারের সাহায্যে টেস্টটিউবটাকে সামনে রেখে পিছনের দিকে ধীরে ধীরে গরম করা হয়।	প্রথমে উৎপন্ন কিছুটা গ্যাস বেরিয়ে যেতে দিয়ে তারপর নির্গম নলটাকে জলভরতি গ্যাসজারের মুখে ঢোকালে জলের নিম্ন অপসারণ করে গ্যাসজারের মধ্যে একটা বর্ণহীন গ্যাস জমা হয়।	(i) $KClO_3$ ও MnO_2 ভালো করে মেশানো দরকার। (ii) MnO_2 -এর মধ্যে যেন চারকোল গুঁড়ো বা অ্যান্টিমনি সালফাইডের গুঁড়ো মিশে না থাকে। (iii) টেস্টটিউবটাকে যেন সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে রাখা হয় ও তাকে যেন সামনে থেকে পিছনের দিকে ধীরে ধীরে গরম করা হয়।

এইভাবে অক্সিজেন তৈরির সময় যে বিক্রিয়া হয় তার সমীকরণ হলো—

$2KClO_3 + [MnO_2] \longrightarrow 2KCl + 3O_2 + [MnO_2]$

হাইড্রোজেন

অক্সিজেনের মতো অন্য একটা পরিচিত গ্যাস হলো হাইড্রোজেন।

কী কী কাজে লাগে হাইড্রোজেন

রাসায়নিক শিল্পে হাইড্রোজেন একটা অতি প্রয়োজনীয় গ্যাস। কী কাজে লাগে হাইড্রোজেন?

হাইড্রোজেনের প্রধান ব্যবহার হলো অ্যামোনিয়া তৈরিতে। এই অ্যামোনিয়া থেকেই তৈরি করা হয় ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট -এর মতো প্রয়োজনীয় সার আর বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজনীয় নাইট্রিক অ্যাসিড। এছাড়াও হাইড্রোজেন লাগে উদ্ভিজ্জ তেল থেকে বনস্পতিজাতীয় ভোজ্য ফ্যাট প্রস্তুতিতে।

রাসায়নিক শিল্পে স্টিম থেকে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করা হয়।

হাইড্রোজেনের ভৌত ধর্ম

অক্সিজেনের মতোই আরও একটা পরিচিত গ্যাস হলো হাইড্রোজেন। যদিও পরিবেশে মুক্ত অবস্থায় এই গ্যাসের অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু একথা ভুললে চলবে কেন যে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করে আছে যে জলভাগ তা অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলিত হয়েই তৈরি। হাইড্রোজেন গ্যাস কীভাবে ভৌত ধর্মের সাহায্যে চেনা যায় তা দেখা যাক—

1. সাধারণ অবস্থায় হাইড্রোজেনও বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন গ্যাস।
2. হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা গ্যাস। এর চেয়ে বায়ু প্রায় 14.4 গুণ ভারী।

তাই হাইড্রোজেন গ্যাস ভরে একটা রবারের বেলুনের মুখ সুতো দিয়ে বেঁধে ঘরের মধ্যে যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, দেখা যাবে যে বেলুনটা ওপরে উঠে ঘরের ছাদে ঠেকেছে।

হাইড্রোজেন গ্যাসে ভরতি বেলুন পাবে কীভাবে? তার জন্য নীচের হাতেকলমে পরীক্ষাটা করে দেখো।

হাতেকলমে

একটা সরুমুখ কাচের বোতলে কয়েকটা জিঙ্কের টুকরো নাও। হাতের কাছে একটা রবারের সাধারণ বেলুন আগে থেকেই টেনে বাড়িয়ে একটু নরম করে রাখো। এবার বোতলের মধ্যে কিছুটা সালফিউরিক অ্যাসিডের (না পেলে বাড়ির বাথরুম পরিষ্কার করার মিউরিয়েটিক অ্যাসিডের) পাতলা জলীয় দ্রবণ ঢেলে চট করে বোতলের মুখে বেলুনের খোলা মুখটা লাগিয়ে হাত দিয়ে চেপে ধরো। একটু পরে দেখবে বেলুনটা কিছুটা ফুলে উঠেছে। বেলুনের খোলা মুখ সুতো দিয়ে বেঁধে ঘরের মধ্যে ছেড়ে দাও। কী ঘটে লক্ষ করো।
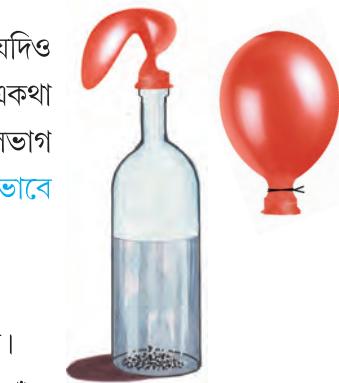
জিঙ্কের টুকরো না পেলে দস্তার প্রলেপ দেওয়া বেশ কয়েকটা লোহার সাধারণ পেরেক নিয়েও পরীক্ষাটা করতে পারো; এখানে জিঙ্কের সঙ্গে অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় যে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় সেটাই বেলুনের মধ্যে ভরতি হয়।

3. হাইড্রোজেন জলে প্রায় অদ্রাব্য।

4. হাইড্রোজেন নিজে জ্বলে, কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্যে করে না।

একটা টেস্টটিউবে কিছুটা জিঙ্কের গুঁড়ো নিয়ে তার মধ্যে কিছুটা সালফিউরিক অ্যাসিডের পাতলা জলীয় দ্রবণ দাও। দ্রবণের ভিতর দিয়ে বুদবুদের মতো একটা গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখবে। যদি টেস্টটিউবের মুখে সাবধানে একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি ধরো তবে দেখতে পাবে যে ওই বেরিয়ে আসা গ্যাসটা টেস্টটিউবের মুখে শব্দসহ দপ করে নীল শিখায় জ্বলে ওঠে এবং দেশলাই কাঠিটা নিভে যায়। এই পরীক্ষা করার সময় অবশ্যই শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

5. হাইড্রোজেনের তিনটে আইসোটোপ হলো $^{1}_{1}H$, $^{2}_{1}H$ এবং $^{3}_{1}H$, যদিও প্রকৃতিতে শেষ দুটোর পরিমাণ খুবই কম।

হাইড্রোজেনের রাসায়নিক ধর্ম

1. হাইড্রোজেন অণু দ্বিপরমাণুক। দুটি টাংস্টেন তড়িৎ দ্বারের সাহায্যে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ (2000°C) সৃষ্টি করে প্রায় শূন্য চাপে H_2 গ্যাস চালনা করলে H_2 অণু ভেঙে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে পরিণত হয়। একে পারমাণবিক বা সক্রিয় হাইড্রোজেন বলে। এই পারমাণবিক হাইড্রোজেন খুবই শক্তিশালী বিজারক।

2. দহনশীলতা ঃ হাইড্রোজেন গ্যাস দহনে সাহায্য করে না, কিন্তু নিজে দাহ্য। অক্সিজেনের সঙ্গে হাইড্রোজেন মিশিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে বিস্ফোরণসহ জ্বলে ওঠে ও স্টিম উৎপন্ন করে।

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$
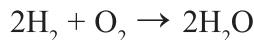
3. অধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঃ অধাতুর সঙ্গে হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে সেই অধাতুর হাইড্রাইড যৌগ উৎপন্ন করে।

(a) সাধারণ উষ্ণতায় অন্ধকারে ও জলীয় বাষ্পের অনুপস্থিতিতে ক্লোরিনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া হয় না। কিন্তু বিক্ষিপ্ত সূর্যালোকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন বিস্ফোরণসহ বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$$
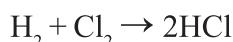
(b) উচ্চচাপে (প্রায় 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে) এবং উষ্ণতায় (550°C) লোহাচুর অনুঘটকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন যুক্ত হয়ে ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$
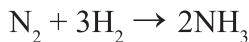
(c) হলুদ রং-এর সালফারকে তাপ দিয়ে গলিয়ে তার ওপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে পচা ডিমের দুর্গন্ধযুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$H_2 + S \rightarrow H_2S$$
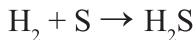
4. ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া : উত্তপ্ত লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালশিয়ামের ওপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে ধাতব হাইড্রাইড উৎপন্ন হয়।

$$2Na + H_2 \rightarrow 2NaH$$ (সোডিয়াম হাইড্রাইড)

$$Ca + H_2 \rightarrow CaH_2$$ (ক্যালশিয়াম হাইড্রাইড বা হাইড্রোলিথ)

5. বিজারণ ক্রিয়া : অক্সিজেনের প্রতি হাইড্রোজেনের বিশেষ আসক্তি দেখা যায়। অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি হওয়ায় হাইড্রোজেন বিজারকরূপে কাজ করে। উত্তপ্ত কালো কিউপ্রিক অক্সাইডের ওপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে, কিউপ্রিক অক্সাইড বিজারিত হয়ে লালচে-বাদামি রং-এর কপার উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন নিজে জারিত হয়ে জলে পরিণত হয়।

$$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$$

6. অন্তর্ধৃতি : কতকগুলো ধাতু বিশেষত প্যালাডিয়াম, প্লাটিনাম, আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাসকে অধিশোষণ করতে পারে। আবার উত্তপ্ত করলে এই শোষিত হাইড্রোজেন বেরিয়ে আসে। এই ঘটনাকে অন্তর্ধৃতি বলে এবং ধাতবপৃষ্ঠে শোষিত হাইড্রোজেনকে অন্তর্ধৃত হাইড্রোজেন বলে। পরীক্ষায় দেখা যায় সাধারণ হাইড্রোজেন অপেক্ষা অন্তর্ধৃত হাইড্রোজেন রাসায়নিকভাবে বেশি সক্রিয়।

হাইড্রোজেন (H_2) গ্যাস প্রস্তুতি

পূর্বপাঠের ভিত্তিকে কাজে লাগিয়ে নীচের সমীকরণের শূন্যস্থান পূরণ করো, প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও। প্রয়োজনে বিক্রিয়ার সমীকরণগুলোর সমতাবিধান করো।

A. 1. $Zn + H_2SO_4$ (লঘু) $\rightarrow ZnSO_4 + H_2$

2. $Mg + HCl$ (লঘু) $\rightarrow MgCl_2 +$ ________

3. $Fe + H_2SO_4$ (লঘু) $\rightarrow FeSO_4 + H_2$

4. $Al + HCl$ (লঘু) $\rightarrow AlCl_3 +$ ________

ওপরের সমীকরণ থেকে বিকারক থেকে বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপাদন সম্বন্ধে সাধারণ যে বিষয়টি জানলে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো ....

B. 1. $Na + H_2O$ (ঠান্ডা জল) $\rightarrow NaOH + H_2$

2. $Ca + H_2O$ (ঠান্ডা জল) $\rightarrow Ca(OH)_2 +$ ________

3. $Mg + H_2O$ (ফুটন্ত জল) $\rightarrow Mg(OH)_2 +$ ________

4. $Al + H_2O$ (ফুটন্ত জল) $\rightarrow Al(OH)_3 +$ ________

5. লোহিততপ্ত $Fe + H_2O$ (স্টিম) $\rightarrow Fe_3O_4 +$ ________

ওপরের সমীকরণগুলো থেকে তোমার সিদ্ধান্তগুলো নীচের ফাঁকা জায়গায় লেখো ....

....

C. 1. $Zn + 2NaOH$ (গাঢ় দ্রবণ) $\rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2$

2. $2Al + 2NaOH$ (গাঢ় দ্রবণ) $+ 2H_2O \rightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2$

উপরের সমীকরণগুলো থেকে তোমার বিক্রিয়ার ধরন সম্বন্ধে যা মনে হয় তা লেখো..........

....

এটাও তোমরা জেনে রেখো —

অধাতু সিলিকনের সঙ্গেও তীব্র ক্ষার (NaOH বা KOH) দ্রবণের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

$Si + 2NaOH + H_2O = Na_2SiO_3 + 2H_2$

D. সালফিউরিক অ্যাসিডযুক্ত জল (H_2O) $\xrightarrow{\text{তড়িৎ বিশ্লেষণ}}$ O_2 + ____________

জল ভালো তড়িৎ পরিবহণ করতে পারে না। জলের মধ্যে লঘু বেরিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ মিশিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাওয়া যায়।

E. $CaH_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 +$ ________

$LiH + H_2O \rightarrow LiOH +$ ________

CaH_2 বা LiH -কে ধাতব হাইড্রাইড বলে।

উপরের বিক্রিয়ার সমীকরণগুলো থেকে বিক্রিয়াজাত পদার্থ সম্বন্ধে তোমার যা মনে হয় তা লেখো.......

....

তাহলে তোমরা দেখলে নানাভাবে আমরা হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করতে পারি। এবার আমরা হাতেকলমে পরীক্ষাগারে কীভাবে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয় তা করে দেখি।

পরীক্ষাগারে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য :

1. অবিশুদ্ধ জিঙ্কের ছিবড়া 2. লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড 3. পাতিত জল

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম :

1. একটি উলফ বোতল 2. দীর্ঘনল ফানেল 3. উলফ বোতলের মুখের সচ্ছিদ্র কর্ক 4. নির্গমনল 5.কিছুটা রবারের নল 6. ভেসলিন

কী করলে	কী দেখলে	কী বুঝতে পারলে
চিত্রের মতো একটি উলফ বোতলে কিছুটা জিঙ্কের ছিবড়ে নাও। বোতলের একমুখে কর্কের মধ্য দিয়ে একটি দীর্ঘনল ফানেল এবং অপর মুখের মধ্যে দিয়ে একটি নির্গমনল লাগাও। দীর্ঘনল ফানেলের সাহায্যে উলফ বোতলের মধ্যে কিছুটা জল এমনভাবে ঢালো যেন দীর্ঘনলের শেষপ্রান্তটি জলের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। এবার নির্গমনলের অপর প্রান্তে ফুঁ দাও। (i) কী দেখবে? (ii) এবার নির্গমনলের মুখ বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরো এবং দীর্ঘনলে জলতল লক্ষ করো। যদি পাত্রটি বায়ুনিরুদ্ধ হয় তবে দীর্ঘনল ফানেলের সাহায্যে কিছুটা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড বোতলে ঢেলে দাও। (iii) অ্যাসিড জিঙ্কের সংস্পর্শে আসামাত্র তুমি কী দেখবে? (iv) কিছুটা গ্যাস বেরিয়ে যাবার পর নির্গম-নলটির শেষপ্রান্ত জলপূর্ণ গ্যাসদ্রোণির মধ্যে ডোবাও। এবার একটা জলপূর্ণ গ্যাসজার গ্যাসদ্রোণির উপর ছবির মতো করে বসাও ও কী ঘটে তা লক্ষ করো। (v) ওই গ্যাসজারের মধ্যে জমা গ্যাসে জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরলে তুমি কী দেখতে পাবে?	(i) দীর্ঘনল ফানেলের মধ্যে কিছুটা জল উঠল। (ii) যদি দেখো দীর্ঘনল ফানেলের জলতল আর নামছে না তার থেকে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পারো? তুমি কি বলতে পারো যে পাত্রটি বায়ুনিরুদ্ধ হয়েছে? .... (iii) .... (iv) .... (v) এই গ্যাসটি জ্বালালে সশব্দে নীলাভ শিখায় জ্বলে।	(i) .... (ii) .... (iii) .... রাসায়নিক বিক্রিয়া লেখো এবং গ্যাসটিকে শনাক্ত করো। .... (iv) .... (v) এই গ্যাসটি আগুনের সংস্পর্শে নিজে জ্বলে এবং গ্যাসটি বাতাসের থেকে হালকা। এই গ্যাস প্রস্তুতিতে তুমি কী কী সতর্কতা অবলম্বন করবে? ....

4 প্রকৃতিতে ও জীবজগতে বিভিন্নরূপে কার্বন যৌগের অবস্থান

বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার খবর তোমরা রোজই শুনছ। তোমরা শুনছ দূষণ কমাতে গাছ লাগানোর কথা। তাহলে গাছ লাগালে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমে কী করে? তাহলে তো জানতে হয় প্রকৃতিতে কার্বনঘটিত যৌগগুলো কীভাবে তৈরি হয় আর কীভাবেই বা অন্য যৌগে বদলে যায়।

প্রকৃতিতে কার্বনঘটিত যৌগের অবস্থান

কার্বন পরমাণুর বিশেষ কিছু ধর্মের (1. কার্বনের চতুর্যোজ্যতা ; 2. C, O, N, S এর সঙ্গে এক বা একাধিক বন্ধন গঠনের ক্ষমতা) জন্য জীবদেহের সমস্ত জৈব অণু তৈরিতে কার্বন অপরিহার্য। কার্বন নানারূপে প্রকৃতির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে —

1) মুক্ত অবস্থায় কার্বন— হিরে, কোক, গ্যাসকার্বন, গ্রাফাইট ইত্যাদি।

2) বিভিন্ন মৌলের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায়— জীবদেহ গঠনকারী মৌলদের মধ্যে অপরিহার্য হলো কার্বন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে কার্বন বিভিন্ন জৈব পলিমার যৌগ (প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, DNA, RNA, সেলুলোজ ইত্যাদি) ও নানা ক্ষুদ্র অণু (লিপিড, ATP ইত্যাদি) রূপে অবস্থান করে। প্রাণীদেহের হরমোন, সমস্ত রকমের প্রোটিন ইত্যাদির অণুর মধ্যেও কার্বন পরমাণু উপস্থিত। মানবদেহের মোট ভরের প্রায় 50 ভাগই কার্বনের ভর। শামুক, ঝিনুক ও অন্যান্য জলজ ক্ষুদ্রজীবের খোলায় আছে ক্যালশিয়াম কার্বনেট। পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাসের হাইড্রোকার্বন যৌগদেরও উপাদান কার্বন ও হাইড্রোজেন। শর্করা ও লিপিডের মধ্যে কার্বন প্রধানত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রোটিনের মধ্যে কার্বন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন আকরিকের [চুনাপাথর ($CaCO_3$), মার্বেল($CaCO_3$), ডলোমাইট($CaCO_3$,$MgCO_3$), ম্যাগনেসাইট ($MgCO_3$), ক্যালামাইন ($ZnCO_3$)] মধ্যেও কার্বন রয়েছে। কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসও কার্বন যৌগ। প্রাকৃতিক গ্যাসে উপস্থিত মিথেনের অণুতে কার্বন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে।

ডিএনএ অণুর মডেল

চুনাপাথর

রেশম, পশম বা পাট এগুলোও কার্বনঘটিত যৌগ। এথেকে আমাদের পোশাক তৈরি হয়। বর্তমান যুগে বিভিন্ন আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিক দ্রব্য, তৈরিতেও কার্বনের পলিমার ব্যবহৃত হয়। নানারকম জীবনদায়ী ওষুধও কার্বনের যৌগ। বিভিন্ন অ্যালকোহল, ক্লোরোফর্ম, বেঞ্জিন, টলুইন ইত্যাদি বিভিন্ন জৈব দ্রাবকও কার্বনেরই যৌগ।

টুকরো কথা

পৃথিবীর সর্বত্র (বায়ুমণ্ডলে, ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্রগর্ভে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে, বিভিন্ন খনিজ আকরিকে, এমন কী প্রাণী, উদ্ভিদ ও জীবাণুরাজ্যেও কার্বন বিভিন্নরূপে ছড়িয়ে আছে। খালিচোখে দেখে আমরা বুঝতে পারি না যে সারা পৃথিবী জুড়েই কীভাবে কার্বন যৌগদের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। কখনও পরিবেশ থেকে জীবদেহে আবার কখনও জীবদেহ থেকে পরিবেশে কার্বনের স্থানান্তর ঘটে। পরিবেশ ও জীবদেহের মধ্যে কার্বনের এই চক্রাকার আবর্তনই হলো কার্বন চক্র।

কার্বন চক্রের ধাপসমূহ

(1) পরিবেশ থেকে CO_2 — রূপে কার্বনের অপসারণ

(a) বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড আবদ্ধীকরণ

সবুজ গাছ, জলের শ্যাওলা ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে সরল খাদ্যে (গ্লুকোজ) পরিণত করে। পরে গ্লুকোজের পরিবর্তনে তৈরি হয় স্টার্চ ও অন্যান্য বহু জৈব যৌগ। বিভিন্ন জৈব যৌগ সংশ্লেষণকে একত্রে বলা হয় জৈব সংশ্লেষণ (Biosynthesis)। এর ফলে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড যৌগে আবদ্ধ হয় ও কোশের নানা স্থায়ী যৌগে পরিণত হয়। এই ধাপকে আমরা তাই বলব কার্বন আত্তীকরণ (Carbon assimilation)। কিছু অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া কার্বন মনোক্সাইডকে (CO) জৈব যৌগে রূপান্তরিত করতে পারে।

(b) সামুদ্রিক প্রাণীর খোলক গঠন

শামুক, ঝিনুক, ও কোরালজাতীয় প্রাণীরা জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে তাকে কার্বনেট যৌগে রূপান্তরিত করে ও তাকে খোলক গঠনের কাজে ব্যবহার করে।

(c) ধাতব কার্বনেট গঠন

স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইট

পরিবেশে বিভিন্ন ধাতব কার্বনেট খনিজ রূপে পাওয়া যায়। যেমন— মার্বেল, চুনাপাথর ও ডলোমাইট ইত্যাদি। বায়ুমণ্ডলের CO_2 শোষণ করে বিভিন্ন ধাতব কার্বনেট ($CaCO_3$,$MgCO_3$) গঠন করে। উদাহরণরূপে চুনাপাথরের গুহায় স্ট্যালাকটাইটের ও স্ট্যালাগমাইটের সুন্দর সুন্দর নানা আকৃতির কথা বলা যায়। এগুলো $CaCO_3$ দিয়ে তৈরি হয়।

(d) বৃষ্টির সময় কার্বনেট গঠন

বৃষ্টির সময় CO_2 জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) গঠন করে। কার্বনিক অ্যাসিড ভেঙে গিয়ে বাইকার্বনেট আয়ন (HCO_3^-) উৎপন্ন হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড সমুদ্রের জলে ক্যালশিয়ামের উপস্থিতিতে ক্যালশিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) গঠন করে। এটি পরে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

(2) পরিবেশে CO_2, CO, CH_4 — রূপে কার্বনের সংযোজন

(a) জীবের শ্বসন ও খাদ্যের জারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন

সবুজ উদ্ভিদ শ্বাসকার্যের সময় দেহে গ্লুকোজের জারণে তৈরি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। এটা সালোকসংশ্লেষের বিপরীত প্রক্রিয়া যেখানে CO_2 আবার পরিবেশে ফিরে যায়। সমস্ত তৃণভোজী জীব উদ্ভিদদেহ থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের ভাঙনে তৈরি CO_2 বাতাসে ফিরিয়ে দেয়। অন্যান্য পরভোজী জীবরা তৃণভোজী জীবদের দেহজ খাদ্য থেকে পুষ্টিলাভ করে। এর পাশাপাশি শ্বাসকার্যের মাধ্যমে তারাও বাতাসে CO_2 ফিরিয়ে দেয়।

(b) মৃত জীবদেহ থেকে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের মাধ্যমে জৈববস্তু পচন ও অন্যান্য পরিবর্তন

তোমরা সকলেই ভিজে কাঠ বা পাঁউরুটিতে ছাতা ধরতে দেখেছ। তোমরা জানো গরমকালে দুপুরে রান্না করা ডাল বা ভাতও জীবাণুর ক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়। মৃত জীবদেহের বা উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ জটিল অণুদের পরিবর্তন না ঘটলে পৃথিবী নানান বর্জ্যে ভরে উঠত। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে এইসব জটিল যৌগদের নানান পরিবর্তন ঘটায় ও সরলতর যৌগ তৈরি করে। এই সময় কিছু কার্বনঘটিত যৌগ মাটি ও জলে মেশে। কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ফিরেও যায়।

পৃথিবীর বিস্তৃত জলাভূমি - ধানখেত - বনভূমির মিথেন (CH_4) উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়া নানান উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিয়োজনে মিথেন তৈরি করে বাতাসে ছেড়ে দেয়। গবাদিপশুদের পাকস্থলীতে যেসব ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদের সেলুলোজ হজমে সাহায্য করে, তারাও মিথেন তৈরি করে। উইপোকাদের অন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুরাও মিথেন তৈরি করে বাতাসে ছেড়ে দেয়। এইভাবে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাওয়া মিথেন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। তাই মিথেন হলো অন্যতম গ্রিনহাউস গ্যাস।

(c) মানুষের জ্বালানি দহন, সিমেন্ট তৈরি, দাবানল ও অগ্ন্যুৎপাত

শক্তির প্রয়োজনে আমরা রোজই পুড়িয়ে চলেছি তেল-কয়লা-গ্যাস-কাঠ। এইসব জ্বালানির দহনে প্রত্যেক দিনই হাজার হাজার টন CO আর CO_2 বাতাসে মিশে যাচ্ছে। সিমেন্ট তৈরির জন্য প্রচুর চুন (CaO) লাগে। পোড়াচুন তৈরির সময় চুনাপাথরকে গরম করা হয়, আর রাসায়নিক বিক্রিয়া ($CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$) ঘটার সময় উৎপন্ন CO_2 বাতাসে মিশে যায়। প্রাকৃতিক নানান ঘটনা — দাবানল ও অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে দিয়েও বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড মিশে যায়।

(d) সমুদ্রে শোষিত CO_2-এর মুক্তি

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে মানুষের নানা কাজকর্মের ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিরাট অংশ (48%) শুষে নেয় সমুদ্রের জল। এর ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ততটা বাড়তে পারে না। পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে CO_2- শোষণকারী অ্যালগির (শৈবাল) CO_2 শোষণ ও ব্যবহার ক্ষমতা আগামী দিনে কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ফলে পরিবেশে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ আরও বেড়ে যেতে পারে।

(e) সামুদ্রিক প্রাণীর খোলকের দহন

শামুক, ঝিনুকের মৃত্যুর পর মানুষ তার প্রয়োজনে ওই খোলকগুলোকে পোড়ায়। ফলে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড মিশে যায়।

বহুরূপতা

নীচে তোমাদের নুন, তুঁতে আর ফটকিরির দানা কেমন দেখতে হয় তা দেখানো হলো।

নুন
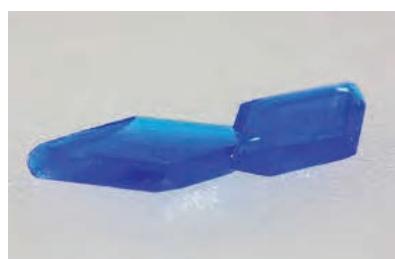
তুঁতে

ফটকিরি

সহজেই চোখে পড়বে যে এই দানাগুলোর জ্যামিতিক আকৃতি সুষম এবং সুন্দর। এই সুষম জ্যামিতিক আকৃতিবিশিষ্ট কঠিন দানাকে বলে কেলাস বা ক্রিস্টাল (Crystal)। শুধু যৌগদেরই যে ক্রিস্টাল হয় তা নয়, মৌলদেরও ক্রিস্টাল হতে পারে। যেমন সালফারের দু -রকম ক্রিস্টাল পাওয়া যায় : নীচের ছবি দুটো দেখো।

পরীক্ষা করো : একটুখানি গুঁড়ো সালফার জোগাড় করে কাচের টেস্টটিউবে নিয়ে সাবধানে গরম করো। গলে গেলে হালকা হলুদ রঙের তরল পাওয়া যাবে। তরলটা নিয়ে ফিল্টার কাগজে ঢেলে দাও। তরল জমে শুষ্ক হতে শুরু হলে ফিলটার কাগজটা খুলে নাও। হলুদ রঙের ছুঁচালো ক্রিস্টাল দেখতে পাবে। গরম করার আগে যে গুঁড়ো সালফার ছিল তাতে এমন ছুঁচালো ক্রিস্টাল ছিল না। এখন যে সালফার পাওয়া গেল তার ক্রিস্টালের গঠন আলাদা। এই দুটো হলো সালফারের দু-রকম রূপ। এদের বলা হয় সালফারের রূপভেদ
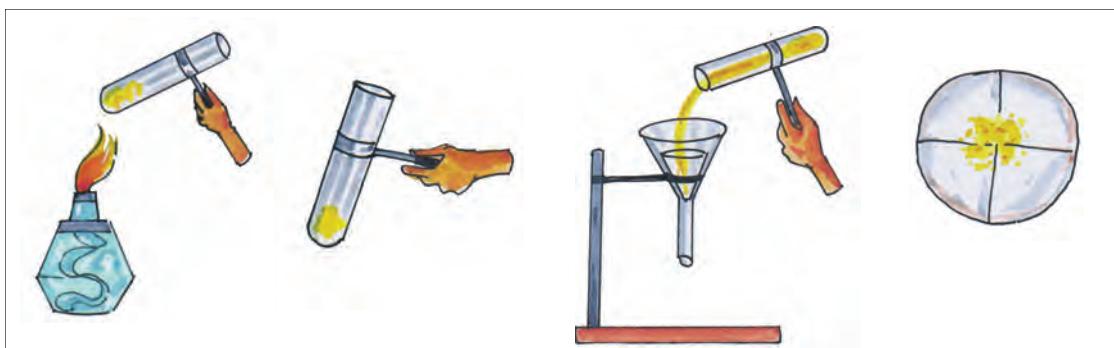
বা বহুরূপ (Allotrope)। যখন কোনো মৌলকে একাধিক ভৌতরূপে পাওয়া যায় তখন সেই ভৌতরূপগুলোকে মৌলটির বহুরূপ বলা হয়। সালফার ছাড়া কার্বন, ফসফরাস, বোরনের একাধিক বহুরূপ আছে। এছাড়াও গ্যাসীয় মৌল অক্সিজেনেরও বহুরূপতা দেখা যায়।

কার্বনের বহুরূপতা

কাঠকয়লা বা চারকোল

হিরে

গ্রাফাইট

ওপরে তোমাদের যেসব জিনিসের ছবি দেখানো হয়েছে তাদের একটা মিল আছে। এগুলো আলাদা রকমের দেখতে হলেও এরা সবাই কার্বন দিয়ে তৈরি। এগুলো হলো কার্বনের রূপভেদ।

মৌলের বহুরূপদের আণবিক গঠনে বা ক্রিস্টালের মধ্যে অণুদের পারস্পরিক অবস্থানে পার্থক্য থাকে। তাই মৌলের বহুরূপদের বিভিন্ন ভৌত ধর্মে (ঘনত্ব, রং, বিশেষ দ্রাবকে দ্রাব্যতা) পার্থক্য দেখা যায়। অনেক সময় বহুরূপগুলোকে বাইরে থেকে দেখতেও আলাদা হয়। কখনো কখনো একই মৌলের বহুরূপদের রাসায়নিক ধর্মেও বেশ কিছুটা পার্থক্য দেখা যায় (লাল ও সাদা ফসফরাস, অক্সিজেন ও ওজোন)।

তাপমাত্রা ও চাপ পরিবর্তন করে অনেকসময় একটা বহুরূপ থেকে অন্য বহুরূপে পরিবর্তন (আন্তঃপরিবর্তন) ঘটানো যায়। ওপরে তোমরা সালফার নিয়ে এই পরীক্ষাই করেছ। তবে সবসময় এই আন্তঃপরিবর্তন ঘটানো সহজ নাও হতে পারে। কার্বনের বহুরূপগুলোর আন্তঃপরিবর্তন সহজসাধ্য নয়।

কার্বনের রূপভেদগুলোকে সাধারণত দু-ভাগে ভাগ করা হয় ; (1) নিয়তাকার (Crystalline) ও (2) অনিয়তাকার (Amorphous)। নিয়তাকার ও অনিয়তাকার এই শ্রেণিবিভাগ পদার্থগুলোর বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয় তার ভিত্তিতে করা হয়। বর্তমানে উন্নত পরীক্ষায় জানা গেছে যে কার্বনের অনিয়তাকার রূপভেদগুলো প্রকৃতপক্ষে গ্রাফাইটেরই অতি ক্ষুদ্র ক্রিস্টালের সমষ্টি। কার্বনের নিয়তাকার রূপভেদগুলোর মধ্যে অণুর গঠনে অনেক পার্থক্য থাকে বলে নানান ভৌতধর্মে অনেকটা পার্থক্য দেখা যায়।

গ্রাফাইট ও হিরের গঠন ও ভৌতধর্মের তুলনা

গ্রাফাইট তোমরা দেখেছ, তার গুঁড়ো নিয়ে খেলাও করেছ নিশ্চয়ই। কোথায়? — কোনো পেনসিলের শিস ছুঁচালো করার সময় যে ধুলোর মতো গুঁড়োটা বেরোয় সেটাই তো গ্রাফাইটমিশ্রিত গুঁড়ো। পেনসিলের শিসের গুঁড়োটা নিয়ে আঙুল ঘষে দেখলে দেখা যায় কী সহজেই না আঙুলে পিছলে গেল। পাশের ছবিতে ↘ বোঝাচ্ছে আঙুল দিয়ে গুঁড়োর ওপর বল প্রযুক্ত হলো। → বোঝাচ্ছে গ্রাফাইটের গুঁড়োগুলোর ওপর আঙুল যেদিকে পিছলে গেল।

কেন এমন হয়? তাহলে তো জানতে হয় গ্রাফাইটের আণবিক গঠন কী রকম। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষায় হিরে

আর গ্রাফাইটের গঠন সম্বন্ধে যা জেনেছেন নীচে ছবিতে দেখানো হলো। ছবিতে ● C পরমাণু বোঝাচ্ছে।
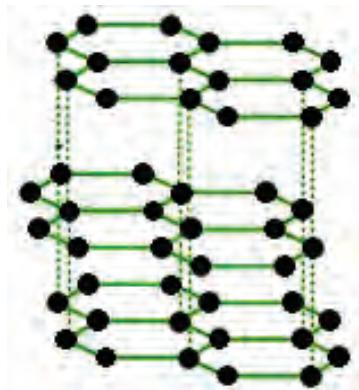
গ্রাফাইটের আংশিক গঠন
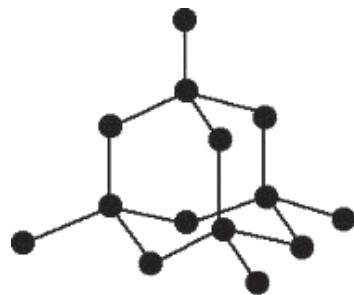
হিরের আংশিক গঠন

ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে যে গ্রাফাইটের নমুনায় কার্বন পরমাণুরা বিভিন্ন সমান্তরাল স্তরে সাজানো থাকে। পরীক্ষায় আরো একটা জিনিস বোঝা যায় — স্তরগুলোর মধ্যে দূরত্ব বেশি এবং আকর্ষণ বল বেশ দুর্বল। এর ফলে ওপরের স্তরে বল প্রযুক্ত হলে সে নীচের স্তরের ওপর দিয়ে পিছলে সরে যেতে পারে। এই কারণেই পেনসিলের শিসের গুঁড়োর ওপর দিয়ে তোমার আঙুল সহজে পিছলে গিয়েছিল। হিরের অণুর গঠনে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে কার্বন পরমাণুরা মোটেই এমন স্তরবিভক্ত থাকে না। সেখানের ত্রিমাত্রিক জালের মতো গঠনে গ্রাফাইটের মতো ফাঁকফোকর নেই, কার্বন পরমাণুরাও পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। এই কারণে হিরে (1) গ্রাফাইটের চেয়ে অনেক শক্ত এবং (2) হিরের ঘনত্ব গ্রাফাইটের ঘনত্বের চেয়ে বেশি।

- তেলের খনি খোঁড়ার যন্ত্রের যে মুখটা পাথর কেটে নীচে নামে সেখানে কী ব্যবহার করা উচিত — হিরে না গ্রাফাইট?

- কোনো যন্ত্রের পিচ্ছিলকারক হিসেবে কোনটি ব্যবহৃত হতে পারে — তেল আর হিরের গুঁড়োর মিশ্রণ না, তেল আর গ্রাফাইটের গুঁড়োর মিশ্রণ?

তাপ পরিবাহিতা

ঘরের উষ্ণতায় গ্রাফাইট ও হিরে দুটোই তাপের সুপরিবাহী। ঘরের উষ্ণতায় (25^0C) হিরের তাপ পরিবাহিতা যে কোনো ধাতুর চেয়ে বেশি। এই কারণে এখন কৃত্রিম হিরের সূক্ষ্ম পাতের ওপর ইলেকট্রনিক বর্তনী (Circuit) তৈরি করা হয়। বর্তনীতে উৎপন্ন তাপ হিরের পাতের মধ্যে দিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে বর্তনী ঠান্ডা থাকে এবং ভালোভাবে কাজ করতে পারে।

তড়িৎ পরিবাহিতা

গ্রাফাইট তড়িতের সুপরিবাহী তাই গ্রাফাইট দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণের তড়িৎ দ্বার তৈরি করা হয়। হিরে কার্যত তড়িতের কুপরিবাহী।

রাসায়নিক সক্রিয়তা

যথেষ্ট অক্সিজেনের মধ্যে পোড়ালে হিরে আর গ্রাফাইট দুটোই দেয় কার্বন ডাইঅক্সাইড। কিন্তু সাধারণভাবে দেখলে গ্রাফাইটের চেয়ে হিরের রাসায়নিক সক্রিয়তা অনেক কম।

ফুলারিন

কার্বনের আর একটি রূপভেদ ফুলারিন প্রথমে গবেষণাগারে ও পরে প্রকৃতিতে পাওয়া গেছে। ফুলারিনগুলো হিরে বা গ্রাফাইটের মতো অতিবৃহৎ অণু নয়। কোনো কোনো ফুলারিন অণুতে 60, 70 টি কার্বন পরমাণু থাকে। পাশে তোমাকে C_{60} অণুর গঠন দেখানো হলো। ইলেকট্রনিক্সে ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে ফুলারিনদের অনেক ব্যবহার থাকতে পারে বলে এখন ফুলারিন নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। ছবিতে ● দিয়ে কার্বন পরমাণু বোঝানো হয়েছে।
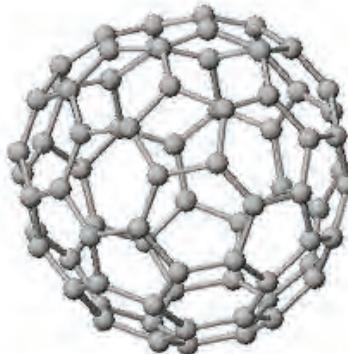
C_{60} ফুলারিন অণু

অনিয়তাকার রূপভেদ

কার্বনের অনিয়তাকার রূপভেদগুলোর নানান ব্যবহার আছে। কোক লাগে ধাতুনিষ্কাশনে আর জ্বালানি হিসেবে। চারকোল বা অঙ্গারের গুঁড়ো দিয়ে জল পরিশোধন করা যায়। চারকোল তার উপরিতলে অনেকরকম পদার্থের অণুকে ধরে রাখতে পারে। একে বলে অধিশোষণ ধর্ম।

একটা পরীক্ষা করো : চারকোলের অধিশোষণ ধর্ম

একটু কাঠকয়লা জোগাড় করে গুঁড়ো করে নাও। একটা মাঝারি শিশিতে অর্ধেক জল দিয়ে তাতে খানিকটা কালি বা রং গুলে নাও। এবার এর মধ্যে কাঠকয়লার গুঁড়ো ঢেলে ছিপি বন্ধ করে ভালো করে ঝাঁকাও। তারপর বেশ কিছুক্ষণ রেখে দাও। এবার মিশ্রণটিকে ফিলটার করো। ফিলটার করার আগে ও পরে কালি বা রঙের গাঢ়ত্বে কী কোনো তফাত দেখতে পাচ্ছ?

চারকোলের এই অধিশোষণের ধর্ম গ্যাস পরিশোধনে কাজে লাগানো হয়। বিশেষভাবে তৈরি চারকোল তার পৃষ্ঠতলে অনেক গ্যাস অণুকে ধরে রাখতে পারে। একে বলা হয় সক্রিয় চারকোল (Activated Charcoal)। বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচতে গ্যাস-মুখোশে সক্রিয় চারকোল ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিজ্জ পদার্থ (কাঠ, চিনি, নারকোলের খোলা) বা প্রাণীজ পদার্থ (রক্ত, হাড়)— এসবকে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করে চারকোল পাওয়া যায়। কার্বনের অন্য রূপভেদগুলোর মধ্যে ভুসোকালি অনেক সময় কাজল বা ছাপার কালি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গ্যাস কার্বন দিয়ে ব্যাটারির বা অন্য তড়িৎকোশের তড়িৎ দ্বার তৈরি করা হয়।
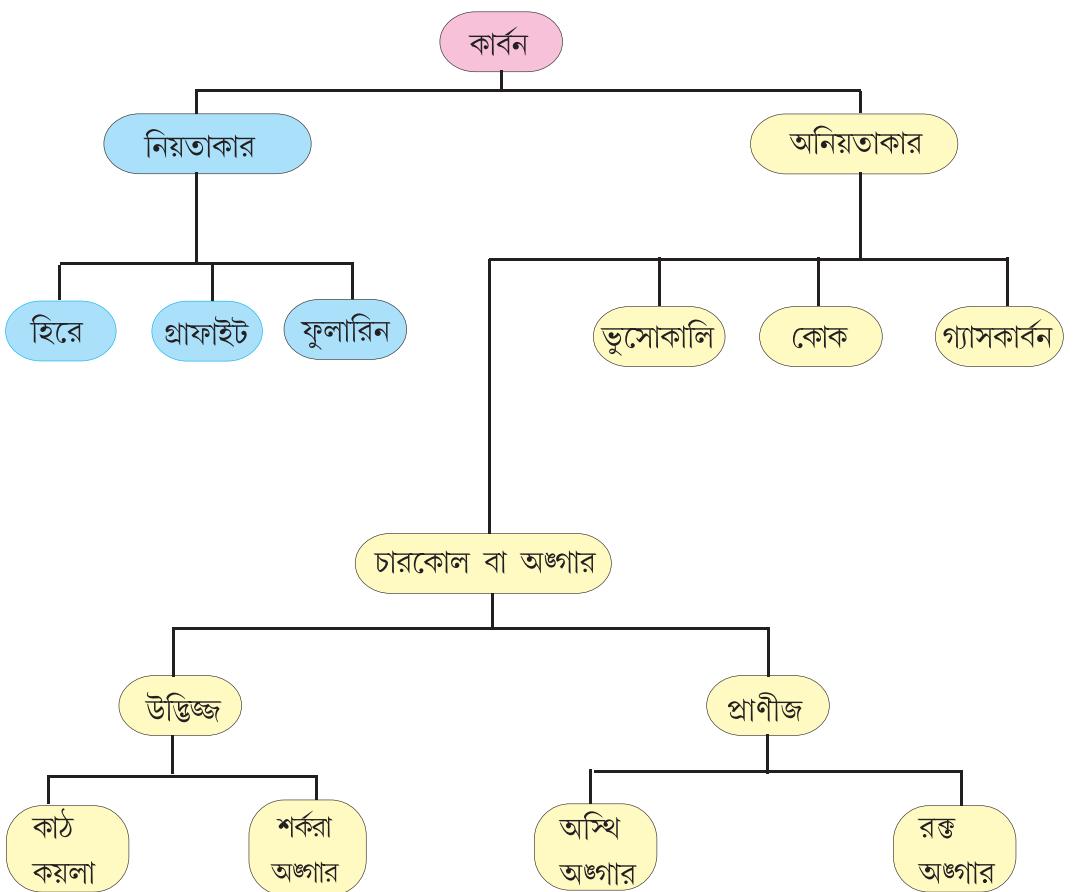
নিয়তাকার ও অনিয়তাকার এই শ্রেণিবিভাগ পদার্থগুলোর বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয় তার ভিত্তিতে করা হয়। কার্বনের অনিয়তাকার রূপভেদগুলো প্রকৃতপক্ষে গ্রাফাইটেরই অতি ক্ষুদ্র ক্রিস্টালের সমষ্টি। সম্প্রতি গ্রাফিন(Graphene) বলে কার্বন পরমাণু দিয়ে গঠিত একরকম পদার্থের কথা জানা গেছে। ন্যানোপ্রযুক্তিতে (Nanotechnology) গ্রাফিনের নানান প্রয়োগ থাকতে পারে বলে গবেষণা চলছে।

জ্বালানি মূল্য বা ক্যালোরি মূল্য

ধরো তোমাকে একটা পাত্রে জল নিয়ে কাঠ, কয়লা ও রান্নার গ্যাস (LPG) ব্যবহার করে গরম করতে বলা হলো। কোন জ্বালানিটা তুমি ব্যবহার করবে?

এককথায় বলা তোমাদের পক্ষে একটু মুশকিল। কারণ এই জ্বালানিগুলো পুড়ে কতটা তাপ উৎপন্ন করতে পারে সে সম্বন্ধে তোমাদের কোনো ধারণা নেই। তোমাদের সুবিধার জন্য নীচে পরিচিত কয়েকটা জ্বালানি পুড়ে কতটা তাপ উৎপন্ন করতে পারে তার একটা তুলনামূলক লেখচিত্র দেওয়া হলো। এখানে তুলনা করা হয়েছে প্রত্যেকটা জ্বালানির 1 কেজি সম্পূর্ণ দহনের ফলে যে পরিমাণ তাপ (শক্তি) উৎপন্ন হয় তার মানগুলোর মধ্যে। একেই আমরা তাপন মূল্য বা ক্যালোরি মূল্য (Calorific value) বলে থাকি। একে কিলোক্যালোরি/কেজি (kcal / kg) এককে প্রকাশ করা হয়।

জ্বালানির তাপন মূল্য (10^3 kcal / kg)
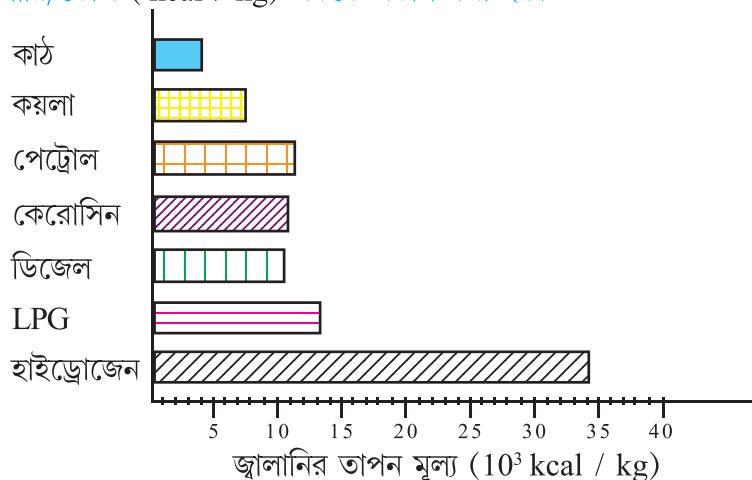
ওপরের চিত্রটা দেখে এখন তুমি বলতে পারবে কাঠ, কয়লা আর রান্নার গ্যাসের মধ্যে কোনটা ব্যবহার করা সবচেয়ে সুবিধাজনক? ____________________________।

এর কারণ হলো তিনটে জ্বালানিই সমপরিমাণ পোড়ালে এদের মধ্যে রান্নার গ্যাস থেকেই সবচেয়ে বেশি তাপ পাওয়া যায়।

এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে বিভিন্ন জ্বালানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার সময় তার তাপন মূল্য জানা জরুরি। কারণ, একই জ্বালানি পুড়িয়ে সবরকম কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। মহাকাশে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাতে রকেট লাগে। রকেটে যে প্রচণ্ড গতির সৃষ্টি করতে হয়, তার জন্যও জ্বালানি লাগে। ওপরের লেখচিত্রটা থেকে বলতে পারো কেন অন্য সব জ্বালানি বাদ দিয়ে রকেটে জ্বালানি হিসেবে তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করা হয়? ______________________।

জ্বালানি সংরক্ষণ

মানবসভ্যতার প্রথম সোপান বলতে যদি কিছু বোঝায় তবে তা হলো মানুষের আগুন জ্বালাতে শেখা। এই আগুনই প্রথম মানুষকে দিয়েছিল অন্ধকারে আলো, যাকে মানুষ গ্রহণ করে জ্ঞানের আলোরূপে। আগুন হলো শক্তির প্রতীক —তাপ ও আলোর ভাণ্ডার। আর তার উৎস হলো জ্বালানি।

আমরা নিজেদের নানা প্রয়োজনে তিন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করি— (i) কঠিন, (ii) তরল ও (iii) গ্যাসীয়।

আমাদের চেনা কয়েকটি জ্বালানির নাম নীচের সারণিতে দেওয়া হলো। তাদের কোনো ব্যবহার জানা থাকলে তা যোগ করো।

অবস্থা	জ্বালানির নাম	জ্বালানির ব্যবহার
কঠিন	কাঠ	রান্না করতে,
	কয়লা	রান্না করতে, বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে, ইট তৈরিতে
তরল	কেরোসিন	
	পেট্রোল	
	ডিজেল	
গ্যাসীয়	রান্নার গ্যাস (LPG)	
	সংনমিত প্রাকৃতিক গ্যাস (CNG)	গাড়ি চালাতে

দেখা যাচ্ছে জ্বালানি হিসাবে আমরা যে সমস্ত পদার্থের ব্যবহার করছি তাদের বেশিরভাগই খনিজ, আরো ভালোভাবে বলতে গেলে এগুলো হলো জীবাশ্ম জ্বালানি। খনিতে জ্বালানির পরিমাণ সীমিত, কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদা ক্রমবর্ধমান । এর সঙ্গে আরো কারণ আছে— বেশি নগরায়ন ও আরো বেশি যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা। এইভাবে জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদা কীভাবে বেড়েছে?
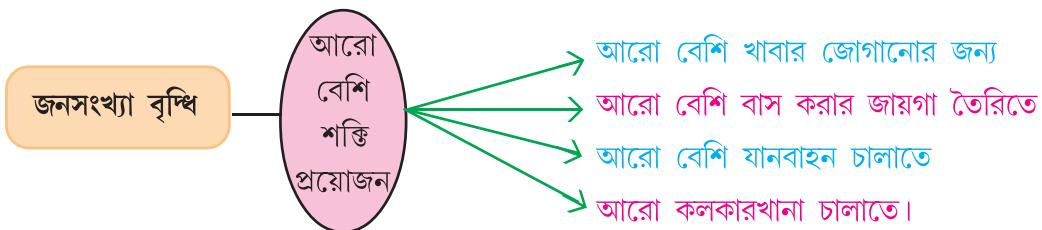
আর জ্বালানি থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তার ওপরে আরো বেশি করে নির্ভর করতে হচ্ছে এই চাহিদা মেটাতে । একটা হিসাবে দেখা গেছে আজ পর্যন্ত যে পরিমাণ জ্বালানি মানুষ পুড়িয়েছে তার মাত্র শতকরা 10 ভাগ পুড়িয়েছে 1900 সাল পর্যন্ত, আর গত শতাব্দীতে পুড়িয়েছে বাকি প্রায় 90 ভাগ। এর থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় বর্তমান মানব সভ্যতার জ্বালানি ক্ষুধা কতটা।

তাই এখন প্রশ্ন উঠেছে— এই বিপুল শক্তি জোগান দিয়েও কীভাবে অবশিষ্ট জ্বালানি দিয়ে আরও বেশি দিন চালানো যায়, অর্থাৎ জ্বালানি সংরক্ষণের। এই কাজটা করতে হলে কয়েকটা বিষয়ে নজর দিতে হবে।

(i) আমরা জানি, লক্ষ লক্ষ বছর আগের বিভিন্ন সময়ে মাটির তলায় চাপা পড়েছে উদ্ভিদদেহ। আর তা থেকেই তৈরি হয়েছে কয়লা, তার মধ্যে আছে কিছু উচ্চমানের (যাদের তাপন মূল্য বেশি), আবার অনেক নিম্নমানের কয়লাও আছে। কিন্তু ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ দেওয়া হয়নি, ফলে অনেক উচ্চমানের কয়লাও ব্যবহার হয়েছে বিভিন্ন কম প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, এমনকি রান্নার কাজেও। কিছু ক্ষেত্র আছে,

যেমন—তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যেখানে উচ্চমানের কয়লা জোগান দেওয়া খুবই দরকারি। এই ধরনের কাজের জন্যেই শুধুমাত্র উচ্চমানের কয়লার ভাণ্ডার সংরক্ষণ করা দরকার। প্রয়োজনে অন্য কোনো সমতুল্য জ্বালানি ব্যবহার করা যায় কিনা তাও দেখা প্রয়োজন।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে তাপ দিয়ে বয়লারে জল ফোটানো হয় আর তৈরি হওয়া গরম স্টিমের চাপে ঘোরে টারবাইনের চাকা। খারাপ মানের কয়লা থেকে কম তাপ তৈরি হয়। ফলে জল ফুটবে কম আর জলের মধ্যে থাকা অদ্রাব্য পদার্থ তাড়াতাড়ি থিতিয়ে পড়বে বয়লারের মধ্যে; তাতে বয়লারের ক্ষতি। আবার কম স্টিম তৈরি হলে বিদ্যুৎ উৎপাদনও কম।

(ii) কয়লাখনি অঞ্চলে দেখা যায় কয়লা খনি থেকে তোলা আর তা বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে নানা জায়গায় পাঠানোর সময় অনেক কয়লা নষ্ট হয়, গুঁড়ো হয়ে যায়। কখনও বা অসতর্কতার ফলে কয়লাখনি এলাকায় ভূগর্ভে আগুন ধরে যায়। এতেও নষ্ট হয় বড়ো এলাকার কয়লার ভাণ্ডার। তাই খনি এলাকায় আরো সতর্কভাবে কাজ করা উচিত।

কয়লা পরিশোধনের পদ্ধতিকে **coal-washing** বলে। এর ফলে কয়লার মধ্যে থাকা নানা অশুদ্ধি দূর করে কম ধোঁয়া ও কম ছাই উৎপাদনকারী কয়লা তৈরি করা হয়। ভারতে এখনও পর্যন্ত 17টা coal-washery আছে। 2013 সালের সেপ্টেম্বর মাসে আরো 16 টা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার।

(iii) কয়লা পরিশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নমানের কয়লা থেকে উচ্চমানের কয়লা উৎপাদনের দিকে লক্ষ দিয়ে এই ধরনের কয়লাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। এইভাবে যে সমস্ত কয়লার ব্যবহার সীমিত ছিল, তা আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

(iv) পেট্রোলিয়ামজাত জ্বালানি তেল পরিবহণের একটা কম খরচের ও বড়ো মাধ্যমই হলো জলপথে পরিবহণ। কিন্তু অনেক সময়ই অসতর্কতার ফলে নদী, সমুদ্রে তেল ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এর ফলে একদিকে যেমন বহুমূল্য জ্বালানির অপচয় হয় তেমনি ক্ষতি হয় জলে বসবাসকারী জীবজগতের। এরকম ঘটনার কথা তোমরা সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনে দেখে থাকবে, এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দিলে অনেকটাই ক্ষতি এড়ানো যায়।

(v) উপযুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা (বিশেষত নিম্নমানের কয়লা) ও খনিজ তেল থেকে অন্যান্য আরো ভালো জ্বালানি তৈরি করা যেতে পারে, যারা একইসঙ্গে দূষণও কম করবে। এভাবেও মূল জীবাশ্ম জ্বালানি সঞ্চয়ের আয়ু দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে।

(vi) প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎস থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস নষ্ট হতে না দিয়ে তার সংরক্ষণ ও প্রয়োজনমতো ব্যবহারে এই ধরনের জ্বালানির অপচয় বন্ধ হতে পারে।

(vii) জ্বালানিবিহীন যানবাহন, যেমন—জলপথে যন্ত্রবিহীন নৌকো বা স্থলপথে সাইকেল , ইত্যাদির ব্যবহার বাড়ালেও জ্বালানির সাশ্রয় সম্ভব। এবিষয়ে — নিউজিল্যান্ড বা আমাদের প্রতিবেশী দেশ চিনে সাইকেল ব্যবহারের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।

(viii) ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার না করে যথাসম্ভব গণপরিবহণ ব্যবস্থার সাহায্য নিলেও কিছুটা হলেও জ্বালানির সাশ্রয় হতে পারে।

বিকল্প জ্বালানি

এছাড়াও বহুব্যবহৃত জ্বালানিগুলোর বিকল্প হিসাবে অন্যান্য শক্তি উৎসের কথা ভাবা যেতে পারে। যেমন— (i) সৌরশক্তি, (ii) বায়ুশক্তি, (iii) ভূ-তাপ শক্তি, (iv) জোয়ারভাটার শক্তি,(v) জৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি, (vi) পারমাণবিক শক্তি।

শক্তির কয়েকটা বিকল্প উৎস সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক—

(i) সৌরশক্তি :

সৌরতাপ ও আলো দক্ষভাবে সংগ্রহ করে কাজে লাগানো যায়। সৌরতাপের সাহায্যে বয়লার চালিয়ে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। বড়ো মাপের আয়না (দর্পণ) ব্যবহার করে বৃহৎ সৌরচুল্লি তৈরি করে তা থেকে উচ্চ উষ্ণতা পাওয়া সম্ভব। সৌর উনুন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে লাভজনক হলেও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ সৌরশক্তি ব্যবহারের মূল প্রতিবন্ধকতা হলো জলবিদ্যুতের মতো সৌরবিদ্যুতেও প্রাথমিক যন্ত্রাদি স্থাপন ও পরিচালন ব্যয় বেশি, প্রায় সমতুল্য। তাই ব্যয় কমিয়ে সৌরশক্তির ব্যবহার বর্তমান শতাব্দীতে একটা মুখ্য ভূমিকা নেবে, এমন আশা করা যেতেই পারে। বর্তমানে সৌরশক্তির ব্যবহার ক্রমবর্ধমান।

(ii) বায়ুশক্তি :

সূর্যের তাপের প্রভাবে এক জায়গার বাতাস অন্য জায়গায় বয়ে যায়। তৈরি হয় বায়ুপ্রবাহ—এটা আমরা জানি। বয়ে যাওয়া বাতাসেরও গতিশক্তি আছে। এই শক্তি কাজে লাগিয়ে যদি বড়ো পাখা লাগানো টারবাইনের চাকা ঘোরানো যায় তাহলেই বিদ্যুৎশক্তি তৈরি হবে। তার জন্যে কোনো প্রচলিত শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। আমাদের রাজ্যের ফ্রেজারগঞ্জে গেলে দেখতে পাবে কেমনভাবে সমুদ্রের ধারের জোর হাওয়া কাজে লাগিয়ে ঘোরানো হচ্ছে বায়ুকল।

(iii) ভূ-তাপ শক্তি :

আমাদের রাজ্যের বক্রেশ্বরের নাম শুনেছ? সেখানে কী আছে বলোতো? — গরম জলের কুণ্ড, যাকে উষ্ণপ্রস্রবণ বলা হয়। ভারতের আরো কোথায় এমন আছে? — ওড়িশার তপ্তপানি, হিমাচল প্রদেশের মণিকরণ, গুজরাতের তুয়া ইত্যাদি। এই সমস্ত জায়গায় গেলে দেখা যাবে ছোটো পুকুরের মতো জায়গায় জল সবসময়েই গরম হয়ে আছে, আর তা থেকে জলের বাষ্প উঠছে। কীভাবে এই জল গরম হলো? — আমরা তো জানি যে মাটির তলায় পৃথিবীর ভেতরটা এখনও গরম। কতটা গরম? পৃথিবীর কেন্দ্রের উষ্ণতা প্রায় $6000^{\circ}C$ । আর আগ্নেয়গিরিতে যে গলিত ম্যাগমা বেরোতে দেখা যায় তা খুবই কম একটা অংশ, বেশিরভাগটাই ভূপৃষ্ঠের 5 থেকে 20 কিমি গভীরে থেকে যায়। যখন এই গলিত শিলা ঠান্ডা হয়ে তরল থেকে কঠিন অবস্থা পেতে শুরু করে, তখন প্রচুর পরিমাণ তাপ ছেড়ে দেয়। আর তার কাছের শিলাস্তর তখন গরম হয়ে যায়। প্রকৃতির খেয়ালে

মাটির তলার জলের স্তর যখন গরম পাথরের স্তরের কাছাকাছি এসে যায় তখন তাও গরম হয়ে যায়। এইভাবেই ভূ-তাপ শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। এত অফুরন্ত সেই শক্তির ভাণ্ডার, তা আমরা এখনও সেভাবে কাজেই লাগাতে পারিনি। মাটিতে নল ঢুকিয়ে এই গরম জল থেকে পাওয়া স্টিম দিয়ে সরাসরি টারবাইনের চাকা ঘুরিয়ে তৈরি করা যায় বিদ্যুৎ। যদি তা সম্ভব না হয়,তবে নল দিয়ে ঠান্ডা জল মাটির গভীরে ঢুকিয়ে, গরম করে আনা যায় বাইরে। শক্তির জোগান দেবে পৃথিবীর ভেতরের তাপ।
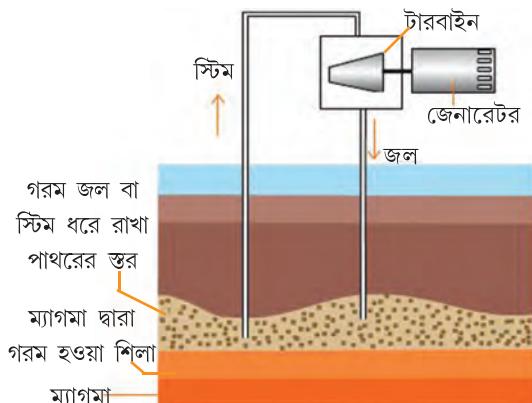
(iv) জোয়ারভাটার শক্তি :

সারাদিনের বিভিন্ন সময়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দু-বার করে জোয়ারভাটা আসে। আর তা স্রোতের মতো বয়ে নিয়ে যায় নদী-সমুদ্রের জলকে। বায়ুশক্তিকে কাজে লাগাতে গেলে যেমন সূর্যের কিরণ বা সূর্যালোক থেকে বায়ুস্তর গরম হওয়া ও তার ফলে বায়ুস্রোত তৈরি হওয়া জরুরি, এখানে কিন্তু সেই অসুবিধা নেই। কেন বলো তো?—কারণ, জোয়ারভাটা দিনে দু-বার করে হবেই, আর সেইসঙ্গে জলের স্রোত তৈরি হবেই। এই স্রোতের গতিশক্তির সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে তৈরি করা যায় বিদ্যুৎ। তাই জোয়ারভাটার শক্তি জলবিদ্যুতেরই অন্য একটা রূপ। আবার সমআয়তনের বাতাসের চেয়ে জল বহুগুণ ভারী, তাই জলস্রোত দিয়ে ঘনভাবে রাখা ব্লেডযুক্ত টারবাইনের চাকা অনেক জোরে ঘোরানো যায়। এভাবে বায়ুকলের থেকে এটা অনেক কার্যকর হতে পারে বিদ্যুৎ উৎপাদনে। যেহেতু এই শক্তি ব্যবহারের আগে কোনো পূর্ববর্তী শক্তি (back-up energy) ব্যবহারের দরকার নেই, সেজন্য আমাদের মতো নদীমাতৃক ও তিনদিক সমুদ্র দিয়ে ঘেরা দেশের সম্ভাবনা প্রচুর।

(v) জৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি

a. জৈব দাহ্যপদার্থ (বায়োমাস) :

কাঠ-পাতা, আখের ছিবড়ে, ধানের তুষ ইত্যাদি বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাড়ির জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিছু কিছু শিল্পপ্রক্রিয়াতেও এই ধরনের বর্জ্য জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই জ্বালানির মূল অসুবিধা হলো এদের দহনজনিত দূষণ। কিন্তু ইদানীং এই দূষণ কমিয়ে বর্জ্য দাহ্যপদার্থ থেকে শক্তি আহরণে নিত্যনতুন উদ্ভাবন ঘটে চলেছে।

b. জৈব গ্যাস :

জৈব আবর্জনা বাতাসের অনুপস্থিতিতে জীর্ণকরণ (digestion) করে পাওয়া গ্যাসকে জৈব বা বায়োগ্যাস বলা হয়। এটা সম্পূর্ণ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই অবায়বীয় জীর্ণকরণ প্রক্রিয়ায় মূলত মিথেন (CH_4) উৎপন্ন হয় বলে ঘটনাকে জৈব মিথেন উৎপাদন (biological methane production) নামে অভিহিত করা হয়। গার্হস্থ্য, শিল্পজাত ও কৃষিজাত জৈব আবর্জনা এই কাজে ব্যবহার করা হয়।

গার্হস্থ্য জৈব আবর্জনার মধ্যে মূলত তরিতরকারি ও ফলমূলের খোসা, খাদ্যবিশেষ ইত্যাদি পড়ে এমন পৌরনিকাশি জল ও নালা-নর্দমার আবর্জনা বোঝায়। শিল্পজাত জৈব আবর্জনা বলতে বোঝায় খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ সংস্থার বর্জ্য ও নিকাশি জল। আর কৃষিজাত আবর্জনা বলতে মূলত উদ্ভিদের বর্জ্য অংশ ও পশুখামার থেকে পাওয়া গবাদিপশুর মল বোঝায়। তাই বলা যায় এই অবায়বীয় জীর্ণকরণ প্রক্রিয়ায় মিথেন উৎপাদন শুধুমাত্র শক্তি উৎপাদনের জন্য নয়, দূষণ নিয়ন্ত্রণেও এর একটা বিরাট ভূমিকা আছে।

c. বায়োফুয়েল :

বায়োফুয়েল বলতে বোঝায় উদ্ভিদ বা অণুজীবের মধ্যে আত্তীকরণ হওয়া কার্বনঘটিত যৌগ থেকে তৈরি জ্বালানি। শর্করা বা স্টার্চসমৃদ্ধ আখ বা ভুট্টা থেকে সন্ধান প্রক্রিয়ায় বায়োইথানল (আসলে ইথাইল অ্যালকোহল) তৈরি হয়। বিদেশে বহু জায়গায় গ্যাসোলিনের সঙ্গে এটা মিশিয়ে যানবাহন চালানো হয়।

উদ্ভিজ্জ তেল অথবা প্রাণীর চর্বি থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বায়োডিজেল তৈরি করা হয়। এটিও যানবাহন চালানোয় ডিজেলের বিকল্প জ্বালানি। আধুনিক গবেষণায় পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে কিছু শ্যাওলা জাতীয় অথবা অন্যান্য অণুজীবও প্রোটিন থেকে জৈবজ্বালানি বা বায়োফুয়েল তৈরি করতে সক্ষম। আমাদের দেশে জৈব জ্বালানি (বায়োফুয়েল) উৎপাদন বলতে প্রধানত জ্যাট্রোফা গাছ চাষ ও তার বীজ থেকে তৈরি তেলের প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বায়োডিজেল তৈরিকেই বোঝায়। আমাদের দেশেরই প্রত্যন্ত এলাকায় বা জঙ্গলের কাছাকাছি থাকেন এমন মানুষেরা বহুযুগ ধরেই জ্যাট্রোফার তেল ব্যবহার করে আসছেন। পরিশোধন না করেই জ্যাট্রোফার তেল ডিজেল জেনারেটর বা ইঞ্জিনে ব্যবহার করা যায়। যেহেতু এই গাছ চাষের জন্য শুকনো বা চাষের প্রায় অযোগ্য জমিই যথেষ্ট, তাই অন্যান্য জৈব জ্বালানি, ভুট্টা বা আখ থেকে পাওয়া অ্যালকোহল অথবা পাম অয়েল, ডিজেল ইত্যাদির তুলনায় এর উৎপাদন ভারতের মতো দেশের পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে খুবই লাভজনক হতে পারে। একইসঙ্গে বহু মানুষের কর্মসংস্থানও হতে পারে।

(vi) কঠিন আবর্জনা (Solid Waste) :

বর্তমানে পৃথিবীর বহু শহরে কঠিন আবর্জনা পুড়িয়ে স্টিম এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। অবশ্য এক্ষেত্রে বায়ুদূষণের দিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(vii) পারমাণবিক শক্তি :

পরমাণুর গঠন জানতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে নিউট্রন আর প্রোটনগুলো একটা শক্তি দিয়ে আবদ্ধ থাকে। তাকে নিউক্লীয় বন্ধনশক্তি বলে। যদি পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে বিশেষ একটা প্রক্রিয়ায় ভাঙা যায় তবে প্রচুর শক্তি বেরিয়ে আসে। এই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলেই বিদ্যুৎ পাওয়া

যায়। এভাবেই তৈরি হয়েছে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। বিদেশে তো বটেই আমাদের দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রের তারাপুর, কেরলের কালাপক্কম, তামিলনাড়ুর কুড়ানকুলাম, গুজরাতের কাকরাপাড় ইত্যাদি জায়গায় ইতিমধ্যেই উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। আরো অনেক জায়গায় কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। 2032 সাল নাগাদ আমাদের দেশে 63000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। কিন্তু রাশিয়ার চেরনোবিল বা জাপানের ফুকুসিমার দুর্ঘটনা থেকে হওয়া তেজস্ক্রিয় দূষণের বিপদের কথা মাথায় রেখে আমাদের এবিষয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলা জরুরি। সাধারণ মানুষের কাছে পরমাণু বিদ্যুৎ এখনও ঠিক গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

জ্বালানির দহনে পরিবেশের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ :

উত্তরোত্তর জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি পরিবেশের ওপর নানারকম কুপ্রভাব ফেলে।

1. কাঠ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানি দহন থেকে অদাহ্য (Unburnt) কার্বন কণা পরিবেশে মিশে যায়। এগুলো অ্যাজমা(হাঁপানি)-র মতো শ্বাসজনিত রোগ সৃষ্টি করে।

2. কম অক্সিজেনে এই সমস্ত জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহনে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয় যা অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস। তাই বন্ধ ঘরে কাঠ বা কয়লা পোড়ানো খুবই ক্ষতিকারক। তাই বন্ধ ঘরে কাঠ বা কয়লা জ্বালিয়ে কোনো মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে মারাও যেতে পারেন।

3. অধিকাংশ জ্বালানির দহনের ফলে পরিবেশে কার্বন, সালফার ও নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড মিশে যায়। এইভাবে পরিবেশে CO_2 বেড়ে যাওয়াই বিশ্ব-উষ্ণায়নের প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

4. কয়লা ও ডিজেল পোড়ালে সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, যা একটা ক্ষয়কারী (Corrosive) ও অত্যন্ত শ্বাসরোধী গ্যাস। আবার পেট্রোল ইঞ্জিন থেকে নাইট্রোজেনের একাধিক গ্যাসীয় অক্সাইড উৎপন্ন হয়। বৃষ্টির জলে সালফার ও নাইট্রোজেনের অক্সাইড গুলে গিয়ে অ্যাসিড উৎপন্ন করে। একেই অ্যাসিড বৃষ্টি বলা হয় যা শস্য, ঘরবাড়ি ও মাটির পক্ষে ক্ষতিকারক।

তাই পেট্রোল, ডিজেলের মতো জ্বালানির বদলে যানবাহনে CNG ব্যবহার করা শুরু হয়েছে, কারণ CNG থেকে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ ক্ষতিকারক পদার্থ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ CNG একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার (Cleaner) জ্বালানি।

জ্বালানি ব্যবহার, দূষণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে তোমার মতামত লেখো।

কার্বন ডাইঅক্সাইড

কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাতাসে এক শতাংশেরও কম বলে তা বলে ভেবো না কার্বন ডাইঅক্সাইড কোনো কাজে লাগে না। আগেই আমরা কার্বন চক্রে পড়েছি প্রকৃতিতে কী কাজে লাগে কার্বন ডাইঅক্সাইড। এবার আমরা রাসায়নিক শিল্পেও কার্বন ডাইঅক্সাইডের কিছু ব্যবহারের কথা জানব।

রাসায়নিক শিল্পে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যবহার

রাসায়নিক কারখানায় প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড। কীসে লাগে লক্ষ লক্ষ টন কার্বন ডাইঅক্সাইড?

1. ইউরিয়া তৈরি :

ফসল ফলাতে চাই নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সার। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত নাইট্রোজেনঘটিত সার হল ইউরিয়া। কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় ইউরিয়া তৈরি করা হয়।

$$CO_2 + 2NH_3 \xrightarrow[\text{150 atm চাপ}]{200^{o}\,C} \underset{\text{ইউরিয়া}}{CO(NH_2)_2} + H_2O$$

2. কাচ তৈরি :

কাচ ছাড়া আজকের সভ্যতা অচল — আয়না, চশমার কাচ, অণুবীক্ষণ, ক্যামেরা, টেলিস্কোপের লেন্স, ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি পরীক্ষাগারের নানারকম যন্ত্রপাতি, গাড়ি বা জানালার কাচ, বালব, টিউবলাইট, ঘড়ির কাচ, ওষুধের শিশি ..... কাচ ছাড়া কিছুই হবে না। এত কাচ তৈরিতে সোডা (Na_2CO_3) চাই। ওই সোডা তৈরিতে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড লাগে।

3. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র এবং কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতিতে :

নানান ধরনের পানীয় তৈরিতে আর আগুন নেভাতে কার্বন ডাইঅক্সাইড লাগে, যদিও তেল ও ধাতু ঘটিত আগুনে এটা ব্যবহার করা যায় না। কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সাধারণ তাপমাত্রায় প্রায় 60 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে তরলে পরিণত হয়। এই তরল কার্বন ডাইঅক্সাইডের ওপর থেকে হঠাৎ চাপ কমালে তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রুত বাষ্পায়িত হতে চায়। এর ফলে তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড কঠিনে পরিণত হয়। এই কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইডকে শুষ্ক বরফ বলা হয়। কঠিন কার্বন ডাইঅক্সাইড খুব ঠান্ডা (-78^{o} C), তাই খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

সারা পৃথিবীর বাতাসে CO_2-র মোট পরিমাণ যথেষ্ট হলেও 100 ভাগ ওজনের বাতাসে তা আছে 1 ভাগেরও কম। বুঝতেই পারছ বাতাস থেকে CO_2 সংগ্রহ করে তাই দিয়ে রাসায়নিক শিল্প গড়া সম্ভব নয়। তোমরা নীচে কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ লক্ষ করো যেখানে ধাতব কার্বনেট বা বাইকার্বনেট থেকে বিভিন্ন ভাবে CO_2 গ্যাসটি উৎপন্ন করা হয়েছে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণগুলো শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সাহায্যে পূরণ করে সমতাবিধান করো। এই বিক্রিয়ার কোন কোন শর্ত CO_2 উৎপন্ন হওয়া প্রভাবিত করতে পারে তা তোমরা শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের সারণিতে লেখো।

A. ধাতব কার্বনেট বা বাইকার্বনেটের সঙ্গে লঘু অ্যাসিডের বিক্রিয়া দ্বারা CO_2 গ্যাস উৎপাদন :

(i) $PbCO_3 + 2HNO_3 = Pb(NO_3)_2 + CO_2 + H_2O$

(ii) $CaCO_3 + 2HCl =$ ______ $+ CO_2 + H_2O$

(iii) $Na_2CO_3 + H_2SO_4 =$ ______ $+ CO_2 + H_2O$

(iv) $MgCO_3 +$ ______ $= MgCl_2 + CO_2 +$ ______

(v) $NaHCO_3 + HCl = NaCl +$ ____ $+ H_2O$
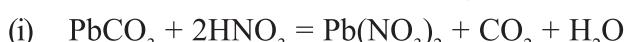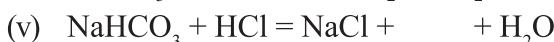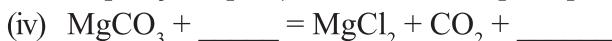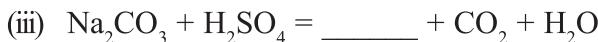
$PbSO_4$, $PbCl_2$ ও $CaSO_4$ জলে অদ্রাব্য। $PbCO_3$-র সঙ্গে লঘু HCl বা H_2SO_4 ব্যবহার করে কি দ্রুত CO_2 গ্যাসটি পাওয়া যেতে পারে? ....।

B. ধাতব কার্বনেট বা বাইকার্বনেটকে তাপ প্রয়োগ করে CO_2 গ্যাস উৎপাদন

(i) $CaCO_3 \xrightarrow{\text{উচ্চ তাপমাত্রা}(1000^o C)} CaO + CO_2$

(ii) $2NaHCO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$

(iii) $PbCO_3 \xrightarrow{\text{উচ্চ তাপমাত্রা}}$ ______ + ______

(iv) $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{\text{সাধারণ তাপমাত্রা}}$ ______ + ______ + ______

(v) $Mg(HCO_3)_2 \xrightarrow{\text{সাধারণ তাপমাত্রা}} MgCO_3 + CO_2 + H_2O$
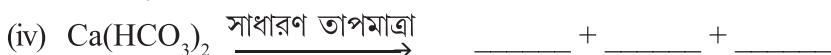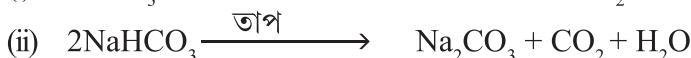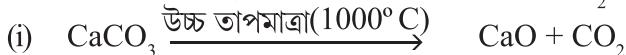
$Ca(HCO_3)_2$ এবং $Mg(HCO_3)_2$ কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায় না। তাই এদের জলীয় দ্রবণকে উত্তপ্ত করা হয় CO_2 গ্যাস উৎপাদনের জন্য। এইসব বাইকার্বনেট লবণ বাতাসের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় CO_2 গ্যাস নির্গত করে ধাতব কঠিন কার্বনেট লবণে পরিণত হয়।

C. কার্বনকে বাতাসে পোড়ালেও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় : $C + O_2 = CO_2$

নীচের শর্তগুলো কীভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে তা সারণিতে লেখো

কার্বনেট/বাইকার্বনেট কঠিন বলে তাকে বেশি সংখ্যায় টুকরো করলে	কার্বনেট/বাইকার্বনেটের জলীয় দ্রবণের গাঢ়ত্ব পরিবর্তন করলে	কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত অ্যাসিডের গাঢ়ত্বের পরিবর্তন করলে	বিক্রিয়ার তাপমাত্রা বাড়ালে / কমালে

তাহলে তোমরা দেখলে ধাতব কার্বনেট, বাইকার্বনেটকে ব্যবহার করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করা যায়। এবার তোমরা জানবে পরীক্ষাগারে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস তৈরি করা হয়।

পরীক্ষাগারে কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য:
মার্বেল পাথর ($CaCO_3$) ও
লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl)

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম: উলফ বোতল, দীর্ঘনল ফানেল, নির্গমনল, গ্যাসজার

আগের পৃষ্ঠায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রস্তুতির ছবি দেওয়া আছে।

এবার তুমি ওই ছবিটি ভালো করে লক্ষ করো এবং কীভাবে পরীক্ষাগারে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করা যায় তা নীচের সারণিতে লিখে রাখো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

কী করবে	কী দেখবে	কেন এমন হয়
		$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2 + H_2O$ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসের চেয়ে ভারী বলে গ্যাস-জারের ভেতরের বাতাসকে সরিয়ে জারের মধ্যে জমা হতে পারে।

ক্যালশিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$) বা ক্যালশিয়াম নাইট্রেট ($Ca(NO_3)_2$) জলে দ্রাব্য। তাই লঘু HCl বা HNO_3 অ্যাসিডদুটি $CaCO_3$-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে CO_2 উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু H_2SO_4 নিয়ে পরীক্ষা করলে প্রথমে সামান্য CO_2 গ্যাস বেরোবার পর বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ $CaCO_3$-র সঙ্গে লঘু H_2SO_4 বিক্রিয়ায় উৎপন্ন ক্যালশিয়াম সালফেট ($CaSO_4$) জলে খুব একটা দ্রাব্য নয়। তাই মার্বেলকুচির উপর $CaSO_4$-এর পাতলা আস্তরণ পড়ে যায়। ফলে মার্বেলকুচি আর অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসতে না পারার জন্য বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের নানান ধর্ম

ভৌত ধর্ম : কার্বন ডাইঅক্সাইড বর্ণহীন, বাতাসের চেয়ে ভারী একটা গ্যাস। জলে খানিকটা দ্রাব্য। কার্বন ডাইঅক্সাইডের ধর্মগুলো বুঝতে নীচের পরীক্ষাগুলো লক্ষ করো।

1. কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসের চেয়ে ভারী:

পরীক্ষা 1

একটা রবারের বেলুন নেওয়া হলো। নীচের ছবির মতো করে একটা বোতলের মুখে তাকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে আটকানো হলো। বোতলে গুঁড়ো খাবার সোডার মধ্যে ভিনিগার (অ্যাসেটিক অ্যাসিড দ্রবণ) ঢালা হয়েছে।
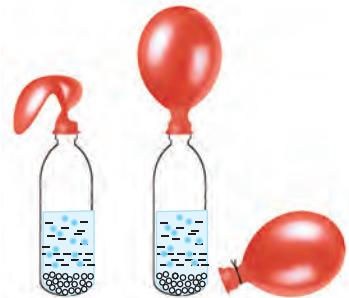
(i) একটু পরে তুমি বেলুনটার কী পরিবর্তন দেখবে?

(ii) এবার বেলুনটাকে খুলে নিয়ে যদি তার মুখটাকে বেঁধে দাও তবে দেখবে বেলুনটা হাওয়ায় ভেসে থাকছে না, টেবিলে পড়ে থাকবে। এ থেকে বোঝা যায় কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসের চেয়ে ________।

(iii) যদি বেলুনটায় হাইড্রোজেন ভরা হতো তাহলে কী হতো?

পরীক্ষা 2

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো
1. 2 নং পরীক্ষার ছবির মতো A ও B গ্যাসজার নাও। A গ্যাসজার কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্বারা পূর্ণ এবং B গ্যাসজারে বাতাস আছে। A ও B গ্যাসজারের ভিতর জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরো। 2. এবার উপরের ছবির মতো করে B গ্যাসজারের উপর A গ্যাসজার উপুড় করে ধরো। কিছুক্ষণ পর আবার A ও B গ্যাসজারের ভিতর জ্বলন্ত পাটকাঠি ধরো।	1. A ও B গ্যাসজারের মধ্যে জ্বলন্ত পাটকাঠির অবস্থা কী হলো। ....। 2. A ও B গ্যাসজারের মধ্যে জ্বলন্ত পাটকাঠির অবস্থা কী হলো। ....।	1. .... 2. ....

2. কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলে দ্রবীভূত হয় :

হাতেকলমে

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো
1. উপরের ছবির মতো A গ্যাসজারের ছবির মতো করে পাতিত জল নাও। ওই জলের মধ্যে লাল লিটমাস ও নীল লিটমাস কাগজ যোগ করো। 2. উলফ বোতল থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গম নলের মাধ্যমে A গ্যাসজারের জলের মধ্যে ছবির মতো করে পাঠাও। বেশ কিছুক্ষণ জলের মধ্যে বুদবুদ ওঠার পর গ্যাসজারের জলের মধ্যে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ ডোবাও।	1. লাল লিটমাস কাগজ ও নীল লিটমাস কাগজের বর্ণের কী কোনো পরিবর্তন হলো? ....। 2. নীল ও লাল লিটমাস কাগজের কি পরিবর্তন হলো? ....।	1. .... 2. ....

বেশি চাপে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস জলে অনেক বেশি পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। তোমরা নিশ্চয় দেখেছ কোল্ডড্রিংকস্-এর বোতল খুললে বুদবুদ আকারে প্রচুর ফ্যানা বোতলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

এমন কেন হয় বলে তোমার মনে হয়?

....।

কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রাব্যতা: কার্বন ডাইঅক্সাইড জলে অল্প দ্রাব্য, চাপ বাড়লে দ্রাব্যতা বাড়ে। জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রাব্য বলেই জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ করতে পারে, শামুক-ঝিনুকের খোলা তৈরি হওয়া সম্ভব হয়। তোমার দেহের রক্তে কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি দ্রবীভূত না হতো তাহলে দেহের নানান অঙ্গ থেকে ফুসফুসে CO_2 পৌঁছোতে পারত কী?

কার্বন ডাইঅক্সাইডের রাসায়নিক ধর্ম:

1. দাহ্যতা:

হাতেকলমে

কার্বন ডাইঅক্সাইড নিজে দাহ্য নয় বা অন্য কোনো বস্তুকে দহনে সাহায্য করে না তা তোমরা আগেই পরীক্ষা করে জেনেছ। এবার ছবির মতো করে একটি কার্বন ডাইঅক্সাইডপূর্ণ গ্যাসজারে একটি জ্বলন্ত ম্যাগনেশিয়ামের ফিতা প্রবেশ করাও।

কী দেখবে	কেন এমন হলো
দেখা যাবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যেও ম্যাগনেশিয়াম ফিতাটা উজ্জ্বল শিখায় জ্বলছে।	কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে জ্বলন্ত ম্যাগনেশিয়াম বিক্রিয়া করতে পারে। আর তার ফলে সাদা রঙের ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের গুঁড়ো এবং কালো কার্বন উৎপন্ন হবে। $2Mg + CO_2 = 2MgO + C$

জ্বলন্ত সোডিয়াম বা পটাশিয়ামের টুকরো কার্বন ডাইঅক্সাইডপূর্ণ গ্যাসজারে প্রবেশ করালে সোডিয়াম বা পটাশিয়াম জ্বলতে দেখা যাবে।

$$4Na + 3CO_2 = 2Na_2CO_3 + C \qquad 4K + 3CO_2 = 2K_2CO_3 + C$$

2. জলের সঙ্গে বিক্রিয়া: CO_2 গ্যাসকে জলে দ্রবীভূত করে লিটমাস পরীক্ষার সাহায্যে তোমরা জেনেছ যে CO_2 গ্যাসের অ্যাসিড ধর্ম বর্তমান।

জলের সঙ্গে CO_2-এর বিক্রিয়ায় কী হয় তা তোমরা নীচের বিক্রিয়ার সমীকরণ পূর্ণ করলেই বুঝতে পারবে।

$$H_2O + CO_2 = _______$$

এই বিক্রিয়ার জন্যই দূষণহীন, নির্মল পরিবেশের বৃষ্টির জলও সামান্য আম্লিক হয়।

3. ক্ষার বা ক্ষারকের সঙ্গে বিক্রিয়া:

Na_2O, $NaOH$, $Ca(OH)_2$, $Mg(OH)_2$ প্রভৃতিকে নিয়ে ভিজে লাল লিটমাস দ্বারা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে লাল লিটমাস নীল হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, এইসব ধাতব অক্সাইড ও হাইড্রক্সাইডগুলোর ক্ষারকীয় ধর্ম বর্তমান। CO_2 একটি আম্লিক অক্সাইড। ক্ষার বা ক্ষারকের সঙ্গে এর বিক্রিয়ায় কী হয় তা তোমরা পরীক্ষা করে জানতে পারবে। জেনে রাখো $CaCO_3$ জলে অদ্রাব্য কিন্তু $Ca(HCO_3)_2$ জলে দ্রাব্য।

অল্প CO_2 গ্যাস চালনা করলে চুনজলের অবস্থা

বেশি CO_2 গ্যাস চালনা করলে চুনজলের অবস্থা

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো
1. ছবির মতো একটা কাচের পাত্রে কিছুটা পরিষ্কার চুনজল [$Ca(OH)_2$ দ্রবণ] নাও। এবার উলফ বোতল থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে চুন জলের মধ্যে দিয়ে চালনা করো।	1. চুনজলের অবস্থা : ....।	1. বিক্রিয়ার সমীকরণ পূর্ণ করে ব্যাখ্যা করো। $Ca(OH)_2 + CO_2 =$ —— $+ H_2O$
2. ওই ঘোলা চুনজলের মধ্যে দিয়ে বেশি পরিমাণ CO_2 বেশিক্ষণ ধরে চালনা করো।	2. চুনজলের অবস্থা : ....।	2. অদ্রাব্য ক্যালশিয়াম কার্বনেট থেকে দ্রাব্য বাইকার্বনেট উৎপন্ন হয় $Ca(OH)_2 + CO_2 + H_2O = Ca(HCO_3)_2$

- বাড়িতে চুনকাম করার জন্য পোড়াচুনে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয়। দু-তিনদিন পরে কলিচুন থিতিয়ে পড়ার পর স্বচ্ছ চুনজলের ওপরে সরের মতো আস্তরণ পড়তে দেখেছ কখনও ?

(i) এই আস্তরণটা হলো ক্যালশিয়াম কার্বনেটের ($CaCO_3$)। কী করে হলো?

....।

(ii) এই আস্তরণ খানিকটা যোগাড় করে টেস্টটিউবে নিয়ে লঘু HCl দিলে কী দেখবে? সমীকরণসহ লেখো।

....।

(iii) একটা টেস্টটিউবে খানিকটা স্বচ্ছ চুনজল নিয়ে তার মধ্যে একটা স্ট্র দিয়ে ফুঁ দিতে থাকো। দেখবে সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে দ্রবণ ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। তোমার নিশ্বাসে যদি CO_2 থাকে তাহলে ওই সাদা অধঃক্ষেপ কীসের বলে তোমার মনে হয়? বিক্রিয়ার সমীকরণ লেখো।

....।

ওপরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নীচের সমীকরণগুলোর শূন্যস্থান পূরণ করো ও ব্যাখ্যা করো:

রাসায়নিক বিক্রিয়া	ব্যাখ্যা
(i) $2NaOH + CO_2 =$ ________ $+ H_2O$ (ii) $Mg(OH)_2 + CO_2 =$ ________ + ______ (iii) $2KOH + CO_2 =$ ________ $+ H_2O$	

CO_2-এর জারণ ক্ষমতা:

লোহিততপ্ত কার্বন, জিঙ্কচূর্ণ বা ম্যাগনেশিয়ামচূর্ণের উপর দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস চালনা করলে নীচের বিক্রিয়াগুলো ঘটে। বিক্রিয়ার সমীকরণ দেখে কোন পদার্থ জারিত হয়েছে ও কে বিজারিত হয়েছে ব্যাখ্যা করো:

রাসায়নিক বিক্রিয়া	কে জারিত ও কে বিজারিত হয়েছে ব্যাখ্যা দাও
(i) $C + CO_2 = 2CO$ (ii) $2Mg + CO_2 = 2MgO + C$ (iii) $Zn + CO_2 = ZnO + CO$	

গ্রিনহাউস এফেক্ট

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ রোদ্দুরে দাঁড়ালে গরম লাগে, ভিজে গামছা রোদ্দুরে রাখলে শুকিয়ে যায়। গরমকালে দুপুরবেলা টিনের চাল কেমন তেতে ওঠে তোমরা জানো। এত তাপ আসে কোত্থেকে? সূর্যের আলোয় ইনফ্রারেড বলে একরকমের অদৃশ্য রশ্মিও থাকে। প্রধানত ইনফ্রারেড রশ্মিই তাপের অনুভূতি সৃষ্টি করে। সোজা কথায় একে আমরা বলতে পারি তাপতরঙ্গ।

মে মাসের রোদ্দুরে রাস্তায় দাঁড়ানো জানালা-দরজা বন্ধ করা গাড়ির মধ্যে রাস্তার চেয়ে বেশি গরম বোধ হয়। গরমকালের দুপুরে কাচের জানালা বন্ধ থাকলে ঘরের মধ্যেও অসহ্য গরম বোধ হয়। এর কোনোটা কী কখনও লক্ষ করেছ? কেন এমন হয়?

কাচের মধ্যে দিয়ে সূর্যালোকের ইনফ্রারেড রশ্মি গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে ও নানান জিনিসকে গরম করে তোলে। তোমরা জানো যে তাপকে পুরোপুরি ধরে রাখা যায় না। গাড়ির মধ্যে জিনিসগুলোও একসময় ইনফ্রারেড রশ্মি ছেড়ে দিতে থাকে। এখন দরকারি কথাটা হলো এই যে সূর্যের আলোর সঙ্গে যে ইনফ্রারেড এসেছিল তার শক্তি ছিল বেশি, আর গরম জিনিসগুলোর ছেড়ে দেওয়া ইনফ্রারেডের শক্তি কিছুটা কম। এই ছেড়ে দেওয়া ইনফ্রারেড রশ্মি যদি কাচের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারত তাহলে কিন্তু গাড়ির ভেতরটা অতটা গরম হয়ে উঠত না। কাচের মধ্যে দিয়ে কম শক্তির ইনফ্রারেড রশ্মি বেরোতে পারে না বলেই গাড়ির ভেতর বা কাচের জানালা লাগানো ঘরও তেতে ওঠে।

সূর্য থেকে যে ইনফ্রারেড রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়ে বাতাসের নানান গ্যাসের অণুরা তাকে শুষে নিতে পারে না। পৃথিবী এই ইনফ্রারেড রশ্মির শক্তি শুষে নিয়ে গরম হয়ে ওঠে। শুষে নেওয়া তাপশক্তির কিছুটা মাটি-জল-পরিবেশের নানান পদার্থের অণুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বাকি শক্তিটুকু পৃথিবী আবার

ইনফ্রারেড রশ্মি হিসেবে ছেড়ে দেয়। বাতাসে থাকা কিছু কিছু গ্যাসের অণুরা এই ছেড়ে-দেওয়া, কম শক্তির ইনফ্রারেড রশ্মিকে শুষে নেয়। এইসব গ্যাস হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), জলীয় বাষ্প (H_2O), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), মিথেন (CH_4), ওজোন (O_3) এবং ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন যৌগগুলো। এই গ্যাস অণুদের ইনফ্রারেড শোষণ ও পুনর্বিকিরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে কিছুটা তাপ আটকে পড়ে, সবটুকু মহাকাশে ফিরে যেতে পারে না। একেই বলে 'গ্রিনহাউস এফেক্ট' (Greenhouse Effect)। অক্সিজেন (O_2) বা নাইট্রোজেন (N_2) কিন্তু গ্রিনহাউস গ্যাস নয়। এরা ইনফ্রারেড রশ্মিকে শুষে নিতে পারে না।

বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস আসে কোথা থেকে
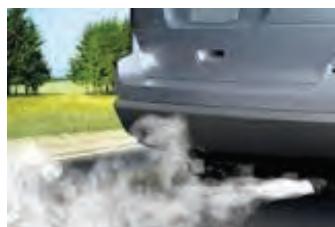
তেল-কয়লা-প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জ্বালানি পোড়ানো, সিমেন্ট তৈরির কারখানায় চুনাপাথর গরম করা— এসব থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস বাতাসে মেশে।

মাটিতে যেসব ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া থাকে তারা নাইট্রেটকে ধাপে ধাপে বিজারিত করার সময় নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) ও নাইট্রোজেন (N_2) তৈরি হয়ে বাতাসে মেশে।

মিথেন আসে কোথা থেকে? পৃথিবীর বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত-জলাভূমি-বর্ষাঅরণ্যের মেথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া মিথেন তৈরি করে চলেছে। গবাদিপশুদের পাকস্থলীর রুমেন প্রকোষ্ঠ ও উইপোকাদের অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াও মিথেন তৈরি করে বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে।
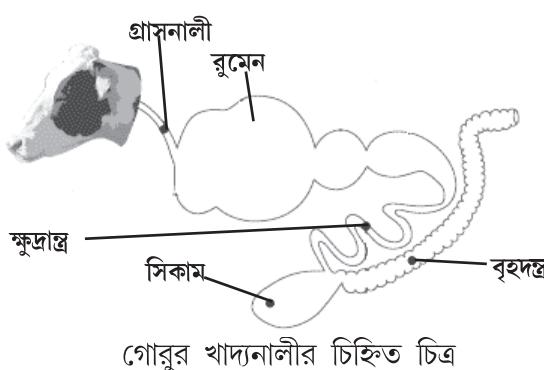
গোরুর খাদ্যনালীর চিহ্নিত চিত্র
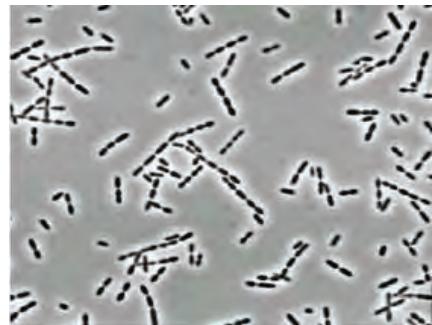
মেথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়া

তবে আমাদের আসল চিন্তার কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডে তৈরি কার্বন ডাইঅক্সাইড যার পরিমাণ গত তিনশো বছরে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়তে থাকলে একসময় গ্রিনহাউস এফেক্টের জন্য বাতাসের উষ্ণতা বেড়ে যাবে। তখন উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর বরফের স্তর গলে গিয়ে সমুদ্রের ধারের বহু শহরকে ডুবিয়ে দেবে। গ্রিনহাউস এফেক্টের ফলে বাতাসের উষ্ণতা বৃদ্ধির এই সম্ভাবনাকে বলা হচ্ছে বিশ্বউষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং (Global Warming)। উষ্ণায়নের ফলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর বহু অংশে খরা দেখা দিতে পারে, কৃষিজ উৎপাদন কমে যেতে পারে, জীববৈচিত্র্য হ্রাস পেতে পারে। উষ্ণতা বৃদ্ধি মশার বংশবৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠলে মশাবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে।

কার্বনঘটিত পলিমার ও তার ব্যবহার

আমাদের চারপাশের বিভিন্ন দিকে লক্ষ করলেই আমরা নানারকম ক্ষেত্রে প্লাস্টিক বা পলিথিনের ব্যবহার দেখতে পাই। একটু ভালো করে দেখলেই দেখতে পাবে প্লাস্টিক, পলিথিন, থার্মোকল, নাইলন — এইসব পদার্থের তৈরি নানা অব্যবহৃত জিনিস বা তার অংশবিশেষ বর্জ্য হিসাবে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরনের পদার্থ থেকে তৈরি জিনিস ব্যবহার হয়। তোমাদের বাড়ির বা স্কুলের চারপাশে পড়ে -থাকা বর্জ্য থেকে তা জানার চেষ্টা করো। প্রয়োজনে বাড়ির বড়োদের বা শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও। তারপর নীচের সারণিতে লেখো।

কোন পদার্থ থেকে তৈরি জিনিস	কোথায় ব্যবহার হয়
পলিথিন	ক্যারিব্যাগ, খাবারের প্যাকেট
প্লাস্টিক	মগ, বালতি ইত্যাদি তৈরিতে
থার্মোকল	
নাইলন	

ওপরের পদার্থগুলো লক্ষ করলে দেখবে তাদের মধ্যে কয়েকটা ধর্ম দেখা যায়—

(i) কিছু পদার্থ নরম, ইচ্ছামতো বাঁকানো যায়।

(ii) অন্য কিছু পদার্থ হয়তো জিনিসপত্র তৈরির সময় নরম ছিল, কিন্তু একবার শক্ত হয়ে গেলে আর তাদের আকৃতি পালটানো যায় না।

কার্বনঘটিত পলিমার ও তার ব্যবহার :

প্লাস্টিক ও পলিমারকে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর মানবসভ্যতার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা যেতে পারে। এখনকার দিনে এমন কোনো দিক নেই যেখানে প্লাস্টিক ও পলিমারের ব্যবহার নেই। নীচের ছবিতে ক্ষেত্রগুলো লক্ষ করো যেখানে পলিমারের বা প্লাস্টিকের ব্যবহার ঘটছে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে পলিমার হলো একটা যৌগিক পদার্থ। একইরকম বা বিভিন্নরকম বহুসংখ্যক অণু রাসায়নিকভাবে জুড়ে গিয়ে এরকম শৃঙ্খলাকৃতি দীর্ঘ যৌগ তৈরি করে। নমনীয়তা বা প্লাস্টিকত্ব (plasticity) হলো এইজাতীয় যৌগের একটা বিশেষ গুণ। কিন্তু অনেক সময়েই আমরা মানুষের সৃষ্টি করা অনেকরকম পলিমারকেই প্লাস্টিক বলে থাকি। অর্থাৎ বহুক্ষেত্রেই প্লাস্টিক ও পলিমার কথাদুটো সমার্থক হয়ে গেছে। যদিও একরকম বিশেষ ধরনের পলিমারকেই প্লাস্টিক বলা হয়। তাই আমাদের চারদিকে নিত্য ব্যবহৃত পলিমার সম্বন্ধে আরো একটু জানা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে অধিকাংশ কৃত্রিম পলিমারই বিভিন্ন কার্বনঘটিত যৌগ থেকে তৈরি করা। এখন প্রশ্ন হলো এতরকম পলিমার ব্যবহার শুরু হলো কেন? আগে যে সমস্ত কাজে অন্য জিনিস ব্যবহার হতো, তার পরিবর্তে বিভিন্ন পলিমার ব্যবহারের দুটো প্রধান কারণ হলো —

(i) কৃত্রিমভাবে তৈরি পলিমারের আয়ু বেশি, (ii) বিভিন্ন পলিমারের জিনিস তৈরির সময় তাকে ইচ্ছামতো আকৃতি দেওয়া যায়।

আমাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যে সমস্ত পলিমার ব্যবহার হয়ে থাকে, এসো তাদের ধর্ম ও সেই ধর্মকে কীভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তা একটা সারণির মাধ্যমে দেখা যাক। এদের কোনো ব্যবহার জানা থাকলে তা নীচে লেখো।

পলিমারের নাম	তার ধর্ম	ব্যবহার
(i) পলিথিন	নমনীয় কিন্তু আংশিক কঠিন (মোমের মতো), তড়িতের কুপরিবাহী, কিছু কিছু রাসায়নিকের প্রতি নিষ্ক্রিয়।	
(ii) টেফলন	উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট, তড়িতের কুপরিবাহী, বিভিন্ন ক্ষয়কারী রাসায়নিকের প্রতি উল্লেখযোগ্যভাবে নিষ্ক্রিয়।	নন-স্টিক বাসনপত্র তৈরিতে, গাড়ির রঙের ওপর প্রলেপ দিতে, রাসায়নিক শিল্পে।
(iii) পিভিসি	স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ, শক্ত; জল, তেল পেট্রোল ও কিছু কিছু রাসায়নিকের সংস্পর্শে নিষ্ক্রিয়।	জলের পাইপ, ইলেকট্রিক তারের আবরণ, বিভিন্ন জিনিসের পাত্র তৈরিতে, বর্ষাতি, গামবুট, চপ্পল তৈরিতে।
(iv) নাইলন	স্বচ্ছ, শক্ত, জলরোধী তন্তু।	
(v) টেরিলিন	নাইলনের মতোই জলশোষণ করে না, সহজে দাগ ধরে না, শক্ত, ভাঁজরোধী, দীর্ঘস্থায়ী তন্তু।	সুতির সুতো মিশিয়ে টেরিকট নামের কাপড় তৈরি করা হয়। এটা টেরিলিনের মতো ভাঁজরোধী কিন্তু সুতির সুতো থাকায় জল শোষণ করতে পারে, এবং বায়ু চলাচল করতে পারে। তাই আমাদের মতো আর্দ্র-গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জামাকাপড় তৈরিতে ব্যবহার ব্যাপক।

কৃত্রিম পলিমার ব্যবহারের সংকট

এখন যে এতরকম কৃত্রিম পলিমার ব্যবহার করা হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এদের দীর্ঘায়ু। কিন্তু কেন এরকম দীর্ঘায়ু এধরনের কৃত্রিম পলিমারের?

পলিমার তৈরির সময় অনেকগুলো অণু জুড়ে যায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ বন্ধন তৈরির মাধ্যমে। যদি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় এই বন্ধনগুলো ভাঙা সম্ভব হয় তবে পলিমারের আয়ু কম হবে।

বলতে পারো সুতির কাপড় কী দিয়ে তৈরি হয়?

তুলো থেকে তৈরি করা সুতো দিয়ে। কিন্তু একটা সিন্থেটিকের বা টেরিলিনের কাপড় তৈরি হয় কৃত্রিম উপায়ে তৈরি পলিমারের সুতো থেকে। তাহলে একটা সুতির কাপড়ের টুকরো আর একটা সিন্থেটিক কাপড়ের টুকরো যদি একই সময় ধরে মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকে, তবে বেশ কিছুদিন পরে কী দেখা যাবে?

কোন জিনিসের কাপড়ে	কী ঘটতে দেখবে
সুতির কাপড়	
সিন্থেটিক কাপড়	

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ তুলো বা খড় জঞ্জালের গাদায় বা পুকুরপাড়ে পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হয়ে যায়। আমরা চলতি কথায় বলি 'খড়টা পচে গেছে'। তুলো বা খড় কী দিয়ে তৈরি ? তুলো বা খড়ের প্রধান উপাদান হলো সেলুলোজ।

সেলুলোজ হলো একটা কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় মস্ত বড়ো অণু (পলিমার)। প্রাকৃতিক পরিবেশে অনেক ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাক থাকে। এরা সেলুলোজকে নিজেদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। প্রকৃতিতে থাকা এইসব ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক নানান এনজাইম দিয়ে সেলুলোজ কিংবা সবজি বা ফলের খোসার অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট পলিমারকে ভেঙে ফেলতে পারে। মাছমাংসের টুকরোয় নানান প্রোটিন থাকে। প্রোটিনও পলিমার। বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন ভাঙার এনজাইম আছে, তাই প্রকৃতিতে মাছমাংসের টুকরোও পড়ে থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পর কোটি কোটি বছরের বিবর্তনে এইসব এনজাইম সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে জীবের দ্বারা নষ্ট হয়ে যাওয়াকে বলে 'বায়োডিগ্রেডেশন' (Biodegradation)। প্রাকৃতিক জৈব পলিমারদের তাই বায়োডিগ্রেডেবল (Biodegradable) বলা যায়।

কিন্তু পলিথিন কিংবা পিভিসি (PVC)-র মতো পলিমার বায়োডিগ্রেডেবল নয়। এগুলো হলো মানুষের তৈরি (কৃত্রিম) পলিমার যা কোনোদিনই প্রকৃতিতে ছিল না। কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের এইসব কৃত্রিম পলিমারের অণু ভেঙে ফেলার এনজাইম নেই। ফেলে দেওয়া পলিথিনের ব্যাগ বা PVC পাইপের টুকরো, কী ডটপেনের রিফিল তাই সেলুলোজের মতো নষ্ট হয় না, পরিবেশে পড়েই থাকে। এইসব পলিমারকে তাই বলা হয় নন-বায়োডিগ্রেডেবল (Non-biodegradable) অর্থাৎ জীবাণুরা যা ভেঙে ফেলতে পারবে না।

বিশেষ কিছু ব্যাকটেরিয়া কয়েকধরনের পলিমার তৈরি করতে পারে যা বায়োডিগ্রেডেবল। এই পলিমার দিয়ে বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক তৈরি করা হচ্ছে। এগুলো পরিবেশে ফেলে দিলে নানান জীবাণু এদের ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়।

5 প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ

বজ্রপাত

উত্তর আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। এতক্ষণ ধরে বইতে থাকা হাওয়া থেমে গেছে। কেমন একটা থমথমে ভাব। হঠাৎ নীলচে কালো মেঘের বুকে আঁকাবাঁকা রেখার এক তীব্র আলোর ঝলকানি। তারপর জোরালো আর গম্ভীর এক শব্দ। কালবৈশাখী ঝড়ে বজ্রপাতের এই দৃশ্য দেখেনি এমন কেউ তোমাদের মধ্যে নেই বোধহয়। বছরের অন্য সময়েও বজ্রপাত হতে নিশ্চয় দেখেছ। আমাদের এখানে শীতকালে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি প্রায় হয়ই না। বর্ষাকালের মেঘ থেকেও বজ্রপাত কমই ঘটে থাকে।

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ হিসাবে বিভিন্ন দেবতা বা অশুভ শক্তিকে দায়ী করা হতো। আমরা কিন্তু এখানে বজ্রপাতের বিজ্ঞানসম্মত কারণ বোঝার চেষ্টা করব। এটা করতে গিয়ে আমাদের কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণা (Concept) সম্পর্কে জানতে হবে।

ছোটো ছোটো ফুলকি

তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ, শীতকালে উলের জামাকাপড় খোলার সময় গায়ের লোমগুলো কেমন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। একটা খুব ক্ষীণ চিড় চিড় শব্দ হয়। এবারে তুমি একটা ছোটো পরীক্ষা করো।

শীতের রাতে খাটে নাইলনের মশারি টাঙানো আছে। জানালা-দরজা বন্ধ করে ঘরের আলো নিভিয়ে দাও। দরকার হলে জানালায় পর্দা বা কাপড় ঝুলিয়ে দাও যাতে ঘর যথেষ্ট অন্ধকার হয়। তোমার গায়ের উলের

চাদর বা সোয়েটার খুলে নাও। এবারে ছবির মতো করে মশারিতে জামা বা সোয়েটারটি বেশ তাড়াতাড়ি করে বোলাও।

কিছু কি দেখতে পাচ্ছ? কিছু শুনতে পাচ্ছ কি? হ্যাঁ, ঠিকই দেখছ — মশারির গায়ে ছোটো ছোটো আগুনের ফুলকি। একটা ক্ষীণ চিড়চিড় শব্দও নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছ।
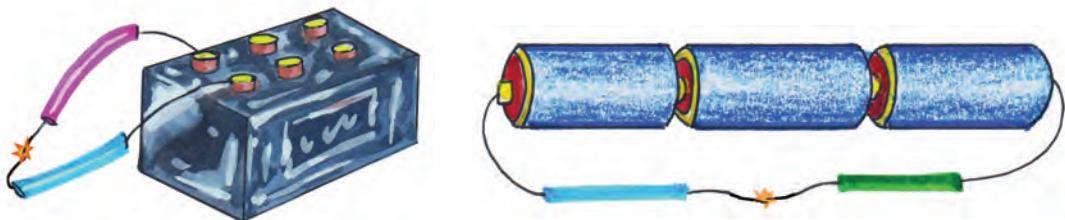
টর্চে বা রেডিয়োতে ব্যবহৃত তড়িৎকোশ তোমরা সবাই দেখেছ। একে ড্রাইসেল বলে। লাউডস্পিকার (মাইক) চালাতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয় তাও তোমরা দেখেছ নিশ্চয়। এবার ব্যাটারির দু-প্রান্তে দুটো তড়িৎবাহী তার লাগাও। তারদুটোর আস্তরণ ছাড়ানো খোলা অংশ দুটো স্পর্শ করিয়েই দ্রুত ছাড়িয়ে নাও। এভাবে কয়েকবার করে দেখো কী ঘটছে। দু-তিনটে ড্রাইসেল পরপর বসিয়েও পরীক্ষাটি করতে পারো।

তারদুটো পরস্পরের থেকে যখনই ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে ঠিক তখনই তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ তৈরি হয়। হয়তো ভাবছ এরকম স্ফুলিঙ্গ তুমি কাঁচি শান দেওয়ার সময়ও দেখেছ। খুব জোরে ঘুরছে এরকম একটা পাথরের চাকতির গায়ে কাঁচিটা ধরা হয় আর প্রচুর ফুলকি ছিটকে বেরোয়। পাথর ও ধাতুর প্রবল ঘর্ষণে তাপ তৈরি হয়। ওই তাপে উত্তপ্ত ছোটো ছোটো ধাতুর টুকরোগুলো ফুলকির আকারে ছিটকে বেরোয়। এগুলো কিন্তু তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ নয়।

কোনো সুইচ চাপতে গিয়ে ছোটো তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ দেখে থাকতে পারো। বৈদ্যুতিক পোস্টে যেখানে দুটো তার জোড়া আছে সেখানেও তড়িৎ ফুলকি দেখেছ হয়তো। জোরে হাওয়া বইছে যখন তখনই এই ফুলকি দেখার সম্ভাবনা বেশি। রাতে বিদ্যুৎচালিত রেলগাড়িতে চড়েছ অনেকে। হয়তো খেয়াল করেছ মাঝেমাঝেই তীব্র আলো পড়ছে পাশের অন্ধকার মাঠে। রেলগাড়ির যে অংশটা বৈদ্যুতিক তার ছুঁয়েছে তাকে পেন্টোগ্রাফ বলে। চলার সময় গাড়িতে ঝাঁকুনি হলে পেন্টোগ্রাফ যেই উপরের তার থেকে একটু ছাড়িয়ে যায় তখনই এই জোরালো আলো দেখা যায়। এই সবগুলোই তড়িতের ফুলকি। বজ্রও এরকম তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ কিন্তু তা খুবই বড়ো ধরনের।

অতি জোরালো বজ্র এবং তোমার জামাকাপড়ে তৈরি হওয়া ছোটো তড়িৎ ফুলকি আসলে একই বিষয় — এই কথাটি 1752 সালে স্পষ্ট করে প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন।

তড়িৎ আধান এবং আয়ন

পরমাণুর উপাদান কণাগুলোর মধ্যে ইলেকট্রন আর প্রোটন তড়িৎ আধান বা চার্জযুক্ত কণা। কণাদুটিতে ভিন্নধর্মী চার্জ (Electric Charge) সমান পরিমাণে আছে। ইলেকট্রন কণার চার্জকে আমরা বলি ঋণাত্মক আধান বা নেগেটিভ চার্জ (Negative Charge)। '—' চিহ্ন দিয়ে এই চার্জ বোঝানো হয়। প্রোটনের চার্জকে বলা হয় ধনাত্মক আধান (Positive Charge) । এই ধরনের চার্জকে বোঝানো হয় '+' চিহ্ন দিয়ে।

পরমাণু সাধারণভাবে তড়িৎবিহীন। কারণ পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রন কণার সংখ্যা সমান থাকে। যদি কোনো কারণে পরমাণুতে প্রোটনের সংখ্যা এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান না থাকে তাহলে সেরকম পরমাণুকে আমরা আয়ন বলি। প্রোটনের সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে সেটি ধনাত্মক আয়ন (Positive Ion) । প্রোটনের সংখ্যা ইলেকট্রনের সংখ্যার চেয়ে কম হলে পরমাণুটি হয়ে ওঠে ঋণাত্মক আয়ন (Negative Ion) ।

কোনো পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে পড়ে থাকা অংশটুকু ধনাত্মক আয়ন গঠন করে । বেরিয়ে যাওয়া ইলেকট্রন অন্য কোনো পরমাণু বা একাধিক পরমাণুর জোটের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে । তখন এই দ্বিতীয় পরমাণু বা পরমাণুর জোট হয়ে ওঠে ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত। পরমাণু থেকে বেরিয়ে পড়া ইলেকট্রন অথবা কোনো আয়ন অনেক সময় বায়ুতে ভাসমান খুব সূক্ষ্ম ধুলিকণা বা জলকণার গায়ে আশ্রয় নিতে পারে। সেই কণাটিও তখন তড়িৎগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সূক্ষ্ম কণা হলেও এরা কিন্তু পরমাণু বা অণুর তুলনায় অনেকগুণ বড়ো। তড়িৎযুক্ত বা তড়িৎগ্রস্ত এইসব আয়ন, পরমাণুর জোট, সূক্ষ্ম ধুলিকণা বা জলকণা বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে রয়েছে।

তড়িদাহিত হওয়া, তড়িৎ ক্ষরণ হওয়া,তড়িৎ আবেশ

শীতকালে প্লাস্টিকের চিরুনি দিয়ে শুকনো চুল আঁচড়ালে চিরুনিতে ঋণাত্মক তড়িৎ আধান জমে। আমরা বলে থাকি চিরুনি ঋণাত্মক তড়িৎ দ্বারা আহিত (Charged) হয়েছে। এবারে চিরুনিটাকে ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোর কাছে ধরলে কাগজের টুকরো আকৃষ্ট হয়। আহিত চিরুনির প্রভাবে কাগজের টুকরোর যে দিকটা চিরুনির কাছে আছে সেখানে ধনাত্মক আধান জমে। একে আমরা **তড়িৎ আবেশ** বলি। বিপরীত আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কাগজের টুকরো এজন্যে চিরুনির দিকে ছুটে আসে।

চুল আঁচড়ে চিরুনিটাকে বেশ কিছুক্ষণ টেবিলে রেখে দাও। এবারে দেখোতো কাগজের টুকরো আকর্ষণ করছে কিনা। হয়তো তখনও সামান্য আকর্ষণ করছে। সময়টা যথেষ্ট বেশি হলে দেখতে পাবে চিরুনিটার আকর্ষণ ধর্ম একেবারেই নেই। চিরুনিটার আধান হয় বাইরে বেরিয়ে গেছে বা বাইরে থেকে বিপরীত আধান চিরুনিতে এসেছে। এই ঘটনাকে আমরা বলি চিরুনির আধান **ক্ষরণ** হয়ে গেছে (Discharged)।

তড়িৎ প্রবাহ, বিভব পার্থক্য
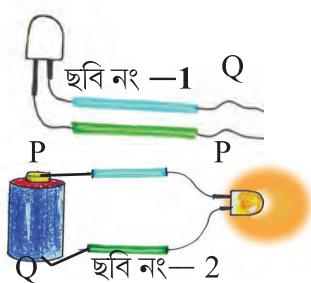
1 নং ছবিতে যেমন দেখছ তেমনভাবে দুটো তার একটা LED বালবে বা একটা টর্চের বালবে জুড়ে দাও। এবারে তারদুটোর খোলা প্রান্ত (P ও Q) একটা ড্রাইসেলের দু-প্রান্তে চেপে ধরো (2 নং ছবি)।

বালবটি জ্বলে উঠল তো? কেন?

কারণ বালবের মধ্য দিয়ে **তড়িৎ প্রবাহ** হচ্ছে। এর মানে হলো পরিবাহী তারের

মধ্য দিয়ে আধানের চলাচল ঘটছে। এ থেকে ভেবে নিও না তড়িৎপ্রবাহ ঘটতে গেলে পরিবাহী তার লাগবেই। বায়ুর মধ্য দিয়ে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক তড়িৎকণার চলাচল ঘটলেও আমরা তাকে তড়িৎপ্রবাহ বলব।

কোশের দু-প্রান্ত পরিবাহী তার দিয়ে জুড়লে তড়িৎপ্রবাহ ঘটে কেন? ড্রাইসেলটি ভালো করে দেখো। কোশটির গায়ে কোথাও 1.5 V লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছ কি? 1.5 V লিখে আমাদের জানানো হচ্ছে — কোশের দু-প্রান্তের মধ্যে দেড় ভোল্ট (1.5 V) **বিভব পার্থক্য** আছে। কোশটির দু-প্রান্ত জুড়ে দিলে তড়িৎ প্রবাহ হয় — কোশটির দু-প্রান্তের বিভব পার্থক্যই এই প্রবাহ ঘটার কারণ।

প্রকৃতিতে ঘটে চলা বিষয়গুলো সাধারণত খুবই জটিল ও রহস্যময়। সেবিষয়ে কিছু বলার আগে আমরা আর দু-একটা পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করব। এর ফলে প্রকৃতির ঘটনাগুলো বুঝতে আমাদের কিছুটা সুবিধা হবে।

3 (A) ছবিটা দেখো ।

দুটো ধাতুর পাত (A ও B), একটা অপরিবাহী স্ট্যান্ড (S) দিয়ে দাঁড় করানো আছে। পাতদুটো পরস্পরের থেকে কিছুটা দূরে রাখা হয়েছে। একটা ড্রাইসেলের দু-প্রান্তের সঙ্গে পরিবাহী তার দিয়ে পাতদুটো যুক্ত। দু প্রান্তে পরিবাহী তার লাগানো আছে এমন একটা বালব (L) পাতদুটোতে জুড়ে দিলে কী হবে? বালবটি জ্বলে উঠবে। কেন?

3 A

কারণ বালবের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ হবে।

তড়িৎপ্রবাহ কেন হবে ? তাহলে কী পাতদুটোর মধ্যে বিভব পার্থক্য আছে?

নিশ্চয় আছে। কারণ পাতদুটো ড্রাইসেলের দু-প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত।

3 (B) ছবিটা দেখো।

যদি বালবটি জোড়া না থাকে তাহলে কি একটুও তড়িৎ প্রবাহ হবে না?

খুব সামান্য তড়িৎপ্রবাহ কিন্তু তখনও হবে। পাতদুটোর মাঝের বায়ুতে থাকা ধনাত্মক আয়ন B পাতের দিকে আর ঋণাত্মক আয়ন A পাতের দিকে আকৃষ্ট হবে। আয়নের এই চলাচলও কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ। এই প্রবাহের পরিমাণ খুবই সামান্য, মাপতে খুব সূক্ষ্ম যন্ত্র লাগবে।

3 B

⊕ ধনাত্মক আয়ন
⊖ ঋনাত্মক আয়ন

ছবিতে একটা বিষয় এতক্ষণে নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ। A পাতের গায়ে (+) এবং B পাতের গায়ে (–) চিহ্ন দেওয়া আছে। তাহলে কি ড্রাইসেলের সঙ্গে যুক্ত হলেই পাতদুটো আহিত (Charged) হয়? হ্যাঁ, সে জন্যেই (+) এবং (–) চিহ্ন দেখানো হয়েছে পাতদুটোতে। খেয়াল করে দেখো A পাতের সঙ্গে ড্রাইসেলের ধনাত্মক প্রান্ত আর B পাতের সঙ্গে ঋণাত্মক প্রান্ত যুক্ত আছে।

পাত দুটো থেকে ড্রাইসেলটি খুলে নেওয়া হলে কি পাতদুটোর মাঝের বিভব পার্থক্য থাকবে? কিছুক্ষণ থাকবে। মাঝের বায়ুর আয়নগুলোর তড়িৎ প্রবাহের জন্যেই বেশ কিছুক্ষণ পর পাত দুটো একেবারেই আধানহীন হবে (Discharged)। তুমি চাইলে ড্রাইসেলটি জুড়ে দিয়ে পাত দুটোকে আবার আহিত (Recharged) করতে পারো।

3 (C) ছবিটা দেখো ।

3 C
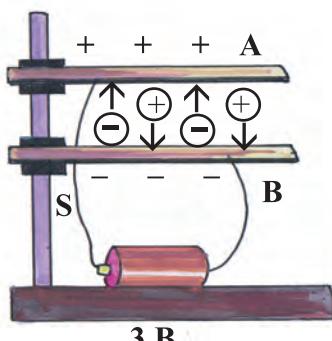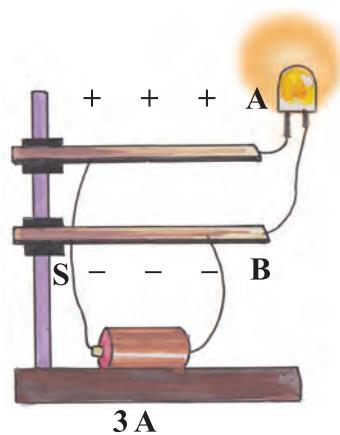
দুটো ড্রাইসেল পরপর বসিয়ে ধাতুর পাতদুটো জোড়া হয়েছে, বলোতো এবারে পাতদুটোর মধ্যে বিভব পার্থক্য কত? হয়তো বুঝতে পারছ এবারে বিভব পার্থক্য 3 ভোল্ট (1.5 V + 1.5 V = 3 V)।

প্রকৃতির নিজস্ব তড়িৎপ্রবাহ এবং বিভব পার্থক্য

মেঘহীন পরিচ্ছন্ন দিন। এমন এক ঝলমলে সকালে তুমি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়েছ। মাথার উপরে উজ্জ্বল নীল আকাশ। তুমি খেয়ালই করছ না তোমার আশেপাশে বাতাসে সারাক্ষণই তড়িৎপ্রবাহ চলছে। কেন কেউ বুঝতে পারছে না? তোমার চারপাশে উপর থেকে নীচের দিকে বয়ে চলা এই তড়িৎস্রোত খুবই সামান্য, মাপতে হলে সূক্ষ্ম যন্ত্র চাই। ভেবে দেখো সারা পৃথিবী জুড়েই বাতাসে তড়িতের এই স্রোত বয়ে চলেছে। ভূপৃষ্ঠের সমগ্র ক্ষেত্রফল জুড়ে এই তড়িৎপ্রবাহের মোট পরিমাণ কিন্তু যথেষ্ট বেশি। একটা 100 ওয়াটের বালব বাড়িতে জ্বালিয়ে রাখলে তার মধ্যে দিয়ে যতটা তড়িৎপ্রবাহ যায় তার থেকে এই প্রাকৃতিক তড়িৎ প্রবাহের মোট পরিমাণ প্রায় চার হাজার গুণ বেশি।

এই তড়িৎপ্রবাহ হচ্ছে কেন? তবে কি ভূপৃষ্ঠ আর উপরের আকাশের মধ্যে কোনো বিভব পার্থক্য আছে? একটু আগের পরীক্ষাগুলোর ধাতুর পাতদুটোর কথা নিশ্চয় তোমার মনে পড়ছে। মোটামুটিভাবে পঞ্চাশ কিলোমিটার উপরের আকাশ আর ভূপৃষ্ঠের মধ্যে প্রায় চার লক্ষ ভোল্ট (400000 V) বিভব পার্থক্য আছে। প্রায় দু-লক্ষ সত্তর হাজার ড্রাইসেল পরপর সাজালে তার দু-প্রান্তের মধ্যে এই পরিমাণ বিভব পার্থক্য হয়।

উপরের আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকার জন্যে এই তড়িৎপ্রবাহ হয়। তাতে কোনো না কোনো আহিত কণার (Charged Particles) চলাচল ঘটে? বায়ুতে থাকা বিভিন্নরকম আয়ন, আধানযুক্ত সূক্ষ্ম কণা—এদের কথা মনে আছে নিশ্চয়। এদের চলাচলই এই তড়িৎ প্রবাহ ঘটায়।

তাহলে প্রাকৃতিক বিভব পার্থক্য তো কমে যাবে, একসময় একেবারেই থাকবে না (আহিত ধাতুর পাতদুটোর কথা মনে রাখো)। হ্যাঁ সত্যিই সারাক্ষণের এই তড়িৎপ্রবাহের জন্যে প্রাকৃতিক বিভব পার্থক্য কমে যায় অনেকটা। তাহলে তো ধাতুর পাতদুটোর মতো ড্রাইসেল জুড়ে আবার তাদের আহিত করতে হয় (Recharging)।

বজ্রপাতই প্রকৃতির সেই ব্যবস্থা যা ঊর্ধ্বাকাশ এবং ভূপৃষ্ঠের মধ্যের বিভব পার্থক্য বজায় রাখে। বজ্রপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠ ঋণাত্মক তড়িতে আহিত হয় আর উপরের আকাশ আহিত হয় ধনাত্মক আধানে।

তোমার মনে হতে পারে এত বজ্রপাত কখন হয়, অনেকদিন তো বজ্রপাত হয়ই না। আমরা কিন্তু সারা পৃথিবীর কথা ভাবছি। বজ্রপাত ঘটাতে পারে এমন ঝড়বৃষ্টির মেঘ সারা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও হয়েই চলেছে। পৃথিবী জুড়ে রোজ প্রায় চল্লিশ হাজার (40000) ঝড়বৃষ্টি হয় যা থেকে প্রচুর বজ্রপাত হয়।
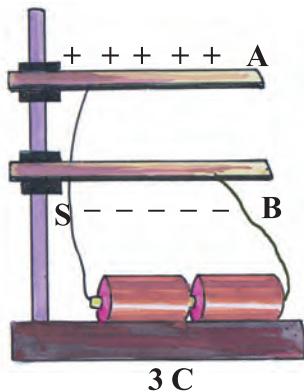
একটা ভুল ধারণা চালু আছে যে, মেঘে মেঘে ঘর্ষণে বা মেঘের জলকণাগুলোর ঘর্ষণে মেঘ আহিত (Charged) হয়। ঘর্ষণের ফলে স্থিরতড়িৎ উৎপন্ন হয়, এই সঠিক তথ্যই এই ভুল ধারণার জন্য দায়ী বোধহয়। খেয়াল রাখতে হবে ঘর্ষণে স্থির তড়িৎ তৈরি হয় ঠিকই, কিন্তু তা সবসময়ই দুটি ভিন্ন পদার্থের তৈরি বস্তুর ঘর্ষণে।

বজ্রবিদ্যুতে ভরা ঝড়ের মেঘ

এই ধরনের মেঘ থেকেই সাধারণত বজ্রপাতসহ ঝড়বৃষ্টি হয়। অনেকটা অঞ্চল জুড়ে জলীয় বাষ্পভরা বায়ু উপরের দিকে উঠতে থাকে। আশপাশ থেকেও বায়ু ওই অঞ্চলের দিকে আসে এবং উপরে উঠতে থাকে। উপরে বায়ুর উষ্ণতা ও চাপ কম। জলীয় বাষ্পভরা বায়ু উপরে উঠে ঠান্ডা হয়। এর ফলে জলীয় বাষ্প জমে জলকণা তৈরি হয়। বাষ্প জমে জল হলে লীনতাপ বেরিয়ে আসে। এই লীনতাপের প্রভাবে বাষ্প ও জলকণাভরা বায়ু আশপাশের বায়ুর তুলনায় গরম ও হালকা থাকে। এজন্যে এই বায়ু (এতক্ষণে জলকণা জমে এই বায়ুতে মেঘ তৈরি হয়েছে) আরও উপরে উঠতে থাকে। এ কারণে ঝড়ের মেঘের উচ্চতা 12 - 13 কিলোমিটার বা তার চেয়েও বেশি হয়। এতটা উপরের মেঘে জল জমে বরফের ছোটো ছোটো টুকরোও গঠিত হয়।
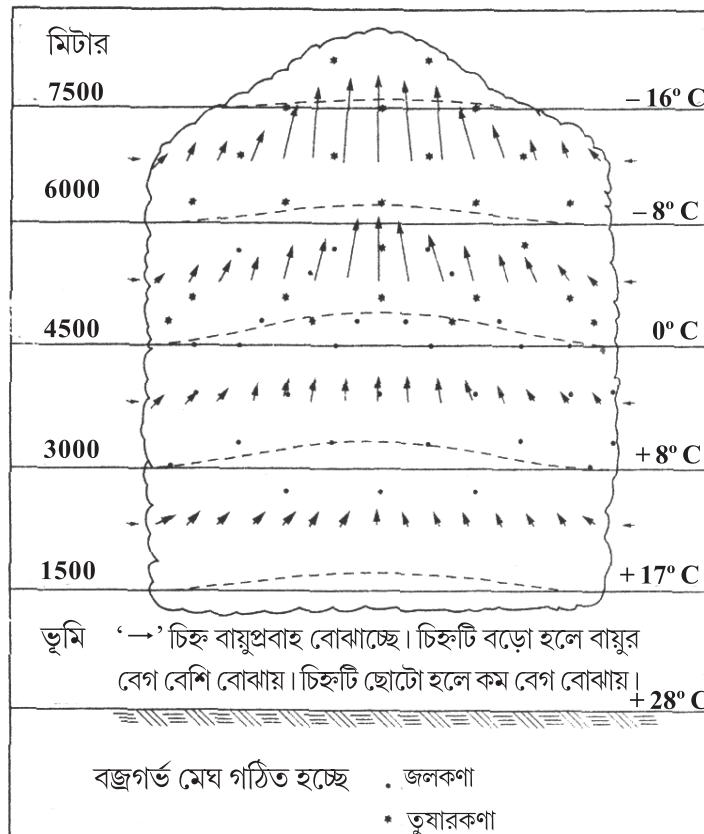
কোনো একটা সময়ে জলকণাগুলো এতটা ভারী হয় যে মাধ্যাকর্ষণের টানে তা নীচে নামতে থাকে। বায়ুর উপরের দিকের গতিও তখন এই জলকণাগুলোর নীচে পড়া আটকাতে পারে না। ততক্ষণে ঝড়ের মেঘের গঠন সম্পূর্ণ হয়েছে। একটা সময়ে বায়ুও হঠাৎ করে নীচে নামতে শুরু করে। এরকম অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়।

ঝড়ে মেঘের এই উপরে ওঠা এবং নীচে নামার সময়েই জলকণাগুলো তড়িৎগ্রস্ত (Charged) হয়। এই তড়িৎ আধান আসে কোথা থেকে? বায়ুতে আগে থেকেই যে বিভিন্ন ধরনের আহিত কণা রয়েছে সেগুলোই জলকণার গায়ে জমে। যে জলকণাগুলো নীচের দিকে নামছে সেগুলোয় সাধারণত ঋণাত্মক আধান জমা হয়। আর যে জলকণাগুলো উপরে উঠছে সেগুলোয় ধনাত্মক আধান জমে। এর ফলে মেঘের নীচের দিকটা সাধারণত ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মেঘের উপরের দিকটায় থাকে ধনাত্মক আধান। ভূপৃষ্ঠ ও উপরের আকাশের মধ্যে বিভব পার্থক্য আছে। এজন্যেই ভিন্ন আধানগুলো মেঘের মধ্যে দুটো আলাদা অঞ্চলে জমা হয়।
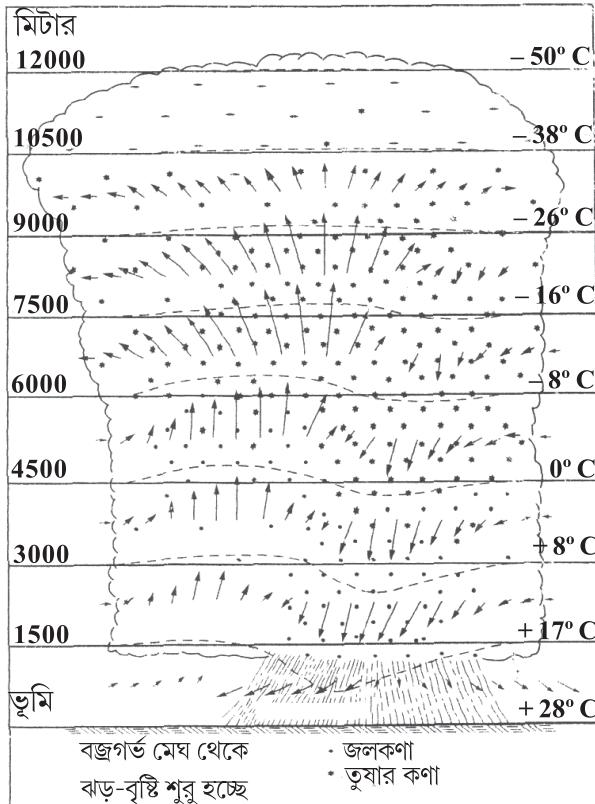
নীচের দিকের ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত মেঘ মাটির কিছুটা কাছে এলে আবেশের ফলে মাটিতে ধনাত্মক আধান জমা হয়। সাধারণ সময়ে মাটি সামান্য ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত। কিন্তু মেঘের নীচের দিকটা প্রবলভাবে ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত। এজন্যে আবেশের ফলে মাটিতে ধনাত্মক তড়িৎ জমে । মেঘ ও মাটির বিভব পার্থক্য খুবই বেশি হলে অত্যন্ত বড়ো স্ফুলিঙ্গের আকারে ঋণাত্মক তড়িৎ আধান মেঘ থেকে মাটিতে চলে আসে । এর ফলে যে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু প্রবল তড়িৎ প্রবাহ হয় তাতে বায়ু অত্যন্ত গরম হয়ে যায়। এই অতিগরম বায়ুই আলো বিকিরণ করে। এই প্রবল গরমে বাতাসে সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে বায়ুতে প্রবল কম্পন তৈরি হয়। বায়ুর এই কম্পনই বজ্রপাতের সময়ে শব্দ উৎপন্ন করে। বিভব পার্থক্য তৈরি হলে দুটো আলাদা মেঘের মধ্যে বজ্রপাত ঘটতে পারে। একই মেঘের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও বজ্রপাত হতে পারে।

বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে রেহাই পাব কীভাবে?

বজ্রপাতের ফলে আমাদের সম্পদ নষ্ট হতে পারে। জীবনহানিও ঘটতে পারে। এজন্যে আমাদের সাবধান হওয়া জরুরি। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা মোটেই নিরাপদ নয়। বজ্রের শব্দ শুনেই আমাদের উচিত নিরাপদ জায়গায় পৌঁছোনো। বজ্রের শব্দ শেষবার শোনার বেশ কিছুক্ষণ পর বাইরে বেরোনো যেতে পারে।

নিরাপদ স্থান

বাড়ির মধ্যে থাকলে জানালা-দরজা বন্ধ রাখা উচিত। পাকা বাড়ির মধ্যে থাকা নিশ্চয়ই নিরাপদ। খোলা বারান্দায় থাকা উচিত নয়। জানালা-দরজা বন্ধ অবস্থায় চলন্ত বাস, মোটরগাড়ি বা রেলগাড়ি নিরাপদ।

বজ্রপাতের সময় কী করা উচিত অথবা কী করা উচিত নয়

যদি তুমি বাইরে থাকো

খোলা গাড়ি, মোটরবাইক বা ট্রাক্টর মোটেই নিরাপদ নয়। খোলা মাঠে ,উঁচু গাছের কাছে, কোনো খোলা উঁচু জায়গায় বা পার্কের ছাউনির নীচে একেবারেই থাকবে না। বজ্রপাতের মধ্যে ছাতা নিয়ে বাইরে বেরোনো মোটেই ঠিক নয়। যদি কোনো কারণে জঙ্গলের গাছপালার মধ্যে থাকতে বাধ্য হও তাহলে অবশ্যই নীচু গাছের আশেপাশে থাকো, মোটেই উঁচু গাছের ধারেকাছে নয়।

নিরাপদ জায়গায় পৌঁছোতে পারছ না, খোলা মাঠেই থাকতে বাধ্য হচ্ছ এমন হলে পাশের ছবিতে যেমন দেখছ তেমনভাবে বসে থাকো।

বাড়ির মধ্যে যদি থাকো

বাড়িতে যেসব বিদ্যুৎবাহী তার বা ধাতুর তৈরি পাইপ আছে সেগুলো থেকে দূরে থাকো। ল্যান্ডফোন মোটেই ব্যবহার করবে না। মোবাইল ফোন নিরাপদ, কিন্তু তোমার সঙ্গে অন্যপ্রান্তে যে কথা বলছে সে হয়তো ল্যান্ডফোন ব্যবহার করছে আর সেখানেও বজ্রপাত হচ্ছে। তাই ফোন না করাই ভালো । বিভিন্ন তড়িৎ যন্ত্রের (টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর) তড়িৎ সংযোগ খুলে রাখো। আলো জ্বালিয়ে রাখা যাবে। মগ দিয়ে বালতির জল ব্যবহার করতে পারো কিন্তু পাইপের মাধ্যমে আসা জল খুলে কোনো কাজ করবে না।

বজ্র নিরোধক (Lightning Conductors)

বজ্রপাত থেকে বাড়ি এবং বাড়ির মধ্যের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রক্ষা করে বজ্র নিরোধক। পাশের ছবিটা দেখো। বাড়িটার সবচেয়ে উঁচু স্থানে একটা ধাতুর দণ্ড শক্তভাবে আটকানো আছে। দণ্ডটির সবচেয়ে উঁচু স্থানে খুব সরু কয়েকটা ছোটো ছোটো ধাতব শলাকা আছে। মাটির মধ্যে 5-6 ফুট নীচে একটা চওড়া ধাতব পাত পুঁতে রাখা আছে। এবারে একটা সুপরিবাহী মোটা তার দিয়ে ওই দণ্ডটি এবং পাতটি যুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থাই বাড়িকে বজ্রপাতের থেকে বাঁচায়। বজ্রপাতের ফলে যে প্রবল তড়িৎপ্রবাহ হয় তা ওই তারের মাধ্যমে মাটিতে চলে যায়। বাড়িটাতে বজ্রপাত হলেও বাড়িটার কোনো ক্ষতি হয় না।

মহামারি

নানা সংক্রামক রোগঘটিত মহামারি

নানা কারণে মহামারি হয়। কোনো মারণরোগের প্রাদুর্ভাবে প্রতি বছর প্রচুর মানুষ যখন একসঙ্গে মারা যান, তখন ওই মারণরোগকে মহামারি বলে ঘোষণা করা হয়।

কোনো রোগ মহামারিতে পরিণত হবে কিনা তা কী করে বোঝা সম্ভব —

- রোগটির লক্ষণ কী?
- রোগটি কতটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়েছে?
- কোথায় এর প্রথম অস্তিত্ব ধরা পড়েছে?
- কখন এই ঘটনাটি ঘটেছে?
- কারা কারা এতে আক্রান্ত হয়েছেন?
- কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটল?
- কী কী ব্যবস্থা নিলে এই রোগটিকে এড়ানো যেতে পারত?
- কী করলে এই রোগের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব?

এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যেই লুকিয়ে আছে কলেরা, ম্যালেরিয়া, AIDS, ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো মহামারি হওয়ার বা না হওয়ার সম্ভাবনা।

মহামারির প্রকারভেদ —

১. সাধারণ উৎস মহামারি — এধরনের মহামারি কোনো রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর জন্য হতে পারে, আবার নাও হতে পারে (জল, বায়ু, খাদ্য বা মাটির বিষক্রিয়াজনিত। যেমন ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি বা জাপানের মিনামাটা রোগ)।

২. সংক্রামক মহামারি — এধরনের মহামারি সরাসরি এক ব্যক্তি থেকে অপর ব্যক্তিতে, কোনো বাহক প্রাণীর মাধ্যমে বা কোনো প্রাণীজ দেহ থেকে সংক্রামিত হতে পারে (হাম, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া)।

৩. অসংক্রামক রোগঘটিত মহামারি — ফুসফুসের ক্যানসার, করোনারি হার্ট ডিজিজ।

কোনো কোনো মহামারি জাতীয় রোগের আবির্ভাব চক্রাকার হয় (দিন/সপ্তাহ/মাস/বছর)। টিকাকরণের আগে হাম সাধারণত 2 - 3 বছর অন্তর অন্তর, ইনফ্লুয়েঞ্জা 7 - 10 বছর অন্তর অন্তর মহামারি রূপে ফিরে আসত। আবার কোনো কোনো রোগের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে 'ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাসের' প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন উন্নত দেশগুলোতে গত 50 - 70 বছর ধরে করোনারি হার্ট ডিজিজ, ফুসফুসের ক্যানসার, ডায়াবেটিসের ঘটনা বেড়েই চলেছে। আবার ওই দেশগুলোতে যক্ষ্মা, টাইফয়েড জ্বর, ডিপথেরিয়া ও পোলিও-র মতো রোগের ঘটনা কমার লক্ষণ দেখা গেছে। কোনো কোনো মহামারির সঙ্গে আবার ঋতুর নিবিড় সম্পর্ক আছে। বসন্তের শুরুতে হাম, জলবসন্তের মতো রোগ বেশি করে হয়। শীতের মাসগুলোতে শ্বাসনালীর উপরের অংশে সংক্রমণের ঘটনা বেশি ঘটে, আবার গরমকালে পেটের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়।

কলেরা — সাধারণত দূষিত জল, মাছি-বসা, না-ঢাকা খাবার এবং নোংরা পরিবেশ থেকেই এই রোগের সৃষ্টি হয়। শরীর থেকে সব জল বেরিয়ে যেতে থাকে। প্রচণ্ড বমি হয়। শরীরে অম্ল-ক্ষারের ও লবণের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। শরীরের চামড়াকে ধোঁয়াটে নীল করে দেয়। কলেরা হলো মারণরোগ। তাই ঠিক সময়ে ঠিক চিকিৎসা প্রয়োজন। কলেরা রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম হলো - *Vibrio cholerae*।

উনিশের শতকে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে প্রথম কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। তারপর সেখান থেকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় সবকটি মহাদেশেই কলেরা আক্রান্ত হয়ে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ঘটে।

ম্যালেরিয়া — ম্যালেরিয়া কথাটির অর্থ হলো খারাপ বায়ু বা bad air। এটি একটি মশাবাহিত রোগ। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা কামড়ালে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত থেকে *Plasmodium vivax* বা *Plasmodium falciparum* নামক প্রোটোজোয়া মশকীর দেহে প্রবেশ করে। এরপর ওই প্রোটোজোয়া মশকীর দেহে বংশবৃদ্ধি করে। পরে ওই মশকী সুস্থ মানুষকে কামড়ালে প্রোটোজোয়া সেই মানুষের দেহে প্রবেশ করে। মানুষটি তখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। বর্ষাকালে, গরম, ঠান্ডা ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় এই রোগের প্রকোপ বাড়ে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। ঘাম দিয়ে জ্বর সেরে যায়, মাথার যন্ত্রণা, যকৃৎ ও প্লীহা বড়ো হয়ে যায়। গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা, গোটা শরীরে ব্যথা। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না করালে মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে 2012 সালে পৃথিবী জুড়ে ম্যালেরিয়া রোগে প্রায় 6 লক্ষ 60 হাজার মানুষ মারা গেছেন। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সচেতনতার জন্য 25 এপ্রিল দিনটিকে বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

ডেঙ্গি — কলকাতায় এই মশাবাহিত মারণরোগের প্রথম দেখা মেলে 1963-64 সালে। *Aedes egypti* মশা এই রোগের জীবাণু বহন করে। এই রোগের জীবাণু ফ্ল্যাভিভাইরাস নামে পরিচিত। ভয়াবহ জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, অণুচক্রিকার সংখ্যা ভয়াবহভাবে হ্রাস পেয়ে রক্ত জমাট বাঁধতে বাধা দেওয়া। রক্তক্ষরণ এই রোগের প্রধান উপসর্গ। শ্বেতরক্তকণিকা ধ্বংস করে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমিয়ে দেয়। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

তোমরা দলে আলোচনা করো। তারপর খোঁজখবর নিয়ে মশাবাহিত ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি প্রতিরোধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা লেখো।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে প্রতি বছর প্রায় ছয় হাজারের মতো মানুষ মারা যান এই ভয়াবহ মারণরোগে।

প্লেগ — ইঁদুর থেকে মানুষের দেহে এই রোগ সংক্রামিত হয়। *Yersinia pestis* নামক ব্যাকটেরিয়া এই রোগের জন্য দায়ী। ফুসফুসে সংক্রমণ, রক্তক্ষরণ, লসিকাগ্রন্থি ফুলে গিয়ে ভয়াবহ যন্ত্রণা, মাথার যন্ত্রণা,বমি, কাশির সঙ্গে রক্ত পড়া এই রোগের প্রধান উপসর্গ। নানাভাবে এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। হাঁচির মাধ্যমে, সরাসরি শরীরের ছোঁয়ায়, দূষিত মাটির স্পর্শে, বাতাস থেকে, এমনকি কিছু পতঙ্গের কামড়েও। *Xenopsylla cheopis* নামে মাছি প্লেগ রোগে আক্রান্ত ইঁদুরের দেহ থেকে এই ব্যাকটেরিয়া বহন করে। তারপর যদি কোনো

মানুষকে কামড়ায় বা খাবারে বসে সেখান থেকে অবধারিতভাবে প্লেগ হবে। 1897 সালে তৎকালীন বোম্বেতে ভালডেমার হাফকিন প্লেগ রোগের টিকা আবিষ্কার করেন। তবে মানুষের সচেতনতা এবং ঠিক সময়ের চিকিৎসার দ্বারা এই রোগকে অনেকটাই এড়ানো সম্ভব।

প্লেগ হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা পরিগণিত প্রথম তিনটি মহামারির একটি। অন্য দুটি হলো কলেরা আর পীতজ্বর, অত্যন্ত ভয়াবহ মারণরোগ।

স্মল পক্স (গুটি বসন্ত) — এই রোগের আরেক নাম রেড প্লেগ। স্মল পক্স এক ভাইরাসঘটিত ভয়াবহ মারণরোগ। চামড়ার শিরা-উপশিরায়,মুখে গলায় এই রোগের সংক্রমণ ঘটে। গোটা জায়গাটি তরলভরতি ফোসকায় ভরে ওঠে। তবে এই রোগকে অনেকটাই কাবু করা সম্ভব হয়েছে টিকা আবিষ্কারের ফলে। খাঁজকাটা সূচের সাহায্যে ত্বকের ওপর এই টিকা দেওয়া হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টিকা দিয়ে স্মল পক্স নির্মূলকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে বর্তমানে স্মল পক্সকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

1796 সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার গো-বসন্তের ভাইরাসকে স্মল পক্সের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে কাজে লাগান। তারপর থেকে এই ভয়াবহ মারণরোগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে।

কালাজ্বর — কালাজ্বরের আরেক নাম দমদম জ্বর। লিশম্যানিয়া নামক প্রোটোজোয়া বা আদ্যপ্রাণীর আক্রমণে এই রোগ হয়। ধারাবাহিক জ্বর, খিদে কমে যাওয়া, ওজন কমে যাওয়া, প্লীহা বড়ো হয়ে যাওয়া, অ্যানিমিয়া প্রভৃতি এই রোগের লক্ষণ। তবে এই আদ্যপ্রাণীটি সরাসরি মানুষের দেহে প্রবেশ করে না। বাহকের ওপর নির্ভরশীল। বেলেমাছি এই আদ্যপ্রাণীটির বাহক।

গোটা পৃথিবীতে প্রায় 59 হাজারের মতো মানুষ প্রতি বছর এই রোগে মারা যান। 1901 সালে ব্রিটিশ চিকিৎসক লিশম্যান দমদমে এক রোগীর দেহে এই রোগের জন্য দায়ী জীবাণুটিকে প্রথম লক্ষ করেন। খুব শীঘ্রই তৎকালীন মাদ্রাজে ক্যাপটেন চার্লস ডোনোভ্যান লিশম্যানের আবিষ্কারের সত্যতা মেনে নেন। তাই এই রোগের জীবাণুটির নাম- *Leishmania donovani* । ভারতীয় বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী 1922 সালে কালাজ্বরের ওষুধ আবিষ্কার করেন। তার ফলে লক্ষাধিক মানুষকে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

ডায়ারিয়া — এই শব্দের অর্থ হলো প্রবাহিত হওয়া। তিনবারের থেকে বেশিবার পাতলা মলত্যাগ হলেই সাবধান হওয়া দরকার। শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায়। শরীরের পাচক রস নষ্ট হয়ে যায়। মল দিয়ে রক্ত পড়ে। শরীরের জলসাম্য, অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য এমনকি লবণের ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যায়। দূষিত জল খাওয়া, অরক্ষিত খাবার থেকেও এই রোগ ছড়াতে পারে। এই রোগের জন্য দায়ী হলো একধরনের রোটাভাইরাস। বাড়িতে ওআরএস বানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ালে এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে রোগের উপসর্গ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া খুবই জরুরি।

তোমরা দলে মিলে আলোচনা করে কীভাবে ওআরএস বানানো হয় তা লেখো —

সমীক্ষায় দেখা গেছে 2011 সালে গোটা বিশ্বে প্রায় 1 লক্ষ 60 হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন ডায়ারিয়াতে। তার মধ্যে বেশিরভাগই পাঁচ বছর বয়সের শিশু।

মহামারি কোনো জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকতেও পারে আবার তা ছড়িয়ে পড়তে পারে দেশে-বিদেশে।

SARS - ভাইরাসঘটিত Severe Acute Respiratory Syndrome 2003 সালে প্রথম দেখা যায় এশিয়াতে। তারপর ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়, ইউরোপে। প্রবল জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, শরীরের ব্যথায় অনেক মানুষ মারা গিয়েছে ভয়াবহ এই ছোঁয়াচে রোগে। রাস্তাঘাটে মানুষ নাকমুখ চাপা দেওয়া মুখোশ পরে এই রোগের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতো।

যক্ষ্মা (Tuberculosis) — যক্ষ্মা বা টিবি ব্যাকটেরিয়াঘটিত বায়ুবাহিত মারণরোগ। এই রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়ার নাম— *Mycobacterium tuberculosis*। এই ব্যাকটেরিয়া মানুষের ফুসফুসকে আক্রমণ করে। অন্ত্র ও হাড়েও যক্ষ্মা হয়। এই রোগ ভীষণ ছোঁয়াচে, বায়ুবাহিত। কফ, কাশি এমনকি থুতু ও লালার মাধ্যমে সংক্রামিত হতে পারে। এই রোগের লক্ষণ হলো ভয়াবহ কাশি ও তার সঙ্গে রক্ত পড়া। রাতের দিকে কষ্ট বাড়ে। প্রচণ্ড ঘাম হয়, ওজন ক্রমশ কমতে থাকে। যথাসময়ে সঠিক চিকিৎসা দ্বারা যক্ষ্মা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। *DOTS* বা *Directly Observed Treatment, Short-Course* -এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বে অনেক মানুষকে এই মারণরোগের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

2012 সালে গোটা বিশ্বে 8 কোটি 6 লক্ষ মানুষের মধ্যে যক্ষ্মা ধরা পড়ে। প্রায় 1 কোটি 3 লক্ষ মানুষ মারা যান। তার মধ্যে 74000 শিশু মারা যায় এই মারণরোগে। প্রায় 22 লক্ষ মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে *DOTS* -এর মাধ্যমে।

হেপাটাইটিস — হেপাটাইটিস হলো ভাইরাসঘটিত মারণরোগ। প্রধানত যকৃৎকে আক্রমণ করে। পাঁচরকমের হেপাটাইটিস হয় — *A,B,C,D* এবং *E* । এই পাঁচরকম হেপাটাইটিস ভাইরাসের আক্রমণে প্রতিবছর বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। যকৃৎকে এই ভাইরাস নষ্ট করে দেয়। *A* এবং *E* দূষিত খাবার ও জল থেকে সংক্রামিত হয়, আর *B, C* এবং *D* সংক্রামিত মানুষের দেহরস বা রক্তের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। এই ভাইরাসের সংক্রমণে জন্ডিস, বমি, পেটব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হেপাটাইটিস রোগটিকে নির্মূল করার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

গোটা পৃথিবী জুড়ে হেপাটাইটিস *B* ও *C*-এর আক্রমণে 2010 সালে 14 লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 28 জুলাই দিনটিকে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

ইনফ্লুয়েঞ্জা/ফ্লু — ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসঘটিত ভয়াবহ শ্বাসরোগ। ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ, হাঁচি, কাশি, কফের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়। কোনো অসুস্থ মানুষের লক্ষণ আসার আগে থেকে শুরু করে অসুস্থ হবার পর পর্যন্ত এই রোগ সংক্রমণ হতে পারে। অর্থাৎ নিজে জানা বা বোঝার আগেই এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। ভয়াবহ জ্বর,ঘাম, কাঁপুনি,মাথার যন্ত্রণা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা, অত্যধিক দুর্বলতা, বমি, ডায়ারিয়া হলো এই রোগের লক্ষণ। তবে ভাইরাসঘটিত রোগ হওয়ার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক খুব একটা কাজ করতে পারে না। তবে এই রোগ হলে বাড়িতে থেকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিলে, প্রচুর পরিমাণে জলপান করলে রোগের কিছুটা উপশম হয়। এই রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশু, বৃদ্ধ, স্বাস্থ্যকর্মীদের ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকাকরণের কথা বলেছেন।

নানা ধরনের ফ্লু ঘটতে দেখা যায়। তার মধ্যে সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 2013 সালে ভারতে এখনও পর্যন্ত 254 জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এইডস, AIDS — Acquired Immuno Deficiency Syndrome — গত তিন দশকে প্রায় আড়াই কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এই ভয়াবহ মারণরোগে। দায়ী ভাইরাসের নাম HIV - Human Immunodeficiency Virus। এই ভাইরাসের আক্রমণে দেহের প্রতিরোধক্ষমতা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। অন্যান্য নানা রোগজীবাণুর আক্রমণে রোগী নানা রোগে আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডায়ারিয়া, জ্বর, যন্ত্রণা, গলা ব্যথা থেকে শুরু করে দ্রুত ওজন হ্রাস পেয়ে মানুষ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। রক্তের মাধ্যমে, দেহরসের মাধ্যমে, লালার মাধ্যমে দ্রুত সংক্রামিত হয় এই রোগ। এই রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা কর্মসূচির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

2012 সালেই প্রায় 3 কোটি 53 লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এই রোগে। এই রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায় খোঁজার পালা এখনও চলছে।

দলে আলোচনা করে নীচের তালিকা পূরণ করো :

	রোগের নাম	যেভাবে ছড়ায়	দায়ী জীবাণুর নাম	কীভাবে এড়ানো সম্ভব
মহামারি	**1.** কলেরা	আঢাকা খাবার, নোংরা পরিবেশ	*Vibrio cholerae*	
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			

অসংক্রামক রোগঘটিত মহামারি

বেশ কিছু অসংক্রামক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, ক্যানসার, মানসিক অসুস্থতাও মহামারির আকার ধারণ করেছে। ঠিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবনচর্যার অভাবে এইসব রোগ ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে।

বিভিন্ন ধরনের খাবারের অভ্যাস ও জীবনচর্যা আমাদের শরীরে কী কী অসুবিধা তৈরি করতে পারে তা আলোচনা করে লেখো—

খাদ্যাভাস ও জীবনচর্যা	কী কী অসুবিধা তৈরি করতে পারে
1. অতিরিক্ত পরিমাণে লিপিড জাতীয় খাদ্যগ্রহণ	
2. অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করা জাতীয় খাদ্যগ্রহণ	
3. রাতজাগা ও কম ঘুমানো	
4. কম্পিউটারের সামনে বসে দীর্ঘসময় কাজ করা	
5. ধূমপান করা ও নেশার বস্তু গ্রহণ করা	
6. মোবাইল ফোনের অত্যধিক ব্যবহার	

6 জীবদেহের গঠন

জীবদেহের গঠনের ধাপসমূহ

তোমার চারদিকে তাকাও। দেখতে পাচ্ছ এমন পাঁচটি জিনিসের নাম লেখো। তুমি কীভাবে এদের শ্রেণিবিভাগ করতে পারো—জড় না সজীব? এই তালিকায় কী এমন কোনো জিনিস আছে যা চলাচল করতে পারে বা পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। লজ্জাবতী বা মানুষ সজীব, কিন্তু পড়ে থাকা কাঠকে কেন আমরা জড় বলি?

সজীবরা শ্বাস নেয়, খাদ্য হজম করে, দেহে উৎপন্ন বর্জ্য বের করে দেয় এবং নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। এধরনের এক বা একাধিক কাজ করতে সজীব দেহে কী থাকে?

- খাদ্য হজম করার জন্য পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র।
- শ্বাসবায়ু নেওয়া ও ছাড়ার জন্য ফুসফুস।
- রক্তকে দেহের দূরতম প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য হৃৎপিণ্ড।
- দেহের বর্জ্যকে মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেওয়ার জন্য বৃক্ক।
- উদ্দীপনা গ্রহণ ও তাকে উত্তেজনায় রূপান্তরের জন্য মস্তিষ্ক।

এসব অঙ্গে কী এমন থাকে যা এসব অঙ্গের বিশেষ গঠনে ও কাজে সাহায্য করে?

এবার এসো দেখা যাক, একটা বাড়ি ও একটা জীবদেহ কীভাবে ধাপে ধাপে গঠিত হয়—

→
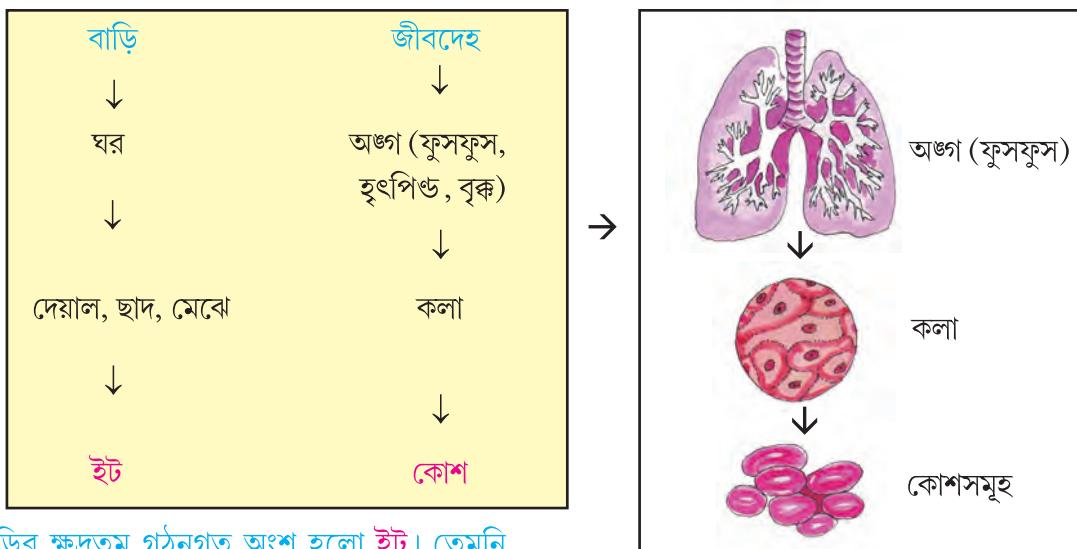
বাড়ির ক্ষুদ্রতম গঠনগত অংশ হলো ইট। তেমনি জীবদেহ গঠনেরও ক্ষুদ্রতম একক হলো কোশ। আবার জীবদেহ যে কাজগুলো করে তাও কোশেই সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ কোশ হলো জীবদেহের এমন এক ক্ষুদ্রতম একক যা যেকোনো কাজ করতে পারে।

টুকরো কথা

কোনো জীবদেহের গঠনগত ও কার্যগত ক্ষুদ্রতম একক হলো কোশ। এরা এতই ছোটো যে **মাইক্রোস্কোপ** ছাড়া সাধারণত এদের খালি চোখে দেখা যায় না।

মাইক্রোস্কোপ

কী করে এই কোশের কথা জানা গেল ?

1665 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক গাছের কাণ্ডের ছাল নিয়ে তার একটি সূক্ষ্ম প্রস্থচ্ছেদ তৈরি করেন। তারপর নিজের তৈরি মাইক্রোস্কোপের নীচে ওই প্রস্থচ্ছেদ দেখার সময় মৌচাকের প্রকোষ্ঠের মতো অসংখ্য কুঠুরি লক্ষ করেন। তিনি এদের Celluliae (ল্যাটিন অর্থ ঘর) বলে আখ্যা দেন। পরে এদেরই তিনি Cell (কোশ)নাম দেন।
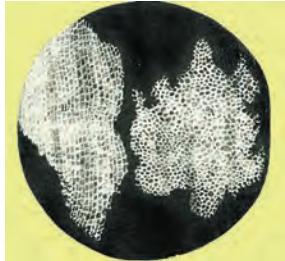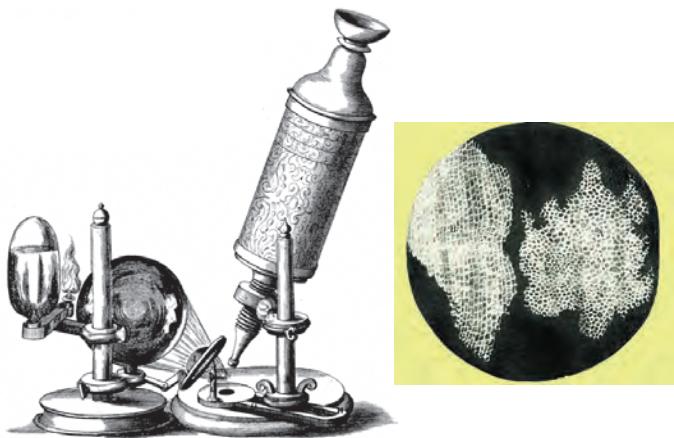
তুমি কী করে একটি কোশকে দেখতে পারো ?

খালি চোখে কোশ দেখা যায় না। দেখতে গেলে একে বহুগুণে বড়ো করা দরকার। এর জন্য আমরা লেন্সযুক্ত যে যন্ত্র ব্যবহার করি তা হলো মাইক্রোস্কোপ (Microcope)।

লিভেনহিক

টুকরো কথা

রবার্ট হুক কর্কের পাতলা ছেদ পরীক্ষা করার সময় যে কোশগুলি লক্ষ করেছিলেন সেগুলি ছিল মৃত। 1674 খ্রিস্টাব্দে ডাচ বিজ্ঞানী লিভেনহিক প্রথম সজীব কোশ পর্যবেক্ষণ করেন। মাইক্রোস্কোপের উন্নতি ঘটিয়ে তিনি নানা অণুজীব ও রক্তকোশ পর্যবেক্ষণ করেন।

কোশের গঠনকে ভালভাবে বুঝতে গেলে নানা রঙের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এদের রঞ্জক পদার্থ (Stain) বলে।

- কোশের গঠন পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রথমদিকে সরল আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Simple Light Microscope) ব্যবহার করা হতো। এতে একটিমাত্র লেন্সের সাহায্য নেওয়া হতো। ফুল কেটে তার অংশবিশেষ দেখার জন্য এই ধরনের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হতো। এটা বস্তুকে 15-20 গুণ বড়ো করে দেখাতে সক্ষম।

- এরপর এলো যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Compound Light Microscope)। এতে দ্রষ্টব্য বস্তুকে অনেকগুণ বড়ো করে দেখানোর জন্য বিবর্ধন ক্ষমতা সম্পন্ন একাধিক লেন্স (অকিউলার লেন্স, অবজেকটিভ লেন্স) ব্যবহার করা হয়। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান আলো দ্বারা দ্রষ্টব্যবস্তুকে আলোকিত করা হয়। এর জন্য একটি বিশেষ ধরনের আয়নার (Mirror) সাহায্য নেওয়া হয়। এই ধরনের লেন্স ব্যবহারের ফলে দ্রষ্টব্য বস্তুকে 2000-4000 গুণ বড়ো করে দেখা সম্ভব।

যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয়?

- ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক, বিভিন্ন এককোশী ও বহুকোশী প্রাণীর দেহের বহির্গঠন জানার জন্য।
- উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশের (মূল, কাণ্ড ও পাতা) অন্তর্গঠন পর্যবেক্ষণের জন্য।
- জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তার প্রস্থচ্ছেদ করে তার কলার গঠন জানার জন্য।
- কোশের ভেতরের অঙ্গাণু ও কোশের বাইরের পর্দার গঠন জানার জন্য।
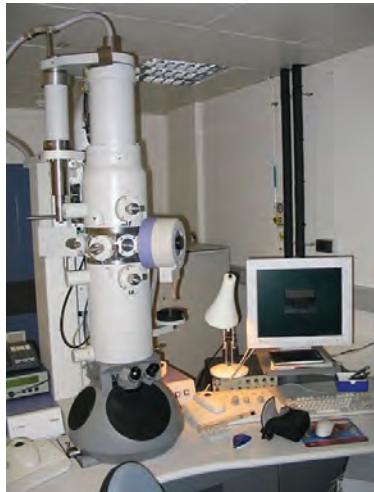
ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Electron Microscope) : এই যন্ত্রে আলোর পরিবর্তে দ্রুতগতির ইলেকট্রন প্রবাহ দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কাচের লেন্সের পরিবর্তে তড়িৎচুম্বক ব্যবহার করা হয়। দ্রষ্টব্য বস্তুকে 50,000-3,00,000 গুণ বড়ো করে দেখা যায়। দ্রষ্টব্য বস্তুকে দেখার জন্য ফোটোগ্রাফিক ফিল্ম ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ভাইরাস ও অন্যান্য অণুজীবকে অনেক বড়ো করে দেখা সম্ভব। এছাড়াও কোশের মধ্যের অঙ্গাণুগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ গঠন জানা সম্ভব হয়।

কোশের বৈচিত্র্য

কার দেহে কত কোশ আছে?
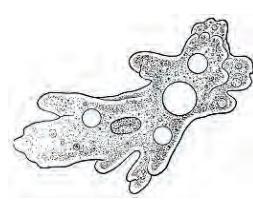
ওপরের বিভিন্ন জীবকে লক্ষ করে ছোটো থেকে বড়ো আকার (Size) অনুযায়ী সাজাও।

(1) .... (2) .... (3)........................(4) ....

ওপরের সব জীবদেহের গঠন কিন্তু একরকম নয়। কোনো জীবের আকার (Size) যত বড়ো হয় তার দেহে কোশের সংখ্যা তত বেশি হয়।

অ্যামিবার দেহ একটি কোশ নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ একটি কোশ একটি জীবদেহের সমতুল্য। এরা এককোশী (Unicellular)। মশা, বিড়াল ও হাতির দেহ অসংখ্য কোশ নিয়ে গঠিত। কোশের সংখ্যা সঠিকভাবে গোনা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই ধরনের জীবরা বহুকোশী (Multicellular)। বহুকোশী জীবে বিভিন্ন জীবন প্রক্রিয়া একই সঙ্গে ও অবিছিন্নভাবে ঘটতে পারে। পরিবর্তনশীল পরিবেশে বহুকোশী জীবের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কোশ দেখতে কেমন? নীচের ছবিগুলো দেখে কোশের আকৃতি (Shape) কতরকম হতে পারে তা লেখো।

নানা ধরনের প্রাণীকোশ

নানা ধরনের উদ্ভিদকোশ

বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে কোশের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন (ডিম্বাকার, আয়তাকার, বহুভুজাকার, স্তম্ভাকার, লম্বাটে, সূত্রাকার ইত্যাদি) হয়। বহুকোশী কোনো জীবের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোশের আকৃতি কাজের উপর নির্ভর করে।

প্রাণীদেহে চামড়ার নীচে বা অন্যান্য অঙ্গে ফ্যাট সঞ্চয়ী চর্বিকোশ থাকে। চর্বি জমা হওয়ার ফলে কোশের নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজম সহ একদিকে সরে যায়। ফলে চর্বিকোশকে আংটির মতো দেখায়। চোখের রেটিনায় মৃদু আলো শোষণে সক্ষম দণ্ডাকার রডকোশ এবং উজ্জ্বল আলো ও বর্ণ শোষণে সক্ষম শঙ্কু আকৃতির কোণ (Cone) কোশ দেখা যায়। উদ্ভিদের বীজের আবরণ ও ফলত্বকে উপস্থিত প্রস্তরকোশে প্রোটোপ্লাজম না থাকায় কোশগুলি দণ্ডাকার, স্তম্ভাকার বা তারার মতো আকৃতি বিশিষ্ট হয়। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়ার কোশ গোলাকার, রডের মতো বা কমা চিহ্নের মতো হয়। আবার স্পাইরোগাইরার মতো শৈবালের সূত্রাকার দেহ কতগুলো আয়তাকার কোশ দ্বারা গঠিত। কোশের বয়স, কোশমধ্যস্থ চাপ ও অন্যান্য শর্ত কোশের আকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

• নীচে অ্যামিবার আকৃতি লক্ষ করো। এর আকৃতি অনিয়মিত। অ্যামিবার আকৃতি অন্য জীবকোশের মতো নয়। সর্বদাই এর আকৃতি (Shape) পরিবর্তিত হয়। অ্যামিবার দেহের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেরোনো বিভিন্ন মাপের অংশগুলো লক্ষ করো। এগুলোর নাম হলো ক্ষণপদ। ক্ষণপদ কখনও তৈরি হয় আবার পর মুহূর্তেই অদৃশ্য হয়। এগুলো অ্যামিবার চলাফেরায় সাহায্য করে।
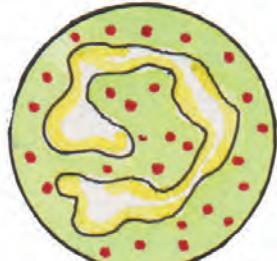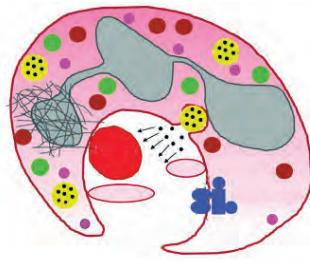
মানুষের রক্তে জীবাণুকে মেরে ফেলার জন্য শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। এরাও অ্যামিবার মতো নিজেদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। তবে মনে রেখো অ্যামিবা একটি স্বাধীন জীব। আর শ্বেত রক্তকণিকা একটি জীবদেহের কোশ।

আমাদের দেহের কোশগুলো কোনটা কেমন?
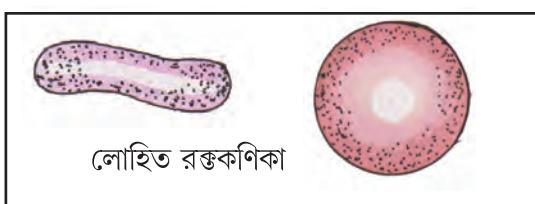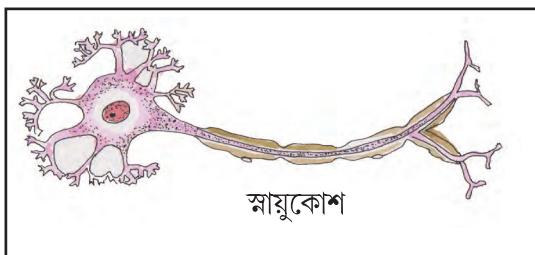
এবার নীচে মানুষের দেহের আরও নানাধরনের কোশ লক্ষ করো।

লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার; দু -পাশ চ্যাপটা, চাকতির মতো। বিভিন্ন ব্যাসের রক্তনালীর মধ্য দিয়ে যাতায়াতের জন্য আর বেশি পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহন করার জন্য এদের এধরনের আকার হয়।

পেশিকোশের দু -প্রান্ত ছুঁচালো, মাঝখানটা চওড়া, সংকোচন-প্রসারণের জন্য এদের আকার এরকম হয়। পেশিকোশের সংকোচন-প্রসারণের জন্য মানুষের স্থান পরিবর্তন, খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে খাদ্যের স্থানান্তরণ, শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে বায়ুর পরিবহন, রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্তের সংবহন ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন হয়।

অন্যান্য কোশের তুলনায় স্নায়ুকোশ দৈর্ঘ্যে অনেক বেশি হয়। আর এর মূল কোশদেহ তারার মতো বা গোলাকার ও তার সঙ্গে নানা আকৃতির শাখা-প্রশাখা যুক্ত থাকে। এরা পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে (আলোক , শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, চাপ, ব্যথা ও তাপ ইত্যাদি) ও তাকে পরিবহন করে। এভাবে জীবদেহের বাইরের ও ভেতরের পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

যে-কোনো মেরুদণ্ডী (যেমন মাছ, ব্যাং, সাপ, পাখি, বাঘ, মানুষ) প্রাণীদের দেহে প্রায় 200-এর বেশি কোশীয় বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। উদ্ভিদদেহেও কোশের আকৃতিগত পার্থক্য চোখে পড়ে।

মূল বা কাণ্ডের অগ্রভাগে যে কোশগুলো থাকে তারা ক্রমাগত বিভাজিত হয়। এ ধরনের কোশগুলো বহুভুজাকার। আবার কাণ্ডের ভেতরে মূল থেকে পাতা পর্যন্ত জলের ঊর্ধ্বমুখী সংবহনের সঙ্গে যে কোশগুলো যুক্ত তারা আবার নলাকার।

এবার কোশের আকৃতি নিয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো ও খাতায় প্রতিটি কোশের ছবি আঁকো। এরকম আকৃতির অন্য কোশের নাম শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে সারণিতে যোগ করো।
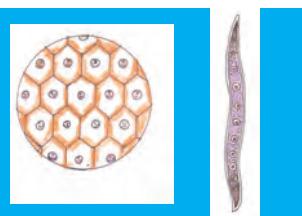
কোশের নাম	কোশের আকৃতি
(1) লোহিত রক্তকণিকা	
(2) শ্বেত রক্তকণিকা	
(3) পেশিকোশ	
(4) স্নায়ুকোশ	
(5) মূল বা কাণ্ডের অগ্রভাগের কোশ	
(6) জল পরিবহণকারী উদ্ভিদ কোশ	

টুকরো কথা

কোশের আকৃতি কী সর্বদা একরকম থাকে? কোনো ডিম্বাকার কোশ ক্যানসার কোশে রূপান্তরিত হলে গোলাকার হয়ে যায়। লোহিত রক্তকণিকা যখন বিভিন্ন ব্যাসের রক্তনালির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে তখন তাদের আকৃতির পরিবর্তন হয়। কোশ বিভাজনের সময়েও প্রাণীকোশের আকৃতি পরিবর্তিত হয়।

করে দেখো

একটা ডিম নিয়ে সিদ্ধ করো। তারপর খোলাটা ছাড়াও। কী দেখবে? একটা সাদা অংশ ভেতরের হলুদ অংশকে ঘিরে রয়েছে। হলুদ অংশ হলো কুসুম। এটা একটা কোশের অংশ। এই একক কোশকে খালি চোখে দেখা যায়।

স্নায়ুকোশের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি। উটপাখির অনিষিক্ত ডিম হলো বৃহত্তম একক কোশ।

কতটা বড়ো একটা কোশ?

অন্য কোশরা কিন্তু মুরগির ডিমের মতো বড়ো নয়। কোশের আকার সাধারণত মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন দিয়ে মাপা হয়। 1 মাইক্রোমিটার 1 মিটারের 10 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ। 1 মিটার = 1000 মিলিমিটার, 1 মিলিমিটার = 1000 মাইক্রোমিটার, 1 মাইক্রোমিটার(μm) = 1000 ন্যানোমিটার এবং 1 ন্যানোমিটার(nm) = 10 অ্যাংস্ট্রম (Å)। এ হিসাবে কোনো বাক্যের শেষে যে যতিচিহ্ন (Full Stop) আমরা ব্যবহার করি তাতে 1 মাইক্রন মাপের 400 টি কোশ এঁটে যায়। অধিকাংশ কোশের আকার 5-10 মাইক্রন।
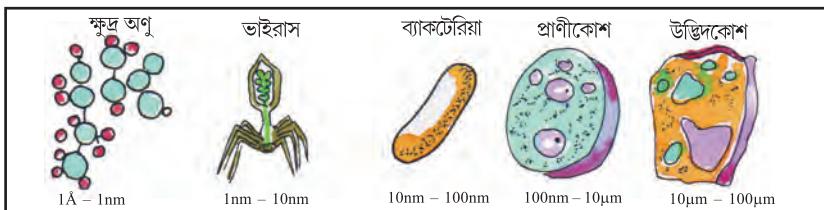
হাতির দেহের কোশ কি ইঁদুরের দেহের কোশের তুলনায় বড়ো?

কোশের আকারের (Size) সঙ্গে জীবদেহের আকারের কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। কোশের আকৃতি (Shape) বরং কোশের কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হাতি ও ইঁদুর উভয়ের দেহেই স্নায়ুকোশ দীর্ঘ ও শাখা-প্রশাখা যুক্ত। উভয়ের দেহেই স্নায়ুকোশ উদ্দীপনা গ্রহণ ও উত্তেজনা পরিবহণের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত।

বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ ও কোশীয় বিশেষত্ব

প্রাণীদেহে কী কী শারীরবৃত্তীয় কাজ হয় এসো জানি—

কাজগুলির নাম	সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া
• খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক , শোষণ, আত্তীকরণ ও অপাচ্য খাদ্য বহিষ্করণ	পুষ্টি
• শ্বাসবায়ুর আদানপ্রদান ও শক্তি উৎপাদন	শ্বসন
• খাদ্যের সারাংশ ও শ্বাসবায়ুকে (O_2) দেহের দূরতম প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া	সংবহন
• দেহে উৎপন্ন ক্ষতিকারক বর্জ্যকে দেহ থেকে বার করে দেওয়া	রেচন
• এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থান পরিবর্তন করা	গমন
• পরিবেশের উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া ও পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলা	স্নায়বিক সমন্বয়
• সংখ্যাবৃদ্ধি করা ও অস্তিত্বরক্ষা করা	জনন

উদ্ভিদদেহেও প্রাণীদেহের মতো না হলেও অন্যান্য নানা কাজ সারাদিন ধরে চলতে থাকে। যেমন—

- মাটি থেকে জল তোলা ও পাতায় পরিবহণ করা।
- অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বের করে দেওয়া।
- ফুল, ফল ও বীজ তৈরি করা।
- সূর্যের আলো শোষণ করা ও খাদ্য তৈরি করা।
- খাদ্য সঞ্চয় ও পরিবহণ করা।
- সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

প্রাণীদেহে নানা কাজ করতে পাকস্থলী, যকৃৎ, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, মস্তিষ্কের মতো অঙ্গ ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদদেহে একইভাবে মূল, কাণ্ড ও পাতার মতো অঙ্গ ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকটি অঙ্গ একাধিক কলা নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি কলা আবার একইরকম কাজ করতে পারে এরকম কোশের সমষ্টিমাত্র। অর্থাৎ জীবদেহ গঠনের ধাপগুলো হলো— (জীবদেহ → অঙ্গতন্ত্র → অঙ্গ → কলা → কোশ)।

কাজ অনুযায়ী কোশের আকার ও আকৃতি যেমন বদলে যায়, তেমনি গঠনেরও পরিবর্তন ঘটে। প্রাণীদেহে যেসব কোশ শোষণ করে তাদের আকৃতি স্তম্ভাকার। আবার যারা ক্ষরণের কাজ করে তারা ঘনকাকার। আবার মুখগহ্বরের ভেতরের যে কোশগুলি প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণ করে তারা আবার মাছের আঁশের মতো দেখতে হয়। বিভিন্ন অঙ্গ যে কোশগুচ্ছ নিয়ে গঠিত হয় তারা গঠনগতভাবে এক বা আলাদা হলেও কার্যগতভাবে অভিন্ন। কোশমধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজমের বিভিন্ন আন্তঃকোশীয় বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো— অবলম্বন, শোষণ, ক্ষরণ, সংকোচনশীলতা, উত্তেজিতা, চাপ ও টান সহ্য করা ইত্যাদি। জীবনের বির্বতনের সঙ্গে সঙ্গে কোশগুলির প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে এইভাবে শ্রমবিভাজন ঘটায় কাজের পার্থক্য ঘটে। এই ঘটনা ঘটার জন্য একেক ধরনের কোশসমষ্টির উৎপত্তি হয়েছে। কোশসমষ্টিই বা কোশগুচ্ছই হলো কলা।

উদ্ভিদদেহে কোশগুচ্ছ বিভিন্ন ধরনের ভাজক কলা এবং স্থায়ী কলা গঠন করে। আর প্রাণীদেহে বিভিন্ন ধরনের কোশগুচ্ছ একত্রিত হয়ে চার ধরনের কলা গঠন করে— আবরণী কলা, যোগকলা, পেশিকলা ও স্নায়ু কলা।

জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কাজ অনুযায়ী কোশের প্রোটোপ্লাজমেরও গঠনগত নানা পরিবর্তন ঘটে। ফলে অঙ্গ ও কলাভেদে কোশের কাজও বদলে যায়। নীচের ছকে উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বিভিন্ন কলার কাজগুলো বোঝানো হলো।

উদ্ভিদদেহে কোশের কাজের বিশেষত্ব ও কলার প্রকারভেদ

ভাজক কলা

• নতুন অঙ্গ সৃষ্টি করা, • মূল ও কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করা, • নতুন পাতা, কাক্ষিক মুকুল ও শাখা উৎপন্ন করা, • ফুল উৎপন্ন করা, • রক্ষণমূলক আবরণ গঠন করা, • সংবহন কলা গঠন করা।

স্থায়ী কলা

• খাদ্য সংশ্লেষ, • সঞ্চয় ও পরিবহণ করা, • জল সংবহন করা, • ভারবহন ও দৃঢ়তা প্রদান করা, • বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয় করা, • প্লবতা প্রদান করা, • ফল ও বীজের বিস্তার করা, • উদ্ভিদ অঙ্গের টান ও চাপ সহনশীলতা বৃদ্ধি করা, • ক্ষত নিরাময় করা।

প্রাণীদেহে কোশের কাজের বিশেষত্ব ও কলার প্রকারভেদ

আবরণী কলা

• দেহের বাইরে ও ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গের মুক্ততলের ওপর প্রতিরক্ষামূলক আচ্ছাদন গঠন করা, • শোষণ করা, • ক্ষরণ করা, • অনুভূতি গ্রহণ করা, • বিজাতীয় বস্তু ও বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করা, • বহিঃকঙ্কাল (আঁশ, রোম, নখ, ক্ষুর, শিং ইত্যাদি) গঠন করা।

যোগ কলা

• ভারবহন করা, • বিভিন্ন অঙ্গ ধারণ করা, • বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, • প্রতিরক্ষা প্রদান করা, ফ্যাট সঞ্চয় করা, • তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।

পেশি কলা

• অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ঘটানো, • গমনে সাহায্য করা, • খাদ্যকে গিলতে সাহায্য করা, • পৌষ্টিকনালির ও মূত্রনালির ক্রমসংকোচন ঘটানো, • হৃৎস্পন্দন ও রক্তপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা, • রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, • শব্দ সৃষ্টি করা, • গ্রন্থির ক্ষরণ ঘটানো, • মুখের অভিব্যক্তি ঘটানো, • দৈহিক ভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো।

স্নায়ু কলা

• সংবেদন গ্রহণ করা, • উদ্দীপনা পরিবহন করা, • দেহের বাইরের ও ভেতরের পরিবেশের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা, • পেশি সংকোচন ঘটানো, • গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা।

প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ও কোশীয় অঙ্গাণু

তবে আগে জানা যাক, একটা জীবকোশের গঠনে সাধারণভাবে কী কী অংশ থাকে?

সক্রিয়তামূলক কার্যাবলি

- তোমরা ঠোঁটের ভেতরের দিক বা গালের পাশের অংশ একটা পরিষ্কার টুথপিকের সাহায্যে তুলে নাও। তারপর একটা গ্লাস স্লাইডের মাঝখানে টুথপিকের মাথাটা ভালো করে ঘসে নাও।
- এবার একফোঁটা মিথিলিন ব্লু (কোশকে দেখতে সাহায্য করে এমন রঞ্জক) স্লাইডের ওপর ফেলে কভার স্লিপ দিয়ে ভালোভাবে চাপা দাও।
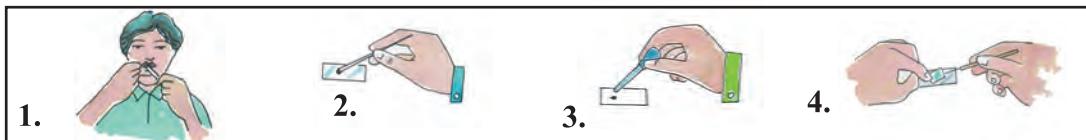
এবার মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখলে তুমি কী দেখতে পাবে?
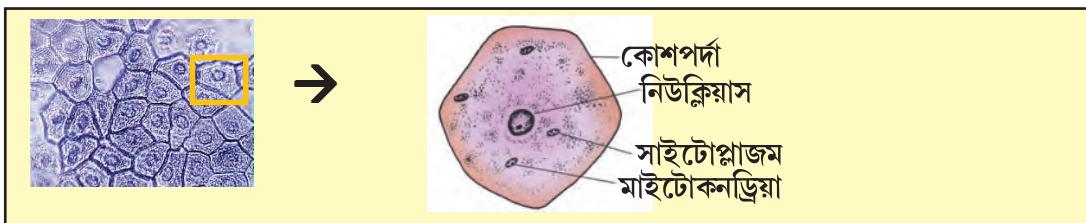
এরকম একটি প্রাণীকোশের ত্রিমাত্রিক মডেলের চিত্র নীচে দেখানো হলো।
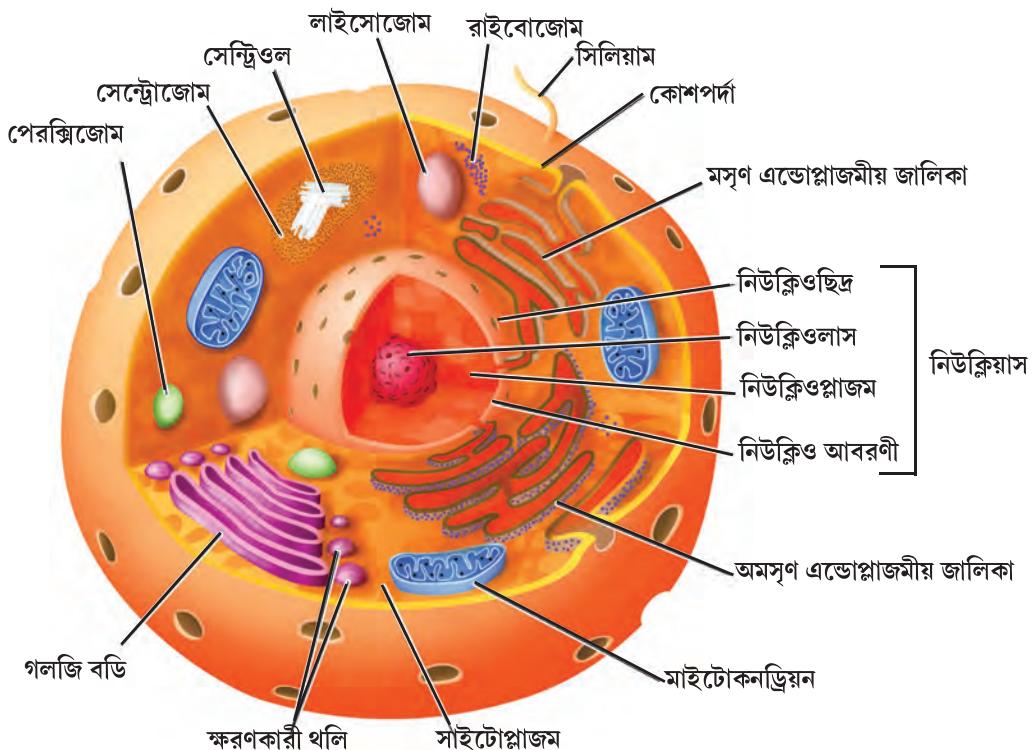
এরকম একটা প্রাণীকোশের গঠনে কী কী দেখা যায়—

• কোশপর্দা (Cell Membrane)— কোশের বাইরে যে পাতলা পর্দা দেখা যায় তা হলো প্লাজমা পর্দা বা কোশপর্দা। এটি কোশকে নির্দিষ্ট আকৃতি দেয়। এটি ছিদ্রযুক্ত। এই পর্দা একটি কোশকে পার্শ্ববর্তী অন্য একটি কোশ থেকে আলাদা করে রাখে। ছিদ্র থাকার জন্য কোশের ভেতরে ও বাইরের মধ্যে জল, খনিজপদার্থ ও অন্যান্য বস্তুর আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করে। তবে ছিদ্রের আকার ও প্রকৃতির ওপর এই দেওয়া-নেওয়া প্রক্রিয়া নির্ভর করে। তাই এটি সম্পূর্ণরূপে ভেদ্য নয়। এটি কোশের ভেতরে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা, গলজিবস্তু, নিউক্লিয়াসের পর্দা ও অন্যান্য পর্দাঘেরা কোশীয় অঙ্গাণু গঠনেও সাহায্য করে।

• সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)— কোশের ভেতরকার জেলির মতো অর্ধতরল পদার্থ। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া চালানোর জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর দরকার হয় তা সাইটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়।

• নিউক্লিয়াস (Nucleus)— কোশের ভেতরের ঘন গোলাকার বস্তু। এটা কোশের ভেতরে ঘটে চলা নানা প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লিয়াসের বাইরে নিউক্লীয় পর্দা থাকে। আর এর ভিতরে নিউক্লিওপ্লাজম নামক তরল থাকে। নিউক্লিয়াসের ভেতরে একধরনের সূক্ষ্ম জালকাকার গঠন দেখা যায় যা সুতোর মতো একে অপরকে পেঁচিয়ে থাকে। এই গঠনগুলোই হলো **DNA** । **DNA** হলো এক ধরনের বৃহৎ জৈব অণু যা নিউক্লিয়াসের মধ্যে পরিস্থিতি অনুসারে গোটানো বা আংশিক খোলা অবস্থায় থাকে ও সেটিকে সুতোর জালের মতো দেখায়। তখন একে ক্রোমাটিন জালিকা বলা হয়। গোটানো অবস্থায় কয়েক ধরনের প্রোটিনের গায়ে এটি জড়ানো থাকে। তখন **DNA** - এর এই গোটানো গঠনগুলোকে ক্রোমোজোম বলে। খোলা অবস্থায় **DNA** অণুর বিশেষ বিশেষ অংশ প্রোটিন তৈরির সংকেত বহন করে যা জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এই অংশগুলোর প্রত্যেকটিকে এক একটি জিন (Gene) বলা হয়। পিতামাতা থেকে তাদের সন্তানদের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্য এই জিনের মাধ্যমেই বাহিত হয়। নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি ঘন গোলাকার অংশ দেখা যায় যেখানে রাইবোজোম তৈরি হয়। একে নিউক্লিওলাস (Nucleolus) বলে।
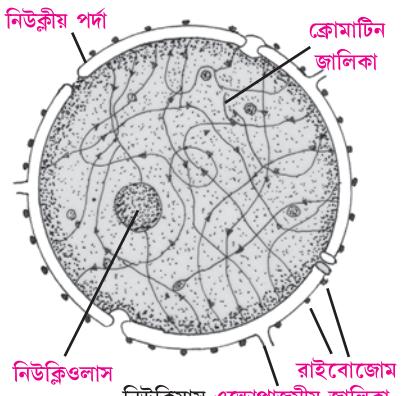
টুকরো কথা

প্রত্যেক প্রজাতিভুক্ত জীবের ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্দিষ্ট। একজন স্বাভাবিক মানুষের দেহকোশের নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা হলো 46। ক্রোমোজোম সংখ্যা বা গঠন দেখেই আমরা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিভুক্ত জীবকে আলাদা করতে পারি।

সমস্ত কোশের নিউক্লিয়াসের গঠন কি একইরকম?

বহুকোশী জীবের নিউক্লিয়াসের মতো নিউক্লিয়াস ব্যাকটেরিয়া কোশে থাকে না (নিউক্লীয় পর্দা ও নিউক্লীয় জালিকা অনুপস্থিত)। কিন্তু পেঁয়াজের কোশ বা মুখের ভেতরের দেয়ালের কোশ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় এদের নিউক্লিয়াস পর্দা দিয়ে ঘেরা। আর তার ভেতরে নিউক্লীয় জালিকা আছে।
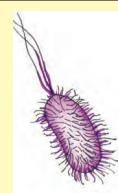
প্রোক্যারিওটিক কোশ

ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়ার মতো পর্দাবিহীন নিউক্লীয় বস্তুযুক্ত কোশকে প্রোক্যারিওটিক (Pro : পুরোনো; Karyon : নিউক্লিয়াস) বলে। ব্যাকটেরিয়া ও সায়ানোব্যাকটেরিয়া ছাড়া অন্য অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের নিউক্লিয়াসে পর্দা ও নিউক্লীয় জালিকা দেখা যায়। এরা হলো ইউক্যারিওটস (Eu: প্রকৃত; Karyon: নিউক্লিয়াস)।

ইউক্যারিওটিক কোশ

কোশের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজমকে একত্রে প্রোটোপ্লাজম বলে।

- অন্যান্য কোশীয় অঙ্গাণু (Other Cell Organelles)— কোশের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম গঠনকে অঙ্গাণু বলা হয়। এরা একত্রেও নানা ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজে (খাদ্যবস্তুর পরিপাক, ভাঙন ও শক্তি উৎপাদন, প্রোটিন সংশ্লেষ, পরিবহণ, সঞ্চয় ও ক্ষরণ; কোশবিভাজন; খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয়; প্রতিরক্ষা প্রদান) অংশগ্রহণ করে।

নীচে বিভিন্ন অঙ্গাণুর মডেলের ছবি দেখানো হয়েছে।

- মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria) (একবচনে মাইটোকনড্রিয়ন)— গোলাকার, ডিম্বাকার বা রডের মতো দেখতে। এর ধাত্রের মধ্যে নানা ধরনের উৎসেচক, রাইবোজোম ও নিউক্লিক অ্যাসিড (**DNA** ও **RNA**) থাকে। এরা খাদ্যের পরিপোষককে (গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড) ভেঙে শক্তি উৎপন্ন করে। এরা দুটি প্লাজমা পর্দা দিয়ে ঘেরা কোশীয় অঙ্গাণু। অন্তঃপর্দা ভাঁজ হয়ে ক্রিস্টি গঠন করে। মাইটোকনড্রিয়া শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

মাইটোকনড্রিয়ন

- এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (Endoplasmic Reticulum)— এরা প্লাজমা পর্দা থেকে উৎপন্ন হয়ে নিউক্লীয় পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কতকগুলো পর্দাবেষ্টিত নানা আকারের নল নিয়ে এরা গঠিত। এরা সাইটোপ্লাজমকে কতকগুলো অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে ভাগ করে। কোনো কোনো পর্দার বাইরের দিকে প্রোটিন সংশ্লেষকারী রাইবোজোম যুক্ত থাকে। তাই এদের অমসৃণ দেখায়। আর কোনো পর্দার বাইরের দিকে রাইবোজোম না থাকায় মসৃণ হয়। বিভিন্ন কোশীয় বস্তুর (প্রোটিন ও লিপিড) সংশ্লেষ, পরিবহণ ও সঞ্চয়ে এই অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে।

অমসৃণ ও মসৃণ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা

- গলজি বস্তু (Golgi bodies)— নিউক্লিয়াসের কাছে থাকা চ্যাপ্টা থলি, লম্বা থলি বা ছোটো গহ্বরের মতো গঠনযুক্ত অঙ্গাণু। এরা পরস্পর সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত থাকে। কোশমধ্যস্থ বিভিন্ন বস্তুর (হরমোন ও উৎসেচক) পরিবহণ ও ক্ষরণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা থেকে গলজি বস্তুর সৃষ্টি হয়।

গলজি বস্তু

- লাইসোজোম (Lysosome)—গলজি বস্তু থেকে উৎপন্ন পর্দা দিয়ে ঘেরা থলির মতো অঙ্গাণু বিশেষ। এর মধ্যে খাদ্যকে হজম করার, জীবাণুদের মেরে ফেলার ও পুরোনো জীর্ণ কোশকে ধ্বংস করার জন্য নানা ধরনের উৎসেচক থাকে। কোশের মধ্যে এটি নানা রূপে অবস্থান করে (লাইসোজোমের বহুরূপতা)। লাইসোজোম যে কোশে থাকে সেই কোশকেই ধ্বংস করতে পারে বলে একে আত্মঘাতী থলি বলে। এই অঙ্গাণুর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

লাইসোজোম

- রাইবোজোম (Ribosome)---এরা পর্দাবিহীন। সাধারণত কোশের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও, অন্য কয়েকটি অঙ্গাণুর ভেতরে (মাইটোকনড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাসটিড) কিংবা এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা ও নিউক্লীয় পর্দার বাইরের দিকেও এই অঙ্গাণুকে আবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়। প্রোটিন সংশ্লেষ করা এই অঙ্গাণুর প্রধান কাজ। সংশ্লেষিত প্রোটিন কোশের ক্ষয়পূরণে ও নতুন কোশ তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। কোনো কোনো প্রোটিন কোশের বাইরেও ক্ষরিত হয়।
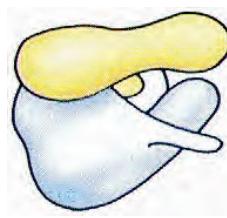
রাইবোজোম

- সেন্ট্রোজোম (Centrosome)---এরাও পর্দাবিহীন। প্রাণীকোশের বিভাজনে এই অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে।

সেন্ট্রোজোম

উদ্ভিদ কোশ

সক্রিয়তামূলক কার্যাবলি

এবার একটি পেঁয়াজ নাও। পেঁয়াজের শুকনো, বাদামি খোসা ছাড়িয়ে ফেলো। ভেতরের যে-কোনো একটি সাদা শাঁসালো স্তর সংগ্রহ করো। এর থেকে একটি পাতলা স্তরকে আলাদা করো। এবার এর প্রস্থচ্ছেদ করো। প্রস্থচ্ছেদে যে অংশটি পাওয়া গেল তাকে স্লাইডে রেখে তার মধ্যে কয়েকফোঁটা মিথিলিন ব্লু যোগ করো। এবার কভার স্লিপ দিয়ে চাপা দিয়ে মাইক্রোস্কোপের নীচে লক্ষ করো।

পেঁয়াজের শল্কপত্রের কোশ

ক্লোরোপ্লাস্ট
নিউক্লিয়াস
গহ্বর
কোশপ্রাচীর

বিবর্ধিত উদ্ভিদকোশ

প্লাজমোডেসমাটা
ক্লোরোপ্লাস্ট
সাইটোপ্লাজম
লাইসোজোম
রাইবোজোম
মাইটোকনড্রিয়ন
অমসৃণ ER
মসৃণ ER
গহ্বর
নিউক্লিওপ্লাজম
নিউক্লিওলাস
নিউক্লিয়ছিদ্র
নিউক্লিয়পর্দা
নিউক্লিয়াস
কোশপ্রাচীর
পেরক্সিজোম
কোশপর্দা
ক্ষরণকারী থলি
গলজি বস্তু
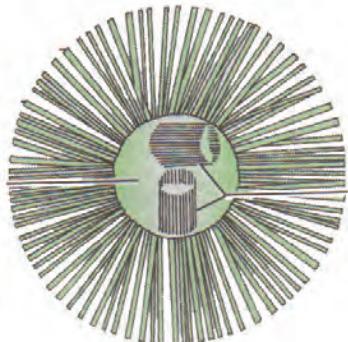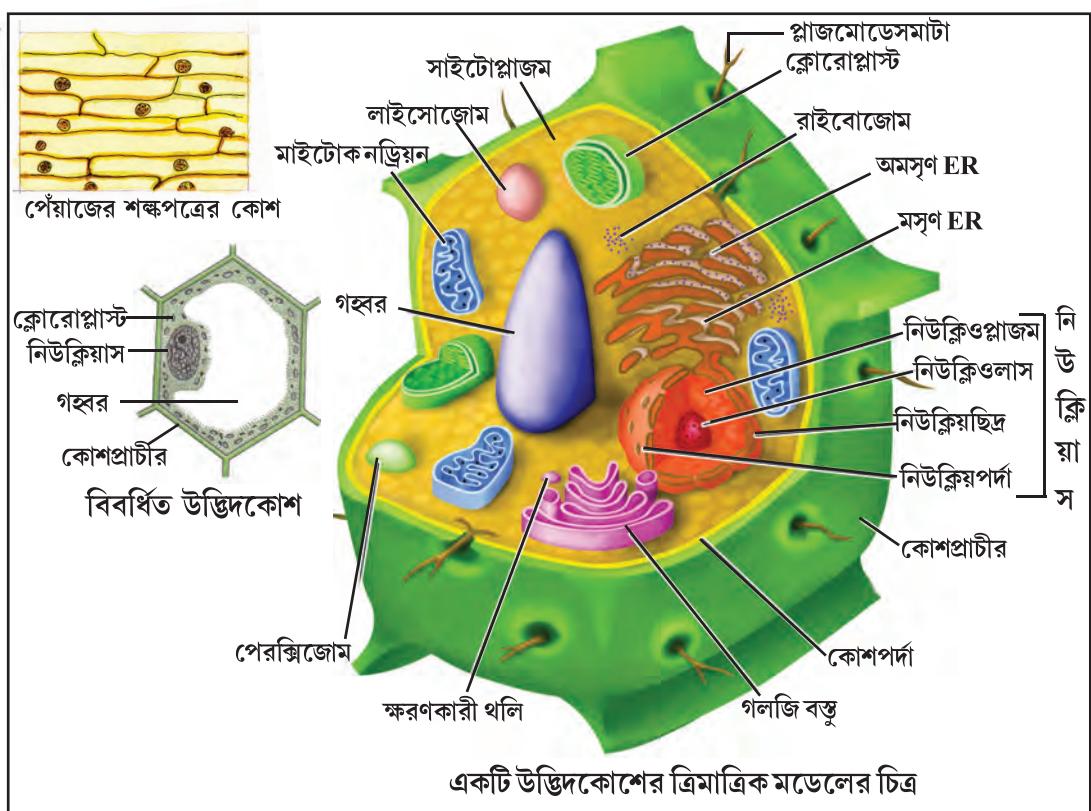
একটি উদ্ভিদকোশের ত্রিমাত্রিক মডেলের চিত্র

দেখোতো, কোন কোন অঙ্গাণু প্রাণীকোশে আছে আবার উদ্ভিদ কোশেও আছে। সেগুলো নীচের ছকে লেখো। আবার কোন কোন অঙ্গাণু প্রাণীকোশে নেই অথচ উদ্ভিদকোশে আছে তার নামও ওই ছকে লেখো।

প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয় কোশে আছে	প্রাণীকোশে নেই অথচ উদ্ভিদকোশে আছে

পেঁয়াজের কোশে প্লাজমা পর্দার বাইরে একটি অতিরিক্ত পুরু স্তর দেখা যায়। এই স্তরটি হলো কোশপ্রাচীর (Cell Wall)। প্রাণীকোশে এটি দেখা যায় না।

কোশপ্রাচীর ও কিছু কথা

উদ্ভিদকোশের বাইরে যে বিস্তৃত বহিঃকোশীয় ধাত্র থাকে তাই হলো কোশপ্রাচীর। এটি মৃত, পুরু, শক্ত এবং দৃঢ়। পরিবেশে প্রায়ই তাপমাত্রার পার্থক্য হয়। বায়ু প্রবাহের গতি বাড়ে বা কমে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণেরও হেরফের হয়। স্থান পরিবর্তন না করতে পারার জন্য সবসময়েই উদ্ভিদকে এধরনের পরিবেশের প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। উদ্ভিদকোশের তাই অতিরিক্ত সুরক্ষার প্রয়োজন হয়। কোশপ্রাচীর উদ্ভিদকে এই অতিরিক্ত সুরক্ষা দিয়ে থাকে।

কোশপ্রাচীরে ছিদ্রের সংখ্যা নির্দিষ্ট। পরিবেশ ও উদ্ভিদকোশের মধ্যে বৃহৎ অণুর আদান-প্রদানও সীমিত। কোশপ্রাচীরের যান্ত্রিক দৃঢ়তার জন্য বাইরে লঘুসারক (হাইপোটনিক) দ্রবণ থাকলেও উদ্ভিদকোশ সহজেই বেঁচে থাকতে পারে। এই কোশপ্রাচীরের রাসায়নিক গঠনের পার্থক্যের জন্য উদ্ভিদের কোনো অঙ্গ নরম, মাঝারি শক্ত বা খুব শক্ত ও দৃঢ় হয়।

কোশপ্রাচীরের উপস্থিতির জন্যই উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের মধ্যে আন্তঃকোশীয় সংযোগ, বৃদ্ধি, জলসাম্য বজায় রাখা, পুষ্টি, বংশবিস্তার, প্রতিরক্ষা ও বাহ্যিক গঠনের নানা পার্থক্য চোখে পড়ে।

তুমি যখন মাইক্রোস্কোপের নীচে পেঁয়াজের কোশ লক্ষ করছিলে তখন কি কোনো ফাঁকা গঠন তোমার চোখে পড়েছে?

যদি এমন গঠন তোমার চোখে পড়ে, তবে জানবে এরা হলো গহ্বর (Vacuole)। পেঁয়াজের কোশে এরা সংখ্যায় একটি আর আকৃতিতেও বড়ো। কিন্তু মুখগহ্বরের কোশে এরা সংখ্যায় অনেক আর আকৃতিতে ছোটো। সাধারণত উদ্ভিদকোশে বৃহদাকৃতির গহ্বর আর প্রাণীকোশে ছোটো আকারের গহ্বর দেখা যায়। উদ্ভিদকোশে গহ্বরের বাইরে কোনো পর্দা থাকে না। গহ্বরের আকার ক্রমশ যখন বাড়তে থাকে, তখন নিউক্লিয়াসসহ সাইটোপ্লাজম কোশপ্রাচীরের ভেতরের দিকে কোশের পরিধির দিকে সরে যায়। গহ্বরকে বেষ্টন করে সাইটোপ্লাজমের এরকম বিন্যাসকে প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল বলে। উদ্ভিদকোশের গহ্বরে জল, অক্সিজেন, রেচন পদার্থ ইত্যাদি জমা থাকে।

প্রাইমরডিয়াল ইউট্রিকল
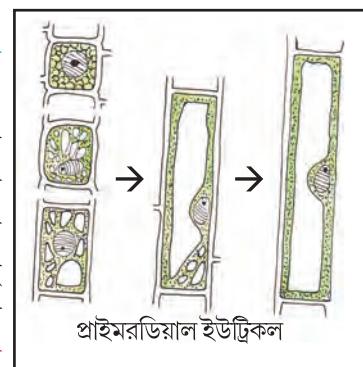
উদ্ভিদকোশ সাইটোপ্লাজমের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হলেও কুঁচকে যায় না। উদ্ভিদদেহ গঠনে গহ্বর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোশের আকার (Size) বাড়বে না কমবে তা কোশের মধ্যে জলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ মাটি থেকে কত পরিমাণ জল শোষণ করতে পারে তার উপর নির্ভর করে গহ্বর জল গ্রহণ করবে না ছাড়বে। প্রখর সূর্যালোকে দীর্ঘ সময় কোনো গাছের চারাকে রাখলে পাতাগুলো নুইয়ে পড়ে। আবার জলের উৎসের সংস্পর্শে এলে গাছটি আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে। কারণটি তোমরা বোঝার চেষ্টা করো।
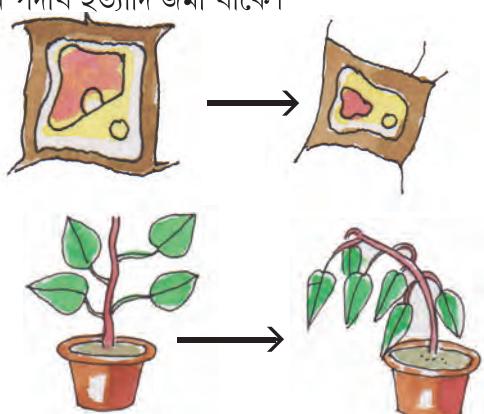
উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আর কি কোনো পার্থক্য তোমার চোখে পড়েছে?

পাতাশেওলা, ঝাঁঝির কোশ নিয়ে তুমি যদি রং করে দেখো তবে দেখতে পাবে সাইটোপ্লাজমে এক ধরনের রঙিন গঠন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরা হলো প্লাসটিড (Plastids)। রং করার পর এরা নানা রং-এর হয়ে থাকে। এদের কারো মধ্যে সবুজ রং-এর রঞ্জক ক্লোরোফিল থাকে। এরা হলো ক্লোরোপ্লাসটিড। ক্লোরোপ্লাস্টিড - এর মধ্যে গ্রানা নামক এক বিশেষ গঠন দেখা যায়। এদের উপস্থিতির জন্য উদ্ভিদের নানা অঙ্গ সবুজ হয়। ক্লোরোপ্লাস্টের ধাত্রেও নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA ও RNA) থাকে। উদ্ভিদদেহের কোথায় কোথায় ক্লোরোপ্লাস্ট দেখা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করো।

(1) .... (2) .... (3) .... (4) ....

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে থাকা ক্লোরোফিল এই প্রক্রিয়ায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। ক্লোরোপ্লাসটিড ছাড়া আরও দু-ধরনের প্লাসটিড উদ্ভিদকোশে দেখা যায়। দ্বিতীয় ধরনের প্লাসটিডে কমলা, লাল, হলুদ ও অন্যান্য বর্ণের (সবুজ ব্যতীত) রঞ্জক থাকে। এরা ফুল ও ফলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের ক্রোমোপ্লাসটিড বলা হয়। আর তৃতীয় ধরনের প্লাসটিড বর্ণহীন। নানাধরনের খাদ্য সঞ্চয় করে। এদের লিউকোপ্লাসটিড বলা হয়।
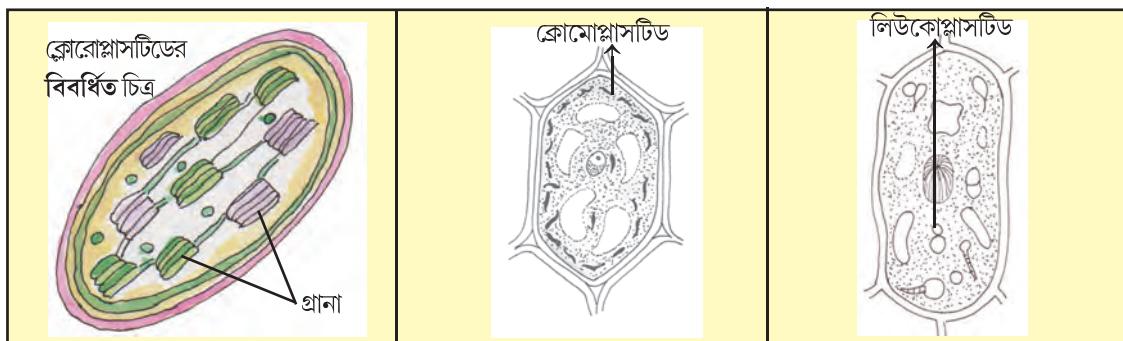
উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশ কি একইরকম না আলাদা?

তুমি যদি পেঁয়াজ কোশ ও মুখের ভেতরের দেয়ালের কোশ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকো, তবে তাদের ছবিগুলো খাতায় এঁকে আবার লক্ষ করো ও বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করো।

পেঁয়াজের কোশ	মুখের ভেতরের দেয়ালের কোশ

বৈশিষ্ট্য	উদ্ভিদকোশ	প্রাণীকোশ
(1) কোশপ্রাচীর		
(2) গহ্বর		
(3) প্লাসটিড		
(4) সেন্ট্রোজোম		

এবার এসো উদ্ভিদ ও প্রাণীকোশের গঠনগত বিভিন্ন অংশকে একসঙ্গে আরেকবার জেনে ও বুঝে নিই।

অঙ্গাণুর নাম	অবস্থান (উদ্ভিদকোশ/প্রাণীকোশ)	বৈশিষ্ট্য	কাজ
(1) কোশপ্রাচীর			
(2) প্লাজমা পর্দা			
(3) সাইটোপ্লাজম			
(4) নিউক্লিয়াস			
(5) মাইটোকনড্রিয়া			
(6) গলজি বস্তু			
(7) লাইসোজোম			
(8) সেন্ট্রোজোম			
(9) রাইবোজোম			
(10) প্লাসটিড			
(11) গহ্বর			

- দেখোতো, নীচের ছকে দু-পাশের কথাগুলো দাগ টেনে মেলাতে পারো কিনা। ডানদিকে একটি বাড়তি নাম দেওয়া আছে।

A স্তম্ভ	B স্তম্ভ
(ক) যে অঙ্গাণু কোশের শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়	(i) লাইসোজোম
(খ) প্রাণীকোশ বিভাজনে যে অঙ্গাণু অংশগ্রহণ করে ।	(ii) ভ্যাকুওল
(গ) উদ্ভিদকোশে যে অংশ থাকার জন্য গাছের গুঁড়ি ভীষণ শক্ত হয়।	(iii) গলজিবডি
(ঘ) কোশের যে অংশটির মধ্যে জিন থাকে।	(iv) নিউক্লিয়াস
(ঙ) চ্যাপটা থলি লম্বা থলি আর ছোটো গহ্বরের ভাঁড়ার।	(v) প্লাসটিড
(চ) রোগজীবাণু পাচন করে ধ্বংস করার সময়ে শ্বেতরক্তকণিকায় যে অঙ্গাণুর সংখ্যা বাড়ে।	(vi) মাইটোকনড্রিয়া
	(vii) রাইবোজোম

A স্তম্ভ	B স্তম্ভ
(ছ) উদ্ভিদকোশে এখানে জল, খাদ্য, রেচনদ্রব্য, বায়ু এসব জমানো থাকে।	(viii) কোশপ্রাচীর
(জ) সাইটোপ্লাজমকে কতকগুলি অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে।	(ix) সেন্ট্রোজোম
(ঝ) খাদ্য তৈরি করে, খাদ্য সঞ্চয় করে, আবার ফুল-ফলের রং-ও নির্ধারণ করে।	(x) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা
(ঞ) প্রোটিন সংশ্লেষকারী কোশে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকার বাইরের দেয়ালে যা লেগে থাকার জন্য অমসৃণ লাগে।	(xi) কোশপর্দা

- নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও (একের বেশি উত্তর ঠিক হতে পারে)।

(i) প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করে :

(i) লাইসোজোম (ii) রাইবোজোম (iii) নিউক্লিওলাস (iv) গলজি বস্তু (v) সাইটোপ্লাজম (vi) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (vii) ক্ষরণ দানা (viii) ভ্যাকুওল (টিক দাও)

(ii) কোশের নানা উপাদান সংশ্লেষ, সঞ্চয় আর ক্ষরণ করতে সাহায্য করে।

(i) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (ii) গলজি বস্তু (iii) লাইসোজোম (iv) সেন্ট্রোজোম (v) ভ্যাকুওল (টিক দাও)

- কোন কোন অঙ্গাণু একটি অপরটির বিপরীত কাজ করে খুঁজে বার করে লেখো।

(i) উদ্ভিদকোশে খাদ্য সংশ্লেষ ও ভাঙন

(ii) প্রাণীকোশে কোশের ভেতরে প্রোটিন সংশ্লেষ ও প্রোটিন পাচন

- কোশের কোন অঙ্গাণু থেকে কোন অঙ্গাণুটি উৎপন্ন হয় লেখো।

(i) গলজি বস্তু : মাইটোকনড্রিয়া/কোশপর্দা/ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা

(ii) লাইসোজোম :সেন্ট্রোজোম/ গলজি বস্তু/ এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা

(iii) এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা : কোশপর্দা/প্লাসটিড/ গলজি বস্তু

(iv) রাইবোজোম : নিউক্লিওলাস/ সেন্ট্রোজোম/ লাইসোজোম

- নখ ও চুলের প্রান্তদেশের কোশগুলি বারবার বিভাজিত হয়ে নখ আর চুলের বৃদ্ধি ঘটায়। এই কোশগুলিতে কোন অঙ্গাণুটি খুব সক্রিয় থাকে?
- শ্বেতরক্তকণিকাগুলি নিজের কোশের মধ্যে রোগজীবাণুদের পাচন করে ধ্বংস করে। ওই সময়ে কোন অঙ্গাণুটির সংখ্যা বেড়ে যায় ও কেন?

- খাওয়ার পরেপরেই পাকস্থলীর উৎসেচক ক্ষরণকারী গ্রন্থিকোশগুলিতে কোন অঙ্গাণুটির সংখ্যা খুব বেড়ে যায়?
- অন্ত্রের দেয়ালের পেশিকোশগুলি আস্তে আস্তে নড়াচড়া করে। কিন্তু হাত-পায়ের পেশিকোশগুলি নড়াচড়া করে খুব তাড়াতাড়ি। তাহলে হাত-পায়ের পেশির কোশে কোন অঙ্গাণুটি অনেক সংখ্যায় আছে?
- যেমন করে পেঁয়াজের শল্কপত্রের কোশ দেখেছিলে, তেমনি করে স্লাইডের ওপর রেখে পর্যবেক্ষণ করো এবং কীরকম কোন কোশ পেলে লেখো ঃ

(i) পুঁই বা লাউডাঁটার ছাল

(ii) পুঁই অথবা লিলিপাতার ছাল

(iii) ভাঙা ডিমের ভাসতে থাকা পর্দার মতো অংশ (মুরগির ভ্রূণ)

(iv) মাংসের গায়ে লেগে থাকা সাদা পর্দার মতো অংশ

বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কোশের ওপর প্রভাব

জীবজগৎ নানাধরনের পরিবেশে বাস করে। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান (বায়ুর উষ্ণতা, আর্দ্রতা, অক্সিজেনের পরিমাণ, সালফারের পরিমাণ, চাপ) -এর সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য জীবদেহে গঠনগত ও কার্যগত নানা বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। আর এই গঠনগত ও কার্যগত নানা বৈচিত্র্যের প্রকাশ কোশীয় পরিবেশেও চোখে পড়ে। এবার দেখা যাক জীবরা কত বিভিন্ন ধরনের পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে।

(1) খুব শুকনো ও অত্যন্ত গরম পরিবেশ (মরু অঞ্চল)

(2) খুব শুকনো ও অত্যন্ত ঠান্ডা পরিবেশ (মেরু অঞ্চল)

(3) জলজ পরিবেশ (পুকুর, হ্রদ, নদী, খাল, বিল ইত্যাদি)

(4) লবণাক্ত পরিবেশে (সমুদ্র, খাঁড়ি, মোহনা)

(5) কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশ

(6) অধিক সালফার যুক্ত পরিবেশ

(7) পচনশীল জৈব পদার্থযুক্ত পরিবেশ

(8) বায়বীয় পরিবেশ

(9) উচ্চ চাপযুক্ত পরিবেশ (সমুদ্রের গভীর অঞ্চলে)

(10) অধিক উচ্চতাযুক্ত পরিবেশ (15000 ফুটের অধিক উচ্চতায়)

বিভিন্ন পরিবেশ ও জীবের নানান সমস্যা :

এসো দেখি ওই পরিবেশে বাস করা জীবরা কী করে নিজেরাই এই সমস্যা সমাধান করেছে?

- খুব শুকনো ও গরম পরিবেশে ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়। এদের কাণ্ডের কোশে জল

সঞ্চয়ী উপাদান মিউসিলেজের আধিক্য চোখে পড়ে। আর কোশের বাইরে মোমজাতীয় পদার্থের আস্তরণ দেখা যায় যা বাষ্পমোচনের হার কমায়।

ক্যাকটাস

- খুব শুকনো ও ঠান্ডা পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীদের কোশে অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন থাকে যা কোশীয় তরলে বরফের কেলাস তৈরিতে বাধা দেয়। এছাড়াও তাপ সংরক্ষণের প্রয়োজনে এদের দেহে ফ্যাট সঞ্চয়কারী কোশের প্রাচুর্য থাকে।
- মিষ্টিজলে বসবাসকারী উদ্ভিদের পুষ্প ও পত্রবৃন্তে বায়ুগহ্বরযুক্ত প্যারেনকাইমা কোশ থাকে। এধরনের কোশ থাকার জন্য এরা সহজেই জলে ভেসে থাকতে পারে।
- লবণাক্ত পরিবেশে বসবাসকারী উদ্ভিদের মূলে লবণপূর্ণ কোশ থাকে। প্রাণীদের ফুলকায় ক্লোরাইড কোশ থাকে যা অতিরিক্ত Na^+ ও Cl^- দেহ থেকে বার করে দিতে পারে।

মেসোজোম

- কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে বিকল্প শ্বসন চালানোর জন্য ব্যাকটেরিয়ার কোশে মাইটোকনড্রিয়া অনুপস্থিত। পরিবর্তে কোশপর্দা ভিতরে সাইটোপ্লাজমের দিকে ভাঁজ হয়ে থলির মতো মেসোজোম গঠন করে। মেসোজোম শ্বসনে অংশগ্রহণ করে।
- উষ্ণ ও অধিক সালফার বা সালফার যৌগযুক্ত পরিবেশে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন বিজারণ বিক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি সংগ্রহ করে।
- পচনশীল জৈবপদার্থ যুক্ত পরিবেশে বসবাসকারী জীবদেহের কোশে অধিক অম্লত্ব সহ্য করার ক্ষমতা বর্তমান।
- বায়বীয় পরিবেশে উড়তে ও ভেসে থাকতে সক্ষম প্রাণীদের লোহিতরক্তকণিকায় অতিরিক্ত অক্সিজেন পরিবহণের প্রয়োজনে অধিক মাত্রায় হিমোগ্লোবিন থাকে। খাদ্য ভেঙে দ্রুত শক্তি পাওয়ার প্রয়োজনে কোশে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যার আধিক্যও চোখে পড়ে। পতঙ্গের দ্রুত ডানা ঝাপটানোর প্রয়োজনে ডানা সংলগ্ন পেশিকোশের এত সংখ্যক মাইটোকনড্রিয়া থাকে যে তারা একত্রিত হয়ে প্রায় কেলাসাকার গঠন সৃষ্টি করে।
- সমুদ্রের গভীরে উচ্চচাপযুক্ত পরিবেশে যে সকল প্রাণী বসবাস করে তাদের কোশেও মাইটোকনড্রিয়া সংখ্যায় বেশি থাকে। অন্তঃকঙ্কালের কোশে ক্যালশিয়ামের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।
- অধিক উচ্চতা যুক্ত পরিবেশে বসবাসের জন্য প্রাণীদের রক্তে লোহিতরক্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। পেশিকোশে মাইটোকনড্রিয়া ও মায়োগ্লোবিনের (অক্সিজেন সরবরাহকারী শ্বাসরঞ্জক) সংখ্যা ও পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেড়ে যায়। লোহিতরক্তকণিকার সংখ্যা বাড়ায় তাতে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণও বেড়ে যায়।
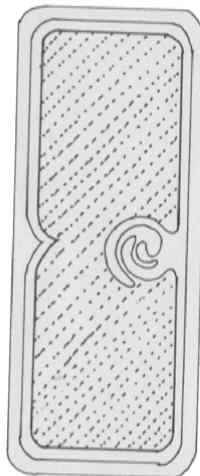
অণুজীবের জগৎ

অণুজীবের বৈচিত্র্য

ওপরে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের ছবি লক্ষ করো। এরা পরিবেশের সজীব উপাদান। বায়ু, জল, মাটি অথবা অন্য নানা জায়গায় এদের দেখা যায়। কিন্তু আমরা কী জানি আমাদের চারদিকে এরা ছাড়াও আরও নানা ধরনের জীব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের খালি চোখে দেখা যায় না। এরা হলো অণুজীব। আমরা এই অদৃশ্য অণুজীবদের সম্পর্কে এসো জানার চেষ্টা করি।
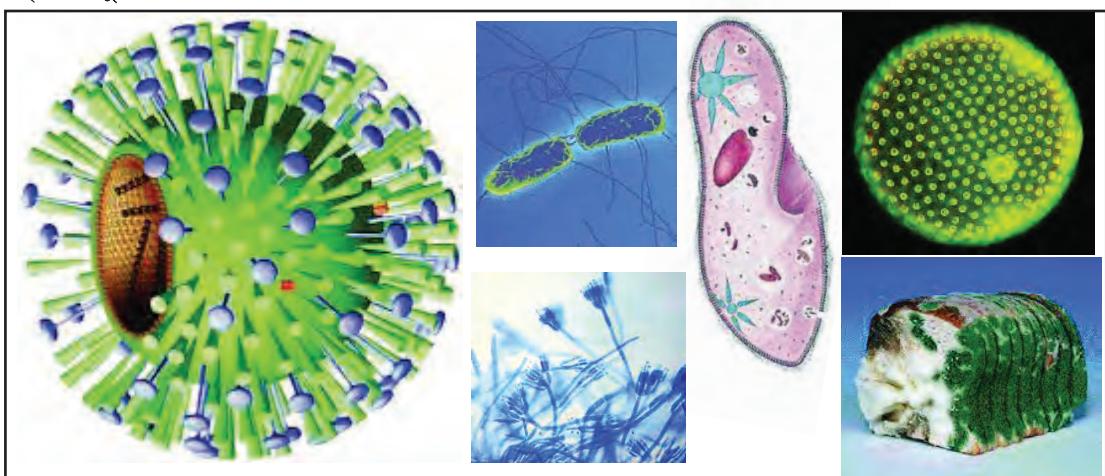
তোমার কাজ

বর্ষাকালে পাঁউরুটি ভিজে গেলে বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে দীর্ঘক্ষণ থাকলে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। এর ওপরে ধূসর সাদা রঙের স্তর তৈরি হয়। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস (Magnifying glass) জোগাড় করে তা দিয়ে পাঁউরুটির ওপর ছাপছাপ জায়গাগুলো দেখার চেষ্টা করো। তুমি কতকগুলো খুব ছোটো, সূক্ষ্ম কালো রঙের গোল গোল কিছু দেখতে পাবে। এই ধরনের গঠন কী এবং এরা কোথা থেকে আসে?
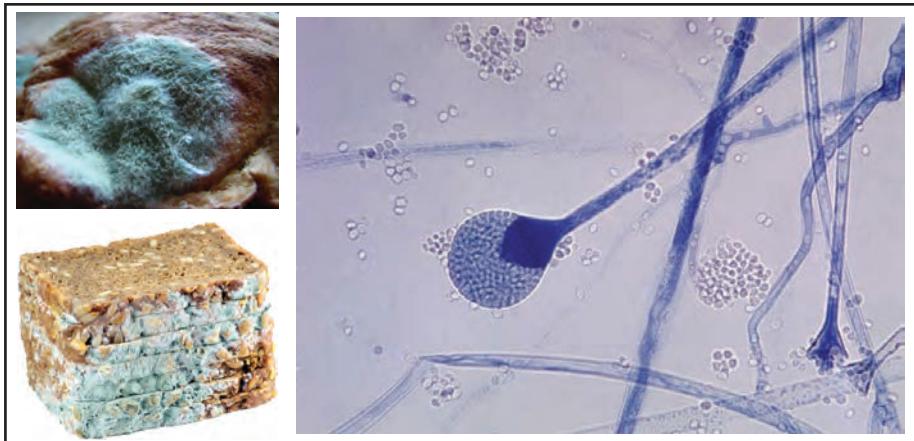
তুমি আর কোথায় কোথায় অণুজীব দেখতে পারো

(a) নীচের নমুনাগুলো সংগ্রহ করে প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদা ভাবে রাখো। কাছাকাছি কোনো আবদ্ধ জলাশয় বা পুকুর থেকে একটা গ্লাসে কিছুটা জল নাও। একটুকরো কাপড়ের মধ্য দিয়ে জলটাকে যেতে দাও। তারপর ছাঁকা পুকুরের জলকে রেখে দাও।

(b) একটা পাতা সংগ্রহ করো। এর ওপরের তলটা জল দিয়ে ভালো করে ধোও এবং ধোওয়া জলটা সংগ্রহ করো।

(c) তোমার নোংরা হাত জল দিয়ে ধোও এবং ধোওয়ার সময় সেই জল একটা পাত্রে সংগ্রহ করো।

(d) এক-দু-ফোঁটা দই নিয়ে তাতে একটু জল মেশাও।

(e) তোমার আশপাশের জমি থেকে কিছুটা ভেজা মাটি সংগ্রহ করো। মাটির নমুনাকে বিকারে রেখে জল মেশাতে থাকো। মাটির কণা তলায় থিতিয়ে পড়লে ওপরের জল সংগ্রহ করো।

যখন তুমি ওপরের যে-কোনো নমুনা লক্ষ করবে, দেখবে সবগুলোই প্রায় স্বচ্ছ। কিন্তু গ্লাস স্লাইডে যে-কোনো নমুনার এক-দু-ফোঁটা নিয়ে মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখলে দেখবে কত ছোটো ছোটো জীব তাতে ভেসে আছে। কিলবিল করছে বা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। এর থেকে কী কী সিদ্ধান্তে তুমি আসতে পারো?

1.

2.

অণুজীবদের কথা

পৃথিবীতে আজ অবধি যতরকম জীবের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে তার মধ্যে সব থেকে পুরোনো হলো এই অণুজীবরা। প্রায় 350 কোটি (3.5 বিলিয়ন) বছর ধরে এরা পৃথিবীতে টিঁকে আছে। কিন্তু তার পরে আসা বহু জীব পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অণুজীবদের সবার ওজন যদি যোগ করা যায়, তবে দেখা যাবে খালিচোখে দেখতে না পাওয়া এই অণুজীবদের ভর পৃথিবীর সমস্ত জীব-ভরের প্রায় 60%। আমরা প্রশ্বাসের সময় যে পরিমাণ (O_2) গ্রহণ করি তার অর্ধেক পরিমাণই তৈরি করে বিশেষ কিছু অণুজীব। তোমার পায়ের নীচে যে মাটি আছে তাতে প্রায় বহু ধরনের অণুজীব বসবাস করে। আর এক গ্রাম মাটিতে প্রায় 100 কোটি অণুজীব থাকে।

অণুজীবদের বৈশিষ্ট্য :

1. পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এদের পাওয়া যায়— গরম মরুভূমি, মেরু অঞ্চলের বরফের স্তূপে, নোনা জলে, জলাভূমিতে, উষ্ণ প্রস্রবণে, এমনকী অন্য জীবদেহের ভেতরেও (মানুষের খাদ্যনালিতে, উইপোকার খাদ্যনালিতে)। কোথায় কোথায় অণুজীব থাকতে পারে তা আলোচনা করে লেখো।

2. অধিকাংশ অণুজীবদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় আবার ইস্ট কিংবা টিটেনাস রোগসৃষ্টিকারী অণুজীবরা কম অক্সিজেন ঘনত্বেও বেঁচে থাকতে পারে। পরিবেশের কোন কোন স্থানে অক্সিজেনের ঘনত্ব বেশি বা কম থাকে তা আলোচনা করে লেখো।

3. এদের বেঁচে থাকার জন্য ভেজা জায়গা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

4. অন্ধকারময় জায়গায় এরা তাড়াতাড়ি বাড়ে। সরাসরি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এলে কোনো কোনো অণুজীব মারা যায়।

5. এদের কেউ কেউ পচা-গলা বস্তু থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার অন্যরা অন্য কোনো জীবদেহে বাসা বাঁধে ও ওই জীবদেহের নানা অঙ্গ, তরল বা কলাকোশ থেকে বেঁচে থাকার খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার কেউ কেউ নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে।

(i) অন্য কোনো জীবদেহে বাসা বাঁধে বা অন্য কোনো জীবদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এমন ধরনের অণুজীব হলো ভাইরাস, কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া (মোনেরা), ছত্রাক ও কোনো কোনো আদ্যপ্রাণী (প্রোটিস্টা)।

(ii) অ্যালগি ও কয়েক ধরনের অণুজীব নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি করতে পারে।
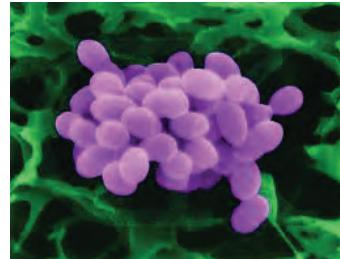
6. সাধারণত বেশিরভাগ অণুজীব 25^0C থেকে 38^0C তাপমাত্রার মধ্যে তাড়াতাড়ি বাড়ে ও বেঁচে থাকে। তবে কোনো কোনো অণুজীব -10^0C এর নীচে বা 100^0C তাপমাত্রার ওপরেও বেঁচে থাকতে পারে। বিশেষ কিছু থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া 100^0C তাপমাত্রার কাছাকাছি বংশবৃদ্ধি করে। নানান উষ্ণ প্রস্রবণের জলে বা গভীর সমুদ্রের গরম জল বেরোবার উৎসের (hydrothermal vent) কাছাকাছি থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়।
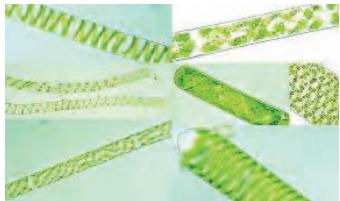
7. অনেকক্ষেত্রে অণুজীবদের অণুবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে দেখার সময় বিশেষ বিশেষ রঙের সাহায্যে রাঙিয়ে নিতে হয়। এই রঙগুলোকে বলে স্টেইন (Stain) এবং রাঙিয়ে নেবার পদ্ধতিকে বলে স্টেইনিং (Staining)।

অণুজীবরা কত ধরনের

অণুজীবরা প্রধানত চার ধরনের। এরা হলো —

- ব্যাকটেরিয়া (মোনেরা)
- আদ্যপ্রাণী (প্রোটিস্টা)
- ছত্রাক (ফাংগি)
- শৈবাল (প্লান্টি)

এছাড়া ভাইরাসরাও আণুবীক্ষণিক। আর এরাও নানারকম ভূমিকা (উপকারী বা অপকারী) পালন করে।
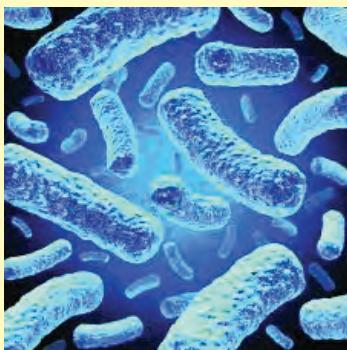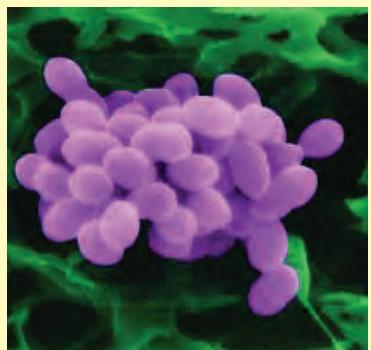
(A) ব্যাকটেরিয়া (মোনেরা)
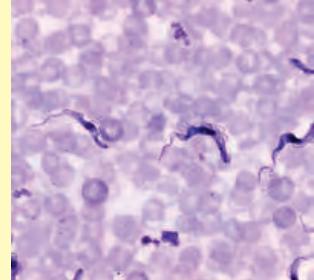
(B) আদ্যপ্রাণী (প্রোটিস্টা)
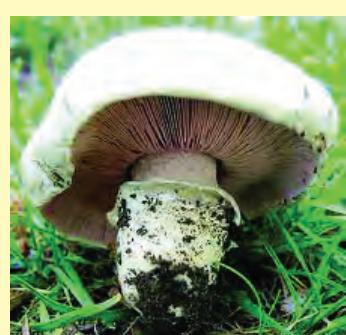
(C) ছত্রাক (ফাংগি)
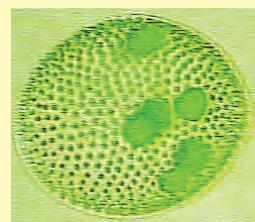
(D) শৈবাল (প্লান্টি)
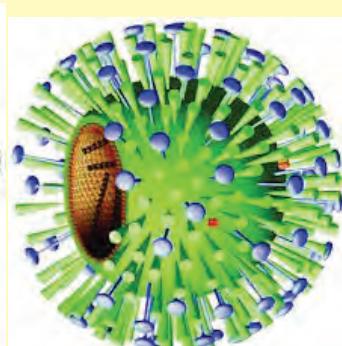
(E) ভাইরাস

ব্যাকটেরিয়া

- জীবজগতের কোশীয় জীবদের মধ্যে আকারে সবথেকে ছোটো ও কোশীয় গঠনের দিক থেকে সরলতম।
- এরা নানা আকারের হয় — কমা, রড, প্যাঁচানো স্ক্রু, বা গোলাকার।
- কোশপ্রাচীর থাকলেও উদ্ভিদ কোশের মতো নয়।
- প্রকৃত নিউক্লিয়াস থাকে না, পরিবর্তে প্যাঁচানো DNA থাকে।
- একক পর্দা দিয়ে ঘেরা কোনো অঙ্গাণু (যেমন-মাইটোকনড্রিয়া, লাইসোজোম, প্লাস্টিড ইত্যাদি) থাকে না। তবে পর্দাবিহীন অঙ্গাণু রাইবোজোম থাকে।

টুকরো কথা
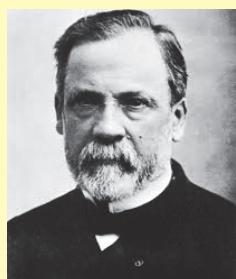
লুই পাস্তুর

1674 সালে আন্তন ফন লিভেনহিক নামে হল্যান্ডের এক লেন্স ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুতকারক সর্বপ্রথম নিজের তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের টিকা ও জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কখ নানা রোগসৃষ্টিতে (যক্ষ্মা ও কলেরা) ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকা আবিষ্কার করেন। এরেনবার্গ (1828) ব্যাকটেরিয়া শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। বর্তমানে ব্যাকটেরিয়াকে 'মোনেরা' গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।
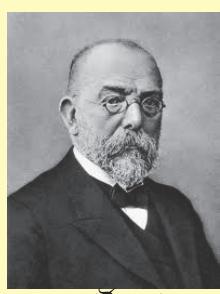
রবার্ট কখ

আদ্যপ্রাণী

অ্যামিবা

- এদের দেহ একটিমাত্র কোশ নিয়ে গঠিত। এদের এখন প্রোটিস্টা বলা হয়। কোশে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে।
- এরা নানা আকারের হয় — গোলাকার, ডিম্বাকার, লম্বা বা থালার মতো।
- এরা স্বাধীনভাবে একা থাকে। আবার অনেকে মিলে একসঙ্গে থাকে। আবার কেউ কেউ পোষক কোশের মধ্যে থেকে নানা রোগ সৃষ্টি করে।
- এরা নানাভাবে চলাচল করে। কারো দেহে ক্ষণপদ, আবার কারোর দেহে চাবুকের মতো ফ্ল্যাজেলা বা চুলের মতো সিলিয়া থাকে।
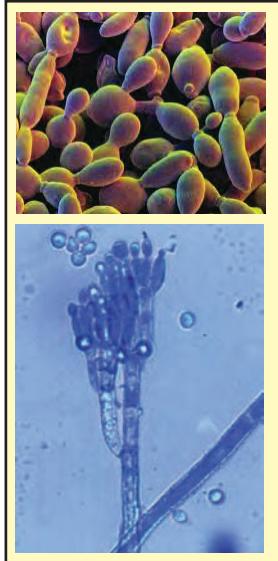
ওপরে ইস্ট ও নীচে পেনিসিলিয়াম

ছত্রাক

- এদের দেহকে মূল, কাণ্ড বা পাতায় আলাদা করা যায় না।
- এদের দেহ এককোশী গোলাকার (ইস্ট) বা সরু সুতোর মতো অংশ দিয়ে তৈরি। এই সুতোর মতো অংশের নাম হলো হাইফি। হাইফি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শাখাপ্রশাখায় ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে জট পাকিয়ে মাইসেলিয়াম নামে একরকম গঠন তৈরি করে। মিউকর, পেনিসিলিয়াম ছত্রাকে এই ধরনের গঠন দেখা যায়। 194 পৃষ্ঠার ছত্রাকের ছবিগুলোতে প্রথম দুটি ছত্রাক আণুবীক্ষণিক এবং তৃতীয় ছত্রাকটি খালি চোখে দেখা যায়।
- এদের কোশে কোশপ্রাচীর, নিউক্লিয়াস, নানা অঙ্গাণু থাকলেও ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে না। তাই এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না।
- এদের কোশপ্রাচীর সবুজ উদ্ভিদের কোশের মতো নয়।
- এরা জলে, স্থলে, আলোর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে থাকতে পারে।

শৈবাল

স্পাইরোগাইরা

- এদের দেহকেও ছত্রাকের মতো মূল, কাণ্ড বা পাতায় আলাদা করা যায় না।
- এদের দেহ এককোশী বা বহুকোশী। অনেকসময় একাধিক কোশ পরস্পর যুক্ত হয়ে বলের মতো গঠন তৈরি করে (এককোশী— ক্ল্যামাইডোমোনাস; এককোশী কিন্তু কোশগুলি পরস্পর যুক্ত— ভলভক্স; বহুকোশী — স্পাইরোগাইরা)।
- এদের কোশে কোশপ্রাচীর, নিউক্লিয়াস, নানা অঙ্গাণু থাকে। নানা আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট থাকায় এরা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে।
- এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য আলোর প্রয়োজন হয়।
- প্রধানত জলে থাকে।

ভাইরাস

এডওয়ার্ড জেনার

বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনারের (1796) বসন্তরোগ সম্পর্কে গবেষণা থেকে আমরা ভাইরাসের কথা জানতে পারি। তবে 1940-এর দশকে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কারের আগে কোনো ভাইরাসকে দেখা সম্ভব হয়নি। সাধারণ অণুবীক্ষণে ভাইরাস দেখা যায় না। ভাইরাস কথাটির শব্দগত অর্থ হলো বিষ।
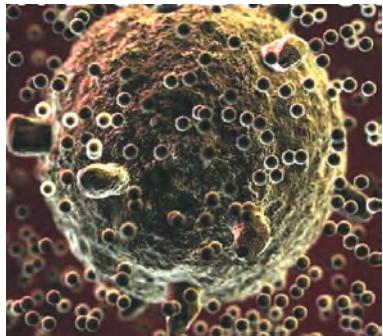
চিকেন পক্স ভাইরাস

- এদের কোনোরকম কোশীয় গঠন নেই।
- এদের কোনো কোশ আবরণী, সাইটোপ্লাজম বা নিউক্লিয়াস থাকে না। পরিবর্তে বাইরে প্রোটিনের তৈরি খোলকের মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA বা RNA) থাকে।
- এরা সবাই পরজীবী বা রোগসৃষ্টিকারী। কেবলমাত্র পোষক জীবকোশে প্রবেশ করলে এদের মধ্যে জীবনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আর পোষক কোশের বাইরে থাকার সময় এরা জড় বস্তুর মতো আচরণ করে। 195 পৃষ্ঠার (E) চিহ্নিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি দুটি ভাইরাসের মডেল।

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক (পরজীবী, মিথোজীবী ও মৃতজীবী)

মানুষসহ বিভিন্ন জীব প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে যে নানা রোগের প্রকাশ দেখা যায় তা প্রধানত অণুজীবদের জন্য। বিভিন্ন প্রকার অণুজীব বায়ু, জল, খাদ্য বা রক্তের মাধ্যমে মানুষের বা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে প্রবেশ করে নানা রোগ সৃষ্টি করে।

এখন দেখা যাক কোন ধরনের অণুজীব মানুষের দেহে কী ধরনের রোগ সৃষ্টি করে।

1) ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ - যক্ষ্মা, কলেরা, ডায়ারিয়া, টাইফয়েড, টিটেনাস, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।
2) ভাইরাসঘটিত রোগ - ইনফ্লুয়েঞ্জা, পক্স , মাম্পস, মিসলস (হাম), পোলিও, জলাতঙ্ক, হেপাটাইটিস, ডেঙ্গুজ্বর, AIDS ইত্যাদি।
3) আদ্যপ্রাণীঘটিত রোগ - অ্যামিবিয়াসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস, ম্যালেরিয়া, স্লিপিং সিকনেস, কালাজ্বর ইত্যাদি।
4) ছত্রাকঘটিত রোগ - দাদ, হাজা, ছুলি, অ্যালার্জি, নাক, মুখ, কান, গলা বা ফুসফুসে রোগ, খাদ্য বিষাক্তকরণ।

   কতকগুলো রঙিন ছত্রাক খুব বিষাক্ত ধরনের। এধরনের ছত্রাক যদি কোনো মানুষ ভুল করে খান তবে বমি, পাতলা পায়খানা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

মানুষের দেহে কোন কোন পথ দিয়ে কোন কোন রোগের অণুজীব প্রবেশ করে তার একটা তালিকা তৈরি করো।

(1) পানীয় জলের মাধ্যমে — ডায়ারিয়া........
(2) হাঁচি কাশির সময় সংক্রামিত বায়ুর শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে — যক্ষ্মা ....
(3) খাদ্যের মাধ্যমে —অ্যামিবিয়াসিস............. (4) রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে — হেপাটাইটিস ....
(5) বাহকের মাধ্যমে — ম্যালেরিয়া..........................
(6) অন্যান্যভাবে — AIDS.......................

টুকরো কথা

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক

কোনো কোনো রোগের জীবাণু (যেমন- ম্যালেরিয়ার জীবাণু) জীবদেহে প্রবেশের পর বিভিন্ন অঙ্গের কোশের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে ওই কোশের বা অঙ্গের বা জীবদেহের ওপর নির্ভরশীল থাকে। অর্থাৎ এরা স্বাধীনভাবে একা একা বেঁচে থাকতে পারে না। কোশের মধ্যে প্রবেশ করলে কোশের নানা অঙ্গাণুর কাজে এরা বাধা সৃষ্টি করে। ফলে পোষকের দেহের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট হয়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। পোষক জীবদেহের সঙ্গে অণুজীবদের এরকম সম্পর্ক হলো পরজীবিতা (Parasitism)।

আবার অনেকসময় দেখা যায় এই অণুজীবদের কেউ কেউ পোষক জীবদেহে থাকলেও তার কোনো ক্ষতি করে না। পরিবর্তে পোষক জীবদেহে নানাভাবে উপকার করে। 1888 সালে বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেন যে সিম, মটর জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করার সময় যদি মাটিতে নাইট্রোজেন বা অ্যামোনিয়া সার না দেওয়া হয় তাহলেও এদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় না।

তোমরা লক্ষ করে থাকবে কোনো ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তিনি তাকে রোগ অনুযায়ী নানা ওষুধ খেতে দেন। ওষুধের মধ্যে যেমন ওই রোগের জীবাণুকে মারার ওষুধ থাকে আবার B কমপ্লেক্স জাতীয় ভিটামিনও থাকে। এখন প্রশ্ন হলো ডাক্তারবাবু কী ওই ব্যক্তির মধ্যে ভিটামিনের অভাব লক্ষ করেছিলেন না অন্য কোনো কারণে তাকে ভিটামিন খেতে দিলেন?

অনেক গবেষণার পর দেখা গেছে মানুষের দেহের ক্ষুদ্রান্ত্রে একধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে যারা ভিটামিন B_{12} তৈরি করে। আমাদের রক্তের কোশ লোহিত রক্তকণিকার ভেতরে থাকা হিমোগ্লোবিন তৈরিতে এই ভিটামিন কাজে লাগে। এখন অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া যেমন মারা যায়, তেমনি অন্ত্রের এই ব্যাকটেরিয়াও মারা যায়। তখন হঠাৎ করে ভিটামিনের অভাব দেখা দিতে পারে।

রাইজোবিয়াম ও মটর গাছের মূলের অর্বুদ

ডাল জাতীয় গাছের মূলের অর্বুদে রাইজোবিয়াম এবং এশ্চেরিচিয়া কোলাই ব্যাকটেরিয়ার মতো অণুজীবরা মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে থেকে আশ্রয় ও পুষ্টি গ্রহণ করে। পরিবর্তে রাইজোবিয়াম বায়ুর নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে যৌগ তৈরি করে মটর গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বা এশ্চেরিচিয়া কোলাই মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন B_{12} সরবরাহ করে।

অনেকসময় একাধিক অণুজীব একে অপরের সঙ্গে সহাবস্থান করে পুষ্টি বিনিময় করে। শৈবাল ও ছত্রাক এরকম পাশাপাশি থাকে। ছত্রাক জল ও অজৈব লবণ শোষণ করে শৈবালদের দেয়। আর শৈবালরা ওই পুষ্টিরস ব্যবহার করে নিজেদের দেহে খাদ্য তৈরি করে। ওই খাদ্যের কিছু অংশ ছত্রাকরা ব্যবহার করে। শৈবাল ও ছত্রাকের এরকম সহাবস্থানই হলো লাইকেন। এও একধরনের মিথোজীবিতা।

টুকরো কথা

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক

মটরগাছের মূলের অর্বুদে থাকা রাইজোবিয়াম বা মানুষের অন্ত্রে থাকা *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়ার পোষক দেহের সঙ্গে ক্ষতি না করে সহাবস্থানের মাধ্যমে থাকার এই পদ্ধতিই হলো মিথোজীবিতা (Symbiosis)।

টুকরো কথা

জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক

বহু অণুজীব মৃত, পচাগলা বস্তুর ওপর নিজদেহ থেকে উৎসেচক ক্ষরণ করে ওই উৎসেচকের ক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তুকে ভেঙে দেয়। ফলে নানা শোষণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য উপাদান তৈরি হয়। বহু ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাক এই পদ্ধতিতে পুষ্টিকার্য সম্পন্ন করে। এখানে একই সঙ্গে জটিল জৈববস্তু বিয়োজন ও রূপান্তর ঘটে। এই পদ্ধতিই হলো মৃতজীবিতা (Saprophytism)। এর ফলে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয়, জীবাণুর সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা কমে ও মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

পরিবেশে অণুজীবের ভূমিকা (কৃষি, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ প্রস্তুতি, বর্জ্য পরিষ্কার)

কৃষি

অণুজীবরা মানুষসহ অন্যান্য জীবদেহে যে যে অপকারী ভূমিকা পালন করে তার একটি তালিকা তৈরি করো। তবে অপকারই নয়, নানা ক্ষেত্রে এরা উপকারী ভূমিকাও পালন করে। এসো কৃষিকাজে ঘটে চলা কতকগুলি ঘটনার সঙ্গে আমরা পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করি।

ঘটনা	সমস্যা
1. বিভিন্ন চাষ করা ফসলের দেহ গঠনের প্রধান উপাদান হলো প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড। এগুলো নাইট্রোজেন ছাড়া তৈরি করা যায় না। কিন্তু কোনো উদ্ভিদই বাতাসের নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না।	কীভাবে বাতাসের নাইট্রোজেন উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেনে পরিণত হতে পারে?
2. পাটগাছ বড়ো হয়ে গেলে তাকে কেটে ডোবা বা পুকুরের অপরিষ্কার জলে কিছুদিন ডুবিয়ে রাখা হয়।	কীভাবে পাটের তন্তু পাটের কাণ্ড থেকে আলাদা করা সম্ভব?

● অধিকাংশ উদ্ভিদই নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট NO_3^- বা অ্যামোনিয়াম NH_4^+ রূপে ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু মাটিতে এদের পরিমাণ খুবই কম এবং এরা সহজেই মাটি থেকে ধুয়ে চলে যায় বা অন্যভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

অণুজীবরা নানাভাবে মাটিতে সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেন যুক্ত করে বা নাইট্রোজেনযুক্ত ব্যবহার উপযোগী যৌগ তৈরি করে মাটিতে মিশিয়ে দেয়—

(i) ক্লসট্রিডিয়াম, অ্যাজোটোব্যাকটার জাতীয় স্বাধীনজীবী ব্যাকটেরিয়া ও নানা সায়ানোব্যাকটেরিয়া সরাসরি বাতাসের নাইট্রোজেনকে শোষণ করে নিজেদের দেহে নাইট্রোজেন যৌগ গঠন করে। এসব অণুজীব মরে গেলে ওই নাইট্রোজেন যৌগগুলো মাটিতে মুক্ত হয়।

(ii) ডাল, সয়াবিন জাতীয় উদ্ভিদের মূলের অর্বুদে বসবাসকারী মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া রাইজোবিয়াম নাইট্রোজেন স্থিতিকরণে (Nitrogen Fixation) সমর্থ। এরা নাইট্রোজেনকে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত করে। এর কিছুটা অংশ আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে সরবরাহ করে। বাকিটা অর্বুদ পচে গেলে মাটিতে মিশে যায়।
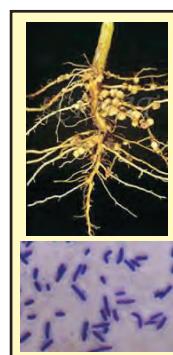
(iii) উদ্ভিদ বা প্রাণীরা যখন মারা যায়, তখন তাদের দেহের নানা নাইট্রোজেনযুক্ত যৌগ ভেঙে গিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরি হয়। এই পদ্ধতিকে অ্যামোনিফিকেশন (Ammonification) বলে। নাইট্রোসোমোনাস, নাইট্রোব্যাক্টার নামক নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া অ্যামোনিয়ামকে যথাক্রমে নাইট্রাইট ও নাইট্রেটে রূপান্তরিত করে। এই পদ্ধতিকে নাইট্রিফিকেশন বলে।

- পাট গাছকে কয়েকদিন পুকুর বা ডোবার অপরিষ্কার জলে চুবিয়ে রাখলে জলের ব্যাকটেরিয়া পাটের কাণ্ডে থাকা পেকটিন নষ্ট করে দেয়। ফলে পাটের তন্তুগুলো পাটকাঠি থেকে সহজেই আলাদা করা সম্ভব হয়।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

(i) দই তৈরি — যখন দই-এর মধ্যে থাকা ল্যাকটোব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়া 37^0C উষ্ণতায় গরম দুধের সঙ্গে মেশানো হয় তখন তাদের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া দুধের ল্যাকটোজকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে।
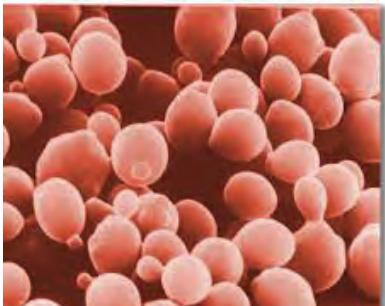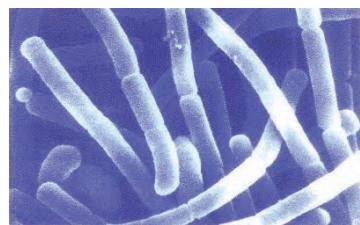
ল্যাকটোব্যাসিলাস

(ii) বিশেষ বিশেষ ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় চিজ, কেক, ধোকলা, ইডলি, দোসা, পাঁউরুটির মতো নানা খাবার বানানো যায়।

(iii) ইস্টের কোশ ফলের রসে থাকা শর্করাকে ভেঙে অ্যালকোহল তৈরি করে। ব্যাকটেরিয়া এই অ্যালকোহলকে ভিনিগারে রূপান্তরিত করে।

ইস্ট

টুকরো কথা

খাওয়ার পর তোমরা কি কেউ কখনও অসুস্থ হয়েছ? যদি কেউ খাদ্য খাওয়ার পর অসুস্থ হন, তবে বুঝতে হবে খাদ্যে কোনো অণুজীবের সংক্রমণ ঘটে থাকতে পারে। সাধারণত ছত্রাক আর ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের সংস্পর্শে এলে খাদ্যস্থিত নানা যৌগকে ভেঙে ফেলে। আর অণুজীবদের দেহ থেকে বেরোনো বিষাক্ত পদার্থ খাদ্যের সঙ্গে মিশে খাদ্যকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে তোলে।

কীভাবে খাদ্যকে ভালো রাখা সম্ভব?

- কোনো পাত্রে বায়ুশূন্য করে খাদ্যকে রেখে (Canning) বা বিশেষ মোড়কে রেখে (Packaging)
- কোনো কোনো সবজি (যেমন- বাঁধাকপি) ও ফলকে (যেমন- টুকরো বা কাটা আম) দীর্ঘসময় রোদে শুকিয়ে নিয়ে (Sun drying)
- মাছ, মাংস বা ফলে নুন মাখিয়ে রাখলে (Salting)
- কাটা আম, লেবু, বাঁধাকপি, পিঁয়াজে ভিনিগার যোগ করলে (Pickling)
- ফলে চিনি যোগ করে (Adding Sugar)
- খাদ্যকে কম তাপমাত্রায় রেখে (Refrigeration)
- পাস্তুরাইজেশন (Pasteurization)

ওষুধ প্রস্তুতি

বিশেষ কিছু ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের দেহনিঃসৃত কিছু কিছু জৈব যৌগ অন্যান্য ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিতে বাধা দেয় অথবা তাদের মেরেও ফেলে। এইসব যৌগকে নানাভাবে বিশুদ্ধিকরণের ও প্রয়োজনে রাসায়নিকভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে নানান জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি করা হয়। এই জীবনদায়ী ওষুধগুলোকে অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) বলা হয়।

টুকরো কথা

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং 1928 সালে প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি অ্যাগার (agar) প্লেটে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি দেখছিলেন। কিন্তু একটা প্লেট তিনি অসাবধানতাবশত খোলা রেখেছিলেন। প্লেটের ওপরে একটা ছত্রাক ক্রমশ সংখ্যায় বাড়তে লাগল এবং ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি ব্যাহত হলো। এই ছত্রাকটি ছিল পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। এই ছত্রাকের দেহ থেকে পাওয়া যৌগটি ছিল পেনিসিলিন। যা ছিল মানুষের আবিষ্কৃত প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক।
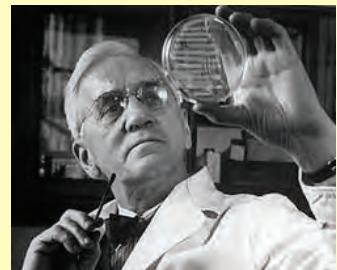
আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

এরপর স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, অ্যাম্পিসিলিনের মতো নানা অ্যান্টিবায়োটিক মানুষ আবিষ্কার করেছে। এইসব অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঠেকানো যায়। ভাইরাস বা ছত্রাকঘটিত কোনো রোগে এরা কাজ করে না।

ভ্যাকসিন — যখন কোনো জীবাণু (ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া বা ছত্রাক) আমাদের দেহে প্রবেশ করে, তখন জীবাণুর গাত্র বা দেহ থেকে বেরোনো নানা ক্ষতিকারক যৌগ আমাদের দেহে প্রবেশ করে। এরা হলো অ্যান্টিজেন। এদের ধ্বংস করার জন্য আমাদের শরীরে একধরনের যৌগ তৈরি হয়। এরা অ্যান্টিজেনকে আক্রমণ করে ও ধ্বংস করে। এই প্রোটিনধর্মী যৌগগুলি হলো অ্যান্টিবডি। কোনো জীবদেহের রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক এই ক্ষমতাই হলো অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি (Immunity)।

এখন কোনো মৃত, দুর্বল, জীবিত অণুজীবকে বা সরাসরি অণুজীবের দেহ থেকে বেরোনো দুর্বল বিষকে নির্দিষ্ট ডোজে আগে থেকে কোনো মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলে কী হতে পারে? ওই ধরনের অণুজীবদের বিরুদ্ধে আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় টীকাকরণ বা অনাক্রম্যকরণ (Vaccination বা Immunization)। ভ্যাকসিন ব্যবহার করে টাইফয়েড, টিটেনাস, পোলিও, ডিপথেরিয়ার মতো বহু রোগকে ঠেকানো সম্ভব হয়েছে।

বর্জ্য পরিষ্কার

(i) মল বা মূত্রের মতো অশোধিত বর্জ্য মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে এক বিশেষ ঝুঁকি। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া কম অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশে থাকে। এরা এধরনের বর্জ্যকে ভেঙে নানা ব্যবহারযোগ্য যৌগ তৈরি করে। এরা রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কমায়। আবার মাটির উর্বরতাও বাড়ায়।

(ii) ভারত বা চিনের মতো দেশে গ্রামের দিকে মানুষ ও অন্য জন্তুর মল, তরকারির খোসার মতো বর্জ্যকে মেথানোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ভেঙে মিথেন গ্যাস তৈরি করা হয়। এই গ্যাস কয়লা, কেরোসিনের মতো জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(iii) মহাকাশযানে বাতাস পরিষ্কার করতে কোনো কোনো শ্যাওলাকে ব্যবহার করা হয়।

ফসল, ফসলের বৈচিত্র্য ও ফসল উৎপাদন

কৃষিবিজ্ঞান

আমরা নানারকম খাবার খাই। তার কোনোটা আমরা পাই উদ্ভিদ থেকে আবার কোনোটা পাই প্রাণীদের থেকে। উন্নতমানের উদ্ভিদজাত আর প্রাণীজাত খাবার যথেষ্ট পরিমাণে পেতে গেলে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তার জন্য বিজ্ঞানের একটা শাখায় খাদ্য উৎপাদনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিজ্ঞানের এই শাখাটাকেই আমরা বলি কৃষিবিজ্ঞান (Agriculture)। নতুন আর উন্নত ধরনের শস্য বা ফসল উৎপাদনের পদ্ধতির আবিষ্কার, বেশি দুধ আর উন্নত মানের ডিম বা ক্ষেত্রবিশেষে মাংস পাওয়ার জন্য বিভিন্ন পশু-পাখি (যেমন গোরু, ছাগল, ভেড়া আর মুরগি ইত্যাদি) পালন করার পদ্ধতি— এসব নিয়েই কৃষিবিজ্ঞানে আলোচনা করা হয়।

কৃষিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

1. মাটির ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ মাটিকে ফসল ফলানোর উপযোগী করে তোলা(Soil management)
2. ফসল উৎপাদন (Crop production)
3. ফল, সবজি, ফুল আর সাজানোর কাজে লাগে এমন বিভিন্ন উদ্ভিদের চাষ (Horticulture)
4. পশুপালন (Animal husbandry)

ফসল কী?

বড়ো মাপে কোনো উদ্ভিদের চাষ করার সময় সেই উদ্ভিদের চাহিদার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা হয়, যাতে ওই উদ্ভিদের ফলন বাড়ে। এইভাবে অনেকটা জায়গা জুড়ে একই ধরনের উদ্ভিদের চাষ যখন করা হয়, তখন ওই উদ্ভিদদের একসঙ্গে বলা হয় শস্য বা ফসল (Crop)।

ফসলের বৈচিত্র্য

ফসল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নীচের তালিকায় বিভিন্ন ধরনের ফসলের কথা বলা হলো। তোমার জানা আরো কিছু ফসলের নাম সারণিতে যোগ করতে পারো।

ফসলের ধরন	উদাহরণ
1. তণ্ডুল জাতীয় ফসল	ধান, গম, ...
2. তন্তু জাতীয় ফসল	তুলো, পাট, ...
3. ডালজাতীয় ফসল	ছোলা, মটর, বিন, ...
4. তৈলবীজ পাওয়া যায় এমন ফসল	সরষে, সূর্যমুখী, ...
5. কন্দ জাতীয় ফসল	আলু, আদা, ...
6. চিনি পাওয়া যায় এমন ফসল	আখ,..........................
7. বাগানে চাষ করা হয় এমন ফসল	চা, কফি, রবার, ...
8. ওষুধ পাওয়া যায় এমন গাছ	তুলসী, ...
9. মশলা পাওয়া যায় এমন গাছ	গোলমরিচ, আদা, ...

তোমরা কি লক্ষ করেছ যে এমন কিছু খাবার আছে যা আমরা প্রতিদিন খাই অথচ সেগুলো ওপরের তালিকায় নেই? কী বলোতো? সবজি আর ফলকে ওই তালিকায় রাখা হয়নি। কারণ কৃষিবিজ্ঞানেরই আরেক শাখা উদ্যানবিজ্ঞান (Horticulture)-এ ফল আর সবজি চাষের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। নীচের তালিকায় এই ধরনের ফসলের নাম দেওয়া আছে । তোমরাও তার সঙ্গে আরো কিছু নাম যোগ করতে পারো।

ফসলের ধরন	উদাহরণ
1. সবজি	টম্যাটো, বাঁধাকপি, ...
2. ফল	কলা, আঙুর, ...
3. আলংকারিক উদ্ভিদ	ক্যাকটাস, বোগেনভেলিয়া, ...
4. ফুল	গোলাপ, জুঁই, ...

অনেকসময় আবার এমনও হয়, একটা ফসল কোনো বিশেষ ঋতুতে খুব ভালো হয়। অর্থাৎ ওই বিশেষ ঋতুর তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, ওই ফসলের বেড়ে ওঠার জন্য উপযোগী। কোন ঋতুতে হয় তার ওপর নির্ভর করে ফসলকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

i) খারিফ ফসল

সাধারণত বর্ষার শুরুতে (জুন/জুলাই) এই ধরনের ফসলের চাষ শুরু হয়। আর সাধারণত বর্ষার শেষে (সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর) এই ফসল তোলা হয়। খারিফ ফসলের ফলন নির্ভর করে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর ওপর। ধান, ভুট্টা, তুলো, চিনেবাদাম, সয়াবিন— এরা হলো কয়েকটা খারিফ ফসল।

ii) রবি ফসল

সাধারণত শীতের শুরুতে (অক্টোবর/নভেম্বর) এই ধরনের ফসলের চাষ শুরু হয়। আর মার্চ/এপ্রিল মাসে ফসল তোলা হয়। রবি ফসল বর্ষার ওপর নির্ভরশীল নয়। গম, বার্লি, ছোলা, মটর, সরষে — এরা হলো কয়েকটা রবি ফসল।

ফসল উৎপাদন

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষক বা চাষিকে বেশ কিছুটা সময় জুড়ে নানারকম কাজ করে যেতে হয়। একজন কৃষক এই যে কাজগুলো করেন, এটাই হলো কৃষিকাজ (Agricultural practices)। এই কাজগুলো নীচে দেওয়া হলো। আমরা একে একে এইসব কাজগুলো সম্বন্ধে এরপর জানব।

1. চাষের জমির মাটি তৈরি করা	**5. আগাছা দমন**
2. বীজ বপন করা / বীজ বোনা	**6. ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানো**
3. সার প্রয়োগ	**7. ফসল তোলা**
4. জলসেচ	**8. ফসল সঞ্চয় করে রাখা**

1. চাষের জমির মাটি তৈরি করা (Preparation of soil of cultivable land)

বীজের অঙ্কুরোদগম আর উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার মাধ্যম হলো মাটি। উদ্ভিদেরা জল আর নানান খনিজ মৌল পায় মাটি থেকে। বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের মাটি। তাই কোনো ফসলের চাষ শুরু করার আগে মাটিকে চাষের উপযোগী করে তোলা খুবই জরুরি। চাষের জমির মাটিকে তাই ওপর-নীচ করা হয়। এর ফলে উদ্ভিদের মূল সহজেই মাটির গভীরে যেতে পারে।

মাটিতে থাকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, জল, বায়ু, পচা-গলা জৈব বস্তু আর বিভিন্ন জীব। মাটি আলগা করলে, মাটিতে বায়ু চলাচল হলে তা কেঁচো আর মাটিতে বাস করা জীবাণুদের বেড়ে ওঠার পক্ষে সহায়ক হয়। ওইসব জীবেরা যে মাটিকে শুধু আরও আলগা করতে সাহায্য করে তাই নয়, এরা মাটির জৈব অংশ যা হিউমাস বাড়াতেও সাহায্য করে। এইসব জীবেরা কৃষকের বন্ধুর মতোই কাজ করে। মাটিতে বাস করা কিছু জীবাণু মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীদের দেহকে পচিয়ে ওইসব জীবের দেহের নানা যৌগ আর মৌলগুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। এগুলোই উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান (nutrients), যা উদ্ভিদেরা মাটি থেকে গ্রহণ করে। মাটির ওপরের দিকের মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার পুরু স্তরটাই উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। তাই নীচের মাটি ওপরে আনলে বা ওপরের মাটি নীচে পাঠালে আর মাটি আলগা করে দিলে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো মাটির ওপরের দিকে চলে আসে। ফলে উদ্ভিদেরা ওই যৌগ আর মৌলগুলোকে সহজেই নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।

ভূমি কর্ষণের যন্ত্রপাতি

তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে চাষের জমির মাটি ওপর-নীচ করা আর মাটি আলগা করার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছ। যে পদ্ধতিতে চাষের জমির মাটিকে ওপর-নীচ আর আলগা করা হয় তার নাম জানো কি? সহজ কথায় জমি চষা আর ভালো বাংলায় বললে ভূমিকর্ষণ করা। জমি চষতে লাগে লাঙল। এসো এবারে চাষের কাজে লাগে এমন কিছু যন্ত্রপাতির কথা জেনে নিই।

লাঙল
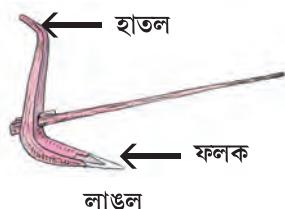
লাঙল (Plough)

বহু প্রাচীনকাল থেকেই চাষের কাজে লাঙলের ব্যবহার আছে। জমি চষা, মাটিতে সার মেশানো বা মাটি থেকে আগাছা তুলে ফেলার মতো নানান কাজে লাঙল ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে দেশি কাঠের তৈরি লাঙলের জায়গা নিয়ে নিচ্ছে লোহার তৈরি লাঙল।

নিড়ানি

নিড়ানি (Hoe)

নিড়ানির সাহায্যে চাষের জমি থেকে আগাছা তুলে ফেলা আর মাটি আলগা করার কাজ করা হয়।

কর্ষক (Cultivator)

বর্তমানে বড়ো বড়ো চাষের জমি কর্ষণ করতে ট্রাক্টরের সাহায্য নেওয়া হয়। ট্রাক্টরের পেছনে লাগানো কর্ষকের সাহায্যে খুব অল্প সময়েই অনেকটা জমি চষে ফেলা যায়। ছোটো জমি বা ফুলের বাগানে এখন অনেকসময় এই কাজে পাওয়ার টিলার ব্যবহার করা হয়।

ট্রাক্টর ও কর্ষক

এরপর একটা কাঠ বা লোহার তৈরি যন্ত্রের (Leveller) সাহায্যে চাষের উঁচু-নীচু জমিকে সমান করে নেওয়া হয়। এর ফলে জল বা বায়ুর প্রভাবে মাটির ক্ষয় কম হয়। অনেকসময় জমি চষার আগে মাটিতে জৈব সার মেশানো হয়। এর ফলে মাটির সঙ্গে সার ভালোভাবে মিশে যেতে পারে।

2. বীজ বপন/ বীজ বোনা (Sowing of Seeds)

বীজ বপন বা বীজ বোনা হলো চাষের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। বীজ বপনের আগে দেখে নেওয়া দরকার বীজগুলো ভালো গুণের অধিকারী অর্থাৎ বীজগুলো সুস্থ, খরা ও অতিবৃষ্টি -সহনক্ষম আর সংক্রমণ-মুক্ত কিনা। বেশি ফলন দেবে এমন বীজই চাষিরা পছন্দ করেন।

ভালো, সুস্থ বীজ আর খারাপ বীজ চিনবে কী করে? এসো একটা ছোটো পরীক্ষা করে দেখি।

একটা গ্লাস বা বিকারে জল অর্ধেক ভরতি করো। একমুঠো গমের বীজ নিয়ে জলে ফেলে ভালো করে নাড়ো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। কী দেখতে পেলে নীচের সারণিতে লেখো।

কী করলে	কী দেখলে	কেন এমন হলো

সংক্রমণ বা অন্যান্য কারণে নষ্ট হয়ে যাওয়া বীজের ভেতরটা ফাঁপা। তাই নষ্ট হয়ে যাওয়া বীজগুলো হালকা বলে জলে ভেসে থাকে। আর ভালো, সুস্থ বীজগুলো ভারী হওয়ার জন্য জলে ডুবে যায়।

বীজ বপনের যন্ত্রপাতি

ছবিতে ফানেল আকৃতির একটা জিনিস নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। ফানেলের নীচে তীক্ষ্ণ প্রান্তযুক্ত দুটো বা তিনটে পাইপ লাগানো থাকে। বীজগুলোকে ওই ফানেলে ভরা হয়। পাইপের তীক্ষ্ণ প্রান্ত মাটি ভেদ করে। আর ফানেল থেকে পাইপ বেয়ে বীজগুলো মাটির নীচে গিয়ে পড়ে। অনেক সময় চাষিরা লাঙলের সঙ্গেই বীজ বোনার উপযোগী এই ফানেল আর নল যোগ করে, লাঙল দিয়ে চষার ফলে তৈরি খাতে (Furrow) বীজ বোনেন।

বীজ বপন যন্ত্র (Seed Drill)

বীজ বপন যন্ত্র

এখনকার দিনে অবশ্য জমিতে বীজ বোনার জন্য উন্নত বীজ বপন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে সঠিক দূরত্ব এবং গভীরতায় বীজ বোনা সম্ভব। বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোনা হলে বীজগুলো সবসময়ই মাটি দিয়ে ঢাকা থাকে। ফলে পাখিরাও আর ওই বীজের নাগাল পায় না। সময় ও শ্রমের সাশ্রয় হয়।
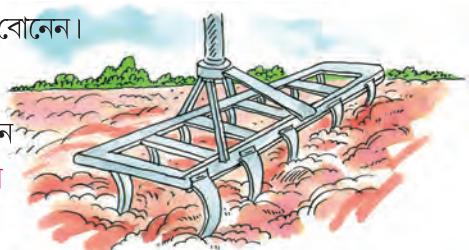
অনেক সময় বীজ বোনার আগে চাষিরা বীজগুলোকে কোনো কোনো রাসায়নিকে ডুবিয়ে নেন। ওই রাসায়নিক পদার্থগুলো বীজগুলোকে জীবাণু সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচায়। ধান বা কিছু সবজির (টম্যাটো, পিঁয়াজ) বীজ প্রথমে বীজতলায় বোনা হয় । এরপর বীজতলায় চারাগাছগুলো কিছুটা বড়ো হলে, তাদের মধ্যে থেকে সুস্থ, সবল আর নীরোগ চারাগাছ বেছে নিয়ে চাষের জমিতে লাগানো হয়। ফলে উন্নত মানের চারাগাছ বেছে নেওয়া সম্ভব হয়। প্রতিস্থাপিত চারাগাছগুলোও মাটির গভীরে মূল প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়। ফলে ফলনও বাড়ে।

3. সার প্রয়োগ (Adding manures and fertilizers)

উদ্ভিদের ঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন হয় কিছু মৌলের — এরাই হলো উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান (nutrients)। উদ্ভিদের এই পুষ্টি উপাদানগুলো আবার দু-ধরনের হয়।

a) মুখ্য খাদ্য উপাদান (Macronutrients) : C, H, O, N, P, K, Mg, S।
b) গৌণ খাদ্য উপাদান (Micronutrients) : Fe, Mn, Cu, B, Mo, Zn, Cl।

এইসব পুষ্টি উপাদানগুলোকে মৌল হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এগুলো আসলে যৌগ হিসাবে উদ্ভিদদেহে গৃহীত হয়। মাটি উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো সরবরাহ করে। উদ্ভিদের বেড়ে ওঠার জন্য এই পুষ্টি উপাদানগুলো খুবই জরুরি। কোনো কোনো অঞ্চলে চাষিরা হয়তো একই জমিতে একটার পরে একটা ফসল ফলিয়ে যান বা একই ফসল বারবার চাষ করেন। জমি কখনই অনাবাদী হিসেবে ফেলে রাখেন না। ভেবে দেখোতো তাহলে মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলোর কী অবস্থা হবে?

একই জমিতে বারবার ফসল ফলানো হলে মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানগুলো ফুরিয়ে আসে। তাই চাষের জমিতে সার মেশাতে হয়। যাতে মাটি উদ্ভিদের হারিয়ে যাওয়া পুষ্টি উপাদানগুলো আবার ফিরে পায়। অর্থাৎ মাটিতে থাকা উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পুষিয়ে দিয়ে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক হয় যেসব পদার্থ, তারাই হলো সার। এই সার আবার দু-রকমের হয়। জৈব সার আর অজৈব সার।

জৈব সার (Organic manure)

মৃত উদ্ভিদ আর প্রাণীদের বর্জ্য পচিয়ে তৈরি হয় জৈব সার। চাষিরা খোলা জায়গায় একটা গর্ত খুঁড়ে সেখানে মৃত উদ্ভিদ আর প্রাণীদের বর্জ্য পদার্থ ফেলে রাখেন পচে যাওয়ার জন্য। ব্যাকটেরিয়া আর ছত্রাকের বিয়োজন ও রূপান্তর ক্রিয়ায় ওইসব বর্জ্য পদার্থগুলো পচে গিয়ে তৈরি হয় জৈব সার।

অজৈব সার (Inorganic fertilizer)

অজৈব সার হলো একধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এতে থাকে নানা অজৈব লবণ, যা উদ্ভিদের বৃদ্ধির সহায়ক। সার কারখানায় তৈরি হয় অজৈব সার। অজৈব সার প্রধানত তিন ধরনের মৌলের ঘাটতি পূরণ করে— নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P) আর পটাশিয়াম (K)। NPK সারে এই তিনটি প্রধান উপাদান বিভিন্ন মাত্রায় মেশানো থাকে। আবার কখনও বা কোনো অজৈব সারে এই তিনটি উপাদানের যে-কোনো একটা উপাদান উপস্থিত থাকে। যেমন পটাস সার বা সুপার ফসফেট। আরও কয়েকটা অজৈব সার হলো ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট।

নিজে করো

ছোলা, মুগ বা অন্য যে-কোনো তিনটে একই উচ্চতার একই ধরনের চারাগাছ নাও। তিনটে ফাঁকা গ্লাস নাও। গ্লাসগুলোতে 1, 2, 3 নম্বর দাও। 1 নং গ্লাসে অল্প একটু ইউরিয়া মেশানো মাটি নাও। 2 নং গ্লাসে অল্প একটু গোবর সার মেশানো মাটি নাও। খেয়াল রেখো যাতে 1 আর 2 নং গ্লাসে নেওয়া মাটির পরিমাণ একই হয়। 3 নং গ্লাসে একই পরিমাণ মাটি নাও। এই মাটিতে কিছু মিশিও না। তিনটে গ্লাসের মাটি একই জায়গা থেকে নিও। তিনটে গ্লাসে সমপরিমাণ জল দাও। এবারে তিনটে চারাগাছ তিনটে গ্লাসে বসিয়ে দাও। প্রতিদিন নিয়ম করে গ্লাসগুলোতে পরিমাণ মতো জল দাও। 7 - 10 দিন ধরে তিনটে গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করো।

কী দেখলে নীচের সারণিতে লেখো।

দিন	1ম গ্লাস	2য় গ্লাস	3য় গ্লাস	মন্তব্য

10 দিন পরে

1. চারাগাছের বৃদ্ধি সব গ্লাসে কি একই হারে হয়েছে?
2. কোন গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভালো হয়েছে?
3. কোন গ্লাসে চারাগাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হয়েছে?

এরকম হওয়ার পেছনে কী কারণ আছে বলে তোমার মনে হয়।

অজৈব সার ব্যবহারের সমস্যা

অজৈব সারের ব্যবহার, চাষিদের বিভিন্ন ফসল যেমন ধান, গম আর ভুট্টার খুব ভালো ফলন পেতে সাহায্য করে। কিন্তু অজৈব সারের অত্যধিক আর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মাটিতে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়ার কাজে বাধা সৃষ্টি করে মাটির উর্বরাশক্তি বা উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অজৈব সার ব্যবহার না করলে মাটির রসায়ন পালটে গিয়ে ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। যেমন— অ্যামোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2SO_4]$ ব্যবহার করলে যেমন মাটির আম্লিক ভাব বেড়ে যায়, তেমনি সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$) ব্যবহারে মাটির ক্ষারকীয়তাও বেড়ে যেতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য মাটির অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য বজায় থাকাটা খুবই জরুরি। তাছাড়াও অজৈব সার ব্যবহার করা হয়েছে এমন চাষের জমি থেকে নাইট্রোজেন বা ফসফরাসের যৌগমিশ্রিত জল নদী বা পুকুরের জলে মিশে জলদূষণ ঘটায়। মাটির উর্বরাশক্তি বজায় রাখতে তাই বর্তমানে অজৈব সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

জৈব সার কেন অজৈব সারের চেয়ে ভালো?

i) জৈব সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়।

ii) জৈব সার ব্যবহার করলে মাটি রন্ধ্রযুক্ত হয়। ফলে মাটির মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন গ্যাসের আদান-প্রদান ভালো হয়।

iii) মাটিতে থাকা উপকারী জীবাণুদের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে জৈব সার।

iv) জৈব সার মাটির গঠন উন্নত করতে সাহায্য করে ।

এবারে তাহলে চট করে অজৈব সার আর জৈব সারে কী পার্থক্য লিখে ফেলার চেষ্টা করো ।

বাইরে থেকে সার ব্যবহার না করে মাটি থেকে হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান প্রাকৃতিক কী কী উপায়ে আবার ফিরিয়ে আনা যায় এবারে দেখে নেওয়া যাক ।

a) চাষের জমি অনাবাদী ফেলে রাখা

দুটো ফসল চাষের মাঝের সময়টা যদি জমিতে কোনো চাষ না করা যায় তবে প্রাকৃতিক উপায়েই মাটি তার হারানো উপাদানগুলো ফিরে পায়। কারণ এই সময়ে মাঠে জমা হওয়া মৃত উদ্ভিদ, প্রাণী বা অন্যান্য জৈব বস্তু নানারকম জীবাণুর ক্রিয়ায় পচে মাটিতে মিশে যায়। ফলে মাটি তার ফুরিয়ে যাওয়া উপাদানগুলো আবার ফিরে পায়।

b) শস্য আবর্তন

মাটি থেকে পাওয়া পুষ্টি উপাদানের চাহিদা বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। একই জমিতে ক্রমাগত একই উদ্ভিদের চাষ করে গেলে ওই উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো মাটি থেকে ক্রমশ ফুরিয়ে যায়। তাই অনেকসময় দুটো চাষের মাঝে একবার শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ যেমন মটর, বিন, ছোলা বা ডালের চাষ করা হয়। এই ধরনের উদ্ভিদের মূলে বাসা বাঁধে রাইজোবিয়াম নামে একধরনের মিথোজীবী ব্যাকটেরিয়া। উদ্ভিদেরা

বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। এই ব্যাকটেরিয়া পরিবেশ থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে উদ্ভিদের ব্যবহারযোগ্য নাইট্রোজেন যৌগে পরিবর্তিত করে উদ্ভিদদের দেয়। এই নাইট্রোজেনের যৌগগুলো উদ্ভিদদের ব্যবহারের পরে বাকিটা মাটিতে রয়ে যায়। তাই শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের ফসল তোলার পরেও মাটিতে যথেষ্ট নাইট্রোজেন থাকে। এর পরে ধান, গম ও ভুট্টা জাতীয় ফসল চাষ করলে এই উদ্ভিদেরা মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনের যৌগ গ্রহণ করতে পারে। তাই এই ধরনের ফসল একবার চাষ করে, মাঝে একবার শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদের চাষ করলে মাটি আবার তার হারানো নাইট্রোজেন যৌগ ফিরে পায়। একই ফসল বারবার চাষ না করে মাঝে একবার অন্য ধরনের ফসল (বিশেষতঃ শিম্বীগোত্রীয় উদ্ভিদ) চাষ করা — এটাই হলো শস্য আবর্তন।

মাটির পুষ্টি উপাদানগুলো বজায় রাখার জন্য অনেকসময় মাটিতে নানারকম মিথোজীবী অণুজীব মেশানো হয়। এটাই অণুজীব সার। এই সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। আর মাটিকে রন্ধ্রযুক্ত করে বায়ু চলাচল বাড়ায়।

4. জলসেচ (Irrigation)

প্রত্যেক জীবেরই বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন জল। উদ্ভিদের বেড়ে ওঠা আর ফুল-ফল-বীজের বিকাশের জন্য জল খুবই প্রয়োজন। তোমরা তো জানো যে উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে জল শোষণ করে। আর জলের সঙ্গেই মাটি থেকে গ্রহণ করে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান আর সার।

উদ্ভিদের দেহে প্রায় 90 % জল থাকে। বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য জল একান্তই প্রয়োজন। তাছাড়াও জলের সঙ্গে মিশে পুষ্টি উপাদানগুলো উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছোয়। ভালো ফসল পেতে গেলে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখা খুব জরুরি। মাঠের ফসলে নির্দিষ্ট সময় অন্তর তাই জল সরবরাহ করা দরকার। এটাই জলসেচ। সাধারণত নদী-হ্রদ, পুকুর, খাল-বিল, জলাধার, কুয়ো, টিউবওয়েল— এইসব উৎসের জল সেচের কাজে ব্যবহার করা হয়। অঞ্চলভেদে এই জল সংগ্রহ করার পদ্ধতিতেও ফারাক থাকে। তারপরে সেই জল খাল দিয়ে বা পাইপ দিয়ে ইলেকট্রিক বা ডিজেল পাম্পের সাহায্যে চাষের জমিতে পৌঁছে দেওয়া হয়। অনেকসময় ইলেকট্রিক বা ডিজেলের পরিবর্তে সৌরশক্তি বা বায়োগ্যাসও ব্যবহার করা হয়। এই কাজে চিরাচরিত পদ্ধতিতে সাধারণত মানুষের শ্রম বা পশুশক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এই পদ্ধতিগুলো তুলনায় সস্তা হলেও কম কার্যকরী হয়। আর জলেরও অপচয় ঘটে।

চিরাচরিত পদ্ধতি

দড়ি-বালতি-পুলি-নালা পদ্ধতি

দোলানো বালতি পদ্ধতি
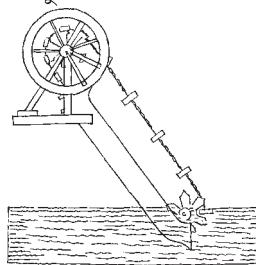
চেন পাম্প পদ্ধতি

ঢেকাল পদ্ধাত

পারসি চাকা বা রাহাত পদ্ধতি

রাহাত পদ্ধতিতে একটা বড়ো কুয়ো আর চাকা ব্যবহার করা হয়। চাকার গায়ে অনেকগুলো বালতি লাগানো থাকে। পশুশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ওই চাকাটা ঘুরিয়ে কুয়ো থেকে বালতিতে জল তোলা হয়। তারপর সেই জল চাষের জমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

আধুনিক পদ্ধতি : আধুনিক পদ্ধতিগুলোয় জলের অপচয় কমানো সম্ভব হয়।

চাষের জমিতে ফসলের ওপর ফোয়ারার মতো জল ফেলা হয়।

ফোয়ারা পদ্ধতি (Sprinkler system)

পাইপের সাহায্যে উদ্ভিদের মূলের ঠিক কাছে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়।

ড্রিপ পদ্ধতি (Drip system)

5. আগাছা দমন (Protection from weeds)

অনেকসময় চাষের জমিতে যে ফসলের চাষ করা হচ্ছে, সেটা ছাড়াও অন্যান্য আরও কিছু উদ্ভিদ জন্মায়। এই অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদগুলোই হলো আগাছা। এই আগাছাগুলো যে উদ্ভিদের চাষ করা হচ্ছে, তাদের জল, পুষ্টি উপাদান, থাকার জায়গা আর আলোয় ভাগ বসায়। তাই ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কোনো কোনো আগাছা ফসল তোলায় বাধা সৃষ্টি করে। চাষিরা আগাছা নির্মূল করার জন্য নানা পদ্ধতি ব্যবহার করেন। জমিতে বীজ বোনার আগে চাষিরা যখন জমি চযেন তখনই আগাছাগুলো মূলশুদ্ধ উপড়ে আসে। আর তারপর শুকিয়ে গিয়ে মাটিতে মিশে যায়।

অ্যামারান্থাস **ঘাস** **চেনোপোডিয়াম**

চাষিরা অনেকসময় হাতে করে মাটি থেকে আগাছা তুলে ফেলেন। কখনও বা আগাছাগুলোকে মাটির খুব কাছ থেকে কেটে দেন। অনেকসময় আবার কিছু রাসায়নিক (যেমন 2, 4-D, ড্যালাপোন, পিক্লোরাম ইত্যাদি) স্প্রে করেও আগাছা দমন করা হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলোই হলো আগাছানাশক (weedicide)। এই রাসায়নিকগুলো ফসলের কোনো ক্ষতি করে না। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই স্প্রে করার সময় চাষিদের নাক আর মুখ ঢেকে নেওয়া দরকার।

আগাছা দমনের কথা তো আমরা জানলাম। এবারে এসো এই ফাঁকে চাষের জমির কয়েকটা সাধারণ আগাছার নাম তোমাদের জানিয়ে রাখি। এরা হলো— পার্থেনিয়াম, অ্যামারান্থাস, চেনোপোডিয়াম, ঘাস ইত্যাদি।

6. ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ থেকে ফসলকে বাঁচানো (Protection from pests)

ইঁদুর, বিভিন্ন পোকা (পঙ্গপাল, উই, গুবরে জাতীয় পোকা) ফসল খেয়ে নেয় বা নষ্ট করে। এরাই হলো ফসল-ধ্বংসকারী প্রাণী (Pest)। পঙ্গপালরা দল বেঁধে উড়ে আসে আর আখ, গমের মতো উদ্ভিদের পাতা খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করে। কিছু পোকা আছে যারা কাণ্ডটা কুরে কুরে খায়। এরা হল stem borer। আবার উই উদ্ভিদের মূল খায়।

পঙ্গপাল

উই **গুবরে জাতীয় পোকা**

এছাড়াও ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক আর ভাইরাসও উদ্ভিদে নানারকম রোগ সৃষ্টি করে ফসলের উৎপাদন কমিয়ে দেয়। কিছু ছত্রাক যেমন গমে মরিচা রোগ আর আলুতে ধসা রোগ সৃষ্টি করে। আবার কিছু ব্যাকটেরিয়া উইলট (Wilt) নামে একটা রোগ সৃষ্টি করে।

ফসল ধ্বংসকারী প্রাণীদের দমনের দুটি উপায় আছে - রাসায়নিক (Chemical) ও জৈবিক (Biological)।

রাসায়নিক দমন পদ্ধতি

ডিডিটি (DDT), বিএইচসি (BHC), ম্যালাথিওন পতঙ্গদের দমনে সাহায্য করে। সালফার আর তামার বিভিন্ন লবণ ছত্রাক দমনে সাহায্য করে। জিঙ্ক ফসফাইড আর ওয়ারফেরিন ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের দমন করে।

রাসায়নিক দমন পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক প্রাণীদের মৃত্যু খুব তাড়াতাড়ি হলেও নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে।

i) অনেকসময় ক্ষতিকারক প্রাণীগুলো নির্দিষ্ট একটা রাসায়নিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

ii) আবার অনেকসময় এই রাসায়নিক পদার্থগুলো নদী বা হ্রদের জলে মিশে দূষণ ছড়ায়।

iii) রাসায়নিক পদার্থগুলো খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করলে, খাদ্যশৃঙ্খলের শেষের দিকের জীবদের ক্ষতি হতে পারে।

iv) রাসায়নিক পদার্থগুলো ফল বা সবজির মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবেশ করলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

v) রাসায়নিক পদার্থগুলো অনেকসময় উপকারী পতঙ্গদের (মৌমাছি, প্রজাপতি) মেরে ফেলে।

এইসব কারণেই অনেকসময় ফসল ধ্বংসকারী জীবদের দমনে জৈবিক দমন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়।

জৈবিক দমন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে একটি জীবকে অন্য জীবের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়। পরভুক (predator) আর পরজীবীদের (parasites) মাধ্যমে ফসল ধ্বংসকারী জীবদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। প্রকৃতিগতভাবে কয়েক ধরনের মাকড়সা, বোলতা, ভীমরুল, গঙ্গাফড়িং ও বেশ কিছু ধরনের পাখি, ফসলের শত্রুদের (যেমন মথ, রস- শোষক পোকা, উই, উচ্চিংড়ে প্রভৃতি) ধরে খায়। তাছাড়াও কিছু ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাস ফসলের শত্রুদের দেহে পরজীবী রূপে বাস করে ওইসব জীবদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ রাখে।

7. ফসল তোলা (Harvesting)

ফসল পরিণত হলে ফসল সংগ্রহ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফসল তোলার সময় ফসল বিশেষে কখনও হাত দিয়ে তোলা হয়। আবার কখনও বা মাটির খুব কাছ থেকে কাস্তে দিয়ে কেটে নেওয়া হয়।

কাস্তে

মাড়াই (Threshing)

দানা জাতীয় ফসলের ক্ষেত্রে ফসল উদ্ভিদকে (Crop plant) ভোজ্য অংশ থেকে আলাদা করতে হয়। এটাই হলো মাড়াই। অনেকসময় ফসল উদ্ভিদকে মাটিতে আছড়েও এই কাজটা করা হয়। কখনও বা মাটিতে ফসল উদ্ভিদটি রেখে তার ওপর দিয়ে গাধা বা ষাঁড়দের হাঁটানো হয়।

ঝাড়াই (Winnowing)

এরপর ঝাড়াই করে দানাশস্য আর ভূষি আলাদা করা হয়। এই কাজে সাহায্য নেওয়া হয় বাতাসের। উঁচু জায়গা থেকে ফেললে, ভূষি হালকা বলে হাওয়ায় উড়ে যায় আর দানাশস্যগুলো মাটিতে এসে পড়ে।

কম্বাইন হারভেস্টার (Combine Harvester) বা কম্বাইন (Combine) নামের মেশিনের সাহায্যে ফসল তোলা, মাড়াই আর ঝাড়াই সবই করা যায়।

কম্বাইন

ফসল তুলে নেওয়ার পর কাণ্ডের যে অংশগুলো চাষের জমিতে রয়ে যায়, সেগুলো আর ভূষি গবাদিপশুদের খাবার হিসাবে দেওয়া হয়। গবাদিপশুদের এই খাবারই হলো জাব (fodder)।

8. ফসল সঞ্চয় করে রাখা / মজুত করা (Storage)

ফসল তোলার পরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ফসল মজুত করে রাখা। দীর্ঘ সময় ধরে মজুত করার সময় পোকা, ইঁদুর আর বিভিন্ন অণুজীবদের হাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। সদ্য সংগ্রহ করা ফসলে আর্দ্রতা বেশি থাকে। দানা জাতীয় শস্য শুকিয়ে নিয়ে মজুত না করা হলে, তাতে নানা অণুজীবের আক্রমণ ঘটতে পারে। তাই মজুত করার আগে দানা জাতীয় শস্য ভালো করে সূর্যের আলোয় শুকিয়ে নেওয়া দরকার। আর্দ্রতা কম থাকলে বিভিন্ন পোকা, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের আক্রমণ রোধ করা সম্ভব।

শস্যাগার

চাষিরা চটের ব্যাগ বা ধাতব পাত্রে দানাজাতীয় শস্য রাখেন। এছাড়াও ব্যাপক মাত্রায় সঞ্চয়ের জন্য শস্যাগার বা বায়ুহীন ঘর (Silo) ব্যবহার করা হয়। উন্নত মানের এইসব শস্যাগার বায়ুহীন, আর্দ্রতাশূন্য হয়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণী এখানে ঢুকতে পারে না। এমনকি সারাক্ষণ একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থাও থাকে এখানে। অনেকসময় ফসল মজুত করার আগে ফসলের গুদামে আর ফসল মজুত রাখার ব্যাগ বা পাত্রে কীটনাশক আর ছত্রাকনাশক স্প্রে করা হয়।

বর্তমানে শস্যাগারের মধ্যে সারাক্ষণ নাইট্রোজেন গ্যাস চালনা করার ফলে ফসল-ধ্বংসকারী জীবেরা(ইঁদুর জাতীয় প্রাণী, পোকা আর অণুজীব) শস্যাগারের মধ্যে অক্সিজেনের অভাবে বাঁচতে পারে না।

বীজ সংরক্ষণ: পরের মরসুমে চাষের জন্য চাষিরা বীজ সংরক্ষণ করেন। এছাড়াও হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন শস্যের বীজও নানাভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

উদ্ভিদজাত খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

ধান

ধান পৃথিবীর এক গুরুত্বপূর্ণ শস্য। ভারতের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য হলো ধান।

তুমি কতরকম ধানের কথা জানো বা শুনেছ? তোমার এলাকায় চাষের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে জানার চেষ্টা করো সেই অঞ্চলে কোন কোন ধানের চাষ হয়। আগে হতো অথচ এখন আর চাষ হয় না এমন ধানের নামও তাঁদের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করো।

তোমার জানা ধানের নাম	এখন যেসব ধানের চাষ হয়	এখন যেসব ধানের চাষ আর হয় না

ধান ক্ষেতের ছবি আঁকো।

ভারতের কোথায় কোথায় ধান চাষ হয়

ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই কম-বেশি ধান চাষ হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, আর তামিলনাড়ুতে ধানের উৎপাদন যথেষ্ট ভালো।

চালের পুষ্টিমূল্য

ধান থেকে পাওয়া যায় চাল। চালে 79.1% কার্বোহাইড্রেট, 6% প্রোটিন আর 0.4% বিভিন্ন মৌল থাকে। এছাড়াও থাকে ভিটামিন B- কমপ্লেক্স আর অন্যান্য কিছু ভিটামিন। এছাড়াও ধানের ভূষি থেকে তেল পাওয়া যায়।

ধানের প্রকারভেদ

জাতিগত বৈশিষ্ট্য আর চাষ করার পদ্ধতি অনুসারে ধানকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। এরা হলো আউশ বা শরৎকালীন ধান, আমন বা শীতকালীন ধান আর বোরো বা গ্রীষ্মকালীন ধান।

উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে আবার ধানকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়— অপেক্ষাকৃত কম ফলনশীল দেশি প্রকারের ধান আর উচ্চফলনশীল প্রকারের ধান।

এবারে আউশ, আমন আর বোরো ধানের চাষ সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটা কথা জেনে নিই।

আউশ

আউশ ধান সাধারণত জমিতে একেবারে সরাসরি বোনা হয়। তাই এর চাষের পদ্ধতি, আমন ও বোরো ধান চাষের পদ্ধতির থেকে একটু আলাদা। সাধারণত রবি ফসল তুলে নেওয়ার পরেই জমি তৈরি করে জমিতে ধান বোনা হয়। পলি, দোঁয়াশ বা এঁটেল — প্রায় সব ধরনের মাটিতেই আউশ ধান বোনা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে অবশ্য সরাসরি বীজ না বুনে, বীজতলা তৈরি করেও আউশ ধান বোনা হয়।

আমন

যে-কোনো ধরণের মাটিতে বর্ষাকালে আমন ধানের চাষ করা হয়। তবে কাদা মাটি বা এঁটেল মাটিই চাষের জন্য ভালো। পশ্চিমবঙ্গে আমন ধানের চাষই বেশি। আমাদের দেশে প্রায় কয়েক হাজার জাতের আমন ধান রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার দেশি জাতগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। দেশি আমন ধানের মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতগুলো হলো — ভাসামানিক, ঝিঙ্গাশাল, রঘুশাল, পাটনাই - 23, বাসমতী প্রভৃতি। আমন ধান চাষের জন্য আগে বীজতলায় বীজ ফেলে চারাগাছ তৈরি করা হয়। এরপরে চাষের জমিতে চারাগাছগুলো রোপণ করা হয়। বীজতলায় ফেলার আগে বীজগুলো শোধন করে নেওয়া দরকার।

বোরো

আমন ধান কাটার পরে বীজতলা তৈরি করে এই ধরনের ধান রোপণ করা হয়। আর মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ ধান কাটা হয়। যেসব অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে বোরো ধানের চাষ হয়।

ধান কত তাড়াতাড়ি পাকে, তার ভিত্তিতে আবার ধানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

i) জলদি জাত/স্বল্পমেয়াদি জাত — ধান খুব তাড়াতাড়ি পেকে যায়। যেমন রত্না জাতের ধান 95-115 দিনের মধ্যে পেকে যায়।

ii) মাঝারি জাত/মধ্যমেয়াদি জাত — ধান পাকতে মাঝারি রকম সময় লাগে। জয়া, জয়ন্তী প্রভৃতি জাতের ধান 116-135 দিনের মধ্যে পাকে।

iii) নাবি জাত বা দীর্ঘমেয়াদি জাত — ধান পাকতে বেশিদিন সময় লাগে। স্বর্ণ, মাসুরি, পঙ্কজ প্রভৃতি ধান পাকতে 140-150 দিন সময় লাগে।

আউশ, আমন, বোরো সবারই জলদি, মাঝারি আর নাবি জাতের ধান আছে। আর একটা কথাও কিন্তু খেয়াল রেখো, একই জাতের ধানকে আউশ, আমন বা বোরো এই তিন মরশুমেই চাষ করা যায়।

গোল্ডেন রাইস : ভিটামিন A-এর চাহিদা মেটাতে কৃষি বিজ্ঞানীরা এই বিশেষ ধরনের ধান তৈরি করেছেন।

নীচের তালিকায় আউশ, আমন ও বোরো ধান চাষের একটা সাধারণ সময়সূচি দেওয়া হলো।

ধানের প্রকার	বীজতলা তৈরি করা	ধান রোপণ করা	ধান বোনা	ধান কাটা
1. আউশ	x x x	x x x	উঃবঙ্গ: মার্চ-এপ্রিল দঃবঙ্গ: মে-জুন	জুলাই-সেপ্টেম্বর
2. আমন	জুন-জুলাই	জুলাই-আগস্ট	x x x	ডিসেম্বর-জানুয়ারি
3. বোরো	নভেম্বর	ডিসেম্বর	x x x	এপ্রিল-মে

চাষের পদ্ধতি

চাষের ধাপ	কী করা হয়
i) বীজ বাছাই	ঘন নুন জলে বীজগুলোকে ডুবিয়ে নাড়ানো হলে সুস্থ আর পুষ্ট বীজগুলো ভারী বলে জলে ডুবে যায়। এই বীজগুলোকে পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হয়।
ii) বীজ শোধন	*a) শুষ্ক শোধন পদ্ধতি :* জমিতে সরাসরি বীজ বোনার জন্য বা শুকনো বীজতলায় বীজ বোনার জন্য এই পদ্ধতি কাজে লাগে। বীজবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংস করার জন্য বীজের সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থের গুঁড়ো মেশানো হয়।
	b) সিক্ত শোধন পদ্ধতি : সিক্ত বীজতলায় অঙ্কুরিত বীজ বোনার জন্য এই পদ্ধতি উপযোগী। বীজবাহিত রোগজীবাণু ধ্বংসের জন্য বীজগুলোকে রাসায়নিক পদার্থের জলীয় মিশ্রণে ভিজিয়ে রাখা হয়। অনেকসময় উষ্ণ জলেও বীজ শোধন করা হয়।
iii) বীজতলা প্রস্তুতি ও চারাগাছ তৈরি	*a) শুষ্ক বীজতলা :* খারিফ ঋতুতে ভালো বৃষ্টি হয় এমন অঞ্চলের পক্ষে শুষ্ক বীজতলা উপযোগী। হালকা লাঙল দিয়ে জমি দু-একবার চষে, জমির আগাছা নির্মূল করা হয়। জমি চষার সময় যথাযথ পরিমাণে জৈব বা অজৈব সার ব্যবহার করা হয়। চারাগাছগুলো 5-6 টি পাতাবিশিষ্ট আর 12-15 সেমি লম্বা হলে রোপণের উপযোগী হয়ে ওঠে।
	b) সিক্ত বা কাদান বীজতলা : নির্বাচিত জমিতে জল বেঁধে রেখে জৈব সার দেওয়া হয়। মাটি নরম হয়ে উঠলেই জমি চষতে হয়। ফলে কয়েকদিনের মধ্যে মাটি কাদা কাদা হয়ে যায়। জমিতে পরিমাণমতো অজৈব সার দেওয়া হয়। এরপর বীজতলায় অঙ্কুরিত বীজ বোনা হয়। পর্যায়ক্রমে বীজতলাকে শুকনো আর জলসেচ করার ফলে চারাগাছগুলোর মূলের বৃদ্ধি ভালো হয়। প্রয়োজনমতো কীটনাশক ওষুধ ও সার দেওয়া হয়।
(iv) জমি তৈরি	*a) শুষ্ক পদ্ধতি :* আউশ ধান ও কোনো কোনো অঞ্চলে নীচু জমিতে আমন ধান চাষ করার সময় বীজতলা ব্যবহার না করে জমিতে সরাসরি বীজ বোনা হয়। রবি শস্য তুলে নেওয়ার পরেই দু-একবার চষে জমি ফেলে রাখা হয়। তার ফলে জমির আগাছাগুলো নষ্ট হয় আর জমি বেশ শুকনো হয়। জমিতে পরিমাণমতো জৈব আর অজৈব সার দেওয়া হয়।

চাষের ধাপ	কী করা হয়
	b) সিক্ত বা কাদান জমি তৈরি: সিক্ত বীজতলা থেকে ধানের চারাগাছ রোপণ করার জন্য সিক্ত বা কাদান জমি তৈরি করা প্রয়োজন। শুষ্ক পদ্ধতির মতো রবি শস্য তুলে নেওয়ার পর দু-একবার চষে জমি ফেলে রাখা হয়। এইসময় জমিতে 5 সেন্টিমিটারের মতো গভীর জল 2-4 দিন বেঁধে রেখে লাঙল দিয়ে কয়েকবার চষলে মাটি কাদা কাদা হয়ে যায়। শেষবার জমি চষার সময় প্রয়োজনমতো জৈব ও অজৈব সার দেওয়া হয়।
v) বীজ বোনা আর চারাগাছ রোপণ	***a) বীজ বোনা :*** আউশ ধানের বীজ সরাসরি জমিতে বোনা হয়। মাটি বেশ নরম থাকতে থাকতেই, হাতে করে ছিটিয়ে বা জমি চষার সময় লাঙলের পেছনে তৈরি হওয়া খাতে হাত দিয়ে বীজ ফেলে বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে বীজ বোনা হয়।
	b) চারাগাছ রোপণ : সকালের দিকে বীজতলা থেকে চারাগাছগুলোকে সাবধানে তুলে আনা হয়। তারপর তৈরি জমিতে 2-3 সেন্টিমিটারের মতো জল বেঁধে রেখে সারিবদ্ধভাবে চারাগাছগুলো রোপণ করা হয়।
vi) সার প্রয়োগ	জমির উর্বরতার মান আর ধানের জাত অনুসারে সারের প্রকার আর মাত্রা বিভিন্ন রকমের হয়। এক্ষেত্রে জৈব আর অজৈব দু-রকম সারই ব্যবহার করা হয়।
vii) অন্তবর্তী কর্ষণ ও পরিচর্যা	ধান জমিতে সময়ে সময়ে নিড়ান দিলে জমির আগাছা সহজে দমন করা যায়। মাটিও নরম থাকে আর চারাগাছগুলোর বৃদ্ধিও ভালো হয়। অনেকসময় রাসায়নিক আগাছানাশক পদার্থ ব্যবহার করেও ধানজমির আগাছা ধ্বংস করা হয়।
viii) জলসেচ	রোপণ করা আউশ, আমন আর বোরো ধানের বেড়ে ওঠার সময় ও পরিণত অবস্থায় গাছের গোড়ায় 30 মিলিমিটার থেকে 50 মিলিমিটার গভীর জল থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও খারিফ ঋতুতে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতে, প্রাক-খারিফ ও বোরো ধান চাষে নিয়মিত জলসেচের প্রয়োজন হয়।
ix) ফসল তোলা	ফসল তুলে আঁটি বেঁধে খামারে তোলা হয়। এরপর মাড়াই করে দানাগুলোকে খড় থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়।

ফলের রাজা হলো আম। তোমরাও নিশ্চয়ই আম খেয়েছ। তোমরা কোন কোন ধরনের আমের নাম জানো? সেই নামগুলো নীচের সারণিতে লিখে ফেলো। বছরের কোন সময়ে ওই আম হয় সেটাও লেখো।

আমের নাম	বছরের কোন সময় হয়

আম থেকে কী ধরনের খাবার তৈরি হয়?

আমের জন্মস্থান আমাদের এই ভারতবর্ষ। পরে আম নিয়ে যাওয়া হয়েছে শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। ভারতে প্রায় সব জায়গাতেই কম বেশি আমের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে মালদা, মুর্শিদাবাদ আর নদিয়াতে সবচেয়ে বেশি আমের চাষ হয়।

আমগাছ তো নিশ্চয়ই দেখেছ। আম গাছের ছবি আঁকো।

আমের গুণাগুণ

ভালো জাতের আমে সুন্দর গন্ধযুক্ত শাঁস থাকে ; আঁশ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমে থাকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট ও খনিজ পদার্থ (Ca, P, Fe ইত্যাদি)। প্রচুর পরিমাণে থাকে ভিটামিন A, B-কমপ্লেক্স ও C। এছাড়াও থাকে জল, তন্তু আর ফাইটোকেমিক্যাল (বিটা-ক্যারোটিন)।

আবহাওয়া

এবারে দেখে নেওয়া যাক কীরকম আবহাওয়া আমের বেড়ে ওঠার পক্ষে উপযোগী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 1500 মিটার উচ্চতা অবধি আম গাছ ভালো জন্মায়। কিন্তু বেশি উচ্চতায় আম গাছ বাড়লেও বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায় না। আমগাছে মুকুল আসার সময় আকাশ বেশ পরিষ্কার থাকা, তুষারপাত ও কুয়াশা না হওয়া একান্তভাবে জরুরি। কারণ বৃষ্টিপাত ও কুয়াশা আমের মুকুলের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক।

মাটি কেমন হওয়া দরকার

আম বিভিন্ন ধরনের মাটিতে জন্মায়। কিন্তু তবুও নদী অববাহিকার পলিমাটি আর উর্বর দোঁয়াশ মাটি আম চাষের পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত। বেলে মাটি আর কাদা বা এঁটেল মাটি আম চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত।

আমের জাত

হিমসাগর, বোম্বাই, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, সফদরপসন্দ বা বীড়া, পেয়ারাফুলি, রানিপসন্দ, ঝুমকোফজলি, নীলাম, চৌসা, দশেরি, আম্রপালি, আলফানসো, বেগমফুলি — সারা ভারতে নানা জাতের আম পাওয়া যায়। তাদের স্বাদ আর গন্ধও আলাদা আলাদা রকমের। পশ্চিমবঙ্গে হিমসাগর, গোলাপখাস, সফদরপসন্দ বা বীড়া, পেয়ারাফুলি, রানিপসন্দ, ঝুমকোফজলি প্রায় প্রতি বছরই ফলন দেয়। এই ব্যাপারে ল্যাংড়া বড়োই খামখেয়ালি। প্রতি বছর ঠিকমতো ফলন পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের যে আমগুলোর নাম করা হলো, তাদের মধ্যে সবচেয়ে আগে পাকে গোলাপখাস আর সব থেকে শেষে ঝুমকোফজলি। ঝুমকোফজলি আসলে একজাতের ফজলি। আকারে কিছুটা ছোটো। থোকা থোকা হয়ে ফলে। প্রচুর পরিমাণে আর নিয়মিত ফলে।

বংশবিস্তার

বীজ থেকে আমের বংশবিস্তার করার রেওয়াজই অনেককাল ধরে বহুল প্রচলিত। কিন্তু বীজের আম গাছে কখনও তার জাত-বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় থাকে না। একটা ভালো জাতের আমের আঁটি পুঁতলে যে চারাগাছটা জন্মাবে, তাতে কিন্তু ওই ভালো জাতের সব গুণবিশিষ্ট আম ফলবে না।

এই সমস্যা এড়াতে ভালো জাতের আম গাছ থেকে কলম করা হয়। কলম থেকে তৈরি চারাগাছের ভালো জাতের সব গুণ বজায় থাকে। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, কলম করা আবার কী? তোমরা হয়তো দেখেছ যে করবী বা জবা গাছের একটা ডাল কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে, সেখান থেকে নতুন গাছ বেরোয়। এটাও কিন্তু একধরনের

কলম করা। একে বলে শাখাকলম। অর্থাৎ উদ্ভিদের কোনো একটা অঙ্গ থেকে নতুন উদ্ভিদ তৈরি করা। এটা উদ্ভিদের একধরনের অঙ্গজ বিস্তার (propagation) যা কৃত্রিম পদ্ধতিতে করানো হয়।

আমগাছের কলম বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা হয়— যেমন জোড় কলম, ভিনিয়ার কলম, চিপ কলম, আঁটির কলম। আমরা এখানে কেবল সবচেয়ে প্রচলিত যে কলম পদ্ধতি, জোড় কলম, সেটা নিয়ে সংক্ষেপে জানব।

আমের জোড়কলম

আঁটি থেকে তৈরি করা একটা চারাগাছের (স্টক) সঙ্গে উন্নত জাতের আম গাছের (সিয়ন) শাখা এক সঙ্গে জোড় বেঁধে কলম করা হয়। সেইজন্য এই পদ্ধতির নাম জোড়কলম। সাধারণত আষাঢ় মাসে এই কলম করা হয়।

i) কলম করার জন্য চারাগাছ আর উন্নত জাতের আমগাছের শাখা, দুটোরই কিছুটা করে অংশ কেটে নিয়ে দুটোকে জোড়া লাগিয়ে সুতলি দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। জোড়া না লাগা পর্যন্ত চারাগাছটাতে জল দেওয়া হয়।

ii) জোড়া লাগা সম্পূর্ণ হলে নির্বাচিত সিয়ন গাছটার জোড়ের নীচের দিকের অংশ ও চারাগাছের জোড়ের ওপরের দিকের অংশ একবারে না কেটে 2 থেকে 3 বারে কেটে ফেলা হয়। (কাটার জায়গাটা ছবিতে তিরচিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।)

iii) জোড়কলমের মাধ্যমে তৈরি হওয়া গাছটাকে কয়েকদিনের জন্য ছায়ায় রাখা হয়। তারপর নার্সারিতে লাগানো হয়।

চাষের পদ্ধতি

চাষের ধাপ	কী করা হয়
i) জমি তৈরি	পর্যাপ্ত সূর্যের আলো আসে আর জল নিষ্কাশনের ভালো ক্ষমতা আছে এমন উঁচু জমি বেছে নেওয়া হয়। ভালোভাবে চষে জমি সমান করে নেওয়া হয়। এরপর জমিতে শণের বীজ বোনা হয়। শণ গাছগুলোর বয়স 5-6 সপ্তাহের মতো হলে লাঙল ও মইয়ের সাহায্যে মাটিতে ভালোভাবে মাড়িয়ে, পচিয়ে সবুজ সার তৈরি করা হয়।
ii) চারাগাছ লাগানো	কলম করার অন্তত কয়েকমাস পরে চারাগাছ লাগানোই ভালো। আমাদের দেশে সাধারণত বর্ষায় চারাগাছ লাগালেই ভালো হয়। সমান দূরত্বে গর্ত খুঁড়ে, গর্ত থেকে তোলা মাটির সঙ্গে পরিমাণ মতো গোবর সার, সুপার ফসফেট আর ছাই মিশিয়ে আবার গর্তগুলো ভরতি করে দেওয়া হয়। এরপর চারাগাছগুলোকে সোজাভাবে লাগিয়ে প্রতিটা গাছে একটা করে কাঠি পুঁতে হালকাভাবে বেঁধে দিলে গাছ সোজাভাবে বেড়ে ওঠে।
iii) সার প্রয়োগ	নিয়মিত ও পরিমাণমতো আমের ফলন পেতে হলে প্রতি বছরই সঠিক পরিমাণে সার দেওয়া প্রয়োজন। গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেনের চাহিদা বেশি থাকে। তাই অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ইউরিয়া দেওয়া হয়।
iv) জলসেচ	চারাগাছের 6 মাস বয়স পর্যন্ত সপ্তাহে দুবার আর তারপর সপ্তাহে একবার করে সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। গাছ বড়ো হয়ে গেলে 15 দিন অন্তর সেচ দেওয়া উচিত।

চাষের ধাপ	কী করা হয়
v) অন্যান্য পরিচর্যা	আমগাছ লাগানোর পর শুধু জল আর সার দিলে চলবে না। সেইসঙ্গে বাগানের জমি নিয়মিত চষে পরিষ্কার রাখতে হয় — একবার বর্ষার শুরুতে আর একবার বর্ষার শেষে। এর ফলে ঝরে পড়া পাতা আর আগাছা মাটির সঙ্গে মিশে জৈব সারে পরিণত হয়।
vi) ফল সংগ্রহ	ফুল থেকে ফল আসতে প্রায় 4-5 মাস সময় লাগে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত পৌষ-মাঘ মাসে আমে মুকুল আসে। আম পুরোপুরি পাকার আগেই গাছ থেকে পেড়ে নেওয়া উচিত। নইলে পাখিতে আম নষ্ট করে। আম যখন ফিকে-সবুজ হতে আরম্ভ করে, তখনই বোঝা যায় যে আম পাড়ার সময় হয়েছে।
vii) ফলন	কলমের আমগাছে পরের বছরেই ফুল চলে এলেও 5 বছরের আগে গাছ থেকে ফল নেওয়া উচিত নয়। মুকুল এলেই ভেঙে দিতে হয়। গাছের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলের সংখ্যা ও পরিমাণ বাড়তে থাকে।
viii) ফল সংরক্ষণ	উন্নত জাতের আমকে পরিণত, শক্ত ও সবুজ অবস্থায় তুলে ভালোভাবে প্যাকিং করে হিমঘরে যথাযথ উষ্ণতা আর আর্দ্রতায় বেশ কয়েক সপ্তাহ ভালোভাবে রাখা যায়।

চা

চা-এর সঙ্গে তোমাদের সবারই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইরাবতী নদীর অববাহিকা চায়ের আদি নিবাস। চিনা ভাষায় Tey থেকে Tea শব্দটা এসেছে বলে মনে করা হয়। চিন, ভারত, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা আর টার্কি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন করে। ভারতের প্রধান চা উৎপাদনকারী রাজ্যগুলো হলো আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু আর কেরালা। 1000 থেকে 2500 মিটার উঁচু এলাকার পাহাড়ের গায়ে আম্লিক মাটিতে চায়ের চাষ হয়। ভারতে নানা ধরনের চা পাওয়া যায়। তার মধ্যে দার্জিলিং, আসাম আর নীলগিরির চা বিখ্যাত।

চায়ের গুণাগুণ

i) চা পান করলে শরীরে উদ্দীপনা আসে। এর মূলে আছে চায়ে ক্যাফিনের উপস্থিতি।

ii) চায়ে থাকে ফ্ল্যাভোনয়েড, ট্যানিন, উদ্‌বায়ী তেল আর ভিটামিন B- কমপ্লেক্স — যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

iii) চায়ে উপস্থিত পলিফেনল রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, হেপাটাইটিস সারাতেও সাহায্য করে।

iv) চায়ের প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, ক্যাফিন ও থিয়োফাইলিন স্নায়ুকে উদ্দীপিত করে আর হৃৎপিণ্ডকে ভালো রাখে।

v) চায়ে বেশি পরিমাণে থাকা ফ্লুওরাইড দাঁতের ক্ষয় রোধ করে।

vi) কালো চায়ে প্রচুর ভিটামিন B-কমপ্লেক্স আর ফলিক অ্যাসিড থাকে। এদের প্রদাহ-প্রতিরোধী আর ক্যানসার-প্রতিরোধী ভূমিকা আছে।

vii) সবুজ চায়ে থাকে ভিটামিন K যা শরীরের ভেতরে হওয়া রক্তক্ষরণ, রিউম্যাটিক প্রদাহ আর হার্ট অ্যাটাক হতে বাধা দেয়।

চা গাছের প্রকারভেদ

উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা *Camellia* গণের অন্তর্ভুক্ত চা উৎপাদনকারী তিন ধরনের গাছকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেন। এরা হলো চিনা জাত, আসামি জাত আর ক্যাম্বোড সংকর জাত। এছাড়াও চা তৈরি করা হয় না অথচ *Camellia* গণের অন্তর্ভুক্ত এরকম আরো অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ আছে। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় এমন চা গাছের উৎপত্তিতে এদের সবার ভূমিকা রয়েছে। তাই বাণিজ্যিক চা গাছগুলোকে বিশেষ কোনো জাতের বলে চিহ্নিত করা মুশকিল।

বংশ বিস্তার (Propagation)

বীজ থেকে বা উদ্ভিদ অঙ্গ থেকে, এই দু-ভাবেই চা গাছের বংশবিস্তার করানো হয়।

বীজ থেকে

ভালো জাতের সুস্থ, সবল আর সতেজ বীজ বেছে নেওয়া হয়। এরপর বালির ওপরে (Sand bed) বীজগুলোর অঙ্কুরোদগম ঘটানো হয়। অঙ্কুরিত বীজগুলোকে পলিথিনের প্যাকেটে নার্সারি বাগিচায় স্থানান্তরিত করা হয়। নার্সারি বাগিচায় জল নিষ্কাশনের ভালো ব্যবস্থা থাকা দরকার। মাথার ওপর শামিয়ানা খাটিয়ে বা প্যান্ডেল তৈরি করে ছায়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। 15-18 মাস পরে চারাগাছগুলো অন্য জায়গায় স্থানান্তরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

অঙ্গজ বিস্তার

পর্ব থেকে কেটে নেওয়া শাখা অঙ্গজ বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয়। ছায়া নেই এমন জায়গায় জন্মানো আর পাতা তোলা হয় না এমন চা গাছের ঝোপ থেকে শাখা কেটে নেওয়া হয়। সাধারণত সকালে আর সন্ধ্যায় এই কাজটা করা হয়। সাধারণত 3- 4 সেন্টিমিটার লম্বা শাখা কাটা হয় যাতে একটা পাতা আর একটা ফোলা সুপ্ত কাক্ষিক মুকুল আছে। এই কেটে নেওয়া শাখাগুলোকে এরপর নার্সারি বাগিচা আর তারপর পলিথিনের প্যাকেটে স্থানান্তরিত করা হয়। শামিয়ানা বা প্যান্ডেল খাটিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত 12-18 মাস বয়সের চারাগাছ চাষের জমিতে লাগানো হয়।

চাষের পদ্ধতি

চাষের ধাপ	কী করা হয়
i) জমি তৈরি	চা চাষের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা সব উদ্ভিদ মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়। কারণ মাটির নীচে মূল রয়ে গেলে সেখান থেকে নতুন চা উদ্ভিদে নানা রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। তারপর অন্তত 45 সেন্টিমিটার অবধি গভীরভাবে মাটি চষা হয়। এরপর গুয়াটেমালা ঘাস, সিট্রোনেলা ঘাস, ক্রোটালারিয়া ও আরও অন্যান্য কিছু উদ্ভিদের চাষ করা হয়। NPK জাতীয় অজৈব সার বা জৈব সার দেওয়া হয়। এই ধরনের ফসলের চাষ মাটির গঠন উন্নত করে আর মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়ায়। এইসব ফসলের উপস্থিতি মাটিতে থাকা বহু রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের মেরে ফেলতে বা নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করে। এরপর এই উদ্ভিদগুলোকে সরিয়ে দিয়ে চা গাছের চারা রোপণের প্রস্তুতি শুরু করা হয়।

চাষের ধাপ	কী করা হয়
ii) চারাগাছ রোপণ	রোপণের এক সপ্তাহ আগে গভীর গর্ত খোঁড়া হয়। এরপর গর্তগুলো জমির ওপরের স্তরের মাটি (top soil) দিয়ে ভরতি করে 12-18 মাসের চারাগাছগুলো পোঁতা হয়। চারাগাছগুলোর গোড়ার চারধারে ভেজা পাতা, খড় ইত্যাদি রাখা হয় (mulching)।
iii) ছায়ার ব্যবস্থা	ক্রান্তীয় আর উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে ছায়ায় চা গাছের চাষ করা হয়। চা গাছকে এই ছায়া দেয় কিছু ছায়া তরু (Shade tree)। ছায়া তরুরা সূর্যের বিকিরণের বেশ কিছু অংশ শোষণ করে চারপাশের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। ফলে গ্রীষ্মে চা পাতার সালোকসংশ্লেষের যথাযথ হার বজায় থাকে। ছায়া তরুর পাতা মাটিতে পড়ে মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণও বাড়ায়। সিলভার ওক জাতীয় গাছ ছায়া তরুর কাজ করে।
iv) আগাছা দমন	চা বাগানে একবীজপত্রী আর দ্বিবীজপত্রী, এই দু-ধরনের আগাছাই জন্মায়। আগাছানাশক নানা রাসায়নিক পদার্থ (ডাইইউরন, সিমাজিন, 2.4-D ইত্যাদি) ব্যবহার করা হয়। জলের সঙ্গে মিশিয়ে এই আগাছানাশকগুলো স্প্রে করা হয়।
v) সার প্রয়োগ	চা যেহেতু একটা পাতা জাতীয় ফসল, তাই নাইট্রোজেনযুক্ত সার প্রয়োগে উৎপাদন বাড়ে। ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ক্যালশিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি সার ব্যবহারের মাধ্যমে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ানো হয়।
vi) জলসেচ	উত্তর-পূর্ব ভারতে শুখা মরশুমে (অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি) সাধারণত ফোয়ারা পদ্ধতিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়।
vii) ফসল তোলা	অগ্রমুকুল, পর্বমধ্য আর তার ঠিক নীচের 2টো বা 3টে পাতাযুক্ত চা গাছের নবীন শাখা তোলা হয় অর্থাৎ 1 টা কুঁড়ি আর 2 টো বা 3 টে পাতা। এই কাজের ওপরেই নির্ভর করে চায়ের উৎপাদন আর চায়ের গুণাগুণ। বাণিজ্যিক চাগাছগুলো থেকে বছরে 35-40 বার পাতা তোলা হয়। একেকবার প্রতিটি গাছ থেকে 10-15 গ্রাম পাতা তোলা হয়।
viii) চা-পাতা তৈরি	চা গাছ থেকে তোলা পাতা কিন্তু চা তৈরির জন্য উপযুক্ত নয়। তোলার পরে নানারকম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার পরেই চা-পাতা চা তৈরির উপযুক্ত হয়ে ওঠে।
ix) চায়ের গুণাগুণ পরীক্ষা	চা-পাতা তৈরির একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো চায়ের স্বাদ পরীক্ষা করে দেখা। বিক্রির আগে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চা পরীক্ষকরা চায়ের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ পরীক্ষা করে দেখেন।

চা পাতা তৈরির ধরন অনুযায়ী বাণিজ্যিক চা-কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এই তিন ধরনের চা হলো — কালো চা (Black tea), সবুজ চা (Green tea) আর উলং চা (Oolong tea)। সারা পৃথিবীর চা উৎপাদনের প্রায় 75 শতাংশই হলো কালো চা।

প্রাণিজ খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

আমরা উদ্ভিদ থেকে যেমন নানা ধরনের খাবার পাই, তেমনই প্রাণীদের থেকেও পাই। তোমরা এর আগে দেখেছ যে উদ্ভিদজাত খাবার পেতে গেলে চাষ করতে হয়। একইভাবে প্রাণীজাত খাবার নিয়মিত আর যথেষ্ট পরিমাণে পেতে গেলেও সেইসব প্রাণীদের যত্নের সঙ্গে প্রতিপালন করা দরকার। আর সেইসঙ্গে দরকার তাদের প্রজননের সুব্যবস্থা করা। এটাই হলো পশুপালন (Animal husbandry)।

আমরা এখানে মৌমাছি, মাছ আর মুরগি পালন সম্বন্ধে জানব।

মৌমাছি

মৌমাছি তোমরা অনেকেই দেখেছ। আর মৌচাক দেখেছ? গাছের ডালে, বাড়ির কার্নিসে, ঝোপঝাড় বা অন্যান্য জায়গায় মৌচাক ঝুলে থাকতে দেখেছ নিশ্চয়ই। মৌমাছিদের কাছ থেকে আমরা পাই মধু আর মোম। গাছের ডালে বা অন্যান্য জায়গায় যে মৌচাক তোমরা দেখো, সেগুলো কিন্তু আসলে বুনো মৌমাছিদের তৈরি করা চাক। বুনো মৌমাছি বলছি তার কারণ ওই মৌমাছিদের পালন করা হয়নি। ওরা নিজেদের তাগিদেই মৌচাক বানায়। আর সেখানে মধুও তৈরি করে।

মৌচাক

মৌমাছিদের সমাজ

মৌমাছিদের মধ্যে বিভিন্ন কাজ করার জন্য নানাধরনের মৌমাছি দেখা যায়— রানি মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি আর শ্রমিক মৌমাছি। মৌমাছিরা সমাজবদ্ধ জীব। মৌমাছিদের সমাজে তিন ধরনের মৌমাছিদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ আছে। রানি মৌমাছির কাজ ডিম পাড়া। পুরুষ মৌমাছির কাজ রানি মৌমাছির সঙ্গে প্রজননে অংশ নেওয়া। আর শ্রমিক মৌমাছির কাজ অনেক - মৌচাক তৈরি করা, ফুলের পরাগরেণু আর মকরন্দ সংগ্রহ করা, রানি ও পুরুষ মৌমাছিদের সেবা করা, মধু ও মোম তৈরি করা, সন্তান লালনপালন করা, মৌচাক পাহারা দেওয়া।

শ্রমিক রানি পুরুষ

মৌচাক আর মধু তৈরি

মৌমাছিরা মৌচাক কীভাবে তৈরি করে জানো কি? শ্রমিক মৌমাছিদের পেটের অনেক থলিতে থাকে মোম গ্রন্থি। এই মোম গ্রন্থির ক্ষরণ দিয়ে তারা মৌচাক তৈরি করে। প্রতিটি মৌচাকে অসংখ্য ষড়ভুজাকৃতি প্রকোষ্ঠ থাকে।

আর মৌমাছি মধু কীভাবে তৈরি করে? শ্রমিক মৌমাছিরা ফুল থেকে মকরন্দ সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করা মকরন্দ নিজেদের দেহের মধুথলিতে জমা রাখে। মধুথলিতে মকরন্দের সঙ্গে লালারস মেশে। এর ফলে

মকরন্দে থাকা শর্করার কিছু পরিবর্তন হয়। শ্রমিক মৌমাছি এরপর এই মিশ্রণকে মধু প্রকোষ্ঠে উগরে দেয়। আর ডানা দিয়ে ক্রমাগত বাতাস করতে থাকে। ফলে জল বাষ্পীভূত হয়ে মধুতে পরিণত হয়।

মধুর পুষ্টিগুণ

মধুতে প্রচুর গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ থাকায় এটি পুষ্টিকর। এছাড়াও এতে অ্যামাইনো অ্যাসিড ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ (Na, K, Ca, Fe, Mg, P) থাকে। এছাড়াও ভিটামিন A, B-কমপ্লেক্স ও C থাকে।

মৌমাছিরা কীভাবে বেড়ে ওঠে

এসো এবারে চট করে জেনে নেওয়া যাক, মৌমাছিরা কীভাবে ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠে। মৌমাছিদের জীবনে চারটে দশা দেখা যায়— ডিম, লার্ভা, পিউপা, পূর্ণাঙ্গ। রানি আর পুরুষ মৌমাছির মিলনের পর রানি মৌমাছি ডিম দেয়। তারপর ডিম থেকে লার্ভা আর লার্ভা থেকে হয় পিউপা। আর পিউপারা পরিণত হয় পূর্ণাঙ্গ মৌমাছিতে।

মৌমাছিদের রকমভেদ

পাহাড়ি মৌমাছি

ভারতীয় মৌমাছি

ছোটো মৌমাছি

ইউরোপীয় মৌমাছি

মৌমাছি পালন

বুনো মৌমাছির চাক থেকে যে মধু পাওয়া যায়, তার পরিমাণ খুবই অল্প। আর সেটা নিয়মিত পাওয়াও যায় না। আর ওই মধুর গুণাগুণও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাই বিজ্ঞানসম্মত ও কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি প্রতিপালন করা হয়। এটাই মৌমাছি পালন বা মৌচাষ। মৌমাছি পালন করার জন্য মৌমাছিদের যে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম থাকার জায়গা ব্যবহার করা হয়, সেটাই হলো মধুমক্ষীশালা বা এপিয়ারি।

ভারতে মৌমাছি পালনের জন্য দু-ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় — দেশীয় পদ্ধতি আর আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

দেশীয় পদ্ধতি

i) এই পদ্ধতিতে মৌমাছিদের প্রতিপালন করা হয় না। প্রাকৃতিকভাবে গাছের ডাল, ঘরের দেয়াল বা কার্নিস প্রভৃতি জায়গায় তৈরি হওয়া মৌচাক খুঁজে বার করা হয়।

ii) অনেক সময় আবার ফাঁকা কাঠের গুঁড়ি, কাঠের বাক্স বা মাটির হাঁড়ি মৌমাছিদের চলাচলের জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। মৌমাছিরা স্বেচ্ছায় এইসব জায়গায় এসে চাক তৈরি করতে পারে।

iii) পরে আগুন, জল বা ধোঁয়া দিয়ে সেই চাক থেকে মৌমাছিদের তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মৌমাছিরা চাক ছেড়ে পালিয়ে যায় আবার কখনও বা মারাও যায়। তারপর সেই মৌচাক ভেঙে মধু বের করে নেওয়া হয়।

আধুনিক পদ্ধতি

i) এই পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক মৌচাক তৈরির কৌশল অবলম্বনে কৃত্রিম মৌচাক তৈরি করা হয়। প্রকৃতিতে স্বাভাবিক উপায়ে তৈরি মৌচাকে নীচের দিকে থাকে মৌমাছিদের সন্তান পালনের ঘর। আর ওপরের দিকে থাকে মধু প্রকোষ্ঠ। এই কৃত্রিম চাকেও সেইরকম ব্যবস্থা করা থাকে।

কৃত্রিম মৌচাক

ii) একটা রানি মৌমাছি আর কতগুলো শ্রমিক মৌমাছিদের ধরে এনে কৃত্রিম মৌচাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা যায় আরও অনেক মৌমাছি ওই মৌচাকে এসে জড়ো হয়েছে।

iii) খুব অল্প সময়ের মধ্যে রানি মৌমাছির ডিম থেকে মৌচাকে প্রচুর মৌমাছির সৃষ্টি হয়।

iv) আম, জাম, লেবু, পেয়ারা, গাজর, ধনে, সরষে, মৌরি, লাউ, কুমড়ো, পেঁয়াজ, মটর ইত্যাদি নানান রকম গাছ থেকে মৌমাছিরা মকরন্দ সংগ্রহ করে। তাই মৌমাছি পালন করতে গেলে মধুমক্ষীশালার কাছাকাছি এইসব গাছ থাকা দরকার।

v) মৌচাক থেকে বিশুদ্ধ মধু সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ ধরনের মধু নিষ্কাশন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

মাছ চাষ (Fisheries), কথাটা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। মাছ ছাড়াও চিংড়ি, শামুক, ঝিনুক, ব্যাঙ ইত্যাদি প্রাণীদের চাষও মাছ চাষের মধ্যেই পড়ে। আমরা কেবল মাছের চাষ (Pisciculture) নিয়েই আলোচনা করব।

মাছ চাষের প্রকারভেদ

মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী মাছ চাষকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

মাছ চাষ (মাছ উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী)

সংগ্রহভিত্তিক (Capture)	**পালনভিত্তিক** (Culture)
নদ-নদী ও বিশাল জলাশয়ে মাছ পালন করা সম্ভব হয় না। তাই নদ-নদী ও বিশাল জলাশয়গুলোতে কেবল মাছ ধরা হয়।	পুকুর, খাল, বিল, ডোবা, ভেড়ি প্রভৃতি জলাশয়ে মাছের চারা ছাড়া হয়। নিয়মিত সার প্রয়োগ, খাদ্য সরবরাহ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য পরিচর্যার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়।

মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্র অনুযায়ী মাছ চাষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।
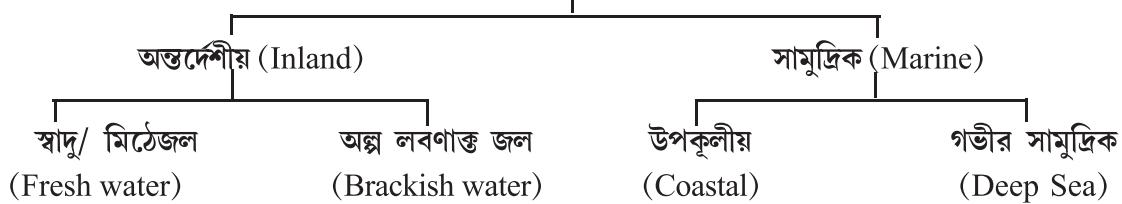
আমরা এখানে মূলত স্বাদু জলে পালনভিত্তিক মাছ চাষ নিয়ে আলোচনা করব।

মাছ চাষ নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে সাধারণত যেসব মাছের চাষ করা হয় তাদের সম্বন্ধে জেনে নিই।

কার্প কী?

মিঠে জলে বাস করা যেসব অস্থিযুক্ত মাছের ত্রিকোণাকৃতি মাথায় আঁশ থাকে না, অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ও চোয়ালে দাঁত অনুপস্থিত আর দেহের ভেতরে পটকা থাকে— তারাই হলো কার্প। যেমন রুই, কাতলা, বাটা ইত্যাদি মাছ। কার্পকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়।

কার্প

দেশি কার্প (Indigenous carp) | **বহিরাগত কার্প** (Exotic carp)

মেজর কার্প	**মাইনর কার্প**	**বহিরাগত কার্প**
i) আকারে বড়ো। ii) তাড়াতাড়ি বাড়ে। সাধারণত বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে না। iii) ব্যবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর চাহিদাও বেশি। উদাহরণ: রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবোস	i) আকারে ছোটো। ii) তাড়াতাড়ি বাড়ে না। সাধাবণত বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে। iii) ব্যবসায়িক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়। উদাহরণ: বাটা, পুঁটি ইত্যাদি	i) বিদেশ থেকে আমদানি করা। ii) ভারতীয় জলবায়ুতে মানিয়ে নিয়ে বেড়ে ওঠে আর প্রজননেও সক্ষম। উদাহরণ: গ্রাস কার্প/ঘেসো রুই, কমন কার্প/আমেরিকান রুই, সিলভার কার্প

রুই | কাতলা | পুঁটি | সিলভার কার্প

মৃগেল | কালবোস | কমন কার্প | গ্রাস কার্প

মাছ চাষের বিভিন্ন পর্যায়
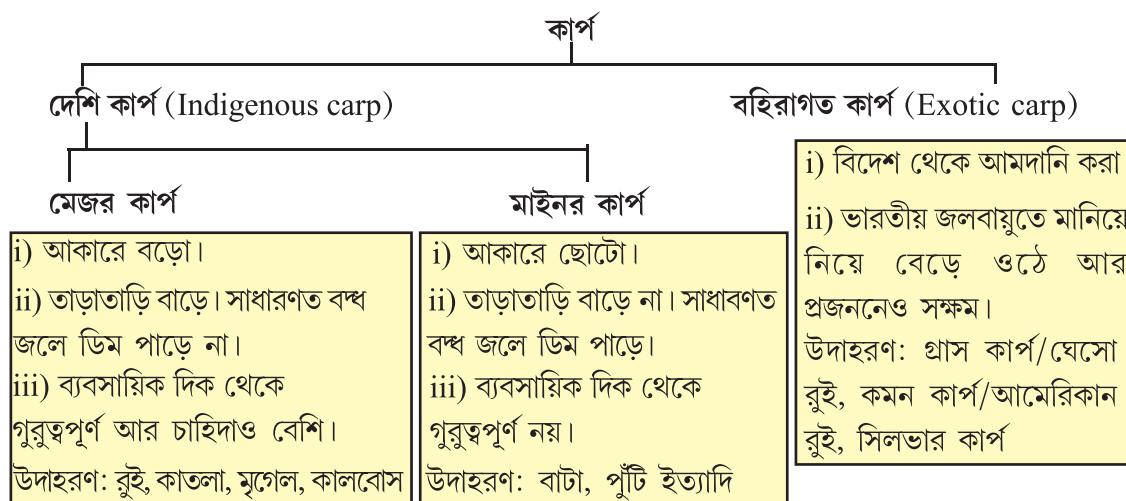
1. ডিম পোনা সংগ্রহ

প্রজনন ঋতুতে অর্থাৎ জুন-জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ) মাসে রুই, কাতলা, মৃগেলের স্ত্রী মাছগুলো অগভীর জলে ডিম ছাড়ে আর পুরুষ মাছ তার শুক্রাণু নিঃসরণ করে। শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনে ডিম পোনা তৈরি হয়। আর মাছ চাষিরা জাল দিয়ে ছেঁকে ডিম পোনা আর নিষিক্ত ডিমগুলোকে হাঁড়িতে সংগ্রহ করে। নিষিক্ত ডিম কোনগুলো জানো? যেসব ডিমের সঙ্গে শুক্রাণুর মিলন হয়েছে, সেগুলোই হলো নিষিক্ত ডিম। আর এই মিলনের প্রক্রিয়াটাই হলো নিষেক। নিষিক্ত ডিমগুলো থেকেই ডিম পোনা তৈরি হয়।

কৃত্রিম পদ্ধতি

i) কৃত্রিম পদ্ধতিতে ডিমপোনা তৈরি করলে কোন কোন মাছের ডিমপোনা তৈরি হচ্ছে সেটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর ডিমপোনা সংগ্রহেও অনেক সুবিধা হয়।

ii) এই পদ্ধতিতে প্রতিটা সুস্থ, সবল স্ত্রী মাছের জন্য দুটো সুস্থ, সবল পুরুষ মাছ নেওয়া হয়। মাছের মাথায় মানুষের মতোই একটা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থাকে— এর নাম পিটুইট্যারি গ্রন্থি। মাছের পিটুইট্যারি গ্রন্থির নির্যাস নিয়ে ওই বাছাই করা মাছদের ইনজেকশান দেওয়া হয়। আর পুরুষ ও স্ত্রী মাছের কোনটাকে কখন কতবার কতটা ইনজেকশান দেওয়া হবে তার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। তোমরা পরে এবিষয়ে বিশদে জানবে।

iii) পিটুইট্যারি ইনজেকশান দেওয়ার ফলে স্ত্রী মাছ ডিম আর পুরুষ মাছ শুক্রাণু নিঃসরণ করে। শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর মিলনে ডিম পোনা তৈরি হয়।

2. ডিম পোনা থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছ

প্রকৃতি থেকে মাছ চাষীদের সংগ্রহ করা নিষিক্ত ডিমগুলো থেকে ডিম পোনা তৈরি করার জন্য একটা পুকুরে রাখা হয়। এটাই হ্যাচারি। আর ডিম পোনাদের পরপর বেশ কয়েকটা পুকুরে প্রতিপালন করে পূর্ণাঙ্গ মাছ তৈরি করা হয়। এই পুকুরগুলো হলো আঁতুড় পুকুর, পালন পুকুর আর সঞ্চয়ী পুকুর।

ডিম পোনা —(আঁতুড় পুকুর)→ ধানি পোনা —(পালন পুকুর)→ চারা পোনা —(সঞ্চয়ী পুকুর)→ পূর্ণাঙ্গ মাছ

মিশ্র মাছ চাষ

দেশি মাছদের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল-—এরা পুকুরের জলের বিভিন্ন স্তরে বাস করে আর সেখান থেকেই খাবার সংগ্রহ করে। যেমন কাতলা মাছ ও সিলভার কার্প জলের ওপরের স্তর থেকে, রুই মাছ ও গ্রাস কার্প জলের মাঝের স্তর থেকে আর মৃগেল মাছ ও কমন কার্প জলের নীচের স্তর থেকে খাবার সংগ্রহ করে। তাই এই ধরনের মাছগুলো একসঙ্গে চাষ করলে খাবার ও থাকার জায়গা নিয়ে এদের মধ্যে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। ফলে মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। এই পদ্ধতিতে অনেক সময় একই পুকুরে কেবল রুই, কাতলা আর মৃগেল মাছের চাষ করা হয়। আবার অনেক সময়ে দেশি আর বহিরাগত এই দু রকম মাছের চাষ একই পুকুরে করা

হয়। এই দুটো ক্ষেত্রেই দেখা যায় মাছের উৎপাদন অনেকটাই বেড়ে গেছে। তিন ধরনের দেশি মাছ একই পুকুরে চাষ করাটাই হলো মিশ্র মাছ চাষ। আর তিনধরনের দেশি কার্পের সঙ্গে তিনধরনের বহিরাগত কার্প একই পুকুরে চাষ করাটাই হলো নিবিড় মিশ্র চাষ বা পলিকালচার।

ময়লা জলে মাছ চাষ

আগে জানা দরকার ময়লা জল বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। ঘরবাড়ি, পৌরসভা ও কলকারখানার বর্জ্যপদার্থ মেশানো সাধারণত কালো রঙের জল — একেই বলা হয় ময়লা জল। এই জলে মল-মূত্রও মিশে থাকে। আর থাকে কঠিন পদার্থরূপে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ।

ময়লা জলে থাকা বিভিন্ন অজৈব পদার্থ, অজৈব সারের মতো কাজ করে। ফলে জলে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই মাছের প্রাথমিক খাবার, ফাইটোপ্ল্যাংকটন প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়। আর এরই ফলে তৈরি হয় জুপ্ল্যাংকটন ও অন্যান্য পোকামাকড়ও। এরাও মাছের খাবার। তাই বাইরে থেকে কৃত্রিম খাবার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে মাছ চাষের পুকুরে সরাসরি অপরিশোধিত ময়লা জল ব্যবহার করলে মাছের ক্ষতি হয়। তাই মাছ চাষের পুকুরে সরাসরি ব্যবহারের আগে ময়লা জল পরিশোধন করে নেওয়া জরুরি।

পূর্ব কলকাতার ভেড়িগুলো এই ময়লা জলে মাছ চাষের অন্যতম কেন্দ্র। বিভিন্ন ক্যানাল বা নালার সাহায্যে কলকাতার ময়লা জল নিয়ে ওই অঞ্চলের ভেড়িগুলোতে সরবরাহ করা হয়। তারপর ওই জলে মাছ চাষ করা হয়।

মাছের পুষ্টিগুণ

প্রাণিজ প্রোটিন, অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিড সরবরাহে মাছের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাছাড়াও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ (Ca, P, Na, K, Mg, S) ও কিছু ভিটামিন (A, C, D ও B-কমপ্লেক্স) থাকে।

পোলট্রি

হাঁস আর মুরগীর মতো পাখিদের পালন করা হয় আর্থিক লাভের জন্য। কারণ এদের ডিম আর মাংসের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে এমন পাখিরাই হলো পোলট্রি পাখি। আমরা এখানে কেবল মুরগি পালন সম্বন্ধে জানব। অর্থনৈতিক উপযোগিতার ভিত্তিতে মুরগিদের তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়।

ওজন অনুসারেও মুরগিদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

মুরগি (ওজন অনুসারে)

হালকা জাত (Light Breed)

যেসব মুরগির ওজন 2-3 কিলোগ্রামের মধ্যে থাকে। উদাহরণ: লেগহর্ন

ভারী জাত (Heavy Breed)

যেসব মুরগির ওজন 3 কিলোগ্রামের বেশি হয়। উদাহরণ: আসিল, ব্রামা, প্লাইমাউথ রক

ডিমে তা দেওয়ার প্রকৃতি অনুযায়ীও মুরগিদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

মুরগি (ডিমে তা দেওয়ার প্রকৃতি অনুসারে)

সিটার (Sitter)

যেসব মুরগি ডিমে তা দেয় উদাহরণ: ব্রামা, কোচিন

নন-সিটার (Non-Sitter)

যেসব মুরগি ডিমে তা দেয় না উদাহরণ: লেগহর্ন

মুরগি পালন

আমরা এখানে মুরগি পালনের দুটো আধুনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানব।

1. ব্যাটারি খাঁচায় মুরগি পালন পদ্ধতি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুরগি পালনের এটা একটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতিটা মুরগির জন্য আলাদা আলাদা খাঁচার ব্যবস্থা করা হয়। খাঁচাগুলো এমন হয় যে খাঁচার অল্প জায়গার মধ্যে একটা মুরগি স্বচ্ছন্দে বসতে বা দাঁড়াতে পারে। এরকম অনেকগুলো খাঁচা সারিবদ্ধভাবে থাকে। খাঁচার মেঝে পেছন থেকে সামনের দিকে ঢালু থাকে। খাঁচার মেঝে ঢালু থাকায় মুরগি ডিম পাড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে এসে খাঁচার বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকা খাঁজে জমা হয়। খাঁচার বাইরের দিকে খাবার আর জলের পাত্র লাগানো থাকে। আর খাঁচার নীচে মুরগিদের মল সংগ্রহের পাত্র থাকে।

ব্যাটারি খাঁচার মধ্যে মুরগিরা বেশি নড়াচড়া করতে পারে না। তাই শক্তি খরচ হয় কম। তাই এরা যা খায় তার বেশির ভাগটাই দেহগঠন আর ডিম তৈরিতে কাজে লাগে।

2. ডিপ-লিটার পদ্ধতি

লিটার তৈরির ঘর আলো বাতাস যুক্ত হওয়া দরকার। ঘরের মেঝেতে লিটার তৈরির আগে চুন আর ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। এরপর এই পরিষ্কার আর শুকনো মেঝেতে লিটার বিছানো হয়। এবার তাহলে জেনে নেওয়া যাক, লিটার কী? বিচালি (ছোটো ছোটো করে কাটা খড়), কাঠের গুঁড়ো, শুকনো পাতা, ধান, তুলোবীজ আর যবের তুষ, ভুট্টা, আমের খোসা ইত্যাদি

দিয়ে ঘরের মেঝেতে জীবের জন্য শয্যা তৈরি করা হয়। এটাই লিটার। প্রথমে কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে তার ওপর খড় বিছানো হয়। এরপর অন্যান্য জিনিসগুলো বিছিয়ে 10-15 সেন্টিমিটার পুরু নতুন লিটার তৈরি করা হয়। মুরগিরা থাকতে আরম্ভ করলে ওই লিটারে মুরগির মল ভালোভাবে মিশে গেলে পুরোনো লিটারের ওপরে আবার নতুন করে 5 সেন্টিমিটার পুরু লিটার পাতা হয়। এর ফলে মোটামুটি 20 সেন্টিমিটার পুরু স্থায়ী লিটার তৈরি সম্পূর্ণ হয়।

ডিপ-লিটার ঘরের দেয়ালের বাইরে খাবার আর জলের পাত্র এমনভাবে রাখা হয়, যাতে মুরগি ঘরের ভেতর থেকে শিকের ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে খাবার আর জল খেতে পারে। এই ঘরের দেয়ালে আবার ডিম পাড়ার জন্য বাসা বসানো থাকে। মুরগিরা ওই বাসায় গিয়ে ডিম পাড়ে।

মুরগির মাংস ও ডিমের পুষ্টিগুণ

মুরগির মাংস আর ডিম প্রাণীজ প্রোটিনের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। মুরগির মাংসে ক্ষতিকারক ফ্যাটের পরিমাণ অন্যান্য মাংসের তুলনায় কম থাকায় এটি স্বাস্থ্যকর। মুরগির ডিম অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিডের জোগান দেয় । ডিম বিভিন্ন মৌলের ((Fe, Ca, P, K) ও ভিটামিনের (A, B-কমপ্লেক্স, D ও E) চাহিদা মেটায়।

ব্রয়লার

ব্রয়লার হলো একধরনের সংকর মুরগি। শুধুমাত্র মাংস পাওয়ার জন্য এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। সংকর জাতের মুরগি তৈরি করার প্রথম চেষ্টা সম্ভবত হয় 1930 সালে। কর্নিশ জাতের একটা পুরুষ মুরগির সঙ্গে সাদা প্লাইমাউথ জাতের একটা স্ত্রী মুরগির মিলন ঘটিয়ে সংকর জাতের মুরগি তৈরি করা হয়। এটাই ব্রয়লার জাতের মুরগি।

ব্রয়লার জাতের মুরগি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। কাজকর্ম বা নড়াচড়া খুব একটা করে না। যা খায়, তার বেশিরভাগটাই নিজের দেহগঠনে কাজে লাগায়। এরা মাত্র 5-7 সপ্তাহের মধ্যে বিক্রি করার মতো ওজনে পৌঁছে যায়। অন্যদিকে স্বাধীনভাবে পালিত মুরগিদের বিক্রি করার মতো ওজনে পৌঁছোতে লাগে 12-16 সপ্তাহ।

ধান, আম বা চায়ের চাষ সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে নীচে লেখো।

তোমার অভিজ্ঞতা

মৌমাছি পালন, মাছ চাষ বা পোলট্রি পাখি পালন সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে নীচে লেখো।

তোমার অভিজ্ঞতা

9 অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

নীচের গল্পগুলি পড়ো। প্রতিটি গল্পে ঘটনাগুলো তোমাদের প্রায় চেনা। এখন সেই চেনা ঘটনাগুলোর কারণ খোঁজার চেষ্টা করো —

গল্প-১

তাপসের আজকাল আয়নায় মুখ দেখা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে বেশ পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায়। মা একটু বকাবকিই করেন। আয়নার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় বলে। কিন্তু তা বলে তাপস ওর অভ্যাসটি ছাড়ে না। রোজ আয়নায় নিজেকে দেখে। ওর ইদানীং গোঁফের রেখা দেখা যাচ্ছে, গলার স্বরেরও খানিক বদল ঘটেছে। তাপস মাকে বলে, মা ওরকমভাবে বোকো না। দেখছ না, আমি বড়ো হয়ে গেছি।

গল্প-২

আজ ইস্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিন । অসিত অন্যদের সঙ্গে দৌড়োবে। বাঁশি বাজতেই সব প্রতিযোগী মাঠের ধারে লাইন বরাবর দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বিতীয় বাঁশি বাজতেই দৌড় শুরু। প্রাণপণে দৌড়ে অসিত যখন দড়ি ছুঁল, দেখল ও প্রথম হয়েছে। অসিত কথা বলতেই পারছিল না। বুকের হৃৎপিণ্ডটা খুব জোরে জোরে ধুকপুক করছিল। ভীষণ হাঁপাচ্ছিল ও। দরদর করে ঘাম ঝরছিল। জিভটাও শুকিয়ে আসছিল। একটুখানি বসতেই আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেল।

গল্প-৩

সুজাতা বাবার সঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়েছিল। খুবই ভালো লেগেছিল ওর। তবে দুজন মানুষকে ওর সবচেয়ে ভালো লেগেছিল। একজন খাটো রণি, অন্যজন রণির বন্ধু বিশাল লম্বা টনি। মনে হয় টনি যেন পায়ে রণ-পা পরে আছে। সুজাতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এরকম খাটো আর এরকম লম্বা মানুষও হয়!

গল্প-৪

রাবেয়া মায়ের সঙ্গে মেলায় বেড়াতে গিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে খুব জল তেষ্টা পেয়েছিল। মাকে বলল সেকথা। তখন তিনি রাবেয়াকে শরবত কিনে দিলেন। দোকানদারকে শরবতে চিনি মেশাতে বারণ করলেন। রাবেয়া মাকে শরবতে চিনি দিতে না বলার জন্য চাপ দিল না। রাবেয়া জানত যে ওর চিনি খাওয়া একদম বারণ। তাই ও একেবারেই মিষ্টি খায় না। আজকাল খুব অল্পেই হাঁপিয়ে যায়। কোথাও কেটে গেলে ঘা যেন শুকোতে চায় না।

গল্প-৫

আজকাল চায়নার খুব ঘুম পায়। সেদিন তো ক্লাসের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার জন্য দিদির কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল । কী যে হয়েছে চায়নার। গলার সামনেটা উঁচু মতো কী একটা যেন ওঠানামা করছে। খুব ক্লান্তি বোধ করে। পড়াশোনা করতেই ইচ্ছে করে না। সবসময় কেবল ঘুমোতে ইচ্ছে করে।

ছোটোবেলা থেকে বড়ো হবার পথে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর আমাদের শরীরে নানা পরিবর্তন ঘটে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে লেখো।

তোমার ছোটোবেলার সঙ্গে তুলনা করে নীচের কাজটি করো —

শরীরের নানা পরিবর্তন	কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছে
1. উচ্চতা	
2. ওজন	
3. কণ্ঠস্বর	
4. পেশির গঠন	

সুতরাং তোমরা দেখলে একটা বয়সের পর তোমার মতোই অনেকের উচ্চতা, ওজন, কণ্ঠস্বরের বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। আচ্ছা এবার মনে তো প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই ধরনের নানা শারীরিক পরিবর্তনের কারণ কী? শুধুই কি শরীরের পরিবর্তন ঘটে। মনেরও তো ঘটে, তাই না?

তোমরা এবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে লেখো তো মনের কী কী পরিবর্তন ঘটে —

মনের পরিবর্তন	কখন হয়
1. রাগ হওয়া	
2. কান্না পাওয়া	
3. হিংসা করা	
4. ভালো লাগা	
5. অভিমান হওয়া	

জন্মের সময় থেকে শুরু করে মারা যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের শরীরে, মনে নানা পরিবর্তন ঘটে। আর এইসব পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হলো হরমোন। শরীরের বৃদ্ধি, ওজন, হজম প্রক্রিয়া, রোগ প্রতিরোধ, রক্তচাপ, মূত্র উৎপাদন, ঘাম তৈরিতে এমনকি হৃদযন্ত্র ঠিক রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নেয় হরমোন। তোমার ভালোলাগা, মন্দলাগা, কান্না, হাসি, সব আবেগকেই অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে হরমোন।

আসলে হরমোন হলো আমাদের শরীরে রক্তবাহিত কয়েক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এরা প্রয়োজন অনুযায়ী এক সেকেন্ডের জন্যও আমাদের শরীরে তৈরি হতে পারে আবার কোনো কোনো হরমোন সারাজীবন ধরেই রক্তে পাওয়া যায়।

আমাদের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে দু-ধরনের সংযোগ স্থাপন হয়। পায়ে মশা বসলে মস্তিষ্ক ঠিক খবর পায়। মস্তিষ্ক তখন হাতকে নির্দেশ দেয় মশাকে তাড়ানোর জন্য। হাত তখন মস্তিষ্কের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। এই ঘটনাটি স্নায়বিক সংযোগস্থাপনের একটি উদাহরণ। আর একটি সংযোগস্থাপন হলো রাসায়নিক। রাসায়নিক বার্তাবাহক হিসাবে রাসায়নিক সংযোগ স্থাপনের কাজটা অনেকটাই করে হরমোন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেলেই সে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তৈরি হয়ে লক্ষ্যে চলে যায়। যে লক্ষ্যে যায় তার নাম গ্রাহক। হরমোন খুব ধীরে ধীরে কাজ শুরু করে। কিন্তু কাজের প্রভাব থাকে অনেকক্ষণ। কাজ হয়ে গেলে হরমোন নষ্ট হয়ে যায়। রক্তে হরমোনের মাত্রা কমে গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী আবার নতুন করে তৈরি হয়। তবে ধারাবাহিকভাবে রক্তে হরমোনের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি বা কম থাকলে নানারকম সমস্যা দেখা যায়। কোনো কোনো হরমোন আমাদের শরীরে প্রোটিনের ব্যবহার কমিয়ে দেয়। ফ্যাটের ভাঙন বাড়িয়ে দেয়। অব্যবহৃত প্রোটিনকে দেহগঠন ও বৃদ্ধির কাজে লাগায়।

হরমোন কোথা থেকে তৈরি হয়

আমাদের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা কোশের গুচ্ছ বা গ্রন্থি। তাদের মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থির আবার পাইপের মতো নালিকা আছে।
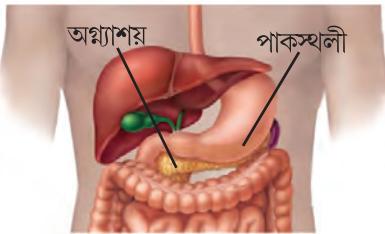
নালিকার মধ্যে দিয়ে গ্রন্থি থেকে বেরোনো রস এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যায়। এই ধরনের গ্রন্থিকে বলে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বা এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড। যেমন, লালাগ্রন্থি থেকে বেরোনো লালারস, পাকস্থলীর গ্রন্থি থেকে বেরোনো পাকরস, অগ্ন্যাশয় থেকে বেরোনো অগ্ন্যাশয়রস ইত্যাদি। তবে এই রসে নানান এনজাইম বা উৎসেচক থাকে যা খাবারকে ভাঙতে সাহায্য করে।

আবার বেশ কিছু গ্রন্থি আছে যাদের কোনো নালিকা নেই। তাই এইসব গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রস সরাসরি রক্তে মেশে। রক্তবাহিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়। এই গ্রন্থি থেকেই ক্ষরিত হয় হরমোন। রক্ত এই হরমোনগুলোকে নির্দিষ্ট ক্রিয়াস্থলে নিয়ে যায়। এইসব গ্রন্থিকে বলে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড। যেমন থাইরয়েড গ্রন্থি । তবে আরও একধরনের গ্রন্থি আছে যাদের মধ্যে অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা দু-ধরনের গ্রন্থিকোশ থাকে। তারা হলো মিশ্র গ্রন্থি। নালিকাবিহীন কোশ থেকে হরমোন বেরোয় আর নালিকাযুক্ত কোশ থেকে বেরোয় উৎসেচক, যা খাবারকে ভাঙতে সাহায্য করে। যেমন অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি।

প্রধান প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও তাদের কাজ

1. **পিট্যুইটারি গ্রন্থি** — মস্তিষ্কের মূলদেশে দুটি খণ্ড বিশিষ্ট পিট্যুইটারি গ্রন্থি থাকে। ওপরের খণ্ডকে বলে অগ্র পিট্যুইটারি, আর নীচের খণ্ডকে বলে পশ্চাৎ পিট্যুইটারি। পিট্যুইটারির এই দুটি খণ্ড থেকে নানারকম হরমোন ক্ষরণ হয়। যেমন সোমাটোট্রফিক হরমোন, থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন, গোনাডোট্রফিক হরমোন, ভ্যাসোপ্রেসিন ইত্যাদি। এরকম একটা ছোটো গ্রন্থি গোটা শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি
যেখানে যেখানে থাকে
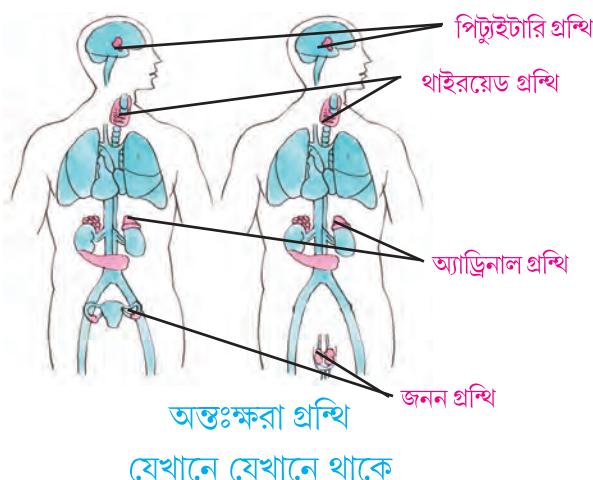
● **সোমাটোট্রফিক হরমোন:** এই হরমোনকে বৃদ্ধিপোষক হরমোনও বলে। আমাদের শরীরের বিভিন্ন পেশি ও হাড়গুলির দৈর্ঘ্য বাড়ায়। প্রোটিনের উৎপাদন বাড়ায় আর প্রোটিনের ক্ষয় কমায়।

অল্পবয়সে এই হরমোনের বেশি ক্ষরণ হলে বিপদ আছে। হাড় বেড়ে যায়। উচ্চতা 7-8 ফুট হয়ে যায়। আর কম ক্ষরণ হলেও বিপদ! পরিণত মানুষের উচ্চতা মাত্র তিন ফুটের মতো হয়। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে শিশুদের মতো দেখায়।

এছাড়া আরও কিছু হরমোন ক্ষরণ করে পিট্যুইটারি গ্রন্থি। যা কিনা অন্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলিকে উত্তেজিত করে।

● থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন: পিট্যুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপনা যোগায়। তবে এই হরমোন ক্ষরণ বেশি হলে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায়। ফলে গলা ফুলে ওঠে।
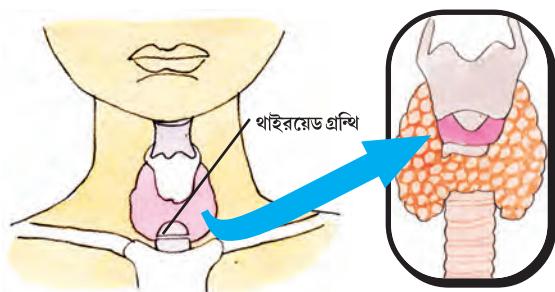
2. **থাইরয়েড গ্রন্থি:** আমাদের গলার সামনে স্বরযন্ত্র রয়েছে। তার ঠিক নীচে শ্বাসনালির দু-পাশে থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে। কারো কারো ক্ষেত্রে ঢোঁক গেলার সময় এটি ওঠানামা করে। এই গ্রন্থির দুটি খণ্ড। এই গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন নামক হরমোন ক্ষরিত হয়।

● **থাইরক্সিন:** এই হরমোন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হারকে বাড়াতে সাহায্য করে। এই হরমোন আমাদের শরীরে শক্তি উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। আমাদের শরীরের কোশগুলিতে অক্সিজেনের ব্যবহারকে বাড়িয়ে দেয়। দেহের হাড় ও পেশিকে বাড়াতে সাহায্য করে।

এই হরমোন বেশি ক্ষরণে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে ওঠে, কিছু ক্ষেত্রে মনে হয় যেন চোখ দুটো ঠেলে বাইরে চলে আসছে। রক্তচাপের তারতম্য হয়।
আবার কম ক্ষরণ হলে শিশুর বাড় কমে যায়, পেট ফোলা হয়, পেশি দুর্বল হয়। জিভ বেরিয়ে থাকে। মুখ থেকে লালা গড়ায়। বড়োদের শরীরে এই হরমোনের কম ক্ষরণে শরীরের চামড়া ফোলা ফোলা ও খসখসে হয়।

3. **অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি:** পাকস্থলীর নীচে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামের 'U' আকৃতির বাঁক থেকে প্লীহা পর্যন্ত রয়েছে অগ্ন্যাশয়। আমরা আগেই জেনেছি অগ্ন্যাশয় হলো মিশ্র গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয় ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নামক হরমোন।
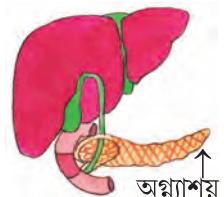
● **ইনসুলিন:** অগ্ন্যাশয় গ্রন্থি ক্ষরিত এই হরমোন রক্তের সাহায্যে গ্লুকোজকে কোশে ঢুকতে সাহায্য করে। গ্লুকোজের ভাঙন ঘটিয়ে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। আবার গ্লুকোজকে যকৃৎ ও পেশিতে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চয় করে রাখতে সাহায্য করে। আবার কখনো -কখনো প্রোটিন, ফ্যাট থেকে গ্লুকোজ উৎপাদনে বাধা দেয়। ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক থাকে, ডায়াবেটিস রোগের সম্ভাবনা কমে। তাই একে অ্যান্টিডায়াবেটিক হরমোন বলা হয়।

এই হরমোনের কম ক্ষরণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে মূত্রের সঙ্গে গ্লুকোজ দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। কোশে প্রয়োজনীয় গ্লুকোজ ঢুকতে পারে না। বারেবারে খিদে পায়। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। রক্তে চিনির পরিমাণ বেড়ে থাকার জন্য রোগজীবাণুর সংক্রমণ বাড়ে। হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক ও চোখের কার্যক্ষমতা কমে যায়।

4. **অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি:** আমাদের প্রতিটি বৃক্ক বা কিডনির উপর ত্রিভুজের মতো একজোড়া গ্রন্থি আছে। বামদিকের গ্রন্থিটি আকারে বড়ো। ডানদিকেরটা ছোটো। বৃক্কের ওপরে টুপির মতো বসানো। এই গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন হরমোন দেহের নানা জরুরি অবস্থায় ক্ষরিত হয়। জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য দেহকে প্রস্তুত করে। তাই এই হরমোনকে আপৎকালীন হরমোন বলে।
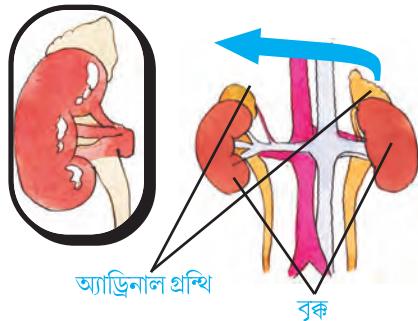
● **অ্যাড্রিনালিন হরমোন:** অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রিনালিন হরমোন ক্ষরিত হয়। এই হরমোন আমাদের শরীরে শ্বাসকার্যের হারকে বাড়ায়। আমাদের শরীরের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ ক্ষমতা বাড়ায়। মূত্র উৎপাদনকেও নিয়ন্ত্রণ করে। বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থা অর্থাৎ ভয়, দ্বন্দ্ব ও পালানোর মনোবৃত্তিকে অ্যাড্রিনালিন হরমোন জরুরি ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ করে।

তবে এই হরমোনের অধিক ক্ষরণে মুখমণ্ডল গোলাকার হয় ও ফুলে যায়। এজন্য এই ধরনের মুখকে বলে মুন ফেস। মুখের ত্বক খসখসে আর ফ্যাকাশে হয়। মহিলাদের মুখমণ্ডলে লোমের আধিক্য দেখা যায়। ক্ষত সারতেও সময় লাগে। কম ক্ষরণে হজমের গণ্ডগোল, পেশির দুর্বলতা ইত্যাদি উপসর্গ তৈরি হয়।

দৌড়োনোর সময় আমাদের শরীরে কী কী পরিবর্তন ঘটে তা দলে মিলে আলোচনা করে লেখো ।

চোখ/মুখ	শরীরের ত্বক	মাংসপেশি	হৃৎপিণ্ড

অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন হলো জরুরিকালীন হরমোন বা সংকটকালীন হরমোন। দৌড়োনোর সময় খুব শক্তি দরকার হয়। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত অ্যাড্রিনালিন সেই বাড়তি শক্তি জোগাতে সাহায্য করে।

5. জনন গ্রন্থি: ছেলে এবং মেয়েদের শরীরে ভিন্ন ধরনের জনন গ্রন্থি থাকে। মেয়েদের শরীরে এই জনন গ্রন্থির নাম হলো ডিম্বাশয়। আর এখান থেকেই ক্ষরিত হয় ইস্ট্রোজেন, প্রজেস্টেরন। আর ছেলেদের শরীরে এই জনন গ্রন্থির নাম হলো শুক্রাশয়। এখান থেকে ক্ষরিত হয় টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন। ইস্ট্রোজেন ও টেস্টোস্টেরন ছেলে ও মেয়েদের দেহে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর সক্রিয় হয়। ফলে জননতন্ত্রে ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গের গঠনে নানা পরিবর্তন চোখে পড়ে।
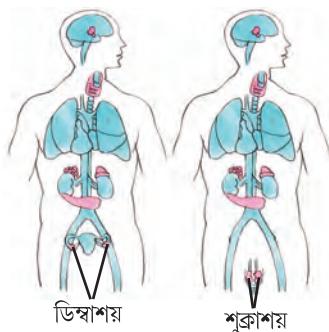
- **টেস্টোস্টেরন**: এই হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের গোঁফ, দাড়ি বের হয়। ধীরে ধীরে হাড় ও পেশি শক্তিশালী হয়। পেশিবহুল চেহারা তৈরি হয়। গলার স্বরে ভাঙন ঘটে। গলার স্বর ভারী হয়।

- **ইস্ট্রোজেন**: স্ত্রীদেহে ক্ষরিত হয়। হাড় ও পেশির বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেহের সম্পূর্ণ বৃদ্ধি ঘটায়। ত্বকের নীচে ফ্যাটজাতীয় পদার্থের সঞ্চয় ঘটিয়ে শরীরে বদল আনে। পুরুষের শরীরেও ইস্ট্রোজেন পাওয়া যায়। তবে স্ত্রীদেহের চেয়ে কম পরিমাণে। স্ত্রীদেহেও টেস্টোস্টেরন পাওয়া যায়। তবে পুরুষের চেয়ে কম পরিমাণে।

প্রথম পাতার গল্পগুলি আবার ভালো করে পড়ো। তারপর নীচের তালিকাটি পূরণ করো—

গল্প নম্বর	যে হরমোনের কম/ বেশি ক্ষরণের ফলে ঘটনাটি ঘটে

নীচের উপসর্গগুলি কোন কোন হরমোনের কারণে ঘটে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে লেখো—

উপসর্গ	দায়ী হরমোনের নাম
গ্রন্থি ফুলে ওঠে, চোখ দুটো যেন ঠেলে বাইরে চলে আসে। দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।	
দেহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। হাড় বেড়ে যায়।	
রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। মূত্রের সঙ্গে গ্লুকোজ বেরোয়। বারেবারে খিদে পায়। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে।	
মুখমণ্ডল ফুলে গোলাকার হয়ে যায়। মুখের ত্বক খসখসে আর ফ্যাকাশে হয়। ক্ষত সারতেও সময় লাগে।	

বয়ঃসন্ধি

ফটিকের কথা -১

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছাইয়া প্রথমত মামির সঙ্গে আলাপ হইল। মামি এই অনাবশ্যক পরিবার বৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। বিশ্বম্ভরের এত বয়েস হইল, তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্ধাস্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সেজন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে, তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।

অতএব, এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোনো অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মতো বিঁধে। এই বয়সে সাধারণত নারীজাতিকে কোনো এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের একটি অংশ। গল্পে ফটিকের বয়স ছিল তেরো-চোদ্দ বছর । অর্থাৎ তোমাদেরই মতো। তারপর ছোটোবেলা থেকে বড়ো হবার পথে ফটিকের মতো তোমাদের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা দলে মিলে আলোচনা করে লেখো।

শরীরের পরিবর্তন	মনের পরিবর্তন

ফটিকের কথা -২

স্কুলে এতবড়ো নির্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাস্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারাক্রান্ত গর্দভের মতো নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত, তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলোর ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোনো একটা ছাদে দুটি-একটি ছেলেমেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত, তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মামা, মার কাছে যাব। মামা বলিয়াছিলেন, স্কুলের ছুটি হোক। কার্তিক মাসে পূজার ছুটি, সে এখনও ঢের দেরি।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একে তো সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাস্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোনো অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্বক বেশি করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামির কাছে নিতান্ত অপরাধীর মতো গিয়া কহিল, বই হারিয়ে ফেলেছি।

মামি অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, বেশ করেছ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে বই কিনে দিতে পারিনে।

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে, এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল; নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

দেখছো তো ওই ‘ছুটি’ গল্পেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ফটিক যা কিছু করুক না কেন সে মনে করত, সব ভুল করছে। নিজেকে ভীষণ হীন মনে করত। আচ্ছা, তোমাদের স্কুলে যদি ফটিকের মতো কোনো বন্ধুকে পেতে তাহলে তোমরা তাকে কীভাবে সাহায্য করতে?

ফটিকের যেমন খেলতে ভালো লাগত, ঘরের নানারকম কাজ করতে ভালো লাগত, সেরকম তোমাদেরও তো নানারকম কাজ করতে ভালো লাগে। তোমার কী কী কাজ করতে ভালো লাগে?

তোমার কোনো কাজের প্রশংসা পেলে কেমন লাগে?

কাজ করার পর কেউ নিন্দা করলে কী মনে হয়?

তোমার ছোটোবেলাতেও কী এরকম মনে হতো?

তোমার ছোটোবেলা থেকে এখন পর্যন্ত তোমার মধ্যে কী কী পরিবর্তন লক্ষ করেছ?

শরীরের দ্রুত পরিবর্তন

শৈশব থেকে যৌবনের সময়কালকে বলে কৈশোর। কৈশোরকে বয়ঃসন্ধিও বলে। WHO (World Health Organization) বয়ঃসন্ধিকাল হিসাবে 10 থেকে 19 বছর পর্যন্ত বয়সকে নির্ধারিত করেছে। এই সময় শরীর ও মনের দ্রুত পরিবর্তন হয়। তুমি নিশ্চয়ই সেটা লক্ষ করেছ তোমার মধ্যে। আমাদের শরীরে বেশ কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন আমাদের উচ্চতা, ওজন, এমনকি শরীরের গঠনেরও পরিবর্তন ঘটে। মানুষের মধ্যেই এই পরিবর্তন ঘটে। তবে বিশেষ কিছু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি এবং হরমোন এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটি করো।

1. কোন কোন হরমোন বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে শরীরে দ্রুত পরিবর্তনে সাহায্য করে?
2. কোন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে এই হরমোনগুলো ক্ষরিত হয়?

বয়ঃসন্ধিতে মনের পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধি পর্বে ছেলেমেয়েদের শরীরে যেমন নানা পরিবর্তন দেখা যায়, তেমনই মনে এবং পারস্পরিক সম্পর্কেও পরিবর্তন দেখা যায়। শরীরের পরিবর্তন চোখে দেখা যায়। কিন্তু মনের?

রাজু আর শুভ দুজনেই ভালো বন্ধু। রাজুর বাবা অন্য জায়গায় বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তাই রাজুকেও যেতে হয়েছিল। অনেকদিন পর সেই রাজুর সঙ্গে দেখা। শুভ দেখল রাজু আগের মতো নেই। শুভ জিজ্ঞাসা করল— স্কুল কেমন চলছে। রাজু বলল- স্কুলের নাটকের দলে একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল পেয়েছিলাম। মনে হয় আমি রোগা আর গলার স্বর ভেঙে গেছে বলে দু-দিন আগে আমাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে।

শুভ নিজের অবস্থার কথাটা একবার ভাবল। ওর উচ্চতা নিয়ে দুশ্চিন্তাটা আবার ঘুরে ফিরে এল। শুভ জানে ওর ক্লাসে ওর চেয়ে সবাই বেশ লম্বা আর রোগা, তাহলে ও কি স্বাভাবিক? ওর কি ওজন বাড়ছে?

টুম্পা আর রুমা খুব ভালো বন্ধু। অনেকদিন পর দেখা। টুম্পাকে বেশ মনমরা দেখাচ্ছিল। রুমা জিজ্ঞাসা করল- কীরে, ভালো আছিস তো? টুম্পা বলল- নারে, মনটা ভালো নেই। মুখে খুব ব্রণ বেরিয়েছে। কি বিচ্ছিরি লাগছে না আর সবার থেকে?

রুমা বলল— টুম্পা একদম মন খারাপ করিস না। আমাদের বয়সে ব্রণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। একটা বয়সের পর থেকে আমাদের মুখমণ্ডলের ত্বকের লোমকূপগুলোতে বেশি পরিমাণ সিবাম জমে গেলে ব্রণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই সময় আমরা যদি শরীরের ঠিকঠাক যত্ন নিই তাহলে ব্রণ হলেও তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে। তাই, তুই মন খারাপ করিস না। আমরা সবাই তো আর একরকম নই। আমরা প্রত্যেকেই স্বাভাবিক ও সুন্দর।

একটা খরগোশের গল্প

এক খরগোশের একটা কান ঝোলা ছিল। তাই দেখে অন্য খরগোশেরা ওকে রাগাত। এতে সে রেগে গিয়ে কান খাড়া করার জন্য নানা কসরত করতে লাগল। পিছনের পা গাছের ডালে আটকে ঝুলতে লাগল। যাতে তার ঝোলা কান সোজা হয়ে যায়। এমন সময় একটা বিড়াল গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল। খরগোশের ওই অবস্থা দেখে ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করল। বিড়াল বলল - তাতে কী হয়েছে? তোমার কান ছোটো বলে তুমি অন্য খরগোশদের থেকে ছোটো হয়ে গেছ? ওরা যদি খাড়া কান নিয়ে স্বাভাবিক হয়, তুমি ঝোলা কান নিয়ে স্বাভাবিক। তোমার তো তাতে কোনো অসুবিধা নেই। খরগোশ নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে দৌড়ে গিয়ে অন্য খরগোশদের একথা বলল। অন্যরাও তখন ওকে নিয়ে হাসিঠাট্টা বন্ধ করল।

আগের পাতার গল্পদুটো ভালো করে পড়ো। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটা করো—

1. কোন কোন গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত কোন কোন হরমোন রাজু, শুভ ও টুম্পার এই অবস্থার জন্য দায়ী?
2. রাজু আর শুভ তাদের অবস্থার উন্নতি কীভাবে ঘটাতে পারবে বলে মনে করো?
3. টুম্পা তার অবস্থার উন্নতির জন্য কী করতে পারে?
4. তোমরা বন্ধুদের কোন গুণটাকে বড়ো করে দেখতে চাও? বন্ধুত্বে চেহারার গড়নের কি কোনো গুরুত্ব আছে?

বয়ঃসন্ধিতে আচরণের সমস্যা

রতন রোজ স্কুলে যাওয়ার নাম করে বেরোয়। কিন্তু স্কুলে আসে না, প্রায় দিনই কামাই। যদিও বা কোনোদিন আসে, সেদিন তো মহা বিপত্তি। বন্ধুদের সঙ্গে মারপিট, বন্ধুদের বই লুকিয়ে ফেলা, মুখে মুখে তর্ক করা এসব অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কারণে অকারণে মিথ্যা বলাটাও কোনো ব্যাপার নয়। বাড়িতেও এক অবস্থা, বাবা- মার সঙ্গে তর্ক করে। রেগে গিয়ে একবার একটা কাচের গ্লাস ভেঙে দিয়েছিল।

মহুয়া যখনই হাত ধুতে যায় বারবার করে হাত ধোয়। ওর মনে হয় হাতটা বোধহয় ঠিকমতো পরিষ্কার হলো না। তাই সে আবার ধোয়। অঙ্ক ক্লাসে তো লাইন টানতে গিয়ে বারবার করে মুছতে থাকে। আর দেখে লাইনটা সোজা হলো কিনা। একদিন তো ঘরে তালা লাগাতে গিয়ে ঘেমে অস্থির। বারেবারে তালায় চাবি লাগিয়ে আবার খুলে ফেলছে। ভাবছে বোধহয় তালাটা লাগেনি।

সুমন পড়াশোনায় ভালোই। বেশ শান্ত প্রকৃতির ছেলে। কম কথা বলে। পাড়াতে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে খুব একটা মিশত না। একা একা থাকতে বেশি ভালোবাসত। ইদানীং দেখা যাচ্ছে ও নিজের মনে কীসব যেন বিড়বিড় করে বকছে। একদিন তো ওর ক্লাসের এক সহপাঠীকে দুম করে মেরেই বসল ও। ভেবেছিল বন্ধুটি নাকি ওর ক্ষতি করবে। ও ভাবল ঠিকই করেছে মারপিট করে। ক্লাসের বন্ধুদের সন্দেহ করতে শুরু করল। খালি নিজের মনে বিড়বিড় করে। মনে হয় যেন কারোর সঙ্গে কথা বলছে। চুল উসকোখুসকো, স্নান-খাওয়াটাও ঠিকমতো করত না। শেষে স্কুলে আসাও বন্ধ করে দিল।

কারোর কারোর আচরণ অন্যদের চোখে সমস্যা হিসাবে ধরা পড়ে। কিছু আচরণ অন্যের ক্ষতিও ডেকে আনে। কিন্তু তার জন্যে তাদের মনে অনুতাপ হয় না। নিজেও কোনো কষ্ট অনুভব করে না। ক্ষতিকর পরিণতির কথা জানা থাকলেও একই আচরণ বারবার করতে থাকে।

এবিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো। তারপর দলে মিলে নীচের কাজটা করো।
তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে কী কী ধরনের আচরণের সমস্যা দেখা যায়?

1. একটুতেই রেগে যাওয়া
2. অকারণে কেঁদে ফেলা
3.
4.
5.
6.
7.

তোমার মতে, এই ধরনের সমস্যা থাকলে কী করা দরকার ?

ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ

আলি ফুটবল খেলার ফাইনালের আগে প্রচুর বাজি কিনেছে। তার মধ্যে শব্দবাজিও আছে। যদিও এগুলো ও লুকিয়ে কিনেছে। দল জিতে যাওয়ায় বাজিগুলো পকেটে পুরে খুব নাচছিল আলি। মাঝে মধ্যে একটা দুটো বের করে ফাটাচ্ছিল। কিছু বাজি ফাটছিল না। সেগুলো তুলে আবার ফাটাচ্ছিল। হয়তো ওই পোড়া বাজিগুলোর কোনোটাতে আগুন ছিল। একটা বাজি হাতের মধ্যেই গেল ফেটে। আলির ডান হাতটা বেশ খানিকটা পুড়ে গিয়েছিল।

একদিন বিকেলে খেলার সময় পাড়ার মন্টুদা এসে বলল -যা তো বাবলু এক বান্ডিল বিড়ি নিয়ে আয়। খেলা ছেড়ে বাবলু বিড়ি আনতে ছুটল, পাছে মন্টুদা রাগ করে। একদিন মন্টুদা ওকে একটা বিড়ি খেতে বলল। তারপর থেকে বাবলু আর বিড়ি ছাড়তে পারেনি। এখন বাবলু রাতে ঘুমোতে পারে না। খুব শ্বাসকষ্ট হয় ওর। ডাক্তার বলেছেন বাবলুর ফুসফুস অকেজো হয়ে গেছে।

1. ওপরের দুটো গল্প পড়ে তোমাদের কেমন লাগল?
2. আলির ডান হাতটা পুড়ে গিয়েছিল। এর জন্য দায়ী কে?
3. আলির কী করা উচিত ছিল?
4. বাবলুর এহেন অবস্থার জন্য দায়ী কে?
5. বাবলুর কী করা উচিত ছিল?

‘না’ বলা

স্কুলে বাৎসরিক অনুষ্ঠানের দিন। খাওয়াদাওয়া শেষ করে সাবিনা, মিতা আর রতন বাড়ি ফিরছিল। মিতার আর রতনের বাড়ি আগে পড়ে। সাবিনাকে বেশ খানিকটা পথ হেঁটে আসতে হচ্ছিল। এমন সময় ভজাদার সঙ্গে দেখা। ওদের বাড়ির পাশেই থাকে। ভজাদা বলল সাবিনা, শহরে কাজ করবি? তোদের পরিবারের যা অবস্থা। শহরে বড়ো ডাক্তারের বাড়ি। পরিবারটা খুব ভালো। অনেক টাকা দেবে। সাবিনা বলল— দেখো ভজাদা, এখন আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। একটু পড়াশোনা করতে চাই। তাছাড়া মা অসুস্থ। মা চায় আমি পড়াশোনা করি। তাছাড়া আমি চলে গেলে কে আর ওদের কথা ভাববে বলোতো? তাই এখন নয়। একটু না হয় কষ্ট করেই চালিয়ে নেব।

অনেকসময় অনিচ্ছা ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও অনেক অনুরোধ বা আদেশ মেনে নিতে হয়। বন্ধু বা কাউকে ‘না’ বললে সম্পর্ক নষ্ট হবার ভয় থাকে। কিংবা পরে বন্ধুর বা কারোর থেকে সাহায্য না পাবার আশঙ্কাও থাকে। তবে এটা জানবে ঠিকমতো ‘না’ বলতে পারলে নানারকম বিপদ থেকেও নিজেকে রক্ষা করা যায়।

ওপরের গল্পটি পড়ো। তারপর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটি করো।

1. সাবিনা যদি ‘হ্যাঁ’ বলতো তাহলে কী হতো বলে মনে করো?
2. সাবিনা ভজাদাকে যেভাবে বলল তাতে কি ওর প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেল বলে মনে করো?
3. তুমি তোমার জীবনে কখনও ‘না’ বলে ভালো করেছ বলে মনে করো?
4. কখন ‘না’ বলা দরকার বলে মনে করো?

আবেগ নিয়ন্ত্রণ

বাংলা ভাষায় আবেগ ও অনুভূতি শব্দ দুটি প্রায় একইভাবে ব্যবহার করা হয়। ইংরাজিতে আবেগ হলো Emotion আর Feeling হলো অনুভূতি।

ভালো গান শুনলে আনন্দ হয়। নিজের নিন্দা শুনলে রাগ হয়, দুঃখ হয়। কারোর দুঃসংবাদে চোখে জল আসে। এসবই স্বাভাবিক। কিন্তু বেশি রাগ, দুঃখ কিংবা আনন্দের অনিয়ন্ত্রিত বহিঃপ্রকাশে শরীরের ও মনের ক্ষতি হতে পারে। আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রেখে চলা খুবই জরুরি। অনুভূতিগুলোকে বুঝে নিয়ে আবেগের যথার্থ প্রকাশের জন্য দরকার জীবনকুশলতা চর্চা।

যেমন রাগ হলো একধারে আবেগ আবার অনুভূতিও। আমরা যখন রেগে যাই তখন আমাদের শরীরে বিশেষ বিশেষ জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে শরীরে তার ছাপ পড়ে।
আবার এই সময় আমাদের আচরণেরও পরিবর্তন ঘটে।

আচ্ছা বলো তো আমরা কি আমাদের আবেগ অনুভূতিগুলো চিনি? তাহলে আমরা রেগে যাই কেন? আবার অনেক সময় আবেগ অনুভূতিগুলো মনের ভিতর চেপে রাখি। প্রেসার কুকারে রান্নার সময় কুকারের মধ্যে বাষ্পের চাপ বাড়লে জোরে হুইসল বাজে আর সেই বাষ্প বেরিয়ে যায়। আমরা যদি সব অনুভূতিগুলোকে মনের ভেতর জমিয়ে রাখি, তাহলে তো ঘোর বিপদ। তাই না?
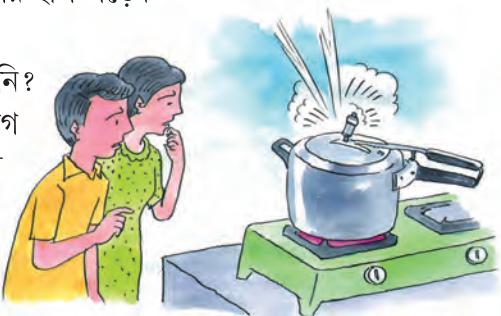
তাই আমাদের আবেগ অনুভূতিগুলোকে চেনা খুব জরুরি। প্রকাশ করতে শেখাও জরুরি। না হলে আমাদের অবস্থা হবে ঠিক প্রেসার কুকারের মতো।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাদের আবেগ/ অনুভূতির তালিকা তৈরি করো। তারপর সেগুলোকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে সে বিষয়ে দু-চার কথা লেখো :

আবেগ/ অনুভূতি			
1. রাগ	4. হতাশা	7. তৃপ্তি	10.
2. ভয়	5. ক্ষোভ	8. অভিমান	11.
3. কান্না	6. আনন্দ	9. দুঃখ	12.

অন্ধকারে একা থাকলে রমার বুক ধড়ফড় করে। হাত পায়ের পাতা ঘেমে যায়। হাত পা কাঁপে। পেশিতে টান ধরে, মাথা ব্যথা করে, পিঠে যন্ত্রণা হয়। গা গুলিয়ে ওঠে ।

গল্পটা পড়ো। বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটা করো।

1. এখানে রমার কোন কোন অনুভূতির প্রকাশ পেয়েছে?
2. এরকম পরিস্থিতিতে কী করা দরকার বলে মনে করো ?
3. গত একমাসে বিভিন্ন ঘটনায় তোমার কী কী অনুভূতি হয়েছিল তা লেখো।
4. তার মধ্যে কোন কোন অনুভূতিগুলো তুমি সহজে চিনতে পেরেছ বলে মনে করো?
5. তোমার কাছে কোন অনুভূতিগুলো বেশ কষ্টকর ?
6. তুমি অঙ্গভঙ্গি করে কোন কোন অনুভূতির প্রকাশ করতে পারো?

শারীরিক সমস্যা	অনুভূতি
1. বুক ধড়ফড়	ভয়
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

আত্ম-উপলব্ধি

নীচের লেখাটা মন দিয়ে পড়ো। তোমার কাছে কোন লাইনটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তার তলায় দাগ দাও।

আমি একজন ভালো মানুষ হবার জন্যই জন্ম নিয়েছি। আমি সবার থেকে আলাদা। আমি নিজেকে খুব ভালোবাসি। আমি তোমাদের সবাইকেও ভালোবাসি। আমার মধ্যে দক্ষতা আছে। বিশেষ গুণও আছে জীবনে কিছু করার। অন্যদের মতো আমিও জীবনে দারুণ কিছু করে উঠতে পারি।

আত্মসচেতনতার জন্য নীচের কাজটি করো। তবে কাজটি করার সময় নিজের প্রতি অবশ্যই যত্নবান হবে।

1. আমি আমার বাবা-মায়ের ভালো সন্তান কারণ______
2. আমি একজন ভালো বন্ধু কারণ___________
3. আমি আমার ক্লাসে একজন ভালো ছাত্র/ছাত্রী কারণ___________
4. আমার বিশেষ গুণ হলো_______________
5. আমার যে গুণটা সবাই পছন্দ করে সেটি হলো__________
6. যে গুণটা আমার পছন্দ সেটি হলো ______________

বয়ঃসন্ধি ও জীবনকুশলতা শিক্ষা

শৈশব থেকে শুরু করে শেষ বয়স পর্যন্ত মানুষের বিকাশপর্বে বয়ঃসন্ধিকাল এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই পর্বের বিশেষত্বই হলো শরীর ও মনের দ্রুত পরিবর্তনশীলতা। দ্রুত বদলে যাওয়া পরিবেশের সঙ্গে তৈরি বয়ঃসন্ধিকালের টানাপোড়েনের মুখোমুখি হতে হয় সকলকেই। কোনো কোনো সময় আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। তাই নিজের এবং বাইরের পরিবেশের নানা অনিশ্চয়তার ও চাপের মুখোমুখি হবার কুশলতা অর্জন করতে হবে নিজেকেই। তাই নিজেকে চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে যথার্থ ভালো মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য দরকার জীবনকুশলতা শিক্ষা। জীবনকুশলতা অনেকরকমের হয়। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পরিকল্পিত দশটি কেন্দ্রীয় (Generic) জীবনকুশলতা (Life skills) শিক্ষার নিয়মিত চর্চা জীবনের নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার সাহস জোগায়। জীবনকুশলতা চর্চার বিভিন্ন দিকগুলি হলো —

> জীবনকুশলতা হলো এক বিশেষ আচরণ যা প্রতিটি মানুষকে তার নানা চাহিদা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে মোকাবিলা করার সাহস যোগায়।

1. আত্মসচেতনতা — নিজের ভালোলাগা, খারাপলাগা থেকে শুরু করে, আবেগ অনুভূতিগুলিকে চিনে তার নিয়ন্ত্রণে পারদর্শী হয়ে ওঠা।

2. বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা — জীবনের নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে চিন্তাভাবনা করে সমস্যার মোকাবিলা করা।

3. সিদ্ধান্ত নেওয়া — এলোমেলো চিন্তাগুলোকে সুবিন্যস্ত করে ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো।

4. সমস্যা দূর করা — সমস্যাটাকে চেনা। তার সমাধানের নানা উপায়গুলোকে বিচার করা। তারপর কার্যকরী সমাধান বেছে নিয়ে প্রয়োগ করা।

5. সৃজনশীল চিন্তা — গান, নাচ, সাঁতার, ছবি আঁকা, খেলাধূলা সহ নানা সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করা।

6. পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন — অন্যের কথা ধৈর্য ধরে শোনার অভ্যাস তৈরি করা। কী বলব যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কীভাবে বলব সেটাও অনুশীলন করা।

7. পারস্পরিক সম্পর্ক — পরিবারের, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও অন্যান্য মানুষজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করা।

8. সমানুভূতি — অন্যের সমস্যার সঙ্গে নিজেকে শামিল করে তার অনুভূতিগুলোকে বোঝা ও প্রকাশ করা।

9. মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ — মনের ওপর তৈরি হওয়া চাপগুলোকে চিনে কীভাবে সেগুলোকে কমানো যায় তার অনুশীলন করা।

10. আবেগ নিয়ন্ত্রণ — নিজের বিভিন্ন অনুভূতিগুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং যথাযথভাবে তা প্রকাশ করা ।

বন

নীচের কোন শব্দটি উদ্ভিদসমষ্টিকে বোঝায়?

- সমুদ্র
- পাহাড়
- বন

বন হলো অনেকটা অঞ্চল জুড়ে জন্মানো উদ্ভিদসমষ্টি। পৃথিবীর স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশই বনে ঢাকা। ভারতের স্থলভাগের 21 শতাংশ স্থান হলো বন। কিন্তু পৃথিবীর বনভূমির পরিমাণ উদ্‌বেগজনক হারে কমতে শুরু করেছে। বন বাঁচানোর সচেতনতা বাড়ানোর জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 2011 সালকে 'আন্তর্জাতিক বনবর্ষ' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

এবার বন বিষয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো। প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

বন থেকে মানুষ কী কী উপকার পায়	কীভাবে বন ওই ভূমিকা পালন করে	আবহাওয়ার কোন কোন ভৌত উপাদানের ওপর বনের গঠন নির্ভর করে
1. আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ		• সূর্যালোক
2. পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ও জলচক্র নিয়ন্ত্রণ		• তাপমাত্রা
3. বন্য জীবজন্তুর আশ্রয়স্থল		• বায়ুপ্রবাহ
4. মাটির ক্ষয় ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ		• বৃষ্টিপাত
5. আসবাবপত্র, বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ উৎপাদন		• বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ
6. মাটির নীচের জলের স্তর নিয়ন্ত্রণ		
7. জ্বালানির উৎস		
8. বিভিন্ন মারণরোগের ওষুধের উৎস		
9.		

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বনের বিভিন্ন গাছ থেকে ব্যবহৃত 5000 -এর বেশি জিনিস পাওয়া যায়। কোনো

বৃক্ষজাতীয় গাছ যদি প্রায় 50 বছর বেঁচে থাকে তবে সে তার জীবদ্দশায় 2700 কেজি অক্সিজেন বাতাসে ছাড়ে।

তুমি বিদ্যালয়ে, বাড়িতে বা খেলার মাঠে বা যাতায়াতের পথে যেসব জিনিস ব্যবহার করো বা করতে দেখো তার একটা তালিকা দেওয়া হলো। এদের নিয়ে নীচের সারণিটি পূরণ করো:

ব্যবহৃত জিনিসের নাম	ওই জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত বনের উপাদানের নাম	উৎস
1. পেনসিল		
2. খেলার ব্যাট		
3. ওষুধ		
4. পোশাক		
5. যানবাহন		
6. মাদুর		
7. ছাউনি		
8. জ্বালানি		

আবহাওয়ার বিভিন্ন শর্তের পার্থক্যভেদে নানা জায়গায় নানা ধরনের বনের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই ধরনের বনে কী কী উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে বা থাকতে পারে তার নাম নীচের খোপে লেখো।

- সুচের মতো পাতাযুক্ত গাছের বন (পাইন, ওক, কালো ভালুক, চিতাবাঘ ....)
- পাতা ঝরা গাছের বন (সেগুন, অর্জুন, আমলকী, বাঘ, হাতি, বাইসন..................)
- চিরসবুজ গাছের বন (জাম, বট, আম, বাঘ, হরিণ, ময়ূর................................)
- কাঁটাওয়ালা ঝোপঝাড় (বাবুল, ক্যাকটাস, কৃষ্ণসার হরিণ, চিংকারা, শেয়াল.................)
- ঘাসের বন (ঘাস, হোগলা, শন, পুরুন্ডি, গন্ডার , হরিণ, জেব্রা...........................)
- শ্বাসমূলযুক্ত গাছের বাদাবন (গরান, গেঁওয়া, বাইন, বাঘ, খাঁড়ির কুমির, ভোঁদড়.....)

বনে যে সব প্রাণী বা উদ্ভিদ থাকে তাদের কয়েকটি ছবি ও নামের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো।
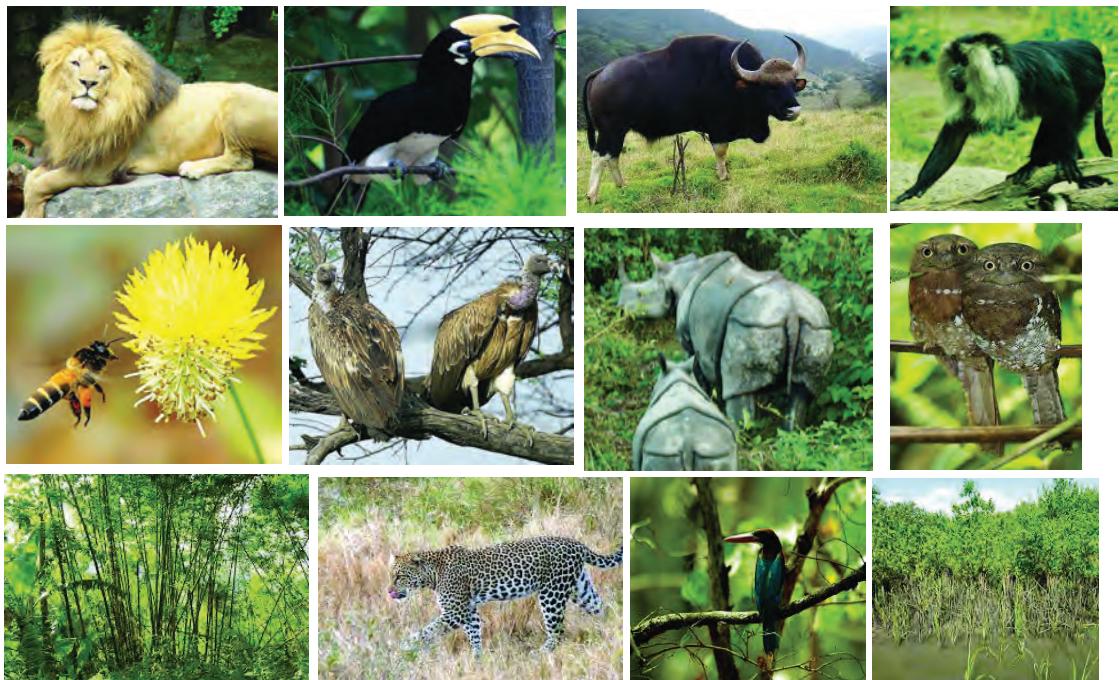
গিরগিটি	শিরীষ	সাপ	আম	হনুমান	হরিণ
শেয়াল	কুসুম	পেঁচা	জাম	হাতি	মাছ
ময়ূর	মেহগনি	ভালুক	বট	বাঁশ	কাঁকড়া
ঈগল	ওক	কাঠবিড়ালি	আমলকী	চালতা	কচ্ছপ
পোকা	দেবদারু	চিতাবাঘ	গরান	গন্ডার	বাঘ
কেঁচো	পাইন	কাঠঠোকরা	ঘাস	পিঁপড়ে	বেজি
বাদুড়	মৌমাছি	উইপোকা	প্যাংগোলিন	সিংহ	ভোঁদড়

ওপরের জীবদের তালিকা থেকে ন্যূনতম তিনটি জীব নিয়ে একটি করে খাদ্যশৃঙ্খল তৈরি করো। খাদ্যশৃঙ্খলে কারা উৎপাদক, তৃণভোজী বা মাংসাশী তা উল্লেখ করো।

একটা আদর্শ বনের গঠন কেমন হতে পারে?

বড়ো বৃক্ষ জাতীয় গাছের বনে গেলে দেখা যায় যেসব ধরনের গাছের বৃদ্ধি একরকম নয় বা সব গাছের দৈর্ঘ্য সমান নয়। ফলে বনে নানা স্তরের সৃষ্টি হয় —

i) একদম ওপরের স্তরকে বলা হয় ছাদ (canopy)। গাছের মাথারা এক হয়ে এই স্তর গঠন করে। গাছের চূড়াগুলো এক হয়ে যে ছাদ গঠন করে তা সূর্যের আলোকে বনের গভীরে ঢুকতে বাধা দেয়। বর্ষাবনে এটি সাধারণত 30 মিটার-এর বেশি উচ্চতায় তৈরি হয়। কখনো-কখনো 90 মিটার উচ্চতায় পৌঁছোয়। এবার বলার চেষ্টা করো বনের এই স্তর কেন সবচেয়ে বেশি খাদ্য তৈরি করে।

ii) ছাদের নীচের স্তরে দেখা যায় এমন গাছ যারা ক্রমশ লম্বা হয়ে ক্যানোপি স্পর্শ করার চেষ্টা করে। তাই এই স্তরের গাছগুলো লম্বায় অপেক্ষাকৃত ছোটো হয়। এই স্তরে বাতাসের বেগ তুলনামূলকভাবে কম এবং আলো কম ; এখানে কম উচ্চতার বৃক্ষ, গুল্ম এবং নরম কাণ্ডের বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ বেশি দেখা যায়। বেশি বয়স্ক গাছ বা চারাগাছের গুল্ম আধিক্য চোখে পড়ে।

iii) তৃতীয় স্তরে নতুন জন্মানো গাছ, পরিণত গুল্ম এবং নানাধরনের ঝোপওয়ালা গাছ দেখা যায়। বনের ছোটো ছোটো প্রাণীদের খাদ্য, বাসস্থান ও আত্মরক্ষার জন্য এই স্তর ব্যবহৃত হয়।

iv) বনের মেঝের ঠিক ওপরে অল্প উচ্চতার যে ধরনের গাছ থাকে তারা মূলত বীরুৎজাতীয়, এখানে বীজ থেকে বেরোনো সদ্যোজাত গাছের চারা, ফার্ন, ঘাস এবং নানা আগাছা দেখা যায়। এরা বনের মেঝেকে ঢেকে রাখে। ইঁদুর, পোকামাকড়, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাং ও নানা পাখি এই স্তরে বাস করে। হরিণরা তাদের বাচ্চাদের আর শিকারি প্রাণীরা শিকার ধরার জন্য নিজেদের এই স্তরে লুকিয়ে রাখে। বনের এই স্তরে সবসময়ই কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে চলে।

প্রথম স্তর
দ্বিতীয় স্তর
তৃতীয় ও চতুর্থ স্তর
পঞ্চম স্তর

v) বনের গঠনের শেষস্তর হলো বনের মেঝে। এটি সাধারণত মরা পাতা, পড়ে থাকা ফুলের পাপড়ি, পচা ফল, গাছের ছোটো ডাল, পাখির পালক, প্রাণীর লোম ও মল, পচাগলা বা মরে যাওয়া জীব দেহের নানা পদার্থ দিয়ে তৈরি হয়। মাটির সাথে মিশে এই সব পদার্থ হিউমাস তৈরি করে। এই ধরনের পদার্থ থেকে বনের গাছের বৃদ্ধি সহায়ক নানা উপাদান খনিজ মৌল, অ্যামিনো অ্যাসিড বের হয়। কেঁচো, আরশোলা, কাঁকড়াবিছে, তেঁতুলবিছে, শামুকসহ নানা আণুবীক্ষণিক জীব এখানে বাস করে।

পৃথিবীতে কোথায় কেমন ধরনের বন দেখা যায়?

সারা পৃথিবীর সব জায়গায় বনের পরিমাণ কিন্তু সমান নয়। সারা পৃথিবীর স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশ বনে ঢাকা। এর 95% প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা। আর বাকি 5% মানুষের তৈরি। এর মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় বনের পরিমাণ প্রায় 23% আর ওশিয়ানিয়ায় মাত্র 5%। তোমরা শুনলে হয়তো অবাক হবে যে পৃথিবীর দশটা দেশে কোনো বন নেই। আর অন্যান্য 64টি দেশে বনের পরিমাণ সে দেশগুলোর স্থলভাগের দশ শতাংশেরও কম।

টুকরো কথা

তোমরা তো আমাজনের বর্ষাবনের কথা জেনেছ। লম্বা লম্বা গাছ, উষ্ণ আবহাওয়া আর প্রচুর বৃষ্টি এ ধরনের বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিরক্ষরেখা বরাবর (ওপরে ও নীচে 10^0-এর মধ্যে) এধরনের বন দেখা যায়। এই বনে গাছগুলো এত ঘন হয়ে জন্মায় যে বনের মাথায় আসা বৃষ্টির প্রথম ফোঁটা মাটিতে আসতে প্রায় 10 মিনিট সময় লাগে। এক হেক্টর এরকম বর্ষাবনে প্রায় 40-এর বেশি প্রজাতির গাছ থাকে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জানা 2,50,000 উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে প্রায় 1,70,000 প্রজাতির গাছ এই বর্ষাবনগুলিতে পাওয়া যায়। এই বর্ষাবনে আফ্রিকান হাতির মতো বড়ো স্তন্যপায়ী থেকে মাউস-লেমুরের মতো ছোটো স্তন্যপায়ীর দেখা মেলে। অ্যাকোয়ারিয়ামে যে রঙিন মাছদের তুমি দেখো তাদের অধিকাংশই দক্ষিণ আমেরিকা বা এশিয়ার বর্ষাবনের জলে জন্মায়। পেরুর বর্ষাবনের একটা গাছেই 50 টা প্রজাতির পিঁপড়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই বর্ষাবন থেকেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ অক্সিজেনের উৎপত্তি। বাতাসে যে জলীয় বাষ্প মুক্ত করে তাই আবার বৃষ্টি হয়ে ফিরে আসে। আবহাওয়া ঠিক রাখতে এর জুড়ি মেলা ভার। বর্ষাবন হলো স্পঞ্জের মতো। জলীয় বাষ্প শুষে নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়তে থাকে। ফলে নদীতে জলপ্রবাহ কখনই এমন হয় না যাতে বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর এই বর্ষাবনেই সন্ধান মেলে জীবন বাঁচানো নানা ওষুধের। তাপির, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওকাপি, ওরাংওটাং, সুমাত্রার গন্ডার বা বাঘের মতো বিলুপ্তপ্রায় জীবজন্তুরা এই বর্ষাবনেই বেঁচে আছে। কিন্তু একেই আমরা ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছি। প্রতি সেকেন্ডে প্রায় দেড় একর বর্ষাবন কাটা পড়ে। এরকম হারে বনধ্বংস চলতে থাকলে আগামী 100 বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে প্রায় সব বর্ষাবন হারিয়ে যাবে।

বনের আগুন ও পরিবেশের ক্ষতি

বনে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলে তা সাধারণত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অধিকাংশ সময় প্রথমে আগুন লাগলে তা মানুষের নজরে আসে না। নানা কারণে বনে আগুন লাগে—

1.অগ্ন্যুৎপাতের সময় বনের গাছের কোনো শুকনো গাছের জ্বলন্ত লাভার সংস্পর্শে আসা।

2. বজ্রপাত।

3. বায়ুপ্রবাহ তীব্র হলে পাশাপাশি দুলতে থাকা বাঁশগাছে ঘষা লাগা ।

4.গড়িয়ে পড়া পাথরের ধাক্কায় তৈরি হওয়া আগুনের শিখার সংস্পর্শে বনের মেঝেতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা এলে।

5. মানুষের নানাবিধ কাজ — বনের ভিতর ধূমপান, রান্না করা ইত্যাদি ।

বনে আগুন লাগলে কী কী ক্ষতি হয়

1. বন ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আগুন লেগে বন নষ্ট হলে বাতাসে CO_2-এর ঘনত্ব বাড়তে থাকে আর O_2-এর ঘনত্ব কমতে থাকে। ফলে পরিবেশের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে।

2 বনের মাটি আর গাছের পাতা বৃষ্টিপাতের প্রায় 50% শুষে নেয়। বনে আগুন লাগার পর মাটি ও গাছের পাতার সেই ক্ষমতা আর থাকে না। ফলে বন্যার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

3. বড়ো গাছগুলো পুড়ে যাওয়ার ফলে প্রবল বৃষ্টিপাতের সময় মাটির ক্ষয় বেড়ে যায়। দাবানলের পর প্রথম বৃষ্টিপাতের সময় জলে ছাই মিলে যাওয়ায় জলদূষণ হতে পাড়ে।

4. বনে আগুন লাগলে বহু প্রাণীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। আর বাকিরা আশ্রয় হারিয়ে ফেলে। কোন ধরনের প্রাণীদের ক্ষেত্রে এধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে?

টুকরো কথা

1910 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এক বিধ্বংসী দাবানলের ফলে প্রায় তিন মিলিয়ন একর বন নষ্ট হয়। দাবানলটি প্রায় দু-দিন স্থায়ী হয়েছিল। এই দাবানল নেভানোর কাজে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে 87 জন এই দাবানলে মারা যান। অতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতেও এরকম দাবানলের ঘটনায় প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। পৃথিবীজুড়ে ঘটে চলা এরকম বনধ্বংসের ঘটনাগুলি জানার চেষ্টা করো এবং পরিবেশের ওপর তার কী প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে নিজেরা আলোচনা করে একটি রিপোর্ট তৈরি করো।

বন কেটে ফেলা ও পরিবেশের ক্ষতি

মানুষ তার নানা প্রয়োজনে, (জমির অত্যধিক চাহিদা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি) কোনো জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বেড়ে ওঠা গাছপালার অপসারণ বা কেটেই চলেছে। সারা পৃথিবীতে প্রতি সেকেন্ডে মানুষ প্রায় $1\frac{1}{2}$ একর বন কেটে

ধ্বংস করে। এবার দেখা যাক এর ফলে কী কী সমস্যা হতে পারে —

1. মাটির খুব গভীরে বা কম গভীরে যাওয়া গাছ যদি হঠাৎ উপড়ে ফেলা হয়, তবে যে মাটির কণাগুলোকে গাছের মূল আঁকড়ে ধরে থাকে, তারা আলাদা হয়ে যায়। তারপর জল শুকিয়ে গেলে ওই মাটি ঝুরঝুরে হয়। বৃষ্টির ধারায় সেই মাটি সহজে ধুয়ে চলে যায় এবং নিচের পাথর বেরিয়ে যায়। ফলে সেখানে তখন আর কোনো উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই ধরনের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে ঘটতে থাকলে মরুভূমি পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে (Desertification)।
2. বন কেটে ফেললে ওই অঞ্চলের মাটি আর বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারে না। ফলে মাটির নীচের জলের স্তর কমতে থাকে।
3. বন ক্রমাগত কাটতে থাকলে CO_2 শোষণে বেশি সক্ষম গাছের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। বাতাসে CO_2-এর পরিমাণ বেড়ে গেলে পরিবেশ গরম হয়ে যায় (Global warming)। অতিরিক্ত গরমে জলচক্র (জল → মেঘ → বৃষ্টি → বরফ) ব্যাহত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে বা বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তন ঘটে। ফলে খরার (Drought) ও বন্যার (Flood) সম্ভাবনা বাড়ে।
4. বিভিন্ন প্রাণী বিশেষ ধরনের গাছ বা বনাঞ্চলকে তার বাসস্থানের জন্য ব্যবহার করে। এধরনের বনাঞ্চল ধ্বংস হলে ওই প্রজাতির বিলুপ্তির (Extinction) সম্ভাবনা বাড়ে এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস পায়।

বন কেটে ফেলা ও পরিবেশের ক্ষতিসংক্রান্ত নীচের ছবিগুলো বিশ্লেষণ করো।
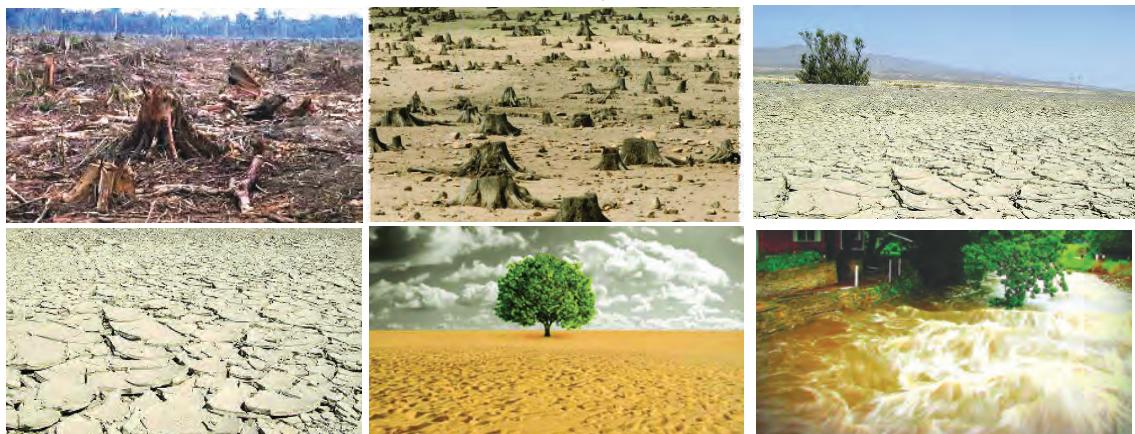
কী করে বন বাঁচানো সম্ভব

1. বনাঞ্চলে গাছকাটা বন্ধ করা।
2. গাছ পোঁতা ও নতুন নতুন বনাঞ্চল তৈরি করা।
3. বনে আগুন লাগার সম্ভাবনা কমানো ও বনাঞ্চলে পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করা।

4. বনের পরিণত গাছ কাটা এবং সেই জায়গায় ওই একই প্রজাতির নতুন গাছের চারা লাগানো।
5. বনের গাছে কোনো রোগের আক্রমণ ঘটলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
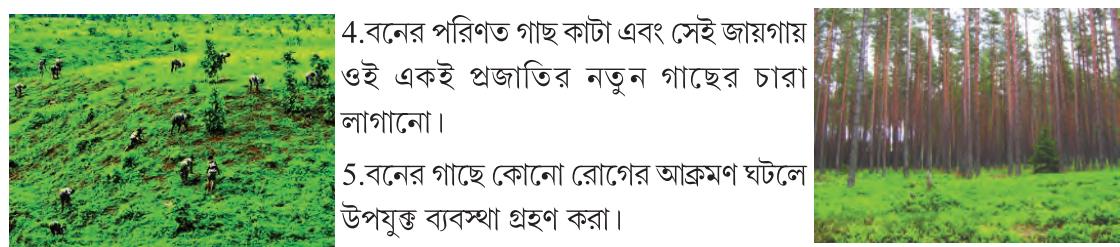
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান দুটি বনভূমি হলো উত্তরবঙ্গের বনভূমি এবং সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভস উদ্ভিদের বনভূমি। উত্তরবঙ্গে উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলের (8,000 ফুটের ওপরে) ও ডুয়ার্স এবং তেরাই-র বন দেখা যায়। বর্তমানে পরিবেশের নানান পরিবর্তন ও মানুষের নানাবিধ কার্যাবলির ফলে ওই বনগুলিতে কিছু সংকট তৈরি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বনভূমির সংকট

উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এবং তরাই-এ বনভূমিতে শাল, গামার, ওদাল, খয়ের, শিশু, আমলকী এবং উঁচু পাহাড়ের ঢালে রোডোডেনড্রন, পাইন প্রভৃতি নানা গাছ চোখে পড়ে। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বিদেশ থেকে ধূপী গাছের চারা এনে উঁচু পাহাড়ের ঢালে ধূপীর বন তৈরি করা হয়েছে। ডুয়ার্স এবং তরাইতেও এরকম অনেক জায়গাতে মানুষের তৈরি শাল বা সেগুনের বন আছে। মানুষের তৈরি এইসব বন প্রাকৃতিক বনাঞ্চল কেটেই তৈরি হয়েছে। চা-বাগানের জন্যও প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের অনেকটাই সংকুচিত।

উত্তরবঙ্গের বনভূমি সংলগ্ন চা-বাগানে কিংবা অনেক সময় বনভূমির পার্শ্ববর্তী জনবসতি এলাকায় ঘুরলে প্রায়ই চিতাবাঘ হানার কথা শোনা যায়। প্রাকৃতিক খাদ্যের অভাবে চিতাবাঘের খাদ্যাভ্যাস অনেকটাই বদলে গেছে। এদের প্রাকৃতিক খাদ্য হলো নানা ধরনের তৃণভোজী প্রাণী — ছোটো হরিণ, বুনো ছাগল, খরগোশ, বুনো মোরগ, ময়ূর। আর খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের পর এরা জঙ্গলের ধারে গ্রামের সীমানা থেকে প্রায়ই ছাগল, গোরু-মোষের বাচ্চা, হাঁস-মুরগি, কুকুর ধরতেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এর সামগ্রিক পরিণতি হলো চিতাবাঘ-মানুষের সংঘাত। চা পাতা তুলতে গিয়ে ঝোপেঝাড়ে থাকা চিতাবাঘের আক্রমণের মুখোমুখি হচ্ছে চা শ্রমিকরা। অনেক সময় বিষ প্রয়োগে বা মরণফাঁদ তৈরি করে চিতাবাঘদের মেরে ফেলা হচ্ছে।

গন্ডারের বসবাস উপযোগী জঙ্গল ও জলার তৃণভূমি আয়তনে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসতে থাকায় ও মানুষের বসতি বেড়ে উঠতে থাকায় উত্তরবঙ্গের বনভূমিতে থাকা একশৃঙ্গ গন্ডারের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

বন কেটে হাতির যাতায়াতের পথে রেললাইন বসানোয় ও জনবসতি গড়ে ওঠায় উত্তরবঙ্গের বনভূমির আরেক সংকট হলো মানুষ-হাতি সংঘাত। উত্তরবঙ্গে ইদানীং ট্রেনে কাটা পড়ে অনেক হাতি মারা যাচ্ছে। বর্ষার শুরুতে ভুট্টা ফলার সময় আর শীতের শুরুতে ধান পাকতে শুরু করলে হাতির চলাচল অনেকটা বেড়ে যায়। হাতির দল তখন নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মানুষের সঙ্গে হাতির সংঘাত শুরু হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিকে যে শাল, সেগুনের অরণ্য দেখা যায় সেখানেও প্রায়ই দলমা পাহাড় থেকে হাতিরা নেমে আসে। তার জঙ্গলে ফিরে না গিয়ে জনবসতি এলাকায় দীর্ঘ সময় থাকার ফলে একই সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

ম্যানগ্রোভস বনভূমি ও বর্তমান সংকট

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণদিকে জোয়ার-ভাটা প্লাবিত অঞ্চলে শ্বাসমূলযুক্ত যে বিশেষ উদ্ভিদ সমষ্টি চোখে পড়ে তারা মিলেমিশে ম্যানগ্রোভস অরণ্য বা বাদাবন তৈরি করেছে।

এই বনের উদ্ভিদেরা বেঁচে থাকার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। এই বনের বাইন, পশুর, কেওড়া, গরান প্রভৃতি উদ্ভিদের নীচের অংশ জোয়ারের সময় দিনে দু-বার জলে ঢেকে যায়। মাটির সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলো কাদায় ঢাকা পড়ায় শ্বাসকার্য চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এইসব উদ্ভিদের মূল থেকে মাটির ওপরে মুলোর মতো অসংখ্য শ্বাসমূল বেরোয়।

আবার কোনো ম্যানগ্রোভ যাতে জোয়ার-ভাটার স্রোতের টানে উপড়ে না যায় তার জন্য ঠেসমূল বের করে। গর্জন গাছে এটি ভালোভাবে চোখে পড়ে। আবার গর্জন, গরান, কাঁকড়া প্রভৃতি উদ্ভিদে বংশরক্ষার তাগিদে পাকা ফল মাটিতে পড়ার আগেই তার মধ্যে অঙ্কুরোদ্‌গম হয়ে যায়। শিশু উদ্ভিদটি যাতে মাটিতে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারে তার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়।

ম্যানগ্রোভস অরণ্যের উদ্ভিদরা অনবরত আরেকটি সমস্যার মুখোমুখি হয়। জোয়ারের সময় সমুদ্রের নোনাজল

সরাসরি খাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। এক হাজার গ্রাম সমুদ্রের জলে প্রায় 33-38 গ্রাম লবণ থাকে যা স্থলভাগের উদ্ভিদরা সহ্য করতে পারে না। কারণ অতিরিক্ত লবণ উদ্ভিদের দেহকলায় বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। বাদাবনের উদ্ভিদেরা আংশিকভাবে মূল বা পাতার লবণ গ্রন্থির সাহায্যে এই লবণ বের করে দেওয়ায় চেষ্টা করে। এছাড়াও পাতা ঝরে যাওয়ার মাধ্যমেও লবণ বার করে দেয়।

তবে বর্তমানে পরিবেশের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকায় জলের উচ্চতা ক্রমাগত বাড়ছে। আর জলে বাড়ছে নুনের পরিমাণ। এতে বহু গাছের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমতে শুরু করেছে। ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ছে বাঘ, খাঁড়ির কুমীর, রিভার টেরাপিন(নদীর কচ্ছপ) -এর মতো প্রাণীরা।

তোমার বাড়ির আশেপাশে বন থাকলে বা যদি কোনোদিন কোনো বনে যাও তবে বনের নিম্নলিখিত বিষয়ে খেয়াল করো বা তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করো এবং তোমার ডায়েরিতে তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করো।

1. বনে কী কী ধরনের গাছ দেখা যায়? 2. বনের জলের উৎস কী কী? 3. বনাঞ্চলে কী কী প্রাণী বেশি করে চোখে পড়ে? 4. বনে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী তুমি দেখতে পেলে তাদের নির্দিষ্ট শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করো। 5. ওই বনের ওপর আশেপাশের মানুষ কীভাবে নির্ভরশীল? 6. বনের গাছের পরাগমিলনে সাহায্যকারী কোন কোন প্রাণী তোমার চোখে পড়েছে? 7. বনের যেসব তৃণভোজী ও মাংসাশী যেসকল প্রাণী তোমার চোখে পড়েছে বা যাদের কথা তুমি জেনেছ তাদের নাম লেখো। 8. বনের কী কোনো সমস্যা তোমার চোখে পড়েছে? 9. কী করে ওই সমস্যার সমাধান করা যায়?

সমুদ্রের নীচের জীবন

সমুদ্র তোমরা অনেকেই দেখেছ। আর সমুদ্রের ধার থেকে ঝিনুকও নিশ্চয়ই কুড়িয়েছো। ওই ঝিনুকগুলো আসলে একধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর খোলক। শক্ত খোলকটা প্রাণীটার নরম দেহকে রক্ষা করত। আমাদের চারপাশে যেমন নানাধরনের জীবেরা বাস করে, সমুদ্রেও তেমনি বাস করে অনেক ধরনের উদ্ভিদ আর প্রাণী।

এসো এবারে সমুদ্র আর সমুদ্রের জীবদের চেনা আর জানার চেষ্টা করি। সমুদ্র আর সমুদ্রের জীবদের সম্বন্ধে জানার প্রথম ধাপটাই হলো সমুদ্রকে চেনা।

মনে করো, তোমাকে কোনো একটা যানে (যার জানালাগুলো কাঁচের মতো স্বচ্ছ জিনিস দিয়ে তৈরি) করে আস্তে আস্তে সমুদ্রের গভীরে নামিয়ে দেওয়া হতে লাগল। সমুদ্রের যত গভীরে নামবে জলের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের চাপও বেড়ে যাবে। তাই যান আর যানের জানালাগুলো এমন জিনিস দিয়ে তৈরি যা জলের এই প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারে। দিনের বেলায় যদি নামো, দেখবে সমুদ্রের জলতলের ঠিক নীচের অংশে কত আলো! কত বিচিত্র প্রাণী সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্যাওলা জাতীয় নানারকমের উদ্ভিদও তোমার চোখে পড়বে। সমুদ্রের গভীরে যত নামবে দেখবে সূর্যের আলো ক্রমশ কমে আসছে। আর তোমার চারপাশ ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। প্রাণীদের সংখ্যাও ক্রমশ কমছে। আরও নীচে গেলে দেখতে পাবে নিকষ কালো অন্ধকার। কেবল তোমার যানের তীব্র আলোয় চারপাশের অন্ধকার অল্প অল্প করে কেটে যাচ্ছে। সেই আলোয় কখনো কখনো চোখে পড়ছে বিচিত্রদর্শন সব প্রাণী। সমুদ্রের গভীরে যেসব জীবেরা বাস করে তারা এই প্রচণ্ড চাপ আর অন্ধকারের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। সমুদ্রের সব অঞ্চলে জীবের দেখা পাওয়া যায় না। আবার সমুদ্রের এমন কিছু কিছু অঞ্চল আছে যেখানে অধিকাংশ জীবের বাস।

অ্যাঙ্গলার মাছ

যেসব সমুদ্রে প্রবাল প্রাচীর থাকে সেখানে মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের বৈচিত্র্য খুব বেশি।

হ্যাচেট মাছ

সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে জীবনের বৈচিত্র্য

জোয়ারের সময় জল যতদূর পর্যন্ত বেড়ে যায় আর ভাটার সময় যতদূর অবধি জল নেমে যায়– তার মাঝের যে অঞ্চল, সেখানে দেখা মেলে নানা জীবের। যেমন লাইকেন, শ্যাওলা, শামুক, ঝিনুক, তারা মাছ, সাগরকুসুম, কাঁকড়া ইত্যাদি। মহীসোপানের (সমুদ্রে ডুবে থাকা মহাদেশের অংশ) ওপরে জলময় যে অঞ্চল, সেখানেও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক জীবের দেখা পাওয়া যায়। এখানে জলের তলায় কেল্পের অরণ্য আর সামুদ্রিক ঘাসের তৃণভূমিতে দেখা পাওয়া যায় স্পঞ্জ আর অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণী, ছোটো মাছ, সামুদ্রিক কচ্ছপ, সী-কাউ, সী হর্স আর ছোটো ছোটো সামুদ্রিক চিংড়ির। কেল্প হলো আসলে একধরনের সামুদ্রিক শ্যাওলা। খালি চোখে দেখা যায় না এমন আণুবীক্ষণিক জীবেরাও বাস করে এই অঞ্চলে।

এরপর খোলা সমুদ্রের যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, সেখানে জলের বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন রকমের মেরুদণ্ডী (হাঙর, হ্যাচেট মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ, তিমি) আর অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের (জেলি ফিস, সাগরকুসুম, চিংড়ি,
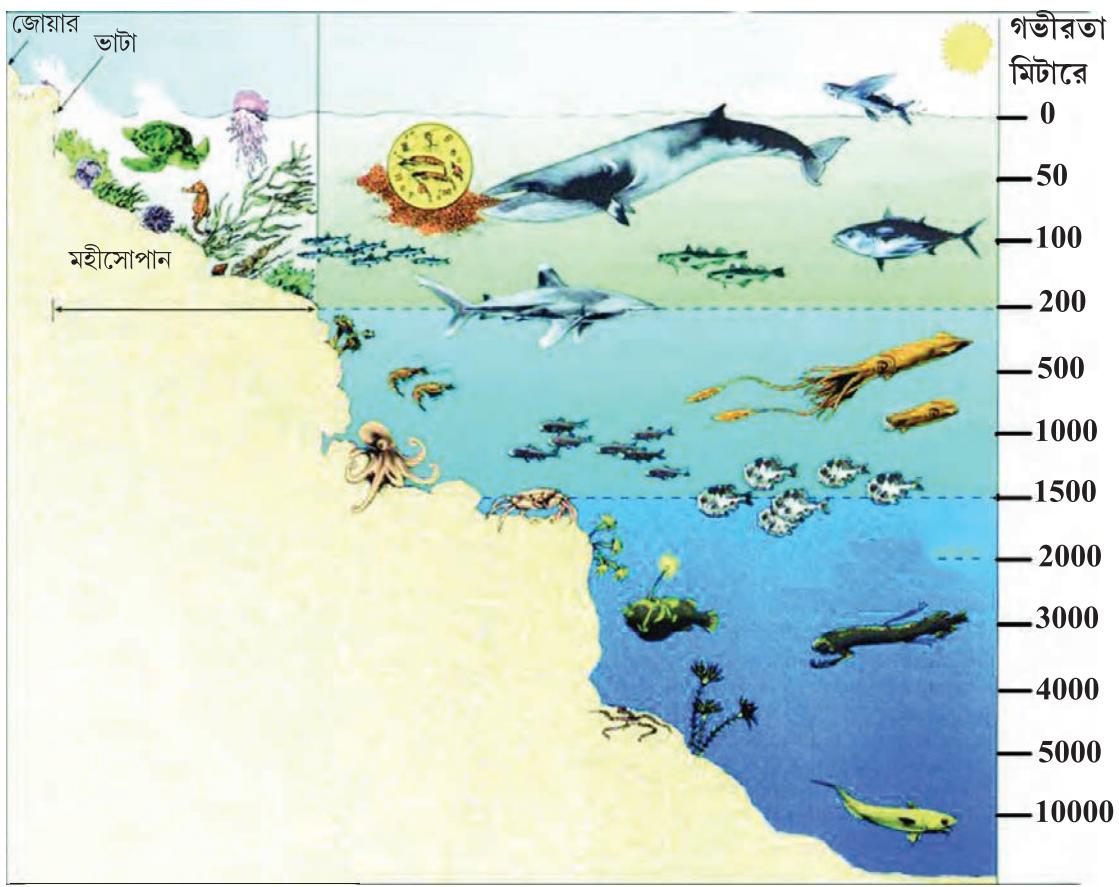
কাঁকড়া, স্কুইড, অক্টোপাস, তারামাছ, সমুদ্র শশা) দেখা মেলে। সমুদ্রের যে গভীরতা অবধি সূর্যের আলো প্রবেশ করে সেখানে নানাধরনের উদ্ভিদের দেখা পাওয়া যায়। জলতলের ঠিক নীচে যতদূর অবধি সূর্যের আলো আর তাপ প্রবেশ করতে পারে, সেখানেই জীবনের বৈচিত্র্য বেশি। কারণ এই অঞ্চলে থাকা সবুজ উদ্ভিদেরা সূর্যের আলোর সাহায্যে খাবার তৈরি করতে পারে। সবুজ উদ্ভিদের সূর্যের আলোর সাহায্যে খাবার তৈরি করার এই প্রক্রিয়াটাই হলো সালোকসংশ্লেষ। এই খাবারের ওপর নির্ভর করে এই অঞ্চলের অন্য সব জীবেরা। আর সমুদ্রের গভীরে বসবাসকারী জীবেরা খাবারের জন্য নির্ভর করে সূর্যের আলোয় আলোকিত ওপরের অঞ্চল থেকে ভেসে নেমে আসা খাবারের টুকরো বা উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষের ওপর। অনেকসময় এরা অন্য জীবদের শিকার করেও খাবার জোগাড় করে। সমুদ্রের যত গভীরে যাওয়া যায় সূর্যের আলো ততই কম প্রবেশ করে। আর তাই সমুদ্রের গভীরে জলের তাপমাত্রাও কমতে থাকে। গভীর সমুদ্রে বসবাসকারী জীবদের তাই কম তাপমাত্রা আর প্রচণ্ড চাপের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে হয়।

ওপরের ছবিতে তোমরা বিভিন্ন গভীরতায় বিভিন্ন জীবদের দেখতে পাচ্ছ। বিভিন্ন জীবদের যে গভীরতায় দেখতে পাচ্ছ তাদের সবসময় যে ওই গভীরতাতেই দেখা যাবে তার কিন্তু কোনো ঠিক নেই। কারণ ওদের মধ্যে অনেকেই কখনও খাবারের খোঁজে আবার কখনও বা অন্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে বাঁচতে জলের বিভিন্ন গভীরতায় ওঠানামা করে।

বায়োলুমিনিসেন্স (Bioluminescence)

সমুদ্রের গভীরে সূর্যের আলো প্রবেশ না করলেও অন্য এক ধরনের আলোর দেখা পাওয়া যায়, যার কোনো উত্তাপ নেই। একে বলে বায়োলুমিনিসেন্স (Bioluminescence)। সমুদ্রের গভীরে কিছু জীবের দেখা মেলে যারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের দেহে আলো তৈরি করতে পারে। এরা হলো বায়োলুমিনিসেন্ট (Bioluminescent) জীব।

বায়োলুমিনিসেন্স কথাটার উৎপত্তি কোথা থেকে সেটা আগে দেখা যাক। গ্রিক শব্দ Bios = জীবিত (living) আর ল্যাটিন শব্দ lumen = আলো (light)। অর্থাৎ জীবের থেকে আসা আলো। বায়োলুমিনিসেন্ট জীবদের দেহে একধরনের প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত রঞ্জক পদার্থ থাকে — লুসিফেরিন (Luciferin)। আর থাকে একধরনের উৎসেচক — লুসিফারেজ (Luciferase)। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এই দুইয়ের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রাসায়নিক শক্তি পরিবর্তিত হয় আলোকশক্তিতে। তৈরি হয় 'ঠান্ডা আলো' বা বায়োলুমিনিসেন্স। অবশ্য সব বায়োলুমিনিসেন্ট প্রাণীদের দেহেই যে এই দুটো পদার্থ থাকে এমন নয়। কোনো কোনো প্রাণীরা এই আলো তৈরির অন্য কিছু আলো-উৎপাদনকারী ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায় অর্থাৎ তাদের সঙ্গে মিথোজীবী সম্পর্ক গড়ে তোলে। বেশিরভাগ বায়োলুমিনিসেন্ট জীবদের দেখা মেলে সমুদ্রের 200-1000 মিটার গভীরতায়। বায়োলুমিনিসেন্স এই জীবদের নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন - খাবার খোঁজা, খাদ্যকে আকর্ষণ করা, ছদ্মবেশ ধারণ, আত্মরক্ষা ইত্যাদি।

সমুদ্রের জীব

প্ল্যাংকটন: (গ্রিক শব্দ Planktos = ভেসে বেড়ায়)

এরা একধরনের জলজ জীব, যারা স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে পারে না। এরা বড়ো বড়ো জলজ প্রাণীদের (মাছ, তিমি) খুব গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য। এরা প্রধানত দু-ধরনের ।

i) ফাইটোপ্ল্যাংকটন (গ্রিক শব্দ Phytos = উদ্ভিদ): এরা সূর্যের আলোর সাহায্যে খাবার তৈরি করতে পারে।

ii) জুপ্ল্যাংকটন (গ্রিক শব্দ Zoon = প্রাণী): এরা নিজেরা খাবার তৈরি করতে পারে না; অন্য প্ল্যাংকটনদের খায়।

উদ্ভিদ

1. ফাইটোপ্ল্যাংকটন

ডায়াটম

এই এককোশী আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদেরা সাধারণত জলের ওপরের দিকটায় বাস করে। সূর্যের আলোর সাহায্যে এরা খাবার তৈরি করে। বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের খাদ্য এরা। তাছাড়াও পরিবেশে কার্বনের ভারসাম্য বজায় রাখায় এদের ভূমিকা আছে।

a) **ডায়াটম :** এরা এককোশী। এরা এককভাবে বা শৃঙ্খলাকারে কলোনি তৈরি করে। এদের কোশপ্রাচীর সিলিকা দিয়ে তৈরি।

b) **ডিনোফ্ল্যাজেলেট :** এরা এককোশী। ডায়াটমদের মতো এদের সিলিকা দিয়ে তৈরি কোশপ্রাচীর থাকে না। এরা এককভাবে থাকে, কলোনি তৈরি করে না। ফ্ল্যাজেলার সাহায্যে এরা চলাফেরা করে।

ডিনোফ্ল্যাজেলেট
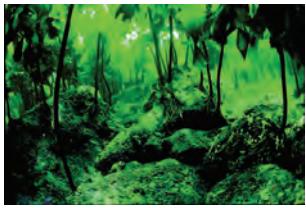
কেল্প

2. কেল্প (Kelp)

এরা খুব বড়ো সামুদ্রিক শ্যাওলা। সমুদ্রের অগভীর অংশে এরা জন্মায়। এমনভাবে এরা বাড়ে যে সমুদ্রের নীচে প্রায় একটা অরণ্য তৈরি করে ফেলে। বেশিরভাগ প্রজাতির দেহ চ্যাপটা, অনেকটা পাতার মতো দেখতে। মূলের মতো একটা অংশের সাহায্যে এরা জলের নীচে কোনো কিছুর সঙ্গে আটকে থাকে। এরা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।।

প্রাণী

1. জুপ্ল্যাংকটন (Zooplankton)

ক্রিল

এরা মূলত আণুবীক্ষণিক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী। অবশ্য সবাই আণুবীক্ষণিক নয়। এরা সমুদ্রের ওপরের তলে ভেসে বেড়ায়। ফাইটোপ্ল্যাংকটনের মতোই এরা ভালো সাঁতার কাটতে পারে না, তাই ভেসে বেড়ায়। অবশ্য কেউ কেউ ভালো সাঁতার কাটতে পারে। কিন্তু শত্রুর চোখ এড়াতে বা সহজে খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভেসে বেড়ায়।

2. সাগরকুসুম (Sea anemone)

সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে অনেকসময় চোখে পড়ে বহু পাপড়িযুক্ত ফুলের মতো একটা জিনিস। হাতে করে তুললে দেখা যায় একটা নরম আর লম্বা বৃন্তের ওপরে ফুলের পাপড়িগুলো যেন ছড়িয়ে আছে। ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে পাপড়িগুলো সামনে আর পেছনে আন্দোলিত হচ্ছে। এটাই সাগরকুসুম। এই সামুদ্রিক প্রাণীটার দেহটা ফাঁপা। পাপড়ির মতো উপাঙ্গগুলোর ঠিক মাঝখানে হলো তার মুখ। এই পাপড়িগুলো আসলে কর্ষিকা। এই কর্ষিকাগুলোতে থাকে অসংখ্য দংশক কোশ। ছোট মাছ বা অন্য কোনো প্রাণী শিকার করতে কাজে লাগে।
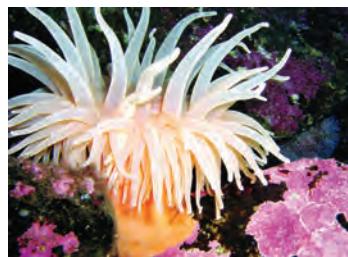
সাগরকুসুম

সাগরকলম

3. সাগরকলম (Sea-pen)

এই প্রাণীটির শরীরের দুই দিকেই সরু অংশ থাকে। অনেকটা হাঁসের পালকের তৈরি কলমের মতো। সী পেনের সারা শরীর জুড়ে অসংখ্য শাখা। প্রতিটা শাখাই মূল দেহ থেকে বেরিয়েছে। সী পেনকে পাথরে আটকে রাখতে সাহায্য করে এই শাখাগুলো।

4. অক্টোপাস (Octopus)

এদের বাহুর সংখ্যা আট। তাই নাম অক্টোপাস। শরীর গোলাকার। এদের দেহের বাইরে কোনো খোলক নেই। এদের বাহুগুলো লম্বা লম্বা শুঁড়ের মতো — ওপরের দিকটা মোটা আর নীচের দিকে ক্রমশ সরু। বাহুগুলোতে অনেকগুলো করে শোষক যন্ত্র থাকে। এই বাহুগুলোর কেন্দ্রে থাকে মুখ। অক্টোপাসের দুটো বড়ো বড়ো চোখ

অক্টোপাস

থাকে। অক্টোপাসের মস্তিষ্ক আর চোখ অমেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে উন্নত বলে মনে করা হয়। অধিকাংশ অক্টোপাসই খুব ছোটো আকারের হয়। সবচেয়ে বড়ো অক্টোপাস হলো প্রশান্ত মহাসাগরের দৈত্যাকার অক্টোপাস। সব অক্টোপাসেরই বিষ আছে। তবে সাধারণত এই বিষ ক্রিয়া করে কাঁকড়া, চিংড়ি, এইসব প্রাণীদের ওপর। কেবল ব্লু-রিংড অক্টোপাস (blue-ringed octopus) মানুষের পক্ষে প্রাণঘাতী হতে পারে। দেখতে যতই বীভৎস হোক না কেন, অক্টোপাসেরা কিন্তু নিরীহ আর ভীরু। আক্রান্ত হলে এরা এদের দেহের একটি গ্রন্থি থেকে কালি ছিটিয়ে জল ঘোলা করে দিয়ে পালিয়ে যায়।

মা অক্টোপাস আঙুরের মতো আকারের ছোটো গোল গোল ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত মা অক্টোপাস পাহারা দেয়। এমনকি খেতেও যায় না যাতে কাঁকড়া বা অন্য প্রাণীরা ডিমের কোনো ক্ষতি না করে। মা অক্টোপাস তিলে তিলে অনাহারে মৃত্যুবরণ করার আগের মুহূর্ত অবধি সন্তানের যত্ন নেয়। তারপর ডিম ফুটে ছড়িয়ে যায় শিশু অক্টোপাসেরা। আর ধীরে ধীরে মা অক্টোপাসের মৃতদেহ নেতিয়ে পড়ে জলের তলায়।

5. স্কুইড আর কাটল ফিশ

স্কুইড

স্কুইডের বাহু দশটা। মাথার কাছে থাকে আটটি ছোটো আর দুটো বড়ো লম্বা মাংসল প্রত্যঙ্গ। এই হলো মোট দশটা বাহু। প্রতিটি বাহুতে থাকে একাধিক শোষক যন্ত্র। এদের দেহ লম্বাটে, টর্পেডোর মতো। আর লেজের দিকে রয়েছে পাখনা। শোষক যন্ত্রের সাহায্যে স্কুইড শিকার ধরে। আক্রান্ত হলে বাদামি কালির মতো তরল জিনিস ছিটিয়ে জলের রং ঘোলাটে করে শত্রুকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে যায়।

কাটল ফিশ

দৈত্যাকার স্কুইড বাস করে আটলান্টিক সমুদ্রের গভীরে। এরা সাধারণত 50-60 ফুট লম্বা হয়। এদের বাহুর দৈর্ঘ্যই 30 ফুট। দেহের মধ্যে আছে অনেকটা বর্শার ফলার মতো দেখতে ক্যালশিয়ামঘটিত একটা শক্ত জিনিস। স্কুইডের আত্মীয় কাটল ফিশ সমুদ্রের ধারে পচে গেলে এই ক্যালশিয়ামঘটিত শক্ত জিনিসটা সহজেই সংগ্রহ করা যায়। এই জিনিস সমুদ্র ফেনা নামে বিক্রি হয়।

6. হাঙর (Shark)

হাঙর শক্ত হাড়ের মাছ নয়। এদের কঙ্কাল তৈরি হয় হাড়ের চেয়ে নরম কার্টিলেজ দিয়ে। এই ধরনের পদার্থ দিয়েই আমাদের নাকের ডগা বা বহিঃকর্ণের শক্ত অংশ তৈরি হয়েছে। খুব অল্প জাতের হাঙরই মানুষখেকো - যেমন গ্রেট হোয়াইট শার্ক, লম্বায় প্রায় 6 মিটারের মতো। হাঙরদের একটা দাঁত ভেঙে গেলে পেছনের সারির সেই অংশের দাঁত সামনে এগিয়ে এসে হারানো দাঁতের জায়গা দখল করে নেয়।

হোয়েল শার্ক

এদের কানকোর চেহারা কাটা দাগ বা ফাটলের মতো (slit)। এরকম পাঁচটা ফাটল বা স্লিট থাকে। হাঙরের

চামড়ায় ছোটো ছোটো আঁশ থাকে। এগুলো পেছনের দিকে ঢালু। তাই হাঙরের মুখ থেকে লেজের দিকে হাত বোলালে নরম লাগে। কিন্তু লেজের দিক থেকে মুখের দিকে হাত বোলালে শিরীষ কাগজের মতো অমসৃণ বা খসখসে মনে হয়। একসময় কাঠ পালিশ করার কাজে হাঙরের চামড়া বা শ্যাগ্রীন ব্যবহার করা হতো।

হ্যামার হেডেড শার্ক

বাস্কিং শার্ক আর হোয়েল শার্কের মতো বড়ো আকারের হাঙর মানুষের ক্ষতি করে না। এদের গলা এত ছোটো যে এরা শুধু খুব ছোটো মাছ আর প্ল্যাংকটন খেয়েই বেঁচে থাকে। হোয়েল শার্ক মুখ খুলে সাঁতার কাটে। আর জলের সঙ্গে ভেসে আসা ছোটো ছোটো জলচর প্রাণীদের খেয়ে ফেলে। এদের কানকো ছাঁকনির কাজ করে। কানকো দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। আটকা পড়ে যায় প্রাণীরা। হোয়েল শার্ক তখন এদের খায়। অধিকাংশ হাঙর বাচ্চা প্রসব করে। তবে কোনো কোনো জাতের হাঙর আবার ডিমও পাড়ে। হ্যামার হেডেড শার্ক দেখতে খুব ভয়ংকর। এর মাথাটা একটা বিরাট হাতুড়ির মতো, যার দু-প্রান্তে দুটো চোখ থাকে। এই হাঙরও মানুষখেকো হতে পারে।

7. তারামাছ

তারামাছের বাহুর সংখ্যা সাধারণত পাঁচটি। বাহুগুলো চ্যাপটা মোটা পাতের মতো দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

তারামাছ

কখনো কখনো এদের চারটে বা দুটো বাহুও দেখা যায়। একটা বাহু ভেঙে গেলে সেখানে আবার নতুন বাহু তৈরি হয়ে যায়। তারামাছের বাহুর ভেতরের দিকে নরম আঙুলের মতো উপাঙ্গ আছে, যার নাম টিউব ফিট বা নালিপদ। এই নালিপদগুলো ফাঁপা আর এদের শেষপ্রান্তে আছে চোষক বা সাকার। নালিপদগুলোর সাহায্যে জল টেনে নিয়ে আর বের করে দিয়ে তারামাছ শিকার ধরে। জল টানায় সাময়িক শূন্যতা (vacuum) তৈরি হয়, ফলে শিকার নালিপদে আটকে যায়। এই নালিপদের সাহায্যেই তারামাছ চলাফেরা করে। ঝিনুক এদের প্রিয় খাবার। কোনো ঝিনুকের সন্ধান পেলে নালিপদের সাহায্যে এরা ঝিনুকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। ফলে ক্রমাগত টান পড়ার ফলে ঝিনুকটা বাধ্য হয় খোলের ভেতরে থেকে বেরিয়ে আসতে।

এসো এবারে আরও কয়েকটা সামুদ্রিক উদ্ভিদ আর প্রাণীদের চিনে নিই।

সামুদ্রিক ঘাস, মাকড়সা কাঁকড়া, লবস্টার, ব্লু-রিংড অক্টোপাস

ললিগো, সোর্ডফিশ, গ্রিন সী টার্টল, স্পার্ম তিমি

সমুদ্রে দূষণ ও সমুদ্রের জীবের সমস্যা

সমুদ্রে দূষণের মূলে কী কী আছে, তাদের একবার চিনে নিই। এরা হলো কীটনাশক, আগাছানাশক, রাসায়নিক সার, ডিটারজেন্ট, তেল, জৈব বর্জ্যযুক্ত ময়লা জল বা সিউয়েজ, প্লাস্টিক আর নানা কঠিন বস্তু।

1. রাসায়নিক সার ও জৈব বর্জ্য যুক্ত ময়লা জল

রাসায়নিক সার আর জৈব বর্জ্যযুক্ত ময়লা জলে থাকা নানা পুষ্টি উপাদান সমুদ্রের জলে মেশার ফলে ফাইটোপ্ল্যাংকটনরা সংখ্যায় খুব বেড়ে যায়। সমুদ্রের জল ঢেকে দেয় এরা। একে বলা হয় অ্যালগাল ব্লুম (Algal bloom)। ডিনোফ্ল্যাজেলেটরা সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে জলের রঙ লাল হয়ে যায়। এটাও একধরনের অ্যালগাল ব্লুম। এদের দেহ থেকে বেরোনো অধিবিষ (Toxin) অন্যান্য সামুদ্রিক জীবদের মৃত্যুও ঘটাতে পারে। জলের স্বচ্ছতা কমে গিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধা সৃষ্টি হওয়ার ফলে সালোকসংশ্লেষ বাধা পায়। আর এই বিপুল পরিমাণ শৈবালরা শ্বাসকার্য চালানোর ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে গিয়ে সামুদ্রিক প্রাণীদের অক্সিজেনের অভাব ঘটে। যার ফলে ওইসব প্রাণীদের মৃত্যু ঘটতে পারে।

2. তেল

তেল বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এমন জাহাজে দুর্ঘটনা ঘটলে বা ডুবে গেলে বা সমুদ্রে তেল তোলার জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটলে সমুদ্রে তেল মেশে। সামুদ্রিক জীবদের পক্ষে এই তেল বিষের মতোই। কারণ অপরিশোধিত তেলে থাকে নানা বিষাক্ত পদার্থ। সমুদ্রের জলের ওপরে তেলের স্তর থাকলে জলে অক্সিজেন ঢুকতে বাধা পায়। ফলে জলের জীবেরা অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে পারে। এছাড়াও সামুদ্রিক প্রাণীদের চামড়ায় ঘা আর চোখ, মুখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গে অস্বস্তি বা প্রদাহ হতে পারে। সমুদ্রের জলে তেল মিশলে সামুদ্রিক প্রাণীদের তাপ- নিরোধক আর জল-নিরোধক ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সমুদ্রের ঠান্ডা জলের সংস্পর্শে এসে তারা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এছাড়াও তেলে ভিজে যাওয়া পাখিরা ঠোঁট দিয়ে নিজেদের তেলে ভেজা পালকে বোলালে, ওই তেল তাদের শরীরে ঢুকে অভ্যন্তরীণ অঙ্গেরও ক্ষতি করতে পারে।

3. প্লাস্টিক

সমুদ্রে প্লাস্টিকজাত জিনিস ফেলা হলে সেগুলো ভাসতে থাকে। অনেকসময় সামুদ্রিক প্রাণীরা খাবার ভেবে এইসব প্লাস্টিকজাত জিনিস খেয়ে ফেলে। প্লাস্টিক বর্জ্য বড়ো আকারের হলে খাদ্যনালীতে আটকে গিয়ে খাবার যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। অনাহার বা সংক্রমণে প্রাণীটার মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

4. সমুদ্রের জলের অম্লতা বেড়ে যাওয়া

মানুষের বিভিন্ন কাজের ফলে পরিবেশে CO_2 নির্গমন বাড়ছে। সমুদ্র এই CO_2-এর একটা বিরাট অংশ শোষণ করে। ফলে পরিবেশে CO_2-র পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জলের অম্লত্ব বাড়ছে। আর এর প্রভাব পড়ছে মাছ, স্কুইড আর অন্যান্য ফুলকাযুক্ত সামুদ্রিক প্রাণীদের ওপর। কারণ আম্লিক সমুদ্রের জল থেকে শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেন পাওয়া এদের পক্ষে ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। তাছাড়াও জলের অম্লতা বেড়ে গেলে কাঁকড়া, লবস্টার আর কোরালদেরও ক্যালশিয়াম কার্বনেটের খোলক তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়বে। অতিমাত্রায় আম্লিক সমুদ্রের জলে এইসব প্রাণীদের ক্যালশিয়াম কার্বনেটের খোলক নষ্টও হয়ে যেতে পারে।

মরুঅঞ্চলের জীবজগৎ

ছবিটি দেখে মরুভূমি অঞ্চলের বৈচিত্র্যগুলো সম্পর্কে তোমার ধারণা লেখো —

মরুভূমি			
ভূ-প্রকৃতি	জলবায়ু	গাছপালা	জীবজন্তু

মরুভূমিতে শুধু বালি আর বালি। পৃথিবীর প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে মরুভূমি। যতদূরে চোখ যাবে শুধু বালি। তাই বলে তার সীমানা নেই তা কিন্তু নয়। আমাদের দেশের থর মরুভূমির দিকে তাকাও। সাতলেজ নদীর পাড় থেকে পূর্বদিকে আরাবল্লী পর্বতকে ঘিরে রয়েছে থর। দক্ষিণে কচ্ছের রণ, পশ্চিমে সিন্ধু নদ। রাজস্থানের সীমানা জুড়ে রয়েছে মরুভূমি।

কোথাও জল নেই। বৃষ্টির ভীষণ অভাব। দিনের বেলায় রোদের তাপ খুব বেশি। বছরে 20 সেন্টিমিটারেরও কম বৃষ্টি হয়। শুধু বালি আর বালি থাকায় জল মাটিতে শোষিত হয় না। ফলে সূর্যের আলো প্রায় 90 শতাংশ বিকিরিত হয়। রাতের বেলা খুব ঠান্ডা। কিছু মরুভূমিতে আবার ভীষণ ঠান্ডা, যেমন এশিয়া মহাদেশের গোবি, কিংবা আন্টার্কটিকা মহাদেশের মরুভূমি। আশঙ্কার কথা হলো মরুভূমির আয়তন ক্রমশ বাড়ছে।

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের কাজটা করো—

1। মেরুপ্রদেশের মরুভূমিগুলো ঠান্ডা হওয়ার কারণ কী ?

পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে গেছে নিরক্ষরেখা। উত্তরে রয়েছে কর্কটক্রান্তি আর দক্ষিণে মকরক্রান্তি। মজার বিষয় হলো, নিরক্ষরেখা বরাবর কোনো মরুভূমি নেই। কিন্তু কর্কটক্রান্তি আর মকরক্রান্তি রেখা বরাবর মরুভূমি রয়েছে । এর কারণগুলো শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্যে লেখার চেষ্টা করো।

মরুভূমির বালির ভেতর লুকিয়ে রয়েছে অপার বিস্ময়। যেখানে বৃষ্টি নেই, জল নেই, আছে শুধু ভয়াবহ উত্তাপ কিংবা ঠান্ডা, এরকম কষ্টকর পরিবেশেও ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে জীবজগতের অপার ভাণ্ডার। আমরা গরমে একটু কষ্ট পেলেই পাখা চালাই, কিংবা ঠান্ডায় কাঁথা বা লেপ চাপা দিই। কিন্তু শত কষ্ট সত্ত্বেও মরুভূমির জীবজগৎ মরুভূমি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চায় না। নানা মরুভূমিতে নানারকম জীবের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

নানাদেশের মরুভূমির জীবজগৎ

নীচের ছবিগুলো দেখো। তোমাদের ধারণা থেকে মরুভূমির জীবগুলোতে টিক (✓) চিহ্ন দাও:

পৃথিবীর প্রধান প্রধান মরুভূমি
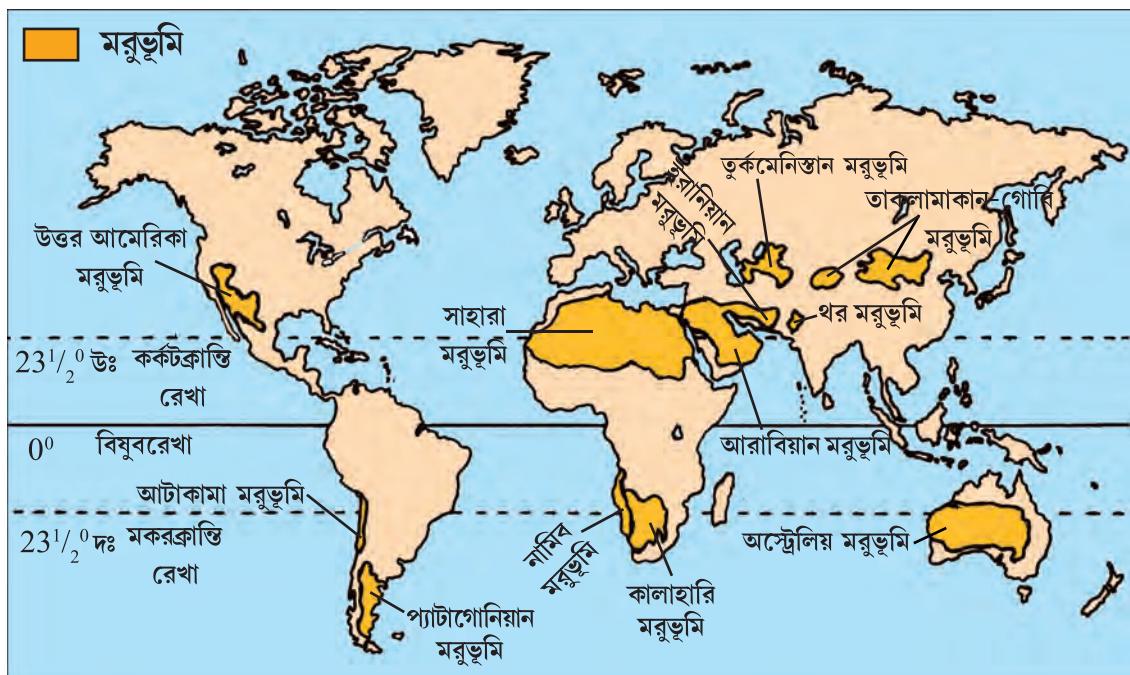
গরম/ঠান্ডা মরুভূমি	মরুভূমির নাম	কোন মহাদেশে অবস্থিত	প্রাণী
গরম	আরবের মরুভূমি	এশিয়া	উট, শেয়াল, খরগোশ, শজারু, বালি কেউটে, ক্যামেলিয়ন, কাঁকড়াবিছে, শকুন
ঠান্ডা	গোবি	এশিয়া	ব্যাক্ট্রিয়ান উট, বিটল, নীলপাহাড়ি পায়রা, ভালুক, বরফ চিতা, বন্য ভেড়া
গরম	থর	এশিয়া	কাঁটাওলা লেজবিশিষ্ট গিরগিটি, শেয়াল, উট, সাপ, শকুন
গরম	সাহারা	আফ্রিকা	পেঁচা, হরিণ, শজারু, শেয়াল, উটপাখি, হায়না

মরূদ্যান

যেখানে শুধু বালি আর বালি বৃষ্টির নামগন্ধও নেই, সেখানে মরূদ্যান! মানে গাছপালা, জলাশয়, নানা ধরনের প্রাণী। এও সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব, চারিদিকে বালির সমুদ্র মনে হলেও বালির নীচে অনেক গভীরে যে শিলাস্তর রয়েছে সেখানে রয়েছে জল। মরুভূমিতে যে সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি হয়, তার বেশিরভাগ অংশই বালির নীচে গভীরে সেই শিলাস্তরে জমা হয়। মরুভূমির কোথাও কোথাও এই শিলাস্তরে ফাটল ধরলে সেই জল বাইরে বেরিয়ে এসে তৈরি করে জলাশয়। আর সেই জলাশয়কে ঘিরেই জন্মায় গাছপালা। শুরু হয় নানা জীবের সংসার, নিষ্প্রাণ, নিস্তরঙ্গ বালির সমুদ্রের মাঝে একটুখানি প্রাণের ছোঁয়া। তবে বিশাল মরুভূমির মাঝে মরূদ্যানের সংখ্যা খুবই কম।

মরুভূমির গাছগাছালি

বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে নীচের তালিকাটি পূরণ করো—

বিষয়	কী কী দরকার	কোথা থেকে পায়
গাছপালা বেঁচে থাকার জন্য দরকার	জল	মাটির তলা থেকে
প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য দরকার		

মরুভূমিতে শুধু বালি আর বালি। সূর্যের তাপ ভয়াবহ। বাতাসে পর্যাপ্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড। কিন্তু মাটি নেই। জলের ভীষণ অভাব। এরকম অবস্থাতেও বালির বুক চিরে জন্মায় নানাধরনের গাছ। মরুভূমিতে প্রধানত দু-ধরনের গাছ চোখে পড়ে। এক ধরনের গাছ শুষ্কতাকে এড়িয়ে চলার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ে। মরে যাওয়ার আগে এই ধরনের গাছে ফুল ফোটে ও বীজ উৎপন্ন হয়। বীজগুলো অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। আরেক ধরনের গাছ শুষ্কতাকে প্রতিরোধ করতে থাকে। এদের কাণ্ড রসালো হয়। অল্প জলেই এরা বেঁচে থাকে অনেকবছর। দীর্ঘদিন নিজের শরীরে জল সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এদের মূল, কাণ্ড হয় খুব বড়ো, আর মোটা। পাতার বদলে থাকে কাঁটা। জল যাতে বাষ্প হয়ে না বেরোতে পারে তার জন্য সারা শরীর কিউটিকল নামক আবরণে ঢাকা। বালির মধ্যে সামান্য স্যাঁতস্যাঁতে ভাব থাকলেই, তার থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় জল সংগ্রহ করতে পারে। বেশ কিছু গাছের মূল বালি ভেদ করে অনেক গভীরে চলে যায়। জলের খোঁজে মূল অনেক গভীরে যায়, তাই তাদের মূলত্র বেশ শক্তপোক্ত। অতিরিক্ত জল যাতে বাইরে না বেরোতে পারে পাতাগুলোর পত্ররন্ধ্রের সংখ্যা কম। একটু বৃষ্টি হলেই আবার কিছু গাছ মাটি ফুঁড়ে ওঠে। তবে বেশিদিন বাঁচে না। অল্পদিনের আয়ুতেই গাছ ফুল-ফলে নিজেদের সাজায়। আবার কিছু গাছ আছে যারা জল ছাড়াই দীর্ঘদিন বাঁচে। এবার আমরা মরুভূমির নানা গাছের সঙ্গে পরিচিত হই।

ফণীমনসা : এই ধরনের গাছেদের মধ্যে প্রথমেই আসে ক্যাকটাসের নাম। সারা গায়ে কাঁটা ভরতি। সবদেশের মরুভূমিতেই রয়েছে এই প্রিকলি পিয়ার বা সাধারণ ফণীমনসা গাছ। গায়ে কাঁটা থাকায় অন্যান্য পশু-পাখিরা খেতেও পারে না। কাঁটা হলো ওদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। সবুজ রঙের কাণ্ড।

যশুয়া গাছ : প্রায় পনেরো থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা হয় এই গাছ। প্রায় দুশো বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। হলুদ-সবুজে ফুল ধরে। ঘন্টার মতো দেখতে। তবে গন্ধটা ভালো নয়। ফলগুলো আবার সবুজ আর খয়েরি। এই গাছের মূলটাও বেশ অন্যরকম। একধরনের মূল জল সঞ্চয় করে স্ফীত হয়ে কন্দ তৈরি করে। আর এক ধরনের মূল গভীরে চলে যায় জলের খোঁজে। পাতাগুলো কাঁটা কাঁটা। মানুষ এই গাছের ছালকে থালা, বাটি হিসাবে ব্যবহার করে।

সাগুয়ারো গাছ : দৈত্যাকার ক্যাকটাস সাগুয়ারো, প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু, প্রায় 200 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। পাতার বদলে কাঁটা ভরতি। পত্ররন্ধ্রের সংখ্যাও কম। প্রায় ছয় থেকে আট টন জল শরীরে জমিয়ে রাখতে পারে। জল সংগ্রহ করে বৃষ্টি থেকে। সাগুয়ারো সেজে ওঠে রাতে। হলুদ ফুলে ভরে ওঠে সারা শরীর। আলো ফোটার সঙ্গে ফুলগুলি চুপসে যায়। মরু অভিযাত্রীরা জল তেষ্টা মেটাতে এই গাছ ব্যবহার করে। গাছের বেরিয়ে থাকা কান্ড কেটে জল বার করে খায়। এর ফল ব্যবহার হয় জ্যাম তৈরিতে। কাঠের শক্ত দড়ি, বাড়ি তৈরিতেও কাজে লাগে।

মেশকুইট গাছ : এই গাছে কিন্তু পাতা আছে। নিজের শরীরে এরা জল ধরে রাখতেও পারে না। তাহলে বেঁচে থাকে কী করে, বালি ভেদ করে গভীর শিলাস্তর পর্যন্ত মূল পাঠিয়ে দেয়। সেখানকার জলস্তর থেকে জল সংগ্রহ করে দিব্যি বেঁচে থাকে। তবে এরা বালিয়াড়ির কাছে জন্মায়। মরুভূমির বালিয়াড়িকে রক্ষা করে।

খাবার হিসাবে ক্যাকটাস : মরুভূমির মানুষদের কাছে ক্যাকটাস খুব প্রয়োজনীয় গাছ। ক্যাকটাসের মূলে জমা থাকে খাবার। তাই সেগুলো বেশ বড়ো আর মোটা। মরুভূমির বালির নীচে লুকিয়ে থাকা মূল বালির সজ্জা দেখে বুঝে নেয় মরুভূমির মানুষ। অনেক ক্যাকটাস মানুষের খাবারের জোগানও দেয়। সাগুয়ারো গাছের ফল তরমুজের মতো দেখতে।

বাড়িতে ও আশেপাশে তোমরা ক্যাকটাস দেখেছ। তোমার দেখা ক্যাকটাসের ছবি আঁকো। তারপর দলে আলোচনা করে নীচের তালিকা পূরণ করো।

মূল	কাণ্ড	কাণ্ডের রং	পাতা	ফুল	ফল	কী কাজে লাগে

মরুভূমির প্রাণী

মরুভূমিতে উদ্ভিদের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে প্রাণীদের জীবন আরও দুঃসহ। এরা সরাসরি সূর্যের বিকিরিত তাপ গ্রহণ করে। পাথর ও মাটি থেকে পরিবহণ পদ্ধতিতে এবং বাতাস থেকে পরিচলন পদ্ধতিতে এদের দেহে তাপ প্রবেশ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জল না পাওয়ার সমস্যা। এর মধ্যেও উটের মতো কোনো কোনো প্রাণী গঠনগত,শারীরবৃত্তীয় ও আচরণগত নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে এখানে বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে।

1) বলোতো উটের কুঁজে কী থাকে?

2) মরুভূমিতে যাতায়াতে উট প্রধান ভরসা, এই উটকে কী বলে ?

মরুভূমিতে যেদিকে তাকাবে শুধু বালি আর বালি। দিনের বেলায় ভয়াবহ উত্তাপ, রাতের বেলা ঠান্ডা, কোথাও যেন প্রাণের চিহ্ন নেই। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমির রূপ যায় পালটে। বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে নানা ধরনের জীবজন্তু, সাধারণত বালির উপর দাপিয়ে বেড়ায়। ভোর হলেই অদৃশ্য, তবে বেশ কিছু প্রাণী আছে যাদের দিনের বেলাতেও দেখা যায়। বেশিরভাগ মরুপ্রাণী আকারে ছোটো হয়। বালির নীচে লুকিয়ে থাকে। তারা জলের অভাব পূরণ করতে শিকার ধরে।

উট : বেশ বড়ো প্রাণী, দু-ধরনের হয়। এক কুঁজ-বিশিষ্ট (অ্যারাবিয়ান) আর দুই কুঁজ-বিশিষ্ট (ব্যাক্ট্রিয়ান)।

মরুভূমিতে যাতায়াতের প্রধান ভরসা, খুব কষ্ট করতে পারে। পিঠের কুঁজটা কিন্তু জল সঞ্চয়ের থলি নয়। এটা হলো চর্বি সঞ্চয় করে রাখা শরীরে একটা অংশ। এই চর্বি থেকে উট শক্তি জোগাড় করে। উট প্রায় 7 দিন পর্যন্ত না খেয়ে থাকতে পারে। উটের হাঁটুর কাছে আর পেটের নীচে মোটা চামড়ার আস্তরণ আছে যা বালিতে বসতে সাহায্য করে। মরুভূমিতে মাঝে মাঝেই মরুঝড় হয়। বালিতে বালিতে চারদিক অন্ধকার। উটের তার নাকের ফুটো প্রয়োজনে বন্ধ করতে ও খুলতে পারে, চোখের পাতা স্বচ্ছ। চোখের ওপরে ভুরু ছোটো মোটা ঝোপের মতো। উটের ঠোঁট এবং জিভ শক্ত পেশি দিয়েই তৈরি, যাতে কাঁটা ঝোপ খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। উটরা প্রায় পঁচিশ গ্যালনের মতো জল একসঙ্গে পান করতে পারে। এদের দেহে ঘর্মগ্রন্থির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। যাতে শরীর থেকে বেশি জল বেরিয়ে না যায়, তাই এদের মূত্র ঘন হয়। এদের পা অনেকটা চওড়া। আর পায়ের পাতা বেশ পুরু। ওপরের তথ্যগুলো থেকে নীচের বক্তব্যের যথার্থতা বিচার করো—

কোনো একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের জীবের উপস্থিতি ওই অঞ্চলের আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। উটের মতো অন্যান্য যে সকল প্রাণীরা মরুভূমিতে থাকে তারা কীভাবে তাপ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে?

1. কোনো কোনো প্রাণী কেবল রাতের বেলায় বের হয়।
2. কোনো কোনো প্রাণী খুব ভোরে বা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় কেবল কয়েক ঘণ্টার জন্য সক্রিয় হয়।
3. কোনো কোনো প্রাণী গরমকালে শুষ্ক জায়গা থেকে উঁচু ঠাণ্ডা জায়গায় চলে যায়। আবার শীতকালে চলে আসে।
4. তাপমাত্রা খুব বেড়ে গেলে কোনো কোনো প্রাণী এস্টিভেশন বা গরম ঘুমে চলে যায়। এসময় তাদের শ্বাসক্রিয়া, হৃদকম্পনের হার কমে যায়।
5. কোনো কোনো প্রাণীর ত্বক অপেক্ষাকৃত পুরু হয় যাতে জল বেরিয়ে না যেতে পারে।
6. কোনো কোনো প্রাণীর পা খুব লম্বা হয়, যাতে দ্রুত দৌড়োতে ও অনেকটা উঁচু পর্যন্ত লাফাতে সুবিধা হয়। এতে তপ্ত বালির সরাসরি সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা কমে।

মরুভূমির গিরগিটি : এরা খুব একটা লম্বা নয়। তবে একটু চওড়া গোছের। এরা দিনের বেলায় বালির মধ্যে ঢুকে থাকে। সন্ধ্যের দিকে বেরিয়ে আসে খাবারের খোঁজে । যখন বালির ওপর দিয়ে ছুটে যায় মনে হয় যেন বালির উপর দিয়ে সাঁতার কাটছে। এদের চওড়া লেজে চর্বি সঞ্চয় করা থাকে। চোখের পাতা স্বচ্ছ চামড়া দিয়ে ঢাকা। পোকামাকড় খেয়েই বেঁচে থাকে।

র‍্যাটল সাপ : মরুভূমির সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ। লেজের কাছে ফাঁপা ঝুমুরের মতো ঝুমঝুমি বা Rattle দেখা যায়। খুবই ভালো সাঁতার কাটতে পারে। যত বয়স হয় তত এদের ঝুমঝুমি বা Rattle লম্বা হয়। এদের শরীরে ঠান্ডা রক্ত থাকে, শরীরে শুকনো আঁশ রয়েছে। এই সাপের জিভ খুবই সক্রিয়। দুটো ফাঁপা বিষদাঁত রয়েছে। এরা মাংসাশী প্রাণী। রাতের বেলা বের হয়। শিকারের ওপর বিষ ঢেলে দেয়। মাংস নরম হয়ে যায়, তারপর খায়। তবে এদের শত্রু হলো ঈগল।

জারবিল : ছোটো, ইঁদুরের মতো প্রাণী । বালি খুঁড়ে বালির ভেতর থাকে। রাতের বেলা বের হয়। এরা ক্যাঙারুর মতো লাফাতে পারে। এদের ক্যাঙারু ইঁদুরও বলা হয়। এরা কোনোরকম জল না পান করেই সারা জীবন থাকতে পারে। এদের লম্বা লেজ থাকে। সাদা থেকে খয়েরি রঙের হয়। তবে শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য বালির মতো রং ধারণ করতে পারে। এদের কান খুব সক্রিয়। এরা সাধারণত ঘাস বীজ, ছোটো শস্য,ফল, ছোটো ছোটো পোকামাকড় খেয়ে বেঁচে থাকে, খাবার থেকেই জল পায়। এমনকি বালির নীচে খাবার জমিয়েও রাখে।

থর মরুভূমিতে এমন কিছু প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় যা অন্য মরুভূমিতে দেখা যায় না। থর মরুভূমির একটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী হলো কৃষ্ণসার হরিণ। এছাড়া এক ধরনের বুনো গাধা আছে যাদের গায়ের রং বালির রঙের সঙ্গে মিশে যায়। থর মরুভূমির সবচেয়ে বড়ো পাখি হলো 'বাস্টার্ড'। রয়েছে ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর। এত ময়ূর ভারতের অন্য কোথাও দেখা যায় না। চিল, ঘুঘু, বালি মোরগও রয়েছে এখানে।

মরুভূমিতে থাকা বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীদের আচরণ তোমরা জানলে। এবার তোমরা আলোচনা করে মরুভূমিতে বেঁচে থাকা উদ্ভিদ ও প্রাণীদের তালিকা তৈরি করো। তারপর তাদের বেঁচে থাকার জন্য শরীরের কোন কোন অংশ সক্রিয় তা উল্লেখ করো।

উদ্ভিদ ও প্রাণীদের নাম	মরুভূমিতে বেঁচে থাকার জন্য প্রধান অঙ্গ	কারণ
1. ফণীমনসা		
2. উট		
3. জারবিল		
4. অস্ট্রিচ		
5.		
6.		
7.		

মরুভূমিতে মানুষ

মরুভূমির মতো শুকনো অঞ্চলে মানুষ কীভাবে বাঁচবে? মরুভূমি কী মানুষের বসবাসের উপযোগী হতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই, আদিমকাল থেকেই মানুষ মরুভূমিতে বাস করে আসছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার নামিব মরুভূমিতে বসবাসকারী মানুষদের বুশম্যান বলে। এরা বালির ভেতরে গর্ত করে থাকে। তিরধনুক নিয়ে প্রাণী শিকার করে। তারপর সেই প্রাণী ঝলসে খায়। কালাহারি মরুভূমিতে বসবাসকারী মানুষদের স্যান বুশম্যান (San Bushman) বলে। এরা ভিজে বালির মধ্যে গর্ত করে নলাকার ঘাস ঢুকিয়ে জল টেনে খায়। অস্ট্রিচের ডিমের খোলককে জল খাবার পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে। এরা মরুভূমির বালি সজ্জা দেখে বলে দিতে পারে বালির তলায় জল আছে বা নেই। সাহারা মরুভূমির আদিবাসী তুয়ারেগরা ঘাস দিয়ে ঝুপড়ি তৈরি করে থাকে। মাটির নীচেও এদের ঘরবাড়ি হয়। মাটির নীচে সুড়ঙ্গ তৈরি করে সুড়ঙ্গপথে যাতায়াত করে।

আমেরিকার মরু অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ানরা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। সবাই মিলে বাড়ি বানায়, প্রতিটি বাড়িতে বেশ কয়েকটা ঘর থাকে। পাথরের তৈরি এই বাড়িগুলিকে পুয়েবলা বলে।

থর মরুভূমিতে যারা থাকে তাদের মধ্যে ওয়াধা, ভীল, গাদি-লোহার সম্প্রদায়ের মানুষেরা উল্লেখযোগ্য। এরা মূলত যাযাবর।

সাহারা ও আরব মরুভূমির বেদুইনরা সারা শরীর লম্বা- ঢিলে ঢালা পোশাকে ঢেকে রাখে, যাযাবরের মতো উটের পিঠে চেপে মরুভূমির ওপর মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে কিছুদিন তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম নেয়। তারপর আবার শুরু হয় পথ চলা।

খাতায় ভারতের মানচিত্র আঁকো। তারপর ভারতের মরু অঞ্চল চিহ্নিত করো।

মরু প্রসার রোধে কী কী ভূমিকা গ্রহণ করা যেতে পারে তা চিহ্নিত করো।
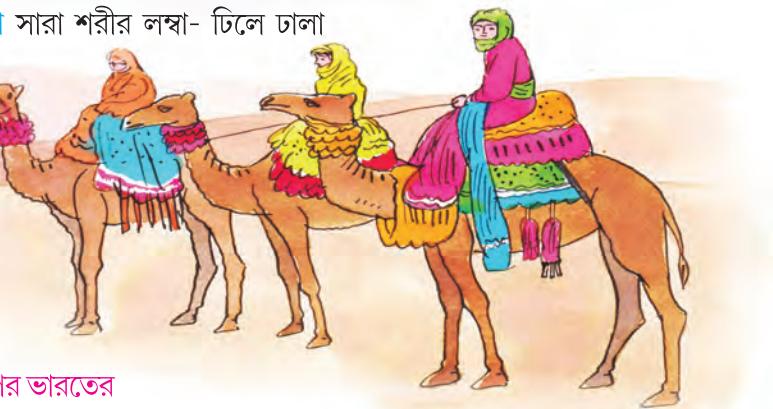
ইউনাইটেড নেশনস-এর পক্ষ থেকে 2006 সালকে 'আন্তর্জাতিক মরুভূমি ও মরুকরণবর্ষ' রূপে ঘোষণা করা হয়। মাটির ক্ষয় ক্রমশ বেড়ে চলায় ও মাটির জৈব উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকায় মরুভূমির বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

মেরু অঞ্চলের জীবজগৎ

মেরু অঞ্চল বলতে কোন অঞ্চলকে বোঝায়?

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে যে ভৌগোলিক অঞ্চল অবস্থান করে তাই হলো মেরু অঞ্চল। উত্তর মেরুকে ঘিরে থাকা অঞ্চল আর্কটিক বা সুমেরু ও দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে থাকা অঞ্চল অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু নামে পরিচিত।

আর্কটিক অঞ্চল হলো প্রায় সমস্ত সুমেরু মহাসাগর ও তাকে ঘিরে ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশের উত্তরাংশের দেশ বা তাদের প্রান্তসীমাসমূহ। অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চল হলো অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ ও তাকে ঘিরে থাকা কুমেরু মহাসাগরের অংশবিশেষ অঞ্চলসমূহ।

টুকরো কথা

গ্রীষ্মের ঠিক মধ্যভাগে আর্কটিক ও অ্যান্টার্কটিকের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে প্রায় 24 ঘণ্টা সূর্যের আলো থাকে। আর শীতের মধ্যভাগে এর ঠিক উলটো ঘটনা ঘটে, 24 ঘণ্টা জুড়ে শুধুই অন্ধকার।

আর্কটিক বা সুমেরুর জীবজগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জলজ স্তন্যপায়ীদের প্রাধান্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তিমি, সিল, সি লায়ন,বলগা হরিণ, কুকুর ও ডলফিন। এছাড়াও মেরু ভালুক, আর্কটিক টার্ন নামক পাখি ও মস, ঘাস, লাইকেন, বার্চ জাতীয় উদ্ভিদ দেখা যায়।

কী করে এত ঠান্ডাতেও সুমেরুর প্রাণীরা বেঁচে থাকে?

- শীতঘুম (Hibernation)

সুমেরুতে ঠান্ডা শুরু হওয়া মাত্র স্থলবাসী অনেক প্রাণী 'শীতঘুমে' চলে যেতে শুরু করে। এই সময় এরা চলাফেরা করে না। দেহের তাপমাত্রা খুব কমে যায়। হৃৎস্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়ার হার কমে যায়। কোনো কোনো শীতঘুমে যাওয়া প্রাণী আবার গর্তের মধ্যে খাবার জমিয়ে রাখে।

- পরিযান (Migration)

এক বাসস্থান ছেড়ে অন্য বাসস্থানে যাওয়াই হলো পরিযান। ম্যাপ বা কম্পাসের সাহায্য ছাড়াই নানা প্রাকৃতিক চিহ্ন (পর্বত, নদী, তটরেখা, উদ্ভিদ, বায়ুর গতিপ্রকৃতি) দেখে সুমেরুর বহু পাখি, বলগা হরিণ খাদ্যের সন্ধানে বা বাচ্চা দেওয়ার জন্য ঠান্ডা জায়গা ছেড়ে অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় পাড়ি দেয়। আর্কটিক টার্ন-রা প্রায় 11,000 মাইল পাড়ি দিয়ে সুমেরু থেকে কুমেরুতে পৌঁছোয়।

কখন সুমেরুর প্রাণীরা বাচ্চা দেয় বা ডিম পাড়ে?

সুমেরুর শীতকালে প্রচণ্ড ঠান্ডায় বেশিরভাগ জীবই বাচ্চা দেয় না। কারণ বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখার উপযুক্ত খাদ্যের অভাব। তাই বসন্তের শেষ থেকে প্রাণীরা নিজেদের অঞ্চল নির্দিষ্ট করে নেয়। আর স্বল্পস্থায়ী গরমের দিনগুলোতে বাচ্চা দেয় বা ডিম পাড়ে। এসময় গাছে গাছেও ফুল আসে যাতে শরতের আগেই গাছের বীজ দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

মেরু ভালুকরা আবার বাচ্চা দেওয়ার জন্য শীতকালকে বেছে নিয়েছে। এরা শীতকালে শিশু ভালুকের জন্ম দেয়। শীতের মাসগুলোতে বরফগুহায় এদের লুকিয়ে রাখে। এসময় শিশুরা মা ভালুকের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে। বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে এরা গুহা থেকে বেরিয়ে আসে।

মেরু ভালুকেরা কীভাবে সুমেরুতে বেঁচে থাকে?

তোমরা কী কখনও বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া মেরু ভালুকের ছবি দেখেছ? এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। ভালুকদের গায়ের সাদা লোম বরফ ও তুষারের রং -এর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় সহজে এদের চলমান অবস্থায় চেনা যায় না। এর ফলে শিকারের ওপর এদের অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে সুবিধা হয়। এদের লোমের তন্তুগুলো খুব স্বচ্ছ যা সূর্যের আলো শোষণ করে তাপ ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে এদের শরীর গরম থাকে। প্রবল ঠান্ডাকে আটকানোর জন্য এদের চামড়ার ওপর ঘন লোমের দু-দুটি আস্তরণ থাকে। আর শরীরের একদম নীচের চামড়া কালো রঙের। ফলে সূর্যের তাপ যতটা সম্ভব ধরে রাখা সম্ভব হয়।

প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য মেরু ভালুকের আরেকটি হাতিয়ার হলো ফ্যাট। ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে এদের চামড়ার নীচে প্রায় 10 cm পুরু ফ্যাট থাকে। সেজন্য এরা সহজে জলে ভেসে থাকতে পারে।

জলে সাঁতার কাটার জন্য মেরু ভালুকের সামনের পায়ের থাবাগুলো আংশিকভাবে জোড়া থাকে। বড়ো ও ভারী সামনের পা-ও একাজে তাদের সাহায্য করে। এছাড়া এদের চোখও জলের অনেক নীচের জিনিস দেখতে ও চিনতে সাহায্য করে।

ভালুকের পা বরফের জুতোর মতো। এদের পায়ের তালুতে যে বিশেষ ধরনের লোম থাকে তা বরফ ও তুষারের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় হড়কে যাওয়া থেকে আটকায়। আর এদের ঘ্রাণগ্রহণ ক্ষমতাও অনেক বেশি। প্রায় 32 km দূরে থাকা কোনো সিলের গন্ধও এরা শুঁকতে পারে। মেরু ভালুকদের কোনো প্রাকৃতিক শত্রু নেই। কিন্তু জীবজগতের তিনটি আশঙ্কাজনক প্রাণীর মধ্যে (বাঘ, গরিলা, মেরু ভালুক) এটি অন্যতম।

মেরু ভালুকের সামনে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে যে হারে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করছে, তাতে এদের বাসস্থান ও বিচরণক্ষেত্র ক্রমশই সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আর বহু বছর ধরে লোম, চামড়া, নখের জন্য এদের শিকারও করা হয়েছে।
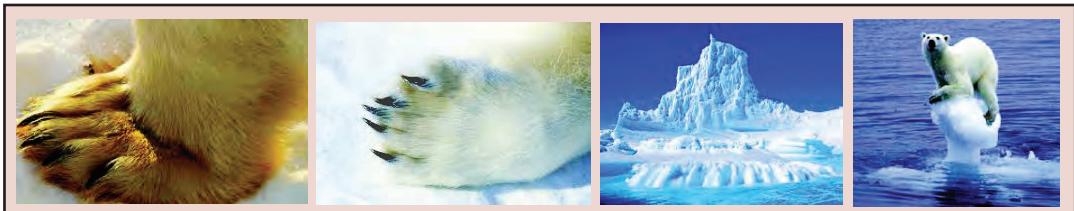
মাছেরা কীভাবে সুমেরুর কম তাপমাত্রায় বেঁচে থাকে?

সুমেরু মহাসাগরের জলে প্রায় 240 ধরনের মাছ থাকে। শুষ্ক মিষ্টিজলের পুকুর বা নদীতে ওপরের জল জমে বরফ হয়ে গেলেও নীচের স্তরের জল তরল থাকে। আর তাতে মাছেরা দিব্যি বেঁচে থাকে। আর নোনাজলের সমুদ্রে হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা নেমে গেলেও জলের নুন এদের দেহকে জমে যেতে বাধা দেয়। আর এদের দেহে কিছু অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন থাকে যা দেহের ভেতরে জলকে বরফ হতে বাধা দেয়।

মেরু অঞ্চলের মানুষ

আর্কটিক মেরু অঞ্চলে আমরা আজ যাঁদের স্থায়ীভাবে বাস করতে দেখি তাঁরা হলেন এস্কিমো। 'এস্কিমো' শব্দের অর্থ হলো 'যারা কাঁচা মাংস খায়।' এঁদের পূর্বপুরুষেরা এশিয়া থেকে একটি ভূ-সংযোগ অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছেছিলেন যার আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

এস্কিমোরা মাত্র এক ঘন্টায় বরফ দিয়ে তাঁদের 'বরফবাড়ি' বা ইগলু বানিয়ে ফেলেন। এস্কিমোরা সবসময় কিন্তু ইগলুতেই থাকেন তা না। দূর গন্তব্যে চলার পথে কানাডার এস্কিমোরাই একমাত্র এধরনের 'বিশ্রাম আবাস' তৈরি করে।

এস্কিমোদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য। উত্তর মহাসাগরের ঠান্ডাজলের সিল, স্যামন, কডমাছ হলো এদের প্রধান খাদ্য। সেইসঙ্গে এঁরা হাঁস, খরগোশ, মেরু শিয়াল এমনকি মেরু ভালুক ও তিমি শিকার করে মাংস খান।

এস্কিমোদের জীবনের অপরিহার্য হলো কুকুর। পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এস্কিমোদের শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াতে হয়। আর তা খালি পায়ে ঘোরা সম্ভব নয়। তাই এস্কিমোদের কুকুরে টানা স্লেজগাড়ির ওপর নির্ভর করতে হয়। তাছাড়া শিকার চিহ্নিত করতেও কুকুরদের ঘ্রাণশক্তিকে এস্কিমোরা ব্যবহার করেন।

অ্যান্টার্কটিক মেরু অঞ্চলের জীবজগৎ

দক্ষিণ মেরুতে উত্তর মেরুর মতো সিল, তিমি, ডলফিন দেখা গেলেও মেরু ভালুক নেই। আর দেখা যায় পেঙ্গুইন যা উত্তর মেরুতে অনুপস্থিত।

পেঙ্গুইন—অ্যান্টার্কটিকার বিস্ময়

অ্যান্টার্কটিকায় যে সকল পেঙ্গুইন প্রজাতি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হলো এম্পারার পেঙ্গুইন।

এম্পারার পেঙ্গুইনের জীবন ইতিহাস বিস্ময়কর কেন?

পেঙ্গুইনদের মধ্যে বৃহত্তম হলো এম্পারার পেঙ্গুইন। এরা বরফ ও জল উভয় জায়গাতেই থাকে। শীতকালে অ্যান্টার্কটিকায় যখন প্রবল হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা, ঘন অন্ধকার নেমে আসে, তখনই এম্পারার পেঙ্গুইন বংশবিস্তার করে। এরা একটিমাত্র ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পরে মেয়ে পেঙ্গুইন খাবার খুঁজতে দূরের সমুদ্রে চলে যায়। পুরুষ এম্পারার পেঙ্গুইন ওই ডিমটিতে তা দেয়। পুরুষ পেঙ্গুইন তার দু-পায়ের সঙ্গে একটি চামড়ার ভাঁজের নীচে ডিমটিকে ধরে রাখে। ডিমে তা দেওয়ার সময় হলো প্রায় দু মাস। এসময় পুরুষ এম্পারার পেঙ্গুইনরা অনেকে একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে। দীর্ঘ সময় কিছু না খাওয়ার ফলে এদের ওজন খুব কমে যায়। কিন্তু ডিম ফুটে বেরোনো বাচ্চাকে পুরুষরাই প্রথম খাওয়ানোর দায়িত্ব নেয়। তারপর মা ও বাবা দুজনেই বাচ্চাকে বড়ো করার দায়িত্ব নেয়। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময় বরফখণ্ডে বাচ্চা পাখিরা চড়ে বসে এবং জীবনে প্রথমবার জলের সংস্পর্শে আসে। তখন সমুদ্রের জলে থাকা বিভিন্ন প্রাণীদের ধরে খেতে শেখে।

পেঙ্গুইনের সংকট

ফ্যাটের লোভে ষোড়শ শতাব্দী থেকে মানুষ পেঙ্গুইন শিকার করতে শুরু করে। পেঙ্গুইনের তেল থেকে বিভিন্ন কারখানায় সাবান ও জ্বালানি তৈরি শুরু হয়। পেঙ্গুইনের তেল থেকে একসময় এমনকি ওষুধও তৈরি হতো। পেঙ্গুইনের পালক জামাকাপড়, টুপি, জুতো ও ব্যাগ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো। **1905 সালে আন্তর্জাতিক পক্ষী মহাসভা পেঙ্গুইনদের রক্ষা করার জন্য আবেদন জানায়। 1959** সালে **12** টি দেশ অ্যান্টার্কটিক চুক্তিতে সই করে। এর ফলে অ্যান্টার্কটিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পেঙ্গুইনদের রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

অ্যান্টার্কটিকার পরিবেশ ও দূষণ

পৃথিবীর সবথেকে কম দূষিত স্থান হলো অ্যান্টার্কটিকা। কিন্তু মানুষ সে জায়গাও দূষিত করতে শুরু করেছে। অ্যান্টার্কটিকায় যদি কোনো দূষিত পদার্থ পাওয়া যায়, দেখা যায় তার উৎস হলো পৃথিবীর অন্য জায়গায়।

মানুষের ব্যবহৃত নানা ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন ও হ্যালন জাতীয় যৌগ অ্যান্টার্কটিকার ওপরে থাকা ওজোনস্তরের ঘনত্ব কমিয়ে দিয়েছে। ফলে দেখা দিয়েছে ওজোন ছিদ্র। আর ওই ছিদ্র দিয়ে ক্রমাগত অত্যন্ত ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পড়ছে। ফলে মানুষের ত্বকে ক্যানসার, চোখে ছানি পড়া ও জলে বসবাসকারী নানা আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের সংখ্যা কমার ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে।

অ্যান্টার্কটিকায় জাহাজের চলাচল ক্রমশ বাড়তে থাকায় সমুদ্রের জলে চুঁইয়ে পড়া তেল ক্রমাগত মিশে জলকে দূষিত করে চলেছে। মাছ ধরার জাল, যন্ত্রপাতি, দড়ি, বাক্সের ক্রমাগত ব্যবহার বাড়তে থাকায় পাখি ও সিলেরা যখন-তখন এতে আটকে মারা পড়ে।

নীচের ছবিগুলোতে ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মেরু অঞ্চলে কোনটি কোন ধরনের দূষণ তা চিহ্নিত করো।
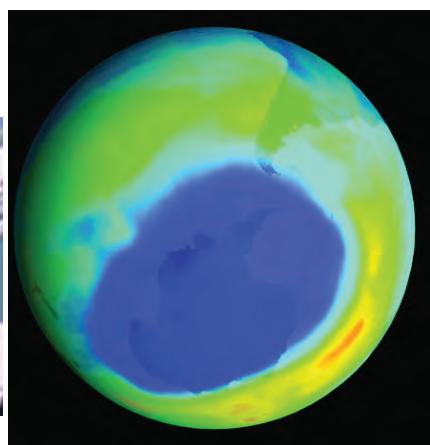
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে মানুষের জীবন নানাভাবে জীববৈচিত্র্যের ওপর নির্ভরশীল।

কী ধরনের নির্ভরশীলতা	কোন ধরনের জীবের ওপর নির্ভর করা হয়
1) খাদ্য	
2) বাসস্থান	
3) পোশাক	
4) জ্বালানি	
5) বাণিজ্যিক উপকরণ	
6) ওষুধ	

কিন্তু মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীববৈচিত্র্যের নানাভাবে সংকোচন ঘটেছে। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নানাধরনের বন্যপ্রাণীরা।

মানুষের যেসব আচরণের ফলে বন্যপ্রাণীর বিপন্নতা বাড়ছে সেগুলো হলো —

- সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার
- বন কেটে ফেলা
- বন্যপ্রাণীর বাসস্থান নষ্ট করে ফেলা
- পরিবেশকে দূষিত করা
- অন্য দেশ বা জায়গা থেকে অপরিচিত প্রজাতিকে নিয়ে আসা
- আবহাওয়ার পরিবর্তন
- শিকার করা বা
- বন্যপ্রাণীর দেহের নানা অংশকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা।

নীচের তালিকায় নাম দেওয়া প্রাণীগুলো কোন কোন পরিবেশে পাওয়া যায় এবং এদের বিপন্নতার কারণ পরের পাতার লেখাগুলো পড়ে এবং অন্যান্য সূত্রে খোঁজখবর নিয়ে নীচে লেখো।

প্রাণীর নাম	কোন কোন পরিবেশে থাকে	এদের সমস্যা
1) শকুন		
2) একশৃঙ্গ গন্ডার		
3) বাঘরোল/মেছো বিড়াল		
4) গঙ্গার শুশুক		

• এছাড়াও এরকম আরো যে অসংখ্য প্রাণী আছে যারা বিপন্ন বা বিলুপ্তির মুখোমুখি তাদের কথা জানব কী করে?

IUCN(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বিপন্ন জীবদের একটি তালিকা প্রকাশ করে। এই তালিকার নাম হলো Red Data Book। এদের তালিকায় বিভিন্ন প্রজাতিকে নানাস্তরে বা ক্যাটিগোরিতে ভাগ করা হয়েছে।

1) বিলুপ্ত (Extinct) — এধরনের প্রজাতির শেষ প্রাণীটিরও মৃত্যু হয়েছে। আর কোনোদিনই একে দেখা যাবে না।

2) বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত (Extinct in Wild) — এধরনের প্রজাতিকে কৃত্রিমভাবে প্রজনন ঘটিয়ে বা চিড়িয়াখানায় বন্দি অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

3) অতিসংকটাপন্ন-ভাবে বিপন্ন(Critically Endangered) — নিকট ভবিষ্যতে যে-কোনো সময়ে প্রজাতিটি স্থায়ীভাবে হারিয়ে যেতে পারে।

4) বিপন্ন (Endangered)— নিকট ভবিষ্যতে না হলেও বন্য পরিবেশে এদের বিলুপ্তির সম্ভাবনা যথেষ্টই।

5) বিপদগ্রস্ত (Vulnerable) — অদূর ভবিষ্যতে এই প্রজাতিটি হয়তো পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

6) কম বিপদগ্রস্ত (Lower Risk) — যখন কোনো প্রজাতিভুক্ত জীবের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে কম হলেও ওপরের তিনটি ক্যাটিগোরিতে (3,4,5) এদের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

7) তথ্য অনুপস্থিত (Data Deficient)— এই প্রজাতিভুক্ত প্রাণীদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আলোচনা হলেও বিস্তৃতি বা সংখ্যার প্রাচুর্য নিয়ে সঠিক তথ্য অনুপস্থিত।

8) যখন কোনো প্রজাতির প্রাণীকে ওপরের কোনো মাপকাঠিতে ফেলা যায় না, তখন তাকে সমীক্ষা করা হয়নি (Not Evaluated) এমন গোষ্ঠীতে রাখা হয়।

তথ্যের অভাবে ওপরের 7 ও 8 এর ক্যাটিগোরিকে পিরামিডে স্থান দেওয়া যায় না।

ভারতবর্ষের এরকম কতকগুলি বিশেষ বিপন্ন প্রাণী হলো

• রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার	• খাঁড়ির কুমির	• গঙ্গার শুশুক
• এশিয়াটিক লায়ন	• শকুন	
• একশৃঙ্গ গন্ডার	• রেড পান্ডা	
• লায়ন-টেইলড ম্যাকাক	• তুষার চিতা	

বিপন্ন জীবকে কীভাবে বাঁচানো সম্ভব

বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিপন্ন জীবকে রক্ষা করার জন্য নানা দেশে নানা প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্গত জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণের জন্য গৃহীত সকল পদ্ধতিকেই একত্রে ‘জিন ব্যাঙ্কস’ বলা হয়। একে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় —

বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকে যখন তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে (সাধারণ বাস্তুতন্ত্র বা মানুষের তৈরি বাস্তুতন্ত্র) সংরক্ষণ করা হয় তখন ওই জীবের স্বাভাবিক বাসস্থান বা মানুষের তৈরি বনকে সংরক্ষিত বন বলে ঘোষণা করা হয়। এটা আবার নানাধরনের হয়— অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক, বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ও ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্য। এই ধরণের সংরক্ষণকে ইন সিটু (In Situ) সংরক্ষণ বলা হয়।

আবার যেসব জীবকে কোনোভাবেই তার স্বাভাবিক বাসস্থানে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান থেকে দূরে অন্য কোনো স্থানে (চিড়িয়াখানায় বা বোটানিক্যাল গার্ডেনে) রেখে বেঁচে থাকার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে কৃত্রিমভাবে সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। এধরনের সংরক্ষণকে এক্স সিটু (Ex Situ) সংরক্ষণ বলা হয়। এছাড়াও বিশেষত অণুজীব ও উদ্ভিদের জিন, কোশ, কলা ও বীজকে গবেষণাগারে সংরক্ষণ করে রাখা হয়।
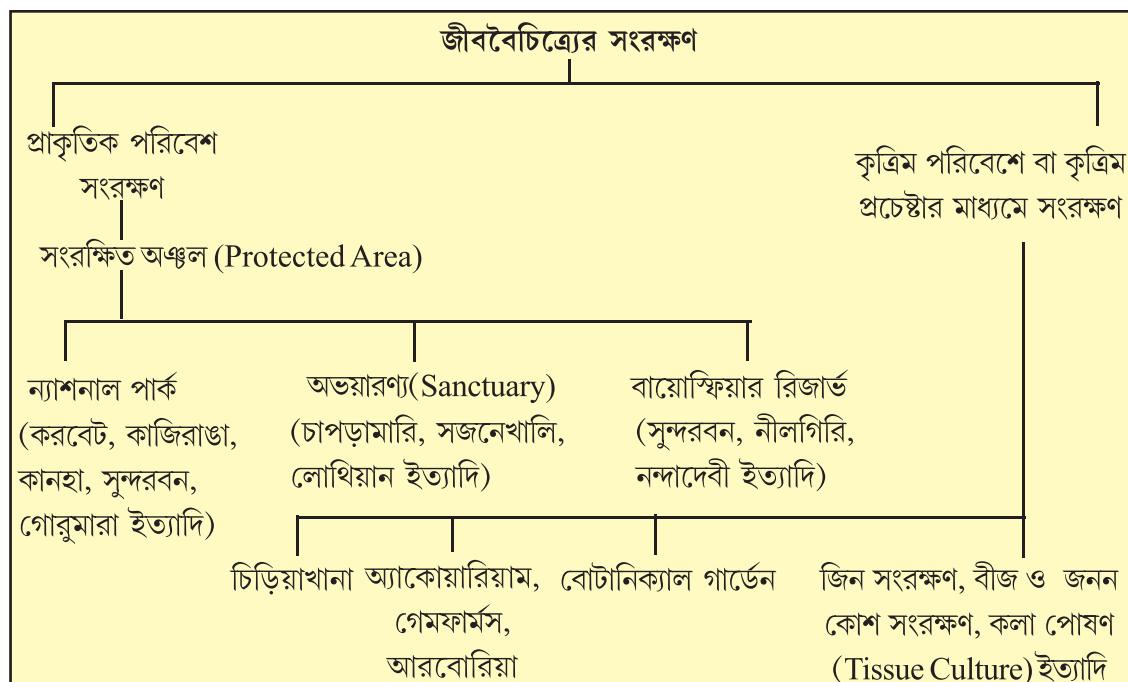
বসুন্ধরা শিখর সম্মেলন (Earth Summit)

1992 সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে পরিবেশ বিষয়ক একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তার নিয়ন্ত্রণের জন্য একুশ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। একে অ্যাজেন্ডা-21 বলা হয়। এর মুখ্য বিষয়গুলো হলো—স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development), বনের সংরক্ষণ, পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, জলসম্পদের সঠিক ব্যবহার, সমুদ্রের সুরক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মানুষের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ইত্যাদি।

কয়েকটি বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও তাদের সংরক্ষণ

IUCNএকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যাঁরা প্রকৃতিতে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবদের বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেন এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগে সহায়তা করেন। IUCN-এর বিচারে যেসব প্রাণীর বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবন এরকম কয়েকটি পরিচিত প্রাণীর কথা বলা হলো।

শকুনদের বেশ বড়োসড়ো চেহারা, তবে মোটেই সুন্দর নয়। কালচে-খয়েরি শরীরের রং, রোগা, লম্বা পালকহীন বাঁকা গলা। ওই লম্বা গলা পশুর মৃতদেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় খাবার সংগ্রহের জন্য। বিশ্রামের সময় তাদের পিছনদিকের সাদা অংশ দেখা যায়, আর ওড়ার সময় যখন ডানাগুলো মেলে দেয় তখন নীচের সাদা পালক দেখেই তাদের চেনা যায়।

সাফাইকর্মী শকুন

গ্রামের কিংবা শহরের শেষপ্রান্তে লম্বা বা ঝাঁকড়া গাছে শকুনরা থাকত। দল বেঁধে অপেক্ষায় থাকত কখন একটা মরা পশু আসবে। ভাগাড়ে বা অন্য কোথাও মরা পশুর দেহ পেলেই ওরা ওই পশুর ওপর বসে প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করতো, শহরের যাবতীয় আবর্জনাস্তূপ থেকে মৃত প্রাণীর শব খেয়েই ওদের জীবন চলতো। ফলে সব পচে মহামারি সৃষ্টিকারী জীবাণুরা বিস্তারলাভ করতে পারত না।

শকুনের বাসা

অশ্বত্থ, বট, শিরীষ, তাল, তেঁতুল, শিমুল, পাকুড় প্রভৃতি গাছের ডালে ওরা বাসা বাঁধতো । কাঠকুটো, ডালপালা জোগাড় করে ডালের খাঁজে বেশ শক্তপোক্ত বাসা ছিল ওদের। সেপ্টেম্বর থেকে মার্চের মধ্যে ওরা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে। একটা পাখি একটাই ডিম পাড়ে। বহুতল বাড়ি তৈরির প্রয়োজনে গাছগুলো কেটে ফেলায় শকুনের বাসা বাঁধার জায়গা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

শকুনের হারিয়ে যাওয়ার কথা

আমাদের গ্রামেগঞ্জে ও শহরের প্রান্তে শকুনরা একসময় আকাশ কালো করে ডানা মেলে উড়তো। তাদের আর এখন দেখতে পাওয়া যায় না। হারিয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ধরা পড়ল এক ভয়ংকর তথ্য। শকুনের দল সাধারণত মৃত পশুপাখিদের খেয়েই বেঁচে থাকে। পোষা গোরু-মোষদের বিভিন্ন অসুখে, বিশেষত হাড়ের অসুখে দেওয়া হয় এক বিশেষ ওযুধ ডাইক্লোফেনাক, ব্যথা কমানোর জন্য। তাদের মৃতদেহেও এই ওযুধ থেকে যেত। এই ডাইক্লোফেনাক শকুনের কিডনি বা বৃক্ককে নষ্ট করে দেয়। একসময় যত্রতত্র মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল শকুনের দলকে। এছাড়াও এখন আর গ্রামেগঞ্জে মরা গবাদিপশুদের ভাগাড়ে না ফেলে পুঁতে দেওয়া হয়। ফলে শকুনের খাদ্যসংগ্রহ করার সংস্থানও কমে গেছে। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে শকুনের ছানারা প্রায়ই মারা পড়ে।

শকুনের সংরক্ষণ

2006 সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার ডাইক্লোফেনাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, শকুনদের সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা শুরু হলো। শকুন অনেকদিন বাঁচে। আবার এদের জীবনের বিকাশ বেশ ধীরগতিতে হয়। তাই শকুনকে আবার তার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে বেশ কয়েক দশক লেগে যাবে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় শকুন পুনর্বাসন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। তার মধ্যে হরিয়ানার পিঞ্জোর এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে রাজাভাতখাওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন শকুনের সকল প্রজাতি সংরক্ষিত আছে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে।

মেছোবিড়াল (বাঘরোল)

বন্যবিড়াল

সাইবেরিয়ার বরফ-ঠান্ডা এলাকা থেকে আমাজনের সূর্যের আলো না পৌঁছোনো বর্ষাবন কিংবা লাদাখের মরুএলাকা থেকে পশ্চিমবঙ্গের জলাভূমি বা বাদাবন-ভূ-প্রকৃতির এবং আবহাওয়ার এই চরম বিপরীত অবস্থাতেও গোটা পৃথিবী জুড়ে যে প্রাণীরা টিঁকে আছে তারা হলো বিড়ালজাতীয় অর্থাৎ বন্যবিড়াল (Wild Cat)। বন্যবিড়াল বলতে আমরা সাধারণত বাঘ, সিংহ বা চিতাবাঘকেই বুঝি। বাঘ আমাদের জাতীয় পশু। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপশু এক বন্যবিড়াল - নাম তার মেছোবিড়াল বা বাঘরোল।

মেছোবিড়ালের গঠন, আচরণ ও বাসস্থান

আকারে বড়োসড়ো হুলোবিড়ালের দ্বিগুণ বা তারও বেশি। আর একসারি ছোটো খসখসে লোম শরীরকে রক্ষা করার জন্য। গায়ের রং মেটে ধূসর বা জলপাই রঙের সঙ্গে খয়েরি মেশানো। ধূসর রং-এর সারা গায়ে কালো লম্বায় ছোপ। আর মাথা থেকে ঘাড় পর্যন্ত 4-6 টি কালো ডোরা রেখা নেমে গেছে। বেঁটে মোটাসোটা লেজ বরাবর কালো দাগের পটি। সামনের পায়ের আঙুলের মাঝখানের চামড়া অনেকটা জোড়া মতন। খালবিল, ঝিল, বাদাবনের জলাভূমি থেকে ঝোপজঙ্গল বা ঘনজঙ্গল - সব জায়গাতেই এদের দেখা যায়। এরা নিশাচর। সাঁতারেও খুব দক্ষ। সাধারণত মাছ শিকার করলেও কাঁকড়া, শামুক, ইঁদুর বা পাখি খেয়ে পেট ভরায়।

মেছোবিড়ালের সংকট ও সংরক্ষণ

কিন্তু যেখানে এককালে ঝোপজঙ্গল বা খড়ি, নল, হোগলায় ভরা জলাভূমি ছিল, সেখানে তৈরি হয়েছে বড়োবড়ো রাস্তা, আবাসন প্রকল্প ও শপিং মল। কোথাও তৈরি হচ্ছে কলকারখানা আর ইটভাটা। ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে বাঘরোলের বাসস্থান আর ক্রমশ কমছে তাদের প্রাকৃতিক খাবার। এর ফলে বাঘরোলরা কখনো-কখনো হাঁসমুরগির লোভে মানুষের বসতি এলাকায় চলে আসতে বাধ্য হয়। আর মানুষের হাতে মারাও পড়ে। এদের বাসস্থান সুরক্ষিত না হলে এবং এদের হত্যা করা সম্পূর্ণ বন্ধ না হলে বিপন্ন এই প্রাণীটি একদিন পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে পারে।

গঙ্গার শুশুক

গঙ্গার শুশুকের বাসস্থান, স্বভাব ও গঠন

মিষ্টি জলের এই স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাস গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদী আর তাদের উপনদীতে। লম্বা নাক (রস্ট্রাম) আর মুখ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও ওপর আর নীচের চোয়ালে দৃশ্যমান দাঁত এদের সহজেই চিনিয়ে দেয়।

এদের চোখে কোনো লেন্স থাকে না। তাই এরা কার্যত অন্ধ। যদিও এরা আলোর দিক আর তীব্রতা বুঝতে পারে। তাহলে এরা আশেপাশে কী আছে বোঝে কী করে? খুব সম্ভবত নাসাগহ্বরে থাকা ডরসাল বার্সা নামের একটা যন্ত্রের সাহায্যে শুশুক একরকম শব্দ ছুড়ে দেয়। সেই শব্দ সামনে কোনো কিছুতে বাধা পেয়ে ফিরে এলে শুশুক সেই প্রতিধ্বনি শুনে বুঝতে পারে সামনে কতদূরে কোন ধরনের জিনিস আছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় ইকোলোকেশন (Echolocation)। বাদুড় বা চামচিকেরাও এই পদ্ধতিতে চলাফেরা করে বা শিকার ধরে। এছাড়াও শুশুকের ঘ্রাণশক্তি প্রবল।

এদের দেহ ধূসর বাদামি বা কুচকুচে কালো রঙের। দেহের মাঝখানটা মোটা, দু-প্রান্ত সরু আর সুচালো। এদের গায়ে লোম থাকে না। চামড়ার নীচে সঞ্চিত পুরু চর্বির স্তর (Blubber) জলের তলায় এদের শরীরকে গরম রাখে। ঘাড় না থাকায় এদের মাথা আর ধড় আলাদা করা যায় না। মুখের সামনে ঠোঁটদুটো অনেকটা চঞ্চুর মতো প্রলম্বিত। এদের প্রতিটি চোয়ালে 27-32 টা ছোটো দাঁত থাকে। শুশুকের দাঁতগুলো সব একই ধরনের। কাটা বা চিবোনোর জন্য আলাদা আলাদা ধরনের দাঁত থাকে না।

এদের নাকের ফুটো লম্বাটে, থাকে চঞ্চুর গোড়ায়। এরা নিজেদের ইচ্ছামতো এই ফুটো খুলতে আর বন্ধ করতে পারে। জলের ওপরে ভেসে উঠে বাতাস থেকে শ্বাস নেয়। শুশুকের সামনের পা দুটো ফ্লিপারে পরিণত হয়েছে। এগুলোর সাহায্যেই শুশুক জলে সাঁতার কাটে। এদের লেজটা ওপরে-নীচে চ্যাপটা।

বর্ষায় ভরা নদীতে উজান বেয়ে এরা ছোটো ছোটো উপনদীতে পৌঁছে যায়। আবার শুকনো মরশুমে নদীর মূল স্রোতে ফিরে আসে। এরা মাংসাশী। ইকোলোকেশনের সাহায্যে এরা নদীর তলায় কাদামাটিতে লুকিয়ে থাকা জীবদের শিকার করে। মাছ আর নানাধরনের জলজ অমেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন চিংড়ি এদের খাবার। শিকারের সন্ধান পেলে লম্বা রস্ট্রাম দিয়ে এরা শিকার ধরে।

গঙ্গার শুশুকের সংকট ও সংরক্ষণ

মানুষের নানান কাজের জন্য এদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। নদীবাঁধ আর অন্যান্য নানা কারণে নদীর জলের গভীরতা কমে যাচ্ছে। নদীর মাঝে মাঝে বালির চর জেগে উঠে নদীকে ছোটো ছোটো অংশে ভেঙে দিচ্ছে। এর ফলে গঙ্গার শুশুকরা যাতায়াতের পথে বাধা পাচ্ছে। তাই এক শুশুক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য শুশুক গোষ্ঠীর যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে আলাদা আলাদা ছোটো ছোটো গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যাওয়া শুশুকদের প্রজননে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শুশুকরা গঙ্গার এমন এক অঞ্চলে বাস করে, যার চারপাশ জুড়ে ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। তার ফলে নদীর জলে দূষণের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দেয়। এছাড়াও গঙ্গার পাড়ে থাকা নানা রাসায়নিক কারখানা, তেল পরিশোধনাগার বা অন্যান্য কলকারখানার বর্জ্য থেকেও নদীর জল দূষিত হয়। জলদূষণের ফলে নদীতে মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আর খাবারের অভাবে বিপদে পড়ছে শুশুকরা। মাছ ধরার জালে আটকে পড়েও এরা মারা যায়।

গঙ্গার শুশুককে জাতীয় জলজ প্রাণী (National Aquatic Animal) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। 1991 সালে বিহারের সুলতানগঞ্জ আর কাহালগাঁও-এর মাঝে গঙ্গার 60 কিমি অঞ্চল জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে পৃথিবীর প্রথম শুশুক স্যাংচুয়ারি, বিক্রমশীলা গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন স্যাংচুয়ারি (Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary)। স্থানীয় জেলেদের মধ্যে শুশুক সংরক্ষণের সচেতনতা বাড়াতে প্রচার করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের ব্রিজঘাট থেকে নারোরা মধ্যবর্তী গঙ্গার অঞ্চলকে শুশুক সংরক্ষণের জন্য ‘রামসর স্থান’(Ramsar Site), অর্থাৎ সংরক্ষিত বিশেষ জলাভূমি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

একশৃঙ্গ গন্ডার

গন্ডারের স্বভাব, গঠন ও বাসস্থান

একশৃঙ্গ গন্ডার পৃথিবীর বিলুপ্তপ্রায় স্তন্যপায়ীদের অন্যতম। গন্ডারের দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। কিন্তু ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল। কানের পাতা গোলমতো, ছড়ানো। এরা থাকে মূলত বন্যাবিধৌত-সমভূমি বা জলা জায়গার আশেপাশের লম্বা ঘাসের জঙ্গলে। গন্ডার সাধারণত একা থাকে। লম্বা ঘাসের জঙ্গল ঠেলে এরা এদের জল খাওয়ার জায়গা আর খাবার খাওয়ার জায়গার মধ্যে চলাফেরা করে। এই লম্বা ঘাসের জঙ্গল এদের সুরক্ষাও দেয়। এরা মূলত খুব ভোরে, সন্ধ্যায় বা রাতের দিকে চরে বেড়ায়। রোদ বেশি উঠে গেলে এরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। বেশিরভাগ সময় এরা জল-কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে সময় কাটায়। গন্ডারের গায়ের মোটা চামড়া প্রচণ্ড গরম থেকে তাকে বাঁচায়। আর তার গায়ের কাদার আস্তরণও তার দেহকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এই কাদার আস্তরণের আর একটা কাজও আছে। গন্ডারের চামড়ায় বাসা বাঁধা পোকামাকড় বা পরজীবীরাও ওই কাদার আস্তরণে চাপা পড়ে যায়।

এরা মূলত শাকাশী—লম্বা লম্বা ঘাস বা জলজ উদ্ভিদ, ছোটো ছোটো গাছপালা, লতাপাতা বা এমনকি ফলও এরা খায়। কোনো কারণে বিরক্ত হলে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ গন্ডার পেছনদিকে প্রায় 3-4 মিটার দূর পর্যন্ত মূত্রত্যাগ করে। গন্ডারের নীচের চোয়ালের কৃন্তক (incisor) দাঁতটা খুব লম্বা হয়। এলাকা দখল বা অন্য কোনো কারণে অন্য গন্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় এই দাঁত গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে।

পুরুষ আর স্ত্রী গন্ডার দুজনেরই নাকের ওপরে চামড়ার ওপর প্রায় 60 সেন্টিমিটার লম্বা একটা খড়্গ বা শিং থাকে। গন্ডারের খড়্গ, কী দিয়ে তৈরি জানো? কেরাটিন দিয়ে। এই কেরাটিন হলো একধরনের প্রোটিন — যা দিয়ে আমাদের নখ আর চুল তৈরি হয়। জন্মের পর বাচ্চা গন্ডারের কিন্তু খড়্গ থাকে না। গন্ডারের 6 বছর বয়স থেকে এই খড়্গ আস্তে আস্তে দেখা দিতে থাকে। কোনো কারণে ভেঙে গেলে, আবার নতুন করে গন্ডারদের খড়্গ গজায়। গন্ডার তার খড়্গ ব্যবহার করে প্রধানত খাবারের খোঁজ করতে — মাটি খুঁড়ে গাছের মূলের খোঁজে। এছাড়াও প্রজনন ঋতুতে অন্য পুরুষ গন্ডারের সঙ্গে মারামারির সময়ও সে তার খড়্গ ব্যবহার করে।

গন্ডারের লোমহীন ধূসর রঙের চামড়ার ওপরটা ঢালের মতো খাঁজকাটা। দেখলে মনে হয় ঠিক যেন গায়ে একটা বর্ম পরে আছে। বর্মে তিনটে ভাঁজ দেখা যায়, ঘাড়ের চারপাশে, কাঁধের ঠিক পেছনে আর ঊরুর ঠিক সামনে। দেহের পাশের দিকে, চামড়ায় বড়ো বড়ো গুটি (tubercle) থাকে। দেহের কোনো কোনো জায়গায় চামড়া প্রায় 4 সেন্টিমিটার পর্যন্ত পুরু হয়। চামড়ার নীচে প্রায় 2-5 সেন্টিমিটার পুরু চর্বির স্তর থাকে। এদের সারা দেহে লোম না থাকলেও লেজের ডগায়, কানের আশেপাশে আর চোখের পাতায় লোম দেখা যায়। লোমগুলো কর্কশ প্রকৃতির।

মলের স্তূপ

গন্ডারের একটা অদ্ভুত অভ্যাস হলো একই জায়গায় মলত্যাগ করা। ফলে দিনের পর দিন এই মলের স্তূপের (Dunghill) উচ্চতা বাড়তে থাকে। মলস্তূপ উচ্চতা খুব বেশি হয়ে গেলে গন্ডার আর পুরোনো স্তূপে মলত্যাগ করতে পারে না। তখন সে কাছাকাছি জায়গায় একটা নতুন মলস্তূপ তৈরি করে। আর চোরাশিকারিরা গন্ডারের এই অভ্যাসেরই সুযোগ নেয়। গন্ডারের মলস্তূপের কাছেই তারা তাদের শিকারের অপেক্ষায় থাকে।

ঘাসজমির বাস্তুতন্ত্র ও গন্ডার

ঘাসজমির বাস্তুতন্ত্রের ওপর একশৃঙ্গ গন্ডারের নানা প্রভাব লক্ষ করা যায়।

1. খড়্গ দিয়ে মাটি খুঁড়ে ফেলার ফলে নতুন নতুন বীজ থেকে অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রাকৃতিক বনভূমি বা ঘাসজমির প্রাচুর্য ও প্রসার ঘটায়। তৃণভোজী নানা বন্যপ্রাণীর এবং তাদের খাদক শিকারী প্রাণীর খাদ্যসম্ভার বেড়ে যায়।

2. একশৃঙ্গ গন্ডার নানা গাছের ফল খায়। এরা একসঙ্গে এক জায়গায় মলত্যাগ করে। তারপর মল যখন অনেক উঁচু হয়ে যায় তখন খড়্গ দিয়ে তাকে সমান করে। এই মলে উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান খুব বেশি পরিমাণে থাকে। তাই ফল খাওয়ার 3-7 দিন পর যখন ওই মলের ওপর বীজগুলো পড়ে, স্বাভাবিকভাবেই তাদের অঙ্কুরোদগম ঘটে। ফলে ওই গাছগুলো অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। পাখিরা ওই মলমধ্যস্থ বীজগুলো যখন খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং বহুদূরে মলত্যাগ করে, তখন নতুন নতুন জায়গায় বীজ থেকে গাছ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

গন্ডারের সংকট ও সংরক্ষণ

একশৃঙ্গ গন্ডার প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রায় 35-45 বছর অবধি বাঁচে। এদের সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ হলো চোরাশিকার। গন্ডারের খড়্গের একটা উত্তেজক গুণ আছে — এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের জন্যই চোরাশিকারিদের লোভের শিকার হয় সে। যদিও এই বিশ্বাসের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। থাকার জায়গা বা বাসস্থান ধ্বংস হয়ে যাওয়াও এদের বিপন্নতার অন্যতম কারণ। গন্ডার সংরক্ষণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গন্ডার শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

একসময় সিন্ধু নদীর উপত্যকা থেকে মায়ানমারের উত্তর দিক পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একশৃঙ্গ গন্ডারের দেখা পাওয়া যেত। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীর অববাহিকা অঞ্চলে (মানস, কাজিরাঙা, পবিতোরা ইত্যাদি), পশ্চিমবঙ্গের দুটো ন্যাশনাল পার্ক (জলদাপাড়া, গোরুমারা), উত্তরপ্রদেশের দুধুয়া সংরক্ষিত অরণ্যে, আর নেপালের চিতওয়ান জাতীয় উদ্যানেই কেবল এদের দেখা পাওয়া যায়।

11 আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদজগৎ

পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাছ

আমাদের চারদিকে আমরা যেসব গাছ দেখি, তাদের থেকে আমরা খাবার, ওষুধ, জামাকাপড় বা ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ জোগাড় করি। গাছ খাবার তৈরির সময় যে অক্সিজেন গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দেয়, অন্যান্য জীবেরা শ্বাসকার্যের জন্য সেই গ্যাস ব্যবহার করে। গাছেরা জীবজন্তুর থাকার জায়গা আর খাবার হিসেবেও কাজ করে। এছাড়া পরিবেশ থেকে দূষক পদার্থ শুষে নিয়ে দূষণের মাত্রা কমায়, জমির সার তৈরি করে, এমনকি মাটির জৈব পদার্থের পরিমাণ বাড়াতেও সাহায্য করে। কোনো কোনো গাছের অংশ বা সমগ্র দেহ সার হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পরিবেশের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণেও গাছেরা নানা ভূমিকা পালন করে। নানা শিল্পের উপকরণরূপেও গাছের নানা অংশ ব্যবহৃত করা হয়।

বাঁশ

বাঁশ এক ধরনের বহুবর্ষজীবী, নিরেট পর্ব ও ফাঁপা পর্বমধ্যযুক্ত চিরসবুজ উদ্ভিদ। এদের কাণ্ড লম্বা নলের মতো এবং শাখাপ্রশাখার পরিমাণ কম। পৃথিবীতে যে সমস্ত গাছ খুব দ্রুত বাড়ে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো বাঁশ। প্রতি 24 ঘণ্টায় কোনো কোনো বাঁশের প্রায় 100 সেমি বৃদ্ধি হয়। সব ঋতুতে এবং সমস্ত ভৌগোলিক অঞ্চলে এর বৃদ্ধির হার সমান নয়।

টুকরো কথা

অধিকাংশ বাঁশে অনিয়মিতভাবে ফুল আসে। অনেক বাঁশগাছে 65 বা 120 বছর অন্তর অন্তর ফুল ফোটে। বাঁশগাছে ফুল ফোটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মত চালু আছে। কেউ কেউ বলেন যে পরিবেশগত প্রভাবে বাঁশগাছে যখন **বিপদ ঘন্টা** বাজতে থাকে, তখন বাঁশগাছ তার অঙ্গজ বৃদ্ধি বন্ধ করে জননগত বৃদ্ধি ঘটায়। তখন তার দেহের সমস্ত শক্তিকে ফুল ফোটানোর কাজে ব্যবহার করে। ফুল ফোটার পরই বাঁশগাছের মৃত্যু হয়। বাঁশ গাছে যখন **Mass flowering** ও ফল হওয়ার ঘটনা ঘটে তখন সেই অঞ্চলে ইঁদুর জাতীয় প্রাণীদের অত্যধিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। তারা তখন শস্যক্ষেত্রের, ও গুদামের শস্য খেয়ে ও শস্যহানি ঘটিয়ে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। আর টাইফাস, প্লেগ ও অন্যান্য ইঁদুরবাহিত রোগের সম্ভাবনাও বেড়ে যায় এবং এর থেকে মহামারি পর্যন্ত হতে পারে। অন্যদিকে প্রচুরসংখ্যক বাঁশের একসঙ্গে মৃত্যু ঘটার ফলে নতুন বাঁশ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় মানুষ আর এক সমস্যার মুখোমুখি হয়। ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ না পেয়ে বহু মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।

বঙ্গোপসাগরের উপকূল বরাবর জন্মানো বাঁশের একটি প্রজাতি হলো *Melocanna bambusoides*। এতে প্রতি 30-35 বছর অন্তর অন্তর ফুল ফোটে ও ফল আসে। তখন এই ক্ষতিকারক প্রভাব লক্ষ করা যায়।

কী কী প্রয়োজনে বাঁশ ব্যবহার করা হয়?

i) বাঁশের নরম কাণ্ড, গোড়া আর পাতা হলো বিশ্বের বিপন্নতম প্রাণীগুলোর অন্যতম প্রধান খাদ্য। (চিনের জায়েন্ট পান্ডা, নেপালের ও ভারতের রেড পান্ডা এবং মাদাগাস্কারের লেমুর)। আফ্রিকার গরিলাদেরও অন্যতম প্রধান খাদ্য হলো এই বাঁশ। শিম্পাঞ্জি ও হাতিরাও বাঁশকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

ii) লাওস, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ও চিনের য়ুনান প্রদেশে জন্মানো বাঁশের গোড়ায় একধরনের পোকা জন্মায়। এরা বাঁশের নরম কাণ্ড খায়। আর স্থানীয় মানুষ এই পোকার লার্ভাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ করে।

iii) বাঁশের গোড়া থেকে বেরোনো নতুন কচি কাণ্ড এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। যদিও ব্যবহারের আগে এর মধ্যে থাকা অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থকে নিষ্কাশন করে দেওয়া হয়। বাঁশের এই নরম কচি কাণ্ড থেকে নানা পানীয় প্রস্তুত করা হয়।

iv) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায় স্যুপকে গরম করা ও ভাত রান্নার পাত্ররূপে বাঁশের ফাঁপা কাণ্ডকে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রান্নার কাজে বাঁশের তৈরি নানা উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

v) ভারতবর্ষে বাঁশ কাগজ তৈরি, ঝুড়ি বা চুপড়ি, ছাতার বাট, ফুলদানি, ট্রে, বাঁশি, নানা ধরনের খেলনা এবং এমনকী ঘরসাজানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

vi) *Bambusa arundinacea* নামক বাঁশের পর্বমধ্যে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ও সিলিসিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ 'তবাশির' (Tabashir) নামক এক গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ প্রস্তুত হয় যা হাঁপানি, সর্দিকাশি ও নানা সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

vii) দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার কোনো কোনো অঞ্চলে বাঁশ হলো মানুষের ঘরবাড়ি তৈরির অন্যতম উপকরণ। এছাড়া নদীর ওপর সাঁকো তৈরির কাজেও হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ বাঁশকে ব্যবহার করে চলেছে।

viii) বাঁশের তন্তুর ব্যাস 3 মিমি-র কম। তাই 'bamboo fabric'-কে ইদানীং জামাকাপড় তৈরির কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

কচুরিপানা

কচুরিপানা একটি জলে ভাসমান বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ। প্রতিটি গাছে বছরে প্রায় 1000 -এর বেশি বীজ তৈরি হয় এবং এরা প্রায় 24 বছর বেঁচে থাকে। এর বংশবৃদ্ধির হার এতই বেশি যে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে এদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়। উত্তর আমেরিকায় 1884 সালে যখন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে একে প্রথম আনা হয়েছিল তখন প্রতি বর্গমিটারে জন্মানো 50 কেজি কচুরিপানার জন্য ফ্লোরিডার সমস্ত জল চলাচলের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যদি কচুরিপানার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, তবে পুকুর ও হ্রদের জলকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঢেকে দেয়। ফলে জলের প্রবাহ কমে যায়, অন্যান্য উদ্ভিদদের সূর্যের আলো পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে এবং জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দেয়। এতে জলে থাকা মাছ ও কচ্ছপদের মৃত্যু হয়। অতিসংখ্যায়

কচুরিপানার জঙ্গলে বংশবৃদ্ধি করে এডিস মশারা। একধরনের শামুক আছে যা মানুষের এক মারাত্মক কৃমিঘটিত রোগ ছড়ায়। এই শামুকও কচুরিপানার জঙ্গলে বাস করে। মানুষের নানাবিধ কার্যাবলির ফলে যেসব জলাশয়ে পুষ্টি পদার্থের জোগান বেড়ে যায় সেখানে কচুরিপানার বাড়বাড়ন্ত চোখে পড়ে। গ্রামগঞ্জের জলাশয়ে কচুরিপানার সংখ্যাবৃদ্ধি এক জ্বলন্ত সমস্যা।

মশার লার্ভা

কী কী প্রয়োজনে কচুরিপানা ব্যবহার করা হয়?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কচুরিপানাকে নানাভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

i) ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে কচুরিপানার কাণ্ডকে এমব্রয়ডারির কাজে ব্যবহার করা হয় এবং বস্ত্রশিল্পের তন্তুর উৎসরূপে ব্যবহার করা হয়। শুকনো কাণ্ডকে ব্যবহার করে ঝুড়ি ও নানা ফার্নিচার বানানো হয়। কচুরিপানার তন্তুকে কাগজ তৈরির কাঁচামাল হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

ii) কচুরিপানায় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি থাকায় এটিকে বায়োগ্যাসের উৎসরূপে ব্যবহার করা হয়।

iii) কচুরিপানার সহ্যক্ষমতা অত্যধিক বেশি। ভারী ধাতুর শোধনক্ষমতা বেশি হওয়ায় বের হওয়া নোংরা দূষিত জল থেকে ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, কোবাল্ট , নিকেল, লেড ও মার্কারির মতো ক্ষতিকারক ধাতুকে শোধন করতে পারে। ফলে জল দূষণমুক্ত ও ব্যবহার উপযোগী হয়।

iv) সোনার খনি অঞ্চলে জলে নির্গত সায়ানাইড শোষণ করে জলকে বিষমুক্ত করে। আর্সেনিকসমৃদ্ধ পানীয় জল থেকে কচুরিপানা আর্সেনিককে অপসারিত করে।

v) নাইট্রিফিকেশন পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণে কচুরিপানার মূলে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

vi) কচুরিপানায় নাইট্রোজেন তথা প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকায় পশুখাদ্য রূপে এর কদর ক্রমশ বেড়েছে। এর অতিরিক্ত ব্যবহার কিন্তু বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। সার হিসেবেও একে নানা জায়গায় ব্যবহারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শাল

শাল একটি বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল, দ্বিবীজপত্রী ও বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। এটি একটি পর্ণমোচী জাতীয় গাছ যা পরিণত হতে প্রায় 25 থেকে 30 বছর সময় নেয়। শালগাছের জঙ্গলে বাঘ, হাতি, চিতাবাঘ, ভালুক, বুনো খরগোশ, বুনো শুয়োর ইত্যাদি প্রাণী বেশি চোখে পড়ে।

কী কী প্রয়োজনে শালগাছ ব্যবহার করা হয়?

i) **কাঠ** - খুঁটি, আসবাবপত্র, জানালা-দরজার কাঠের ফ্রেম, পাটাতন, নৌকা, জাহাজের জেটি, সেতু প্রভৃতি তৈরি করার জন্য শক্ত ও টেকসই কাঠ পাওয়া যায় শালগাছ থেকে। গাছ থেকে কাটার সময় কাঠের রং হালকা, আর কাঠ কেটে ফেলে রাখলে গাঢ় বাদামি রঙের হয়ে যায়। নির্মাণকাজে এই কাঠের চাহিদা আছে। কিন্তু এই কাঠ পালিশ করার উপযোগী নয়।

ii) **পাতা** - উত্তর আর পূর্ব ভারতে শালগাছের শুকনো পাতা দিয়ে থালা-বাটি, ঠোঙা তৈরি করা হয়। আর গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি হিসেবে এর ব্যবহার হয়। ব্যবহৃত শালপাতা বা শালপাতার থালা গোরু-ছাগলের খাবার।

iii) **আঠা** - শালগাছের আঠা থেকে সুগন্ধযুক্ত লাল ধুনো পাওয়া যায় যা ধূপ তৈরিতে, কাঠের জোড়ের স্থানে প্রলেপ দেওয়ার কাজে, জুতো পালিশ ও অন্যান্য কাজে লাগে।

iv) **রজন** - গুঁড়ি থেকে প্রাপ্ত রজন স্পিরিট ও বার্নিশ তৈরির কাজে লাগে।

v) **ট্যানিন**- ছাল থেকে প্রাপ্ত ট্যানিন চর্মশিল্পে ব্যবহৃত হয় ।

vi) **শালবীজ**- বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেল প্রদীপ জ্বালাতে রান্নার কাজে ও চকোলেট প্রস্তুত করার কাজে লাগে।

সুন্দরী

সুন্দরবনের লবণাক্ত অঞ্চলে মিষ্টি জলে সুন্দরী গাছ জন্মায়। নরম মাটিতে জন্মায় এই গাছ। এই গাছের চারপাশে মাটি ভেদ করে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট মূল। প্রথমদিকে এরা বেশ নরম থাকলেও পরে শক্ত শক্ত সুচালো কাঠের মতো বেরিয়ে থাকে। এই মূলগুলো বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে সুন্দরী গাছকে বাঁচিয়ে রাখে। এই মূলগুলো সুন্দরীগাছের শ্বাসমূল। চিরসবুজ, লম্বা গাছগুলো সমুদ্রের কাছাকাছি থাকে। এই গাছকে লবণাম্বু বা ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলে। কাণ্ড বেশ শক্তপোক্ত তবে নরম মাটিতে আটকে থাকার জন্য কাণ্ডের নীচের দিক থেকে বাঁকাভাবে কিছু অস্থানিক মূল বেরিয়ে মাটিতে প্রবেশ করে। নরম মাটিতে গাছকে অবলম্বন দেয়। এই মূলগুলোকে ঠেসমূল বলে।

পাতার ওপরের দিক সবুজ, চকচকে। নীচের দিক হালকা সবুজ। সুন্দরীগাছের ফল ডিমের মতো, তবে একটু লম্বাটে ধরনের। ফলের রং খয়েরি। প্রত্যেকটা ফলে একটা করে বীজ থাকে। ফলের মধ্যে থাকা বীজ থেকে নতুন চারা তৈরি হয়।

কী কী প্রয়োজনে সুন্দরীগাছ ব্যবহার করা হয়?

সুন্দরীগাছের কাঠ আসবাব, বাড়ি ও খুঁটি তৈরিতে কাজে লাগে। এছাড়া জ্বালানি হিসেবে এই কাঠ খুবই ব্যবহার করা হয়। গাছের ছালে থাকে প্রচুর ট্যানিন। যা চামড়া ও রং শিল্পে ব্যবহার করা হয়।

প্রচুর পরিমাণে সুন্দরীগাছ পাওয়া যেত বলেই সুন্দরবন নাম হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাসস্থানের জন্য এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরীগাছ কাটা পড়েছে। এছাড়াও জলে লবণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সুন্দরবনের সুন্দরীগাছ আজ দ্রুতহারে কমে যাচ্ছে যা নষ্ট করে দিচ্ছে সুন্দরবনের প্রকৃতিকে। এটি একটি বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ। তাই ঝড়খালিতে সুন্দরী গাছ প্রতিপালন ও সংরক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে আইন করে সুন্দরীগাছ কাটা বন্ধ করা হয়েছে।

মশলা ও গাছ

আমাদের প্রতিদিনের রান্না করা খাবারে এত সুন্দর স্বাদ, গন্ধ কীভাবে আসে বলোতো? কী এমন জিনিস মেশানো হয় রান্নার সময় যাতে আমাদের চিরপরিচিত নানারকম শাকসবজি, মাছমাংস নিত্যনতুন স্বাদ আর গন্ধ নিয়ে হাজির হয় আমাদের খাবার পাতে! সেই জিনিসটা হলো মশলা।

ইতিহাসের পাতা উলটে গেলে দেখতে পাওয়া যায় বিদেশিদের কাছে ভারত বললেই রাজামহারাজা, হিরে, মসলিন—এইসব জিনিসের সঙ্গেই ভেসে ওঠে ভারতীয় মশলার অনন্য স্বাদ,গন্ধ আর জাদুর গল্প। অতীতে রাজারাজড়াদের কাছে দামি হিরে মণি-মুক্তোর সঙ্গেই সমান আদর পেত নানান ধরনের মশলা। এইসব মশলার হালহকিকত গোপন রাখতে তাঁরা ছিলেন সদাতৎপর। এই মশলার খোঁজেই কত নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন জলপথের দরজা খুলে গেছে মানুষের কাছে।

গ্রিস আর রোমের যখন জন্মও হয়নি, তখনও ভারতীয় মশলা, সুগন্ধি আর সূক্ষ্ম কাপড় জাহাজে করে যেত মেসোপটেমিয়া, অ্যারাবিয়া আর মিশরে। যিশুখ্রিস্টের জন্মের অনেক আগে থেকেই গ্রিসের ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বাজারে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকত। কেন বলোতো? সেখানকার বাজার থেকে তারা কিনত মশলা আর অন্যান্য মহার্ঘ জিনিস। ভারতীয় মশলা, সিল্ক আর অন্যান্য জিনিসের জন্য রোম খরচ করত প্রচুর অর্থ।

টুকরো কথা

1497 সালে সুদূর পোর্তুগালের লিসবন থেকে চারটে জাহাজ নিয়ে এশিয়ার মশলার দেশের খোঁজে বেরিয়েছিলেন ভাস্কো-দা গামা। 24000 মাইল পথ পেরিয়ে দু-বছর পরে দুটো জাহাজ খুইয়ে অবশেষে

তিনি ভারতের খোঁজ পান। মাত্র ওই দুটো জাহাজে করেই তিনি যা মশলা আর অন্যান্য জিনিস দেশে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, তাতেই নাকি তাঁর যাত্রার খরচের 60 গুণ বেশি অর্থ উঠে আসে! তোমরা হয়তো ভাবছ যে মশলার এত দাম! মধ্যযুগে এক পাউন্ড আদার দাম ছিলো 1 টা ভেড়ার দামের সমান। গোলমরিচ ছিল তখনকার যুগে সবচেয়ে দামি মশলা। প্রায় তিনশো বছর ধরে পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড (নেদারল্যান্ড) আর ব্রিটেন মশলার দেশগুলোর দখল নেবার জন্য লড়াই চালিয়ে গেছে।
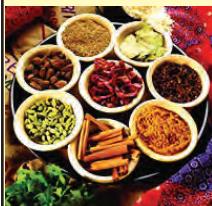
কিন্তু তখনকার দিনে কী কাজে লাগত এই মশলা? খাবারের স্বাদ বাড়ানো ছাড়াও মশলা সংরক্ষকের কাজও করতো। তখন তো আর ফ্রিজ ছিল না। তাই ঘরে মাংস সংরক্ষণের কাজে মশলা ব্যবহার করা হতো। যেমন লবঙ্গতে আছে ইউজিনল নামে এক রাসায়নিক পদার্থ। এটির ব্যাকটেরিয়ানাশক ক্ষমতা আছে। এখনকার দিনেও কোনো কোনো দেশে শুয়োরের মাংস সংরক্ষণের জন্য লবঙ্গ ব্যবহার করা হয়। তখনকার দিনে বাইরের দেশে, মশলার অভাবে, শীতের জন্য খাবার সংরক্ষণ করতে না পারলে অভুক্ত থাকতে হতো। তবেই বুঝে দেখো, মশলার চাহিদা কেন এত বেশি ছিল! আজ আমরা সেই মশলার কথাই জানব। বলোতো মশলা আমরা কীভাবে পাই? কী মনে হয় তোমাদের? নীচে লিখে ফেলো।

আমরা মশলা কীভাবে পাই

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় 80 ধরনের মশলার চাষ হয়। আর শুধু ভারতেই প্রায় 50 ধরনের মশলার চাষ হয়। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ থেকেই আমরা মশলা পাই। এসো একঝলকে দেখে নিই কোন কোন উদ্ভিদের অংশ থেকে আমরা কোন কোন মশলা পেয়ে থাকি।

উদ্ভিদ অংশ	মশলার নাম
1.গাছের ছাল	দারচিনি
2. মুকুল (অপ্রস্ফুটিত পুষ্পমুকুল)	লবঙ্গ
3. কন্দ	পিঁয়াজ, রসুন
4. ফুলের অংশ	জাফরান
5. ফল	গোলমরিচ, এলাচ, লঙ্কা
6. পাতা	তেজপাতা, পুদিনা
7. গ্রন্থিকাণ্ড	আদা, হলুদ
8. ক্ষরিত পদার্থ	হিং
9. বীজ	জোয়ান, মৌরি, ধনে, সরষে পোস্ত, মেথি
10. অন্তর্বীজ	জায়ফল

কী কাজে লাগে মশলা

এসো দেখে নেওয়া যাক মশলা আমাদের কী কাজে লাগে।

i) জোলো খাবারে স্বাদ আনতে সাহায্য করে।
ii) সংরক্ষকরূপে (আচার, চাটনি ইত্যাদিতে) কাজ করে।
iii) লালারসের ক্ষরণ বাড়িয়ে হজমে সাহায্য করে।
iv) মুখগহ্বরকে ক্ষতিকারক জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

এসো এবারে আমাদের চেনা কয়েকটা মশলার খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করা যাক।
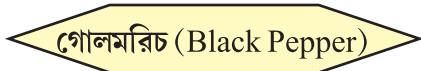
তুমি গোলমরিচ বা কালোমরিচ নিশ্চয়ই দেখেছ। নীচের সারণিটি পূরণ করো।

গোলমরিচ কেমন দেখতে	তোমার বাড়িতে কী কাজে লাগে

গোলমরিচ একটি বহুবর্ষজীবী লতাজাতীয় উদ্ভিদ। অন্যান্য গাছে ভর করে এটি বেড়ে ওঠে । ফল কাঁচা অবস্থায় সবুজ আর পেকে গেলে লালচে রঙের হয়। শুকিয়ে গেলে পাকা ফলের রং কালো হয়ে যায়। সেটাই মশলা হিসেবে খাওয়া হয়।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

গোলমরিচের তীক্ষ্ণ স্বাদের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। এই কারণেই হিন্দিভাষী মানুষরা একে তীখে বলেন। যাঁরা রান্নায় লঙ্কা খেতে চান না, তাঁরা রান্নায় ঝাল স্বাদ আনতে গোলমরিচ ব্যবহার করেন। গোলমরিচ গোটা অবস্থায় বা গুঁড়ো করে রান্নায় ব্যবহার করা হয়। তীক্ষ্ম স্বাদের জন্য দায়ী পিপেরাইন নামে একটা যৌগের উপস্থিতি। তোমার বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে কোন কোন রান্নায় গোলমরিচ ব্যবহার করা হয় সেটা নীচের সারণিতে লিখে ফেলো।

বাড়িতে রান্না করা খাবারে	বাইরের খাবারে

অন্যান্য ব্যবহার

কাশি, দাঁতের ব্যথা, মাড়ি থেকে রক্ত পড়ায়, মাড়ির ব্যথায়, ডায়ারিয়া, বদহজম ও গ্যাসের সমস্যায় গোলমরিচ কাজে লাগে। মাংস এবং অন্যান্য খাবার যা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় — এই ধরনের খাবারের ক্ষেত্রে গোলমরিচ সংরক্ষকের কাজ করে।

দারচিনি (Cinnamon)

দারচিনি দেখেছ? কেমন দেখতে বলতে পারো কিনা দেখোতো। আর বাড়িতে কী কাজে লাগে সেটাও লেখার চেষ্টা করো।

কেমন দেখতে	বাড়িতে কী কাজে লাগে

এটা একটা চিরহরিৎ উদ্ভিদ । দারচিনি গাছের কাণ্ডের ছালের ভেতরের স্তর (inner bark) শুকিয়ে তৈরি হয় দারচিনি। এই ছালের ধরনের ওপর নির্ভর করে দু-ধরনের দারচিনি পাওয়া যায়—মোটা ছাল আর পাতলা ছালের দারচিনি।

রান্নার কাজে ব্যবহার

দারচিনির নিজস্ব একটা সুগন্ধ আর স্বাদ আছে। তাই দারচিনি ছোটো ছোটো টুকরো করে বা গুঁড়ো করে নানারকম রান্নায় ব্যবহার করা হয়।

তুমি কোন কোন রান্নায় দারচিনি ব্যবহার হতে দেখেছ, লিখে ফেলো দেখি।

কোন কোন রান্নায় দারচিনি ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

ডায়ারিয়া, বমিভাব, বমি, সর্দিতে দারচিনি থেকে উপকার পাওয়া যায়। দারচিনি থেকে যে উদ্‌বায়ী তেল পাওয়া যায়, সেটা বাতের ব্যথায় মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে দারচিনিকে এক অমূল্য মশলা বলে মনে করা হতো। ঐতিহাসিক প্লিনি লিখেছিলেন যে 327 গ্রাম (তখনকার এক রোমান পাউন্ড) দারচিনির দাম ছিল এক শ্রমিকের প্রায় দশ মাসের পারিশ্রমিকের সমান।

হলুদ (Turmeric)

তোমরা প্রত্যেকেই হলুদের সঙ্গে পরিচিত। নীচে সারণিতে লিখে ফেলো হলুদ কেমন দেখতে আর কী কী কাজে হলুদ ব্যবহার হতে তুমি দেখেছ।

গাছ	কেমন দেখতে	কী কাজে লাগে

হলুদ একটা বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। হলুদের বায়বীয় কাণ্ড প্রায় নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে তার প্রায় সবটাই পাতা দিয়ে ঢাকা। মাটির নীচে কাণ্ডের একটি অংশ, কন্দ থাকে।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

মাটির নীচে হলুদ গাছের হলুদ রঙের যে কন্দ পাওয়া যায় সেখান থেকেই বাণিজ্যিক হলুদ অর্থাৎ মশলার হলুদ তৈরি হয়। কন্দগুলোকে প্রায় 30-45 মিনিট জলে ফোটানো হয়। এরপর গরম ওভেনে শুকিয়ে নেওয়া হয়। তারপর এই শুকনো কন্দগুলোকে গুঁড়ো করা হয়।

বিভিন্ন সবজি, মাছ বা মাংস রান্নায় হলুদ ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মাখন, চিজ, মার্জারিন, আচার আর সরষের স্বাদ ও রং আনতে হলুদ ব্যবহার করা হয়।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্নায় হলুদ ব্যবহার করা হয় লিখে ফেলো।

বাড়িতে কোন কোন রান্নায় হলুদ ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

হলুদে কারকিউমিন (Curcumin) নামের একটা যৌগ পাওয়া যায়। এই যৌগের উপস্থিতির জন্যই জীবাণুনাশক হিসাবে হলুদ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাককে মেরে ফেলার ক্ষমতা রাখে। হলুদ যকৃতকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, অ্যালার্জি, আলজাইমার রোগের চিকিৎসাতে কারকিউমিন কার্যকরী। শরীরের কোনো অংশে আঘাত লাগলে বা মচকে গেলে চুন-হলুদ লাগালে উপকার পাওয়া যায়। হলুদে লোহার পরিমাণ বেশি থাকায় এটি রক্তাল্পতায় ভালো কাজ করে। গবেষণায় দেখা গেছে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলুদ সক্ষম। ওষুধ আর বিভিন্ন খাবারে রং আনবার জন্যও হলুদ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এলাচ (Cardamom)

এলাচ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। এলাচ কেমন দেখতে হয় বলোতো? আর কী কাজেই বা লাগে এলাচ? নীচের পৃষ্ঠার সারণিতে লিখে ফেলো।

কেমন দেখতে	কী কী কাজে লাগে

এলাচ হলো একরকমের বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। এর কাণ্ড থাকে মাটির নীচে। এলাচ প্রধানত দু-রকমের—বড়ো এলাচ আর ছোটো এলাচ। বড়ো এলাচ শুকোলে তামাটে রঙের হয়। এই ফলটাই এলাচ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আর ছোটো এলাচের ফলটা কৃত্রিমভাবে তাপে শুকোলে হালকা বাদামি রঙের হয়। গাছ থেকে তোলার সময় কেবলমাত্র এলাচের সেই ফলগুলোকেই বেছে নেওয়া হয় যেগুলো প্রায় পেকে উঠেছে। পুরোপুরি পাকা ফল নেওয়া হয় না। কারণ পাকা ফল শুকোনোর সময় ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বড়ো এলাচ

ছোটো এলাচ

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

নানারকম তরকারিতে স্বাদ আর গন্ধ আনতে এলাচ ব্যবহার করা হয়। পায়েস আর অন্যান্য মিষ্টি খাবারেও এলাচের ব্যবহার আছে।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্না করা খাবারে এলাচ ব্যবহার করা হয় নীচের সারণিতে লেখো।

কোন কোন রান্না করা খাবারে এলাচ ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

গ্যাস বা পাকস্থলী সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় এলাচের ব্যবহার আছে। পানের মধ্যে এলাচ দিয়ে খাওয়া হয়। খাওয়ার পরে মুখশুদ্ধি হিসেবেও খাওয়া হয়। বড়ো এলাচ দাঁতের মাড়ি সবল করে। বড়ো এলাচের দানা ভেঙে খেলে বমিভাব কমে যায়।

গরমমশলা

লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, গোলমরিচ, জৈত্রী আর জায়ফল একসঙ্গে মিশিয়ে গরমমশলা তৈরি করা হয়। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গরমমশলা তৈরির উপাদান অর্থাৎ মশলার পার্থক্য থাকে। নানারকম তরকারি, মাছ, মাংস ইত্যাদি রান্নায় স্বাদ আর গন্ধ আনতে গরমমশলা ব্যবহার করা হয়।

আদা (Ginger)

আদা কেমন দেখতে আর কী কাজে লাগে নীচের সারণিতে লেখো।

কেমন দেখতে	কী কী কাজে লাগে

আদা একটা বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ। কাণ্ড গ্রন্থিকাণ্ড প্রকৃতির, মাটির নীচে থাকে। আদা গাছের গ্রন্থিকাণ্ডটাই শুকিয়ে নিয়ে আদা হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

বিভিন্ন রান্নায় পিঁয়াজ, রসুনের সঙ্গে আদা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও কোনো কোনো পাঁউরুটি তৈরিতে আর বেকারিশিল্পেও আদার ব্যবহার আছে। সস তৈরিতেও আদা ব্যবহার করা হয়।

তোমার বাড়িতে আদা কোন কোন রান্নায় ব্যবহার করা হয় নীচে লেখো।

কোন কোন রান্নায় আদা ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

পেটের অসুখ, অম্বল বা গ্যাসের সমস্যায়, কাশি ও হাঁপানিতে আদা কার্যকরী। খাওয়ার আগে বিশেষত বর্ষাকালে আর শীতকালে আদার কুচি নুন দিয়ে খেলে (আদা-নুন) মুখে খাওয়ার রুচি আসে, খিদে বাড়ে। আসলে আদা খেলে মুখে লালা তৈরি হয়। আর তোমরা তো জানো যে, লালারস খাবার হজম করতে সাহায্য করে।

রসুন (Garlic)

রসুন কেমন দেখতে আর কী কী কাজে লাগে নীচের সারণিতে লিখে ফেলো।

কেমন দেখতে	কী কী কাজে লাগে

এটা একটা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ।

পিঁয়াজের মতো এরও কাণ্ড কন্দ জাতীয়। মাটির নীচে লম্বভাবে অবস্থান করে। রসুনের কন্দ 6-30 টা আরো ছোটো ছোটো কন্দের মতো অংশ নিয়ে তৈরি। এগুলো হলো রসুনের এক একটা কোয়া। এই গোটা অংশটা একটা সাদা বা হালকা গোলাপি কাগজের মতো খোসা দিয়ে ঢাকা থাকে।

রান্নার কাজে মশলা হিসাবে ব্যবহার

রসুন গাছের কন্দটাই রসুন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। মাছমাংসসহ বিভিন্ন রান্নায় স্বাদ আনতে রসুন ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো পাঁউরুটি (গার্লিক ব্রেড) তৈরিতে রসুনের ব্যবহার আছে।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্নায় রসুন ব্যবহার করা হয় নীচে লেখো।

তোমার বাড়িতে কোন কোন রান্নায় রসুন ব্যবহার করা হয়

অন্যান্য ব্যবহার

রসুনে থাকে অ্যালিসিন নামে এক যৌগ। এই যৌগের জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে। রসুন গ্যাস দূর করে। তাছাড়াও পাকস্থলীকে উদ্দীপিত করে খাবার হজম করতে সাহায্য করে। হৃৎপিন্ড ও রক্তনালীর নানা সমস্যায় রসুন কার্যকরী। রসুনের অ্যান্টিসেপটিক বা পচননিবারক ভূমিকাও আছে।

তোমার বাড়িতে নিশ্চয়ই আরো কিছু মশলা ব্যবহার করা হয়। নীচের সারণিতে তাদের নাম আর ব্যবহার লেখো।

মশলার নাম	ব্যবহার

ওষধি গাছ

আমাদের দেশে ওষুধ হিসেবে বিভিন্ন দেশীয় গাছ বা গাছের অংশ ব্যবহারের চল দীর্ঘদিনের। অথর্ববেদে বিভিন্ন গাছগাছড়ার ওষধি গুণের কথা বলা আছে। বেদ-পরবর্তী যুগে সুশ্রুতের লেখা সুশ্রুত-সংহিতায় প্রায় 700 ওষুধের কথা আছে। পরবর্তীকালে ওষধি গুণাগুণসম্পন্ন আরও অনেক গাছের কথা জানা গেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব মতো পৃথিবীর প্রায় 80% মানুষ তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নির্ভর করেন চিরাচরিত ওষুধের ওপর। এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মোট 20,000-এরও বেশি এমন গাছের কথা জানা গেছে, যাদের ওষধি গুণাগুণ আছে। তার মধ্যে এশিয়াতেই পাওয়া যায় প্রায় 8500 প্রজাতির গাছ। আমাদের দেশেই বর্তমানে প্রায় 3500 প্রজাতির ওষধি গাছের কথা জানা গেছে। এখানে আমাদের দেশে পাওয়া যায় এমন কয়েকটা ওষধি গাছ আর তাদের গুণাগুণের কথা আমরা আলোচনা করব।

নিম

নিম একটা মাঝারি ধরনের বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। এই চিরহরিৎ উদ্ভিদ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।

তোমার অঞ্চলে নিমগাছের বিভিন্ন অংশ কীভাবে ব্যবহার করা হয় পরের পৃষ্ঠার সারণিতে লেখো।

গাছের অংশ	কী কাজে ব্যবহার করা হয়
(i) কান্ড	
(ii) পাতা	
(iii)	

ওষধি গুণ

(i) বহুমূত্র রোগের ক্ষেত্রে নিমপাতার রস খুবই উপকারী।

(ii) ভাইরাসজনিত মহামারি আর বাতে নিম বীজ কাজে লাগে।

(iii) কানের ব্যথায়, দাঁত আর দাঁতের মাড়ির ব্যথায় নিমতেল ব্যবহার করা হয়।

(iv) নিম গাছের মূল বা কাণ্ডের ছাল (বাকল) আর পাতা থেকে তেঁতো স্বাদের যে ওষুধ তৈরি হয়, সেটি বারে বারে ফিরে আসা জ্বর (যেমন — ম্যালেরিয়া) সারাতে কাজে লাগে। নানারকম চর্মরোগ সারাতেও এটি ব্যবহার করা হয়।

(v) বর্তমানে বহু প্রসাধনী জিনিসে (সাবান, শ্যাম্পু , দাঁতের মাজন, পাউডার) নিমজাত পদার্থ ব্যবহার করা হয়।

(vi) কীটনাশক ওষুধ হিসাবেও নিমতেলের ব্যবহার আছে।

(vii) নিমগাছের পাতা আর মূলের অ্যান্টিবায়োটিক অর্থাৎ জীবাণুনাশক ক্ষমতা স্বীকৃত।

(viii) নিমের তেল চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে, যকৃতের কাজ করার ক্ষমতা বাড়াতে, রক্তকে পরিষ্কার রাখতে ব্যবহার করা হয়।

(ix) এছাড়া নিমজাত দ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক আর পরজীবী কৃমি প্রতিরোধী গুণ আছে।

কচি ডালশুদ্ধ নিমপাতা জোগাড় করো। খবরের কাগজের মাঝে কয়েকদিন রেখে শুকিয়ে নিয়ে খাতায় আটকাও।

এটি একটি মাঝারি আকারের পর্ণমোচী উদ্ভিদ।

তোমার এলাকায় বেল বা বেলগাছের অংশ কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় লেখো।

ওষধি গুণ

(i) বেলে থাকে মিউসিলেজ আর পেকটিন যা কোষ্ঠকাঠিন্যের অব্যর্থ ওষুধ।

(ii) বেলের শরবত আমাশয় রোগীদের অন্ত্রের যত্ন নেয়।

(iii) কাঁচা বা আধ-কাঁচা ফল খিদে ও হজমক্ষমতা বাড়ায়।

(iv) দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখে বেল কার্যকরী।

(v) বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষায় বেলের পাতা, ফল আর মূলের অ্যান্টিবায়োটিক বা জীবাণু-প্রতিরোধী ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে জ্বর হলে বেলগাছের মূলের ছাল থেকে তৈরি ওষুধ খাওয়ার চল আছে।

আমলকী

আমলকী একটা মাঝারি ধরনের পর্ণমোচী বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ।

আমলকী ফল নিশ্চয়ই দেখেছ। কেমন দেখতে আর কী কী কাজে লাগে লেখো।

আমলকী ফল কেমন দেখতে	আমলকী ফল কী কাজে লাগে

ওষধি গুণ

(i) আমলকী ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C আছে। দাঁতের মাড়ি ফোলায় আমলকী ফল খুব কাজে আসে।

(ii) শুকনো আমলকী ফল পেটের গোলমাল, রক্তক্ষরণ আর আমাশয় বন্ধ করতে সক্ষম।

(iii) বমিভাব আর কোষ্ঠকাঠিন্যেও ভালো কাজ করে আমলকী।

(iv) আমলকী ফলের বীজ হাঁপানি, পিত্তরোগ আর ফুসফুসের প্রদাহে উপকারী।

(v) অ্যানিমিয়া, বার্ধক্য ও ক্যান্সার প্রতিরোধে আমলকী ফল কার্যকরী।

তোমার এলাকায় আমলকী ফল আর কী কী ভাবে ব্যবহার করা হয় লেখার চেষ্টা করো।

ত্রিফলা : ত্রিফলা হলো একধরনের আয়ুর্বেদিক ওষুধ। 'ত্রিফলা' কথাটার মানে তিনটে ফল। ত্রিফলায় থাকে সমপরিমাণে আমলকী, হরিতকি আর বহেড়া (বীজ ছাড়া)। ত্রিফলাচূর্ণ জোলাপের কাজ করে, যা আমাদের শরীরের পরিপাকনালীকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। ত্রিফলা রক্ত-পরিষ্কারক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ত্রিফলায় খুব বেশি পরিমাণে ভিটামিন C থাকে। তাই ত্রিফলাকে অনেকসময় সহযোগী খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

নয়নতারা

নয়নতারা একবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ।

ওষধি গুণ

(i) নয়নতারা পাতা বহুমূত্র রোগের একটা ভালো ওষুধ।

(ii) মূত্র বৃদ্ধিকারক, আমাশয় প্রতিরোধক, রক্তক্ষরণ প্রতিরোধক গুণ আছে নয়নতারার।

(iii) রক্তার্শে আর বোলতার কামড়ে নয়নতারা পাতা ব্যবহার করলে উপকার পাওয়া যায়।

(iv) এই গাছের মূলে থাকে রৌবেসিন (Raubasine) নামে একটি উপক্ষার। মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালনে কোনোরকম বাধার সৃষ্টি হলে এই উপক্ষার তা দূর করতে সাহায্য করে।

(v) ভিনক্রিস্টিন (Vincristine) আর ভিনব্লাস্টিন (Vinblastine) নামের অন্য দুটো উপক্ষারও পাওয়া যায়

নয়নতারায়। ব্লাড ক্যানসার আর অন্যান্য কয়েক ধরনের ক্যানসারের মতো দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের জন্য বর্তমানে চিকিৎসাজগতে এই দুটি উপক্ষার ব্যবহার করা হচ্ছে। রক্তের ক্যানসার ছাড়াও টিউমার প্রশমনেও এই দুটি উপক্ষার বেশ কার্যকরী।

পুদিনা একটা বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ।

ওষধি গুণ

(i) পুদিনার শরবত পেটের গোলমালে খুব উপকারী। এছাড়াও মূত্রের পরিমাণ বাড়াতে, বমিভাব দূর করতে পুদিনা সাহায্য করে।

(ii) পেট ফাঁপা, বদহজম, বাচ্চাদের পাতলা পায়খানা আর মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে পুদিনা কার্যকরী।

(iii) পুদিনা জীবাণুনাশক হিসাবেও কাজ করে।

(iv) কাশি, অরুচি ও পাকস্থলীর প্রদাহে পুদিনা উপকারী।

(v) পুদিনার প্রলেপ ব্যথার জায়গায় লাগালে বাতের যন্ত্রণা ও মাথাধরা কমাতে সাহায্য করে।

ঘৃতকুমারী হলো বহুবর্ষজীবী বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদ।

ওষধি গুণ

(i) ভিটামিন, খনিজ মৌল, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও ফ্যাটি অ্যাসিড ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাসে পাওয়া যায়।

(ii) অ্যাসিডের আধিক্য, রক্তের ঘন হয়ে যাওয়ার প্রবণতা, দূষণজনিত চাপ ও অস্থিসন্ধির প্রদাহ কমাতে ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

(iii) গ্যাস্ট্রিক ক্ষত, কোষ্ঠকাঠিন্য, তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত চামড়ার ক্ষতে ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

(iv) ঘৃতকুমারীর নির্যাসে অ্যান্টিপাইরেটিক উপাদান থাকায় জ্বর হলে তাপমাত্রা কমাতে এটি ব্যবহৃত হয়।

(v) ঘৃতকুমারীর পাতার নির্যাসে প্রায় 99% জল থাকে। তাই চামড়াকে আর্দ্র করতে, স্থিতিস্থাপকতা বাড়াতে এই নির্যাস ব্যবহার করা হয়। এই নির্যাস ব্যবহার করলে চামড়ায় রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ত্বকের কলাকোশের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ও সংশ্লেষ -ক্ষমতা বাড়ে। ফলে ত্বক শিথিল হয় না।

(vi) মানসিক চাপ ও উদ্‌বেগ কমাতে ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাস ব্যবহার করা হয়।

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

পাঠ্যসূচি

1.1 বল ও চাপ
- ক) বলের পরিমাপ ও একক
- খ) ঘর্ষণ ও তার পরিমাপ
- গ) তরলের ঘনত্ব ও চাপ
- ঘ) তরলের চাপ
- ঙ) বায়ুর চাপ
- চ) বস্তুর ভাসন, প্লবতা ও আর্কিমিদিসের নীতি

1.2 স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল
- ক) অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ
- খ) অভিকর্ষ ও মহাকর্ষের প্রভাবে গতি
- গ) স্থির তড়িৎ বল ও আধানের ধারণা
- ঘ) তড়িৎ বলের প্রভাবে গতি

1.3 তাপ
- ক) তাপের পরিমাপ ও একক
- খ) অবস্থার পরিবর্তন ও লীনতাপের ধারণা
- গ) তাপের প্রবাহ পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ

1.4 আলো
- ক) প্রতিবিম্ব
- খ) আলোর প্রতিসরণের সূত্র

2.1. পদার্থের প্রকৃতি
- ক) পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম
- খ) ধাতু ও অধাতুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
- গ) মানবজীবনে ও পরিবেশে ধাতু ও অধাতুর ব্যবহার

2.2. পদার্থের গঠন
- ক) পরমাণু ও অণুর ধারণা
- খ) পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা
- গ) যোজ্যতা ও রাসায়নিক বন্ধন

2.3 রাসায়নিক বিক্রিয়া
- ক) রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবক
- খ) অনুঘটক
- গ) তাপগ্রাহী ও তাপমোচী পরিবর্তন
- ঘ) জারণ বিজারণের ধারণা

2.4. তড়িতের রাসায়নিক প্রভাব

তড়িৎ বিশ্লেষণ ও তড়িৎলেপন

3. কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি
- ক) পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি
- খ) অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন

4. প্রকৃতিতে ও জীবজগতে বিভিন্নরূপে কার্বন যৌগের অবস্থান
- ক) প্রকৃতিতে ও জীবজগতে কার্বন যৌগের অবস্থান
- খ) বহুরূপতা
- গ) জ্বালানি মূল্য বা ক্যালোরি মূল্য
- ঘ) কার্বন ডাইঅক্সাইড
- ঙ) গ্রিনহাউস এফেক্ট
- চ) কার্বনঘটিত পলিমার ও তার ব্যবহার

5. প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ
- ক) বজ্রপাত
- খ) মহামারি

6. জীবদেহের গঠন
- ক) জীবদেহ গঠনের ধাপসমূহ
- খ) মাইক্রোস্কোপ
- গ) কোশের বৈচিত্র্য
- ঘ) বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্য ও কোশীয় বিশেষত্ব
- ঙ) প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ও কোশীয় অঙ্গাণু
- চ) বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও কোশের ওপর প্রভাব

7. অণুজীবের জগৎ
- ক) অণুজীবের বৈচিত্র্য
- খ) জীবজগতের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক (পরজীবী, মিথোজীবী ও মৃতজীবী)
- গ) পরিবেশে অণুজীবের ভূমিকা (কৃষি,খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ প্রস্তুতি, বর্জ্য পরিষ্কার)

8. মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন
- ক) ফসল, ফসলের বৈচিত্র্য ও ফসল উৎপাদন
- খ) উদ্ভিদজাত খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি
- গ) প্রাণীজ খাদ্য চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি

9. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি
- ক) অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি
- খ) বয়ঃসন্ধি

10. জীববৈচিত্র্য, পরিবেশের সংকট ও বিপন্ন প্রাণী সংরক্ষণ
- ক) বন
- খ) সমুদ্রের নীচের জীবন
- গ) মরু অঞ্চলের জীবজগৎ
- ঘ) মেরু অঞ্চলের জীবজগৎ
- ঙ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ
- চ) কয়েকটি বিপন্ন বন্যপ্রাণী ও তাদের সংরক্ষণ

11. আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদজগৎ
- ক) পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাছ
- খ) মশলা ও গাছ
- গ) ওষধি গাছ

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1.	ভৌত পরিবেশ— 1.1 বল ও চাপ (1-16)	5
	1.2 স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল (17-28)	
2.	মৌল, যৌগ ও—2.1 পদার্থের প্রকৃতি (54-78)	5
	—2.2 পদার্থের গঠন (79-91)	
3.	দেহের গঠন — (173-190)	5

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1.	ভৌত পরিবেশ—1.3 তাপ	5
2.	মৌল, যৌগ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া—2.3 রাসায়নিক বিক্রিয়া (92-109)	5
	—2.4 তড়িতের রাসায়নিক প্রভাব (110-117)	5
5.	প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ (160-172)	5
8.	মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন (202-223)	5

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন :

1.	ভৌত পরিবেশ 1.4 আলো (46-53)	7
3.	কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি (118-133)	7
4.	কার্বন ও কার্বনঘটিত যৌগ (134-159)	7
7.	অণুজীবের জগৎ (191-201)	7
9.	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি (224-242)	7
10.	পরিবেশের সংকট ও সংরক্ষণ (243-279)	7
11.	আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদ জগৎ (280-293)	7

বিশেষ মন্তব্য : তৃতীয় পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট অংশগুলির সঙ্গে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত বল ও চাপ; পদার্থের গঠন ও দেহের গঠন অধ্যায়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে। সংযোজিত অংশটি ধরে প্রতিটি বিষয় অবলম্বনে 7 নম্বরের প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের জন্য তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধ্যায় ও তা থেকে তৈরি করা প্রশ্নের মূল্যায়নের সারণিটি হবে নিম্নরূপ :

অধ্যায়	প্রশ্নের মূল্যমান
1.1. বল ও চাপ	7
1.4. আলো	7
2.2 পদার্থের গঠন	7
3. কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি	7
4. কার্বন ও কার্বনঘটিত যৌগ	7
6. দেহের গঠন	7
7. অণুজীবের জগৎ	7
9. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি	7
10. পরিবেশের সংকট ও সংরক্ষণ	7
11. আমাদের চারপাশের পরিবেশের ও উদ্ভিদ জগৎ	7

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
1) সারণি পূরণ 2) ছবি বিশ্লেষণ 3) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ 4) দলগত কাজ ও আলোচনা 5) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ 6) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন 7) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি 8) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	i) অংশগ্রহণ ii) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান iii) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য iv) সমানুভূতি ও সহযোগিতা v) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো।)

1. সঠিক উত্তর নির্বাচন করো : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) তরলের চাপ ক্রিয়া করে — a) শুধু নীচের দিকে b) শুধু পাশের দিকে c) শুধু উপরের দিকে d) সবদিকে সমানভাবে।

ii) একটা ছোটো বস্তুকে কিছুটা উপর থেকে ফেলে দিলে। বস্তুটা নীচের দিকে পড়বে। তাহলে — a) বস্তু পৃথিবীকে বেশি বলে আকর্ষণ করবে b) পৃথিবী বস্তুকে বেশি বলে আকর্ষণ করবে c) বস্তু ও পৃথিবী দুজনেই দুজনকে সমান বলে আকর্ষণ করবে d) উপরের কোনোটাই ঠিক নয়।

iii) সিসা ও টিন মিশিয়ে ফিউজ তার তৈরি করা হয় কারণ তাতে — a) পরিবাহী তারের রোধ কমে b) পরিবাহী তারের গলনাঙ্ক সিসা ও টিন উভয়ের গলনাঙ্কের চেয়ে কমে c) পরিবাহী তার আরও শক্ত হয় d) সিসা ও টিন সহজে পাওয়া যায়।

iv) দুটি আয়নাকে এমনভাবে রাখা হলো যাতে তাদের মধ্যবর্তী কোণ হয় 60^0। আয়না দুটির মাঝখানে একটি বস্তু রাখলে মোট প্রতিবিম্বের সংখ্যা হবে — a) 3টে b) 4টে c) 5টা d) 6টা।

v) টেবিলের ওপর একটি বই স্থির অবস্থায় রয়েছে। বইটি স্থির থাকার কারণ — a) বইটির ওপর কোনো বল কাজ করছে না। b) বইটির ওজন ও টেবিলের লম্ব প্রতিক্রিয়া পরস্পর সমমানের ও পরস্পরের বিপরীতমুখী। c) বইটির তলদেশে টেবিলের দেওয়া কোনো ঘর্ষণ বল কাজ না করার জন্য। d) বস্তুর ওজন টেবিলের লম্ব প্রতিক্রিয়ার চেয়ে বেশি।

vi) যদি বায়ুতে কোনো বস্তুর ওজন W_1 ও তরলে নিমজ্জিত হলে তার ওপর ক্রিয়াশীল প্লবতা W_2 হয়, নীচের কোনটি ভাসনের শর্ত ?— a) $W_1 > W_2$ b) $W_1 = W_2$ c) $W_1 < W_2$ iv) $W_1 \neq W_2$ হলেই চলবে।

vii) একটা ক্যাম্বিস বলকে ওপর থেকে ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীর টানে নীচের দিকে নেমে আসে। কিন্তু পৃথিবী ও বস্তু পরস্পরকে সমান বলেই আকর্ষণ করে। তাহলে ক্যাম্বিস বলই কেন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, উলটো হয় না কেন ? — a) কারণ ক্যাম্বিস বলটির টানে পৃথিবীতে সৃষ্ট ত্বরণ। পৃথিবীর টানে ক্যাম্বিস বলটিতে সৃষ্ট ত্বরণের চেয়ে বেশি। b) কারণ পৃথিবীর টানে বস্তুতে সৃষ্ট ত্বরণ, ক্যাম্বিস বলটির টানে পৃথিবীতে সৃষ্ট ত্বরণের চেয়ে বেশি c) কারণ উল্লেখিত উভয় ত্বরণই সমমানের d) ক্যাম্বিস বলটির টানে পৃথিবীতে কোনো ত্বরণ সৃষ্টি হয় না।

viii) একটা টেস্টটিউবে জিঙ্ক ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় একটা বর্ণহীন গ্যাস উৎপন্ন হলো যা শব্দসহ নীল শিখায় জ্বলে উঠে নিভে যায়। গ্যাসটা হলো— (a) অক্সিজেন (b) নাইট্রোজেন (c) কার্বন ডাইঅক্সাইড (d) হাইড্রোজেন

ix) জলের মধ্যে পোড়াচুন দিলে প্রচুর স্টিম উৎপন্ন হয় কারণ— (a) পোড়াচুন খুব গরম পদার্থ (b) পোড়াচুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া তাপগ্রাহী বিক্রিয়া (c) পোড়াচুনের সঙ্গে জলের বিক্রিয়া তাপমোচী বিক্রিয়া (d) এদের কোনোটিই নয়।

x) নীচের কোনটি তড়িৎবিশ্লেষ্য— (a) চিনি (b) অ্যালকোহল (c) গ্লুকোজ (d) নুন

xi) নীচের কোন্ অক্সাইডটি উভধর্মী — (a) কার্বন ডাইঅক্সাইড (b) ক্যালশিয়াম অক্সাইড (c) সালফার ডাইঅক্সাইড (d) জিঙ্ক অক্সাইড

xii) কোন্‌টি অক্সিজেনের বৃহৎ শিল্পব্যবহার— (a) অ্যামোনিয়া তৈরি (b) ইউরিয়া তৈরি (c) সোডা তৈরি (d) ইস্পাত তৈরি

xiii) ডেঙ্গি রোগের জীবাণু বহন করে যে প্রাণী সেটি হলো— (a) অ্যানোফিলিস মশা (b) কিউলেক্স মশা (c) এডিস মশা (d) মাছি

xiv) DOTS পদ্ধতিতে যে রোগের চিকিৎসা করা হয় সেটি হলো — (a) কালাজ্বর (b) স্মল পক্স (c) হেপাটাইটিস (d) যক্ষ্মা

xv) গলজি বস্তু সৃষ্টি হয় যে অঙ্গাণু থেকে সেটি হলো ---(a) এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা (b) রাইবোজোম (c) কোশপর্দা (d) লাইসোজোম

xvi) প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করে--- (a) গলজি বস্তু (b) সাইটোপ্লাজম (c) লাইসোজোম (d) রাইবোজোম

xvii) জিয়ার্ডিয়াসিস রোগটি হলো — (a) ব্যাকটেরিয়াঘটিত (b) ছত্রাকঘটিত (c) ভাইরাসঘটিত (d) আদ্যপ্রাণীঘটিত

xviii) খারিফ ফসলের একটি উদাহরণ হলো— (a) গম (b) ভুট্টা (c) ছোলা (d) সরষে

xix) কৃত্রিম পদ্ধতিতে মাছের ডিমপোনা তৈরি করতে যে গ্রন্থির নির্যাস ব্যবহার করা হয় সেটি হলো--- (a) অগ্ন্যাশয় (b) পিট্যুইটারি (c) শুক্রাশয় (d) থাইরয়েড

x) ইনসুলিন ক্ষরিত হয় যে গ্রন্থি থেকে সেটি হলো — (a) অগ্ন্যাশয় (b) থাইরয়েড (c) অ্যাড্রিনাল (d) পিট্যুইটারি

xi) নালিপদের সাহায্যে চলাফেরা করে এমন একটি প্রাণী হলো — (a) হাঙর (b) সাগরকলম (c) তারামাছ (d) অক্টোপাস

xii) সুন্দরবন হলো একটি— (a) অভয়ারণ্য (b) ন্যাশনাল পার্ক (c) সংরক্ষিত বন (d) বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ

xiii) কারকিউমিন যৌগটি পাওয়া যায় যে মশলায় সেটি হলো — (a) দারচিনি (b) হলুদ (c) রসুন (d) আদা

xiv) আদ্যপ্রাণীর দেহে কোষের সংখ্যা— (a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

xv) আমেরিকার মরু অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ানরা পাথরের তৈরি যে বাড়িতে থাকে তার নাম —(a) ইগলু (b) পুয়েবলা (c) তাঁবু (d) ঝুপড়ি

2. ঠিক বাক্যের পাশে '✓' আর ভুল বাক্যের পাশে '×' দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) ম্যালেরিয়া কথাটির অর্থ হলো খারাপ বায়ু। ☐ ii) যক্ষ্মা বায়ুবাহিত মারণরোগ। ☐ iii) মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপর্দা ভাঁজ হয়ে ক্রিস্টি গঠন করে। ☐ iv) খুব শুকনো ও ঠান্ডা পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীদের কোষে অ্যান্টিফ্রিজ প্রোটিন থাকে। ☐ v) থার্মোফিলিক ব্যাকটেরিয়া (100^0C) তাপমাত্রার কাছাকাছি তাপমাত্রায় বংশবৃদ্ধি করে। ☐ vi)ক্লোরোমাইসেটিন হলো একধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ। ☐ vii) অজৈব সার মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ায়। ☐ viii) আউস ধান জমিতে একেবারে সরাসরি বোনা হয়। ☐ ix) মাইনর কার্পের উদাহরণ হল মৃগেল। ☐ x) মেয়েদের শরীরে থাকা জনন গ্রন্থির নাম হলো শুক্রাশয়। ☐ xi) আত্মসচেতনতা হল জীবনকুশলতা চর্চার একটি অন্যতম দিক। ☐ xii) কেল্প হলো খুব বড়ো সামুদ্রিক শ্যাওলা। ☐ xiii) মরুভূমির মেশকুইট গাছে পাতা থাকে না। ☐ xiv) গন্ডারের খড়্গ তৈরি হয় কেরাটিন দিয়ে। ☐ xv) হলুদ একটা চিরহরিৎ উদ্ভিদ। ☐ xvi) আমলকী ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C আছে। ☐

3. শূন্যস্থান পূরণ করো : (প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য 1 নম্বর)

i) একটি চোঙাকৃতির ড্রামের তলদেশে ড্রামটিতে অবস্থিত জলের চাপ _______ হয়ে যাবে যদি ড্রামের জল অর্ধেক বের করে নেওয়া হয়। ii) জলে ভাসমান অবস্থায় একটি বস্তুর ওজন 12N। তাহলে ঊর্ধ্বমুখী প্লবতা_______N । iii) অভিকর্ষজ ত্বরণ বস্তুর _______ নিরপেক্ষ। iv) কোন পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বার করে নিলে তা _______ হয়ে পড়বে। v) তুমি আয়নার দিকে 3 m সরে এলে তোমার প্রতিবিম্ব তোমার দিকে _______ m সরে আসবে। vi) পেরিস্কোপে আলোর _______ধর্মকে কাজে লাগানো হয়। vii) দুটি মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক সমান হলে আপতিত ও প্রতিসৃত রশ্মির মধ্যে কোণের মান হবে _______ । viii) বিশুদ্ধ বরফ অপেক্ষা নুন মেশানো বরফের গলনাঙ্ক_______। ix) শীতকালে একটা মোটা জামার চেয়ে দুটি পাতলা জামা পরলে শরীর বেশি _______ থাকে। x) ইগলু বরফ দিয়ে বানানো হয় কারণ বরফ তাপের_______। xi) মরীচিকা_______প্রতিবিম্বের উদাহরণ। xii) সাধারণত: ধাতুর তাপ পরিবাহিতা অধাতুর চেয়ে _____________ যদিও _____________ এবং _____________ অধাতু দুটো এই বিবৃতির ব্যতিক্রম: xiii) সোনার প্রসারণশীলতা লোহার চেয়ে ___________ বলেই সোনার সূক্ষ্ম তার তৈরি করা সম্ভব হয়; xiv)

মৌল অণুর কল্পনা করেন ______________ । xv) প্রাচীন গ্রিসে ______________ ও ______________ পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন xvi) ${}^{206}_{82}Pb$ পরমাণুতে প্রোটন , ইলেকট্রন ও নিউট্রনের সংখ্যা যথাক্রমে ____________ , _____________ , ও _____________ । xvii) ${}^{14}_{7}N$ ও ${}^{14}_{6}C$ পরস্পরের _____________ । xviii) সূর্যালোকের _____________ রশ্মিই প্রধানত তাপের অনুভূতি সৃষ্টি করে। xix) _____________ অক্সাইড ধাতুর অক্সাইড হলেও উভধর্মী প্রকৃতির। xx) কঠিন বিক্রিয়কের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ ___________ । xxi) হাইড্রোজেনের সর্ববৃহৎ শিল্পব্যবহার হলো _____________ তৈরি। xxii) জলের তড়িৎবিশ্লেষণে _____________ ও ___________ গ্যাস পাওয়া যায়। xxiii) $ZnO + C \rightarrow Zn + CO$ বিক্রিয়ায় ___________ জারিত ও ___________ বিজারিত হয়েছে। xxiv) ঘৃতকুমারীর নির্যাসে ___________ উপাদান থাকায় জ্বর হলে তাপমাত্রা কমাতে ব্যবহার করা হয়। xxv) দারচিনি গাছের ____________ থেকে পাওয়া যায়। xxvi) সুন্দরী হলো একধরনের ____________ উদ্ভিদ। xxvii) ব্যথা কমানোর ওষুধ ____________ শকুনের বৃক্ককে নষ্ট করে দেয়। xxviii) ___________ মেরুতে পেঙ্গুইনদের দেখা যায়। xxix) তারামাছের বাহুর সংখ্যা ___________ । xxx) টেস্টোস্টেরন ___________ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। xxxi) গোল্ডেন রাইসে ___________ ভিটামিনের পরিমাণ বেশি। xxxii) ___________ ব্যাকটেরিয়া দই তৈরিতে সাহায্য করে। xxxiii) ক্ল্যামাইডোমোনাস হল এককোশী ___________ । xxxiv) প্রাণীকোশের বিভাজনে অংশগ্রহণ করে _____________ নামক অঙ্গাণু । xxxv) কালাজ্বরের আরেক নাম _____________ জ্বর। xxxvi) _____________ ব্যাকটেরিয়া বর্জ্যকে ভেঙে মিথেন গ্যাস তৈরি করে।

4. স্তম্ভগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো : **(প্রতিটি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 1নম্বর)**

(নমুনা হিসাবে একটি করে দেওয়া হলো)

I.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ	'C' স্তম্ভ
i) সংকট কোণ	a) পৃথিবীর টান	1) বিকিরণ
ii) সমসংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন	b) উর্ধ্বমুখী বল	2) মরীচিকা
iii) তাপের সঞ্চালন	c) অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন	3) অভিকর্ষ বল
iv) বস্তুর ওজন	d) গতির বিরুদ্ধে বাধা	4) পরমাণু নিস্তড়িৎ
v) প্রবাহীতে নিমজ্জিত বস্তু	e) মাধ্যম নিরপেক্ষ	5) ঘর্ষণ বল
vi) স্থির বস্তুতে গতি সৃষ্টির চেষ্টা	f) ইলেকট্রন ও প্রোটনের আধানের মান সমান কিন্তু বিপরীত প্রকৃতির	6) প্লবতা

উ: (b) - (iv) - (4)

II.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
i) আয়তন × ঘনত্ব	a) তরলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল বেশি হলে
ii) পতনশীল বস্তুর বেগ	b) সংকট কোণের মান কম
iii) বাষ্পায়ন দ্রুত হয়	c) সময় বাড়ার সঙ্গে বাড়ে
iv) হিরে চকচক করে	d) ভর

III.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
i) ক্যাথোডে	a) ইস্পাত তৈরিতে প্রয়োজন।
ii) অ্যানোডে	b) বিশেষ বিশেষ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি করে।
iii) কার্বন ডাইঅক্সাইড	c) মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য।

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
iv) অক্সিজেন	d) নন-বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার।
v) অ্যাসিটিক অ্যাসিড	e) বিজারণ ঘটে।
vi) পিভিসি	f) গ্রিনহাউস গ্যাস।
vii) সেলুলোজ	g) জারণ ঘটে।
viii) উৎসেচক বা এনজাইম	h) বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার।
ix) LPG	i) তরল জ্বালানি।
x) বায়োডিজেল	j) গ্যাসীয় জ্বালানি।

IV.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
i) সুন্দরী	a) ফাঁপা পর্বমধ্যযুক্ত চিরসবুজ উদ্ভিদ
ii) মাইটোকন্ড্রিয়া	b) সমুদ্র ফেনা
iii) ইস্ট্রোজেন	c) 2,4-D
iv) আগাছানাশক	d) জোড়কলম
v) বাঁশ	e) শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়া
vi) রাইজোবিয়াম	f) হরমোন
vii) গঙ্গার শুশুক	g) নাইট্রোজেন স্থিতিকরণ
viii) গন্ডার	h) লবণাক্ত অঞ্চল
ix) কাটল ফিস	i) শাখাকলম
x) সিয়ন আর স্টক	j) ইকোলোকেশন
	k) জলদাপাড়া

5. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1নম্বর)

i) একটি বস্তু কোন তরলে আংশিক নিমজ্জিত অবস্থায় ভাসছে। বস্তুর ওজন ও অপসারিত তরলের ওজনের মধ্যে সম্পর্ক কী? ii) দুটি ভিন্ন ভরের বস্তুকে অবাধে পড়তে দেওয়া হলো। ভারী বস্তুটি যদি 2 সেকেন্ড পরে মাটিতে পড়ে হালকা বস্তুটি কত সময় পরে মাটিতে পড়বে? iii) হুবহু একইরকম দুটি বোতলে একই পরিমাণের ভিন্ন ভিন্ন তরল রাখা আছে। বোতলসমেত একটির ভর 2 kg ও অপরটির ভর 2.5 kg। কোন তরলের ঘনত্ব বেশি? iv) জলপূর্ণ একটি ঢাকনা খোলা বোতলের গায়ে বোতলের তলদেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় দুটি ফুটো করা হলো। কোন ফুটো থেকে জল বেশি বেগে নির্গত হবে? ফুটো দুটি একই উচ্চতায় থাকলে কি একই ঘটনা ঘটত? v) জলের ওপর তেল ভাসে। তাহলে জল ও তেলের মধ্যে কার ঘনত্ব বেশি? vi) একটি কঠিন বস্তু ও একটি তরলের ঘনত্ব সমান। ওই কঠিন বস্তুটিকে ওই তরলে নিমজ্জিত করলে কী ঘটবে? vii) কোনো বস্তুকে 11.2 km/s বেগে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপর দিকে ছোড়া হলো। কী ঘটবে? viii) 10 N ও 20 N ওজনের দুটি বস্তুকে একই উচ্চতা থেকে একসঙ্গে অবাধে পড়তে দেওয়া হলো। কোনটি আগে মাটি স্পর্শ করবে? ix) হিমমিশ্রণ কোন নীতিতে কাজ করে? x) আলোর কোন ধর্মের জন্য সূর্য অস্ত চলে যাওয়ার পরেও সূর্যকে আমরা পশ্চিম আকাশে কিছুক্ষণ দেখতে পাই? xi) একটি 10 kg ভরের বস্তুর ওজন কত? ($g = 9.8 m/s^2$)। xii) পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো বস্তুর ওজন 25 N হলে তার ভর কত? xiii) কাচকে 'X' পদার্থ দিয়ে ঘষলে 'X' ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয়। তাহলে এক্ষেত্রে কোন পদার্থটি ইলেকট্রন গ্রহণ ও কোনটি ইলেকট্রন বর্জন করেছে? xiv) কোনো কঠিনকে খোলা হাওয়ায় উত্তপ্ত করলে তরল অবস্থা পাওয়া যাচ্ছে না এমন দুটো উদাহরণ দাও। xv) কোনো তরলের স্ফুটনাঙ্ক উল্লেখ করার সময় চাপ উল্লেখ করা উচিত কেন? xvi) তাপমোচী রাসায়নিক বিক্রিয়ার দুটো ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো। xvii) হাইড্রোজেন সালফাইড ও কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের অণুর প্রাথমিক গঠন কেমন হবে এঁকে দেখাও। (কার্বনের যোজ্যতা 4, সালফারের যোজ্যতা 2; H ও Cl একযোজী)। xviii) গলিত $CaCl_2$ -র তড়িৎবিশ্লেষণে ক্যাথোড ও অ্যানোড সংঘটিত বিক্রিয়া দুটো লেখো। xix) লোহার পাইপে জিঙ্কের প্রলেপ দিতে হলে কোনটাকে ক্যাথোড ও

কোনটাকে অ্যানোডরূপে ব্যবহার করবে? xx) চারকোলের কোন ধর্মের জন্য জল, বিভিন্ন দ্রবণ ও গ্যাস পরিশোধন করতে ব্যাপকভাবে চারকোল ব্যবহৃত হয়? xxi) কার্বন ডাইঅক্সাইডের দুটো গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ব্যবহার উল্লেখ করো। xxii) একটা প্রকৃতিজাত বায়োডিগ্রেডেবল পলিমার ও একটা কৃত্রিম, নন্‌-বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারের উদাহরণ দাও। xxiii) জৈব আবর্জনা থেকে জীবাণুর ক্রিয়ায় প্রস্তুত বায়োগ্যাসের মুখ্য উপাদান কী? xxiv) জৈব যৌগ গঠনে O, P, S, C —এই মৌলদের মধ্যে কোন্‌টা অপরিহার্য? xxv) শক্তির তিনটে বিকল্প উৎসের নাম লেখো। xxvi) জিঙ্ক ফসফেট, ক্যালশিয়াম নাইট্রেট, ফেরিক সালফেট ও মারকিউরাস নাইট্রেটের সংকেত লেখো। xxvii) একটা ধাতু ও একটা অধাতুর চিহ্ন লেখো যাদের যৌগ মানুষের দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। xxviii) ইন-সিটু সংরক্ষণ কোথায় দেখা যায়? xxix) AIDS রোগের জন্য দায়ী ভাইরাসের পুরো নামটা লেখো। xxx) ক্যাকটাসের কাণ্ডের কোশে জল সঞ্চয়ী উপাদানটির নাম লেখো। xxxi) কোন অণুজীব পাটকে জলে চুবিয়ে রাখলে পাটের কাণ্ডের পেকটিন নষ্ট করে দেয়? xxxii) আমন ধান চাষের জন্য কোন ধরনের মাটি উপযোগী? xxxiii) মুরগি পালনের একটি আধুনিক পদ্ধতির নাম লেখো। xxxiv) থাইরয়েড গ্রন্থি কোথায় থাকে? xxxv) একটি এককোশী ফাইটোপ্ল্যাংকটনের নাম লেখো। xxxvi) এস্কিমো শব্দের অর্থ কী? xxxvii) এমন একটি রোগের নাম লেখো যার জন্য ফ্ল্যাভিভাইরাস দায়ী। xxxviii) এলাচ ব্যবহার করা এমন একটা মিষ্টি খাবারের নাম লেখো। xxxix) রক্তে থাকা হয় এমন একটা কোশের নাম লেখো যেটা নিজের আকার পরিবর্তন করতে পারে।

6. দু-একটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 2 নম্বর)

i) দুটি বস্তু পরস্পর ঘষা হলো। বস্তুদুটি তড়িৎগ্রস্ত হলো— কেন এমন হলো? ii) কোন বস্তুর মোট ভরকে বস্তুটির মোট আয়তন দিয়ে ভাগ করা হলো। এতে বস্তুটির পরিমাপের কোন রাশি পাওয়া গেল? তা তুমি কীভাবে পেলে? iii) টেবিলের ওপর একটি ভারী বস্তু রাখা আছে। বস্তুটির ওপর তুমি ক্রমবর্ধমান বল প্রয়োগ করায় সেটি কিছুক্ষণ পর চলতে শুরু করল। বস্তুটিকে ঠেলা মাত্রই বস্তুটিতে গতি সৃষ্টি হয় না কেন? বস্তুটি কখন সচল হবে? iv) সাধারণত বাড়ির জল সরবরাহের ট্যাঙ্ক বাড়ির সবচেয়ে উঁচুস্থানে রাখা হয় কেন? v) মাছ সংরক্ষণের জন্য বিশুদ্ধ বরফ না নিয়ে নুন-মেশানো বরফ নেওয়া হয় কেন? vi) বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কারণ দুটি লেখো। vii) পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা $0^{o}C$ বা তার কম হলে বিশুদ্ধ বরফ গলতে পারে না কেন? [ধরে নেওয়া যাক অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত আছে।] viii) হিরের উচ্চ তাপ পরিবাহিতার একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো। ix) কার্বন ডাইঅক্সাইডের জারণধর্মের সমীকরণসহ উদাহরণ দাও। x) শুকনো খাবার সোডা ও অক্সালিক অ্যাসিডের গুঁড়ো মেশালে কোনো বিক্রিয়া ঘটে না; কিন্তু এই মিশ্রণে জল দিলে দ্রুত বিক্রিয়া ঘটে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বুদ্‌বুদ্‌ বেরোয়। এর কারণ কী হতে পারে? xi) জলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রাব্যতার উপর (a) উষ্ণতা ও (b) চাপের প্রভাব উল্লেখ করো। xii) উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস পাঠালে যে বিক্রিয়া ঘটবে তার সমীকরণ লেখো। xiii) আদা, রসুন আর পেঁয়াজ ব্যবহার করা হয় তোমার জানা এমন দুটো রান্নার নাম লেখো। xiv) মেজর কার্প ও মাইনর কার্পের দুটো পার্থক্য উল্লেখ করো। xv) উত্তরবঙ্গে মানুষ-হাতি সংঘাতের কারণ কী? xvi) মাটি থেকে হারিয়ে যাওয়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান কী কী প্রাকৃতিক উপায়ে ফিরিয়ে আনা যায়? xvii) বর্জ্য পরিষ্কারে ব্যাকটেরিয়া কীভাবে সাহায্য করে? xviii) লোহিত রক্তকণিকার আকার গোল ও দু-পাশ চ্যাপ্টা চাকতির মতো হওয়ার কারণ কী? xix) কোন কোন সমস্যায় আমলকী কাজে লাগে ?

7. ৩-৪টি বাক্যে উত্তর দাও: (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 3 নম্বর)

i) জলের ভেতর বুদবুদ চকচকে দেখায় কেন? ii) তোমার কাছে গরম খাবার অনেকক্ষণ ধরে গরম রাখার পাত্র (যেমন ফ্লাস্ক) নেই। অথচ কোন গরম খাবার তোমাকে অনেকক্ষণ গরম রাখতে হবে। তুমি কী কী করবে? কেন করবে? iii) প্লাস্টিকের স্ট্রকে সিল্কের কাপড় দিয়ে বেশ কয়েকবার ঘষলে। এবার ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোর সামনে ঐ নলটিকে নিয়ে গেলে। দেখা গেল নলটি কাগজের টুকরোগুলোকে আকর্ষণ করছে। এর কারণ কী? iv) একটি স্টিলের চামচ বালতির জলে ফেললে সেটি ডুবে যায়। অথচ চামচের থেকে অনেক ভারী একটি স্টিলের গামলা জলে ভাসে কেন? v) অনেকসময় কাচের ফাটলে আলো পড়লে সেই স্থান বিভিন্ন অবস্থান থেকে চকচকে দেখায় কেন? vi) তরলের সমোচ্চশীলতা ধর্মের একটি বাস্তব প্রয়োগ ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করো। vii) পাশের ছবিটি দেখে তুমি যা বুঝতে পারলে তার ব্যাখ্যা দাও। viii) এমন দুটো সহজ পরীক্ষার উল্লেখ করো যার ফলাফল থেকে বোঝা যেতে পারে যে তরল আর গ্যাসীয় অবস্থায় অণুরা গতিশীল; ix) তোমাকে দুটো টেস্টটিউবের একটায় জিঙ্কের টুকরো আর অন্য একটায় ফেরাস সালফাইডের গুঁড়ো দেওয়া হলো। একটা রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাপেক্ষে এদের শনাক্ত করবে কী করে? ভৌত পর্যবেক্ষণসহ লেখো। x) লোহার মরচে ধরা একটা অবাঞ্ছিত জারণ বিজারণের ঘটনা। কী কী উপায়ে লোহায় মরচে ধরায় বাধা দেওয়া যেতে পারে? xi) "$CuSO_4$ (দ্রবণ) + Fe $\rightarrow$ Cu + $FeSO_4$

(দ্রবণ) বিক্রিয়াটি ইলেকট্রনীয় বিচারে জারণ বিজারণ”— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। xii) Al_2O_3 -এর সঙ্গে অ্যাসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ার উপযুক্ত সমীকরণ দিয়ে বোঝাও কেন একে উভধর্মী অক্সাইড বলা হয়; xiii) কার্বন ডাইঅক্সাইড যে আম্লিক অক্সাইড তা প্রমাণ করতে একটা সহজ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করো। xiv) চুনজলে প্রথমে অল্প ও পরে অতিরিক্ত CO_2 গ্যাস পাঠালে কী ঘটবে সমীকরণ পর্যবেক্ষণসহ লেখো। xv) ঘাসজমির বাস্তুতন্ত্রে একশৃঙ্গ গন্ডারের ভূমিকা কী? xvi) তোমার অভিজ্ঞতা থেকে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের একটা ঘটনা সম্বন্ধে লেখো। xvii) খুব শুকনো ও গরম পরিবেশে ক্যাকটাস কীভাবে মানিয়ে নেয়? xviii) আমের জোড়কলম করা হয় কেন? xix) স্কুইড কীভাবে শিকার ধরে? xx) অ্যান্টার্কটিকার পরিবেশ দূষণের জন্য মানুষ কীভাবে দায়ী? xxi) ময়লা জলে মাছ চাষের সুবিধা কী? xxii) উট কীভাবে মরুভূমির জীবনে মানিয়ে নেয়? xxiii) খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, ওষুধ প্রস্তুতি আর কৃষি— এই তিনটে ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া কীভাবে আমাদের উপকার করে? xxiv) ডায়ারিয়া হলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?

8. গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করো : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 3 নম্বর)

i) 2 বর্গ মি অঞ্চল জুড়ে 14 নিউটন বল কাজ করছে। চাপের মান কত? ii) একটি 50 গ্রাম ভরের পদার্থ খণ্ডের উষ্ণতা 2^0C বাড়াতে 25 ক্যালোরি তাপ লাগে। ঐ পদার্থের আপেক্ষিক তাপ কত? iii) 3200 ক্যালোরি তাপ দিয়ে 0^0C তাপমাত্রায় কত গ্রাম বরফকে ঐ একই তাপমাত্রায় জলে পরিণত করা যাবে? iv) এক ব্যক্তি 5 কিমি/ঘন্টা বেগে একটি আয়নার দিকে হেঁটে আসছে। তার প্রতিবিম্বের বেগ কত হবে? v) পরস্পর d দূরত্বে অবস্থিত দুটি বস্তুর ভর যথাক্রমে m_1 ও m_2। তাদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল F। — (a) প্রথম বস্তুর ভর দ্বিগুণ দ্বিতীয় বস্তুর ভর তিনগুণ করা হলে তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন ঘটবে? (b) ভর স্থির রেখে তাদের মধ্যে দূরত্ব চার গুণ করলেই বা ওই আকর্ষণ বলের কী পরিবর্তন হবে? vi) পৃথিবীর ভর চাঁদের ভরের প্রায় 100 গুণ। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ চাঁদের গড় ব্যাসার্ধের প্রায় চার গুণ। পৃথিবী ও চাঁদের পৃষ্ঠে একটি বস্তুর ওজনের তুলনা করো। [সমাধানের ইঙ্গিত: ধরা যাক, বস্তুটির ভর m, চাঁদের ভর M, চাঁদের ব্যাসার্ধ R, পৃথিবীপৃষ্ঠে ও চন্দ্রপৃষ্ঠে বস্তুটির ওজন যথাক্রমে W_e ও W_m]

$$\frac{W_m}{W_e} = \frac{G\frac{mM}{R^2}}{G\frac{m100M}{(4R)^2}} = \frac{16}{100} = \frac{1}{6} \text{ (প্রায়)]}$$

9. সূত্রের সাহায্যে শব্দছকটি পূরণ করো : (প্রতিটি শব্দের জন্য 1নম্বর)
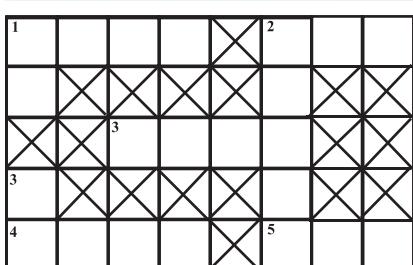
সূত্র

পাশাপাশি:
1. পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপশু
2. হিরে যা দিয়ে তৈরি
3. মরুভূমিতে বাস করা ছোটো ইঁদুরের মতো প্রাণী
4. মরুভূমিতে দেখার ভুল
5. কুয়াশা ও শিশির সৃষ্টি হয় জলীয় বাষ্প দ্বারা ______ বায়ু দিয়ে

ওপরনীচ :
1. সুন্দরবনের প্রধান আকর্ষণ
2. সমুদ্র ফেনা
3. ফলের রাজা
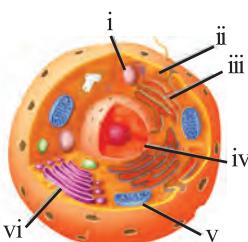
10. পাশে দেওয়া প্রাণীকোশের ছবিতে নিম্নলিখিত অঙ্গাণুগুলো দেখাও: (প্রতিটি অঙ্গাণুর জন্য 1 নম্বর)

লাইসোজোম, কোশ পর্দা, মাইটোকন্ড্রিয়ন, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, নিউক্লিয়াস, গলজি বডি

11. পাশে দেওয়া মৌমাছির জীবনচক্রের ছবিতে ফাঁকা বাক্সগুলো ভরাট করে তোমার খাতায় লেখো। (প্রতিটি শব্দের জন্য 1নম্বর)

শিখন পরামর্শ

নতুনভাবে নির্মিত বিদ্যালয় পাঠক্রমের দিক্‌নির্দেশ অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণির উপযুক্ত এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটির পঠন-পাঠন আর মূল্যায়নের জন্য এখানে কিছু প্রসঙ্গের অবতারণা করা হলো।

তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণিতে শুরু হয়েছে শিশুর পরিবেশ চর্চা। নানারকম হাতেকলমে কাজ, অনুসন্ধান, আদান-প্রদান, কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে তার চারপাশের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন। আমরা চেয়েছি তারা দল বেঁধে কাজ করুক। আরও চাওয়া হয়েছে যে শিশুর জ্ঞানগঠনের এই প্রক্রিয়া যেন কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক-নির্ভর না হয়। আশা করা হয়েছে এর ফলে শিক্ষার্থীর পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান, মূল্যবোধ আর দক্ষতার বিকাশ ঘটবে।

শিশুর পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার রূপায়ণে ষষ্ঠ, সপ্তম আর অষ্টম শ্রেণির 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান'-এর নতুন বইগুলোতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন আর জীববিদ্যার অনুসন্ধানের সঙ্গেই সমন্বয় ঘটানো হয়েছে পরিবেশ চর্চার। বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে যাতে আলোচ্য প্রসঙ্গ বয়সোপযোগী হয়।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা 2005 আর শিক্ষা অধিকার আইন 2009 অনুযায়ী এই বইয়ের ভাষা, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন, ছবি ও বর্ণনা যথাসম্ভব শিশু-বান্ধব ও শিশুকেন্দ্রিক করার চেষ্টা হয়েছে।

আশা করা যায় শিক্ষার্থীর ইতিমধ্যে যতটুকু জ্ঞান, মূল্যবোধ আর দক্ষতা গঠন সম্পন্ন হয়েছে, তার ফলে সে এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। হয়ত এর ফলে শ্রেণিকক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় আপনাদের আরো বেশি করে নানারকম দলগত কাজের আয়োজন করতে হবে। বিজ্ঞান বিষয়ের চর্চায় পরীক্ষাগারের প্রয়োজন কতটা তা নিয়ে আমাদের কোনো সংশয় নেই। চেষ্টা করুন বিদ্যালয়ে সামান্য কিছু উপকরণ সংগ্রহ করার, যাতে আমাদের পড়ুয়ারা আরো বেশি করে হাতেকলমে কাজ করতে পারে। এই সব অনুসন্ধান যেন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। যেখানে প্রয়োজন, শিক্ষার্থী যেন নিজের খাতায়, হাতে-কলমে কাজ আর সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণ লিখে রাখে। আনুষঙ্গিক বিষয়ে তার প্রশ্ন থাকলে, সেটাও লিখে রাখুক। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করুক। এসব কাজে উৎসাহ দিন। 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বিষয়ে নিজস্ব সংগ্রহ গড়ে তুলতে ওদের উৎসাহ দিন। সেগুলো সংরক্ষণের জন্য শ্রেণিকক্ষের একটা অংশ ব্যবহার করুন। দৈনন্দিন জীবনে জীবনকুশলতা চর্চার নানাদিক নিয়ে আলোচনা করুন। ছাত্রছাত্রীদের নানা সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করুন। শিক্ষার্থীরা এসব কাজে কীভাবে অংশগ্রহণ করছে, আপনি সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীর বিকাশ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে আপনি প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রয়োজনে অষ্টম শ্রেণির এই 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটিতে আমরা কিছু প্রসঙ্গকে 'টুকরো কথা' বলে উল্লেখ করেছি। এগুলো গল্পের ছলে পড়বার জন্য, শিক্ষার্থী যেন মুখস্থ না করে। তাদের জানিয়ে দিন পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে এসব নিয়ে প্রশ্ন করা হবে না।

শিক্ষার্থীর প্রতিদিনের কাজ, প্রশ্ন করা, অন্যকে সাহায্য করা, বিদ্যালয় ও তার আশেপাশের পরিবেশকে প্রতিনিয়ত সুন্দর করে তোলার মধ্যে দিয়ে যে সবসময় প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন করা হচ্ছে তাও শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখুন।

আশা করা যায় আপনাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অষ্টম শ্রেণির সব পড়ুয়ার কাছে 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' বইটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

এই বই-এর পঠন-পাঠন সম্পর্কে আপনাদের অভিজ্ঞতা, মতামত ও মূল্যবান পরামর্শের ভিত্তিতে আগামী দিনে বইটির উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে।